

ଅଦୈତ୍ୟାସୁତବିଷ୍ଣୁ

(ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ)

(ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ)

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ଶ୍ରୀଅମୂଳପଦ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

প্রকাশক :

ব্রজেন কবি শ্রীঅমূলপদ স্মৃতি সঙ্ঘ

৫৩/৭, ধানব ঘোষ রোড

কলিকাতা-৭০০০৬১

প্রাপ্তিস্থান :

(১) মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

(২) প্রকাশকের নিকট

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা (৪৫.০০)

মুদ্রাকর :

শ্রীনিরঞ্জনকুমার ঘোষ

রবীনাথ প্রিন্টার্স

৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬



ভূমিকা

ওঁ “যস্মিন্ সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বঃ সৰ্বতচ্চ যঃ ।

যচ্চ সৰ্বমসৌ দেবস্তস্মৈ সৰ্বাঙ্গনে নমঃ ॥”

ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ—মহাভারত ।

গুরু, ঈশ্বর, ইষ্টদেবতা, মাতা, পিতা, বংশের ঋষি আচার্য্যগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই “অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী” গ্রন্থ লিখিত হইল । মৎকর্তৃক সম্পাদিত “শ্রীমদ্ভগবদগীতার” একটি পরিবর্ধিত দ্বিতীয়-সংস্করণ বাহির করিবার ইচ্ছা ছিল । কিন্তু আজকাল কোন বড় বই ছাপান অত্যধিক ব্যয়সাধ্য । সুতরাং অর্থাভাবে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইলাম ।* শ্রীশ্রীগীতার দ্বিতীয়-সংস্করণে সংযোজিত করিবার জন্য কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম । ঐ প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া এবং নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া “অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী” নাম দিয়া ঐকান্ত পুস্তকাকারে এই পুস্তক বাহির করা হইল । “অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী” অদ্বৈত-বেদান্তের তাৎপর্য্য বৃদ্ধি-বার এবং অদ্বৈতমতে গীতার মর্ম্ম বৃদ্ধিবার বিশেষ সাহায্য করিবে । যদিও এই পুস্তকে অদ্বৈতাসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি প্রথমে বৈতবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সাধনাদি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং অদ্বৈতাসিদ্ধান্তেও স্থিত হওয়া যায় না । সেইজন্য এই গ্রন্থে অদ্বৈতরাজ্যে উঠিবার সোপানস্বরূপ নিকামকর্ম্ম, যোগ, ভীক্ত প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে । সুতরাং অন্যবাদিগণও এই গ্রন্থে তাহাদের সাধনার অনুকূল অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইবেন । অদ্বৈতবাদটী অবিবাদ—ইহাতে অন্য সকল মতেরও স্থান আছে ।

এই গ্রন্থ লিখিবার কালে নিম্নলিখিত অদ্বৈতমার্গানুরাগী চিন্তাশীল স্মৃধী ব্যক্তিগণের গ্রন্থসকল হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি । সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিতেছি ।

*গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ এখন প্রকাশিত হইয়াছে ।

(১) শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দৃগ্‌দর্শ্যবিবেক' 'পঞ্চদশী', 'পাতঞ্জলদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

(২) পূজাপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ সম্পাদিত 'অষ্টৈতীসিদ্ধি' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

(৩) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-সম্পাদিত 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ। ('ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন ভাবধারা' নামক প্রবন্ধটির অনেকাংশ ইহাকে ভিত্তি করিয়া লিখিত।)

(৪) শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত—'কৌলমার্গরহস্য'।

(৫) শ্রীনিত্যগোপাল পণ্ডতীর্থ-সম্পাদিত 'বৃহদারণ্যকের' বঙ্গানুবাদ।

(৬) শ্রীবাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 'অষ্টৈতবাদ' নামক গ্রন্থ।

(৭) শ্রীদেবশঙ্কর মিত্র-সম্পাদিত 'বিচার-সাগরের' বঙ্গানুবাদ।

এতদ্ব্যতীত বহু সাধু ও শাস্ত্রসেবা করিয়া দীর্ঘকাল শ্রবণ-মননাদি-সহকারে এই পুস্তক লিখিত। শ্রদ্ধালু পাঠক যত্ন-সহকারে এই পুস্তক পাঠ করিয়া মনন ও নির্দিষ্টাশনণীল হইলে অবশ্যই চিন্তে আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হইবেন। এই পুস্তকে সম্বন্ধেই প্রাচীন ঋষি ও মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা হইয়াছে, আধুনিকতার অনুরোধে শাস্ত্রার্থ বিকৃত করা হয় নাই। তথাপি যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হয়, তবে উহা আমার বুদ্ধিদোষেই হইয়াছে। কিছু মন্দাকর-প্রমাদ রহিয়া গেল, ভাষাগত ত্রুটীও কিছু থাকিবার সম্ভাবনা। সূচীগণ ঐ সকল ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

১৬ই ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৯। }

বিনীত নিবেদক
শ্রীঅমূল্য চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ।

গ্রন্থকারের নিবেদন

ঈশ্বরানুগ্রহে আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীকেশবলাল মেহতা মহাশয়ের ইচ্ছায় ও অর্থানুকূলে “অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী”র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । কেশবলালের এই সদিচ্ছা ও উদারতার জন্য আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি

এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণ হইতে স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে । অধিকন্তু ইহাতে “প্রবঞ্চমালা” নামক দ্বিতীয় ভাগ সংযোজিত হইল । এই ভাগের প্রবঞ্চগদ্য শ্রীশ্রীভোলানন্দ সংন্যাসাশ্রমের “শিবম্” পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল । স্থানে স্থানে উহাদেরই অল্প পরিবর্তন করিয়া এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে । প্রবঞ্চগদ্য বিভিন্ন সময়ে লিখিত—সেই জন্য কোন কোন স্থলে মূলগ্রন্থের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাইবে । আমি উহা এড়াইবার চেষ্টা করি নাই । কারণ (১) উহাতে প্রবঞ্চগদ্যের অঙ্গবিকৃতি ঘটে (২) দ্বন্দ্ব দার্শনিক বিষয়গদ্য লিখিয়া অন্য ভাষায় পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠকের পক্ষে বুদ্ধিবাদ সন্নিবিষ্ট হয় । সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু মদ্রাকর প্রমাদ থাকিয়া গেল । আমাদের দেশের সাধারণ মদ্রালয়ে যে প্রকার ব্যবস্থা উহাতে ঐ প্রকার প্রমাদ অপরিহার্য বলিয়াই মনে হয় । প্রথম সংস্করণ সুধীবৃন্দ ও সংবাদপত্রদ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত ও আদৃত হইয়াছে । আশা করি এই দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকগণকে অধিক আনন্দ প্রদান করিবে । “শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু” । ইতি—

১লা বৈশাখ ১৩৭৬ সাল

}

নিবেদক—

শ্রীঅমলপদ চট্টোপাধ্যায়

“গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥”

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের গ্রন্থকার আমাদের পরমারাধ্য গুরু ৩অমূলপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী ইহবাম পরিত্যাগ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক ৩কেশবলাল মেহতা মহাশয় গ্রন্থকারকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া তাহার গুরুভক্তির নিদর্শন রাখিয়াছিলেন।

৩শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের বহুগুণমণ্ডিত ভক্ত ও গণ্য তাহার লিখিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইসব ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অদ্বৈতামৃতবারিণী গ্রন্থখানি আর ছাপা কপি নাই। অথচ পণ্ডিত মহলে এই বইখানির চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই ধরনের গ্রন্থ সর্বসাধারণের মধ্যে চাহিদা না থাকার জন্য কোনও বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থার নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায় না। অথচ ভারতের সনাতন ধর্মের প্রবক্তাস্বরূপ বাংলাভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানি বাঙালী ধর্মপরায়ণ ও দার্শনিক ব্যক্তিদের তৃষ্ণা মিটাইতে অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাহারা এইসব গ্রন্থের প্রকাশ করার উদ্যোগ লইতেন এইরকম উদ্যোগও বই ছাপানোর অত্যধিক খরচের জন্য বন্ধ হইতে চলিয়াছে।

এমতাবস্থায় ৩অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন তৈরী করিয়া তাহার লিখিত বইগুলি প্রকাশ করিবার তাগিদ অনুভব করিয়া আমরা “ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রীঅমূলপদ স্মৃতি সন্থ” নামে একটি সংগঠন তৈরী করিয়া এই সংগঠনকে ঐ বইগুলি প্রকাশের ভার অপর্ণ করি। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সদস্য ও কিছূ সহদয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় নিঃশেষিত প্রায় গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার প্রয়াত ৩অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়ের দিব্যশক্তি আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও সার্থক করিয়া তুলিবে বলিয়া আশা রাখি। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর ও শ্রীগুরুপদে অসংখ্য প্রণাম। ইতি—

৫০/৭, ষাদব বোম রোড

কলিকাতা-৭০০০৬১

২৮শে আষাঢ়, ব্রহ্মস্মৃতি

১০১৪ সাল।

বিনীত নিবেদক

আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

ব্রহ্মজ্ঞ কবি শ্রীঅমূলপদ স্মৃতি সন্থ।

প্রবন্ধমূচী

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
১। আনন্দ ...	১—৭
২। বৈরাগ্য ও মৃদুস্বভাব ...	৮—১৫
৩। শ্রদ্ধা ...	১৬—২৪
৪। আত্মানুবিচার ...	২৯—৭০
৫। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ ...	৭৪—৮২
৬। প্রকৃতি ও কর্ম-পরিচয় ...	৮৩—৮৯
৭। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম ...	৯০—৯২
৮। সৃষ্টিতত্ত্ব ...	৯৩—৯৯
৯। শব্দশক্তি ও সৃষ্টি ...	১০০—১১৮
১০। কতিপয় সাধন সংক্ষেপ ...	১১৯—১২৬
১১। যোগ ...	১২৭—১৬৩
১২। বিভূতি ...	১৬৪—১৭২
১৩। গায়ত্রী-উপাসনা ...	১৭৩—১৭৮
১৪। ত্রিগুণাতীত ...	১৭৯—১৯৪
১৫। জীবের গতি নিরূপণ ...	১৯৫—২০০
১৬। সাম্যবাদ ও শাস্তি ...	২০১—২১৫
১৭। দেবাসুর ও যজ্ঞ তত্ত্ব ...	২১৬—২২৮
১৮। পরিণিষ্ঠ— ...	২২৯—২৬০
(ক) অবৈতবাদীগণের ৪টি বাদ ...	২৩২—২৩৯
(খ) ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন ভাবধারা ...	২৩৯—২৬০

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
অ	
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ	... ২৫৫-২৫৮
অজপাসাধনা	... ১১৫
অজাতবাদ	... ৫০, ২০৮-২০৯
অজ্ঞান, অবিদ্যা	৪২, ৪৩, ৪৬-৫০, ৯৩, ১১৩, ১৩১
অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নয়	... ৪৬
অজ্ঞানে জীবের বন্ধন	... ৩৩, ৮৮, ৮৯
অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না	... ৫৮, ১০০
অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ	... ৪৬
অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক আবরণ করিতে পারে না	৫৫, ৫৬
অজ্ঞান-নাশ (জ্ঞানদ্বারা)	... ৭৩, ৭৫, ১৬১-১৬৩
অধৈর্যত	... ২৩৯-২৪১
অধিকারী, বেদান্তের	... ২৯ (পাঃ টীঃ)
অধিষ্ঠান ও আধারে পার্থক্য	... ১৫৭
অধ্যারোপ ও অপবাদ	... ৭৩ (পাঃ টীঃ)
অধ্যাস শব্দের অর্থ ও অধ্যাসের কারণ	... ১৫১-১৫২
অনিবচনীয়-খ্যাতি	... ১৫৭-১৫৯, ৪১-৪২, ৫২
অগদৈতন্য বিভূদৈতন্য হইতে পারে কিনা	... ৬৬, ৬৭
অন্তঃকরণ-বিভাগ	... ৯৭
অন্তঃকরণকে ধ্যানদ্বারা কলীন করাই জ্ঞান নয়	... ১৮৭
অন্তর্মাতৃকা	... ১০৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অন্ন ও অন্নাদ	... ২২০
অন্ন হইতে মনের উৎপত্তি	... ১১৯
অন্নময় কোষ	... ৩৪, ৩৫
অপরোক্ষ জ্ঞান	১৬-১৭ (পাঃ টীঃ) ৭৪-৭৬, ১৪৮, ১৬১-১৬৩
অপরিগ্রহ	... ১০৫
অবচ্ছেদবাদ	... ২৩৬, ২৩৭
অভিনিবেশ	... ১৩২
অভ্যাস	— ৭৬, ৭৯, ১৩২
অলাত	... ১০৬ (পাঃ টীঃ)
অহংকার তত্ত্ব	... ৯৬
অহিংসা	... ১০৩-১৫৪
অষ্টাঙ্গযোগ	... ১০৩-১৪২
অসৎ ও মিথ্যা শব্দের পার্থক্য	— ৩৪ (পাঃ টীঃ)
অসদ্রগন জ্যোষ্ঠ ও দেবগন কনিষ্ঠ কেন	... ২১৭
অসদ্রগন কিভাবে যন্তু নষ্ট করে	... ২২৩-২২৪
অস্তিত্ব	... ১০৪-১৩৫
অস্মিতা	... ৮৯, ১৩১

আ

আচমন-তত্ত্ব	... ২২৪
আত্মাই ব্রহ্ম	... ৪৫
আত্মা আনন্দ-স্বরূপ ; আত্মার সহিত সম্বন্ধহেতু স্থাপিত্যাদি প্রিয় ...	২-৩
আত্মানন্দ কিরূপে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়	... ৪-৫
আত্মার সহিত যাহার যত নিকট সম্বন্ধ সে তত প্রিয়	... ৩-৪
আত্মা কিরূপে সৎ দঃ ভোগ করেন	... ৩৩, ৮৮, ৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আত্মাকে জানিলে পরে পরমাত্মাকে জানা যায়	৪১, ১৬৯, ১৫১, ১৬৭
আত্মানন্দের এক একটু অংশ লইয়া জীবগণ তর-তম-ভাবে আনন্দী হয়	৫
আত্মা চতুঃপাদ	... ১০১, ১০২
আত্মার তিনটী দেহ	... ৮০-৮৪
আত্মা-সাক্ষাৎকারের স্বরূপ	... ১৬১-১৬৩
আধিকারিক পদরূপ	১১২
আধুনিকতার দোষ	... ১৯-২৩
আনন্দলাভজন্যই জীব কর্ম করে	... ১, ৮৬
আনন্দ যাহা বিষয়-সম্পর্কে জ্ঞাত উহা দুঃখের কারণ	১, ২
আনন্দলাভের উপায়	... ৬৭
আনন্দ সকলেরই কাম্য	... ১
আনন্দ বিষয়ে নাই	... ১-৩
আনন্দময়-কোষেই জীব সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ ভোগ করে	৪
আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য	... ১৪৮-১৫১, ২৩৪
আভাসবাদ	... ২৩৪-২৩৬
‘আমি ব্রহ্ম’ ঠিক অনুভব করিয়া বলা অহংকার নয়	৫৯
‘আমি দীন হীন’ ভাবের মধ্যে অহংকার থাকে	... ৫৯
আরম্ভবাদ	... ১০২ (পাঃ টীঃ) ২৪৬
আহার একটী বস্তু	... ২২১-২২২
আহুতি-তত্ত্ব	... ২২০
আসন	... ১৫৬-১৩৭
■	
ইন্দ্রিয়দোষ-বিচার	... ১৪ ১৫
ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও তাহাদের দেবতাগণ	১৬, ১৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
ইহামুদ্রফলভোগবৈরাগ্য	... ২৯ (পাঃ টীঃ)
ইষ্টমন্ত জপের ফল	... ১১৪-১১৬

ঈ

ঈশ্বর	৪৮, ৪৯, ৫২-৫৪, ৯৪, ১০৪, ১০৫, ১১২-১১৪, ২০৪
ঈশ্বর-প্রাণধান	... ১৩৬
ঈশ্বর অনাদি-সংস্কার সাহায্যে সৃষ্টি করেন	... ৫৩, ৫৪
ঈশ্বর সজ্জন্মের স্বাধীনতা	... ৯৪, ১১২-১১৪
ঈশ্বর-ঐবত ও জীব-ঐবত	... ১১০, ১১১
ঈশ্বর-ঐবত জ্ঞানের সহায়ক	... ১১০, ১১১, ১৬৬
‘ঈশ্বর নাই’ বাক্য উপহাসাম্পদ	... ১৬৯
ঈশ্বরকে ষাদ দিয়া সাম্যবাদ অসম্ভব	... ২০৩, ২০৪
ঈশ্বরলীলা সত্য কি না	... ৬৭-৬৯

উ

উপমন্নার উপাখ্যান	... ২৪-২৭
উপাসা দেয়তাগণের মধ্যে ভেদদর্শন নিন্দনীয়	... ১৭৭
উপমন্না কিরূপে বিদ্যা লাভ করিল	... ২৬
উপর্যতি	... ২৯ (পাঃ টীঃ) ১৮৯

●

ওঁকার-তত্ত্ব ও নাদবিশদ তত্ত্ব	... ১০৫-১১২
ওঁকারই দৃশ্যমান জগৎ, ওঁকারই তদ্রূপীয়	... ১০১ ১০২
ওঁকারের ম্পন্দনে গায়ত্র্যাদি ছন্দের ও জগতের উৎপত্তি	১০৬, ১০৭, ১৭৬

ক

কর্ম কাহাকে বলে	... ৮৪-৮৬
কর্মের উদ্দেশ্য কি	... ৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
কৰ্মযোগ বা নিকামকৰ্ম, কৰ্মযোগ কিরূপে ভক্তি ও জ্ঞানের কারণ হয়	৭৭-৮১
কৰ্ম, অকৰ্ম বিকৰ্ম	... ৯০-৯২
কৰ্ম তিনপ্রকার—প্রারম্ভ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ	... ৯১ (পাঃ টীঃ)
কৰ্মের নিবৃত্তি কখন হইবে	... ১. ৮০, ৮১
কৰ্মে অকৰ্ম ও অকৰ্মে কৰ্মদর্শন	— ৯১, ৯২
কৰ্ম ও জ্ঞান বিরুদ্ধ	... ৮২
কাৰ্য্যকে কারণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া উহার গোধান	২২৩
কারণ—উপাদান, আরম্ভ ও বিবর্ত	... ১০২, ১০৩ (পাঃ টীঃ)
কিরূপে জগতে স্বাভাবিকভাবে যজ্ঞ চলিতেছে	২২০-২২২
ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট বৃত্তি	... ১৩০, ১৩১
কৃষ্ণ শব্দের অর্থ	৮৫, ৮৬, (পাঃ টীঃ) ১৪৮-১৫০
ক্লেশপঞ্চক—অবিদ্যাদি	... ১৩১, ১৩২

গ

গড়্‌ডালিকা-প্রবাহ	... ২৮ (পাঃ টীঃ)
গায়ত্রী শব্দের অর্থ	১৭৭, ১৭৮
গায়ত্রী-তত্ত্ব	... ১৭৫, ১৭৭
গায়ত্রী রূপের ৫টী অঙ্গ	... ১৭৩-১৭৬
গায়ত্রী মন্ত্রের ত্রিপাদ	১৭৪ ১৭৫
গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা	... ১৭৫
গায়ত্রী—সংশির	... ১৭৫ ১৭৬
গায়ত্রীম্যানে ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়গতির ধ্যান করিতে হয়	১৭৭
গীতার সমদর্শনের শ্লোকসকল	... ২০১, ২০২
গুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগরত্ন ও ভক্তের একই অবস্থা	... ১৭৯
গুরুত্ব ও উহার অর্থ	... ২২৬, ২২৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গৃহস্থগণের পক্ষেও আত্মানুবিচার মঙ্গলপ্রদ	... ২৯, ৩০
গৃহস্থও জ্ঞানী হইতে পারে	... ২৯, ৭৬, ৭৭, ১০ (পাঃ টীঃ)
গৌণ অধিকারীর প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য হয় না	১৪৫, ১৪৬, ৭৬
গৌণ সংন্যাস ও মূখ্যসংন্যাস	... ৮১

চ

চতুর্দশ-লোক	... ২৮
চণ্ডীদেবী দেবতাগণের শক্তির সমষ্টি	... ২১৮
চিং ও জড়ের বিচার	... ৩০, ৩৪
চিহ্ন-গ্রন্থি	... ৩৩, ৮৯
চিন্তাবৃত্তি কাহাকে বলে	... ১২৯, ১৩০, ২৫৪
চিন্তাবৃত্তি নিরোধের উপায়	... ১৩২-১৪১, ১৪৬-১৪৮
চিন্তাবৃত্তি নিরোধের ফল	... ১৩০, ১৪৮
চিন্তের ওটী অবস্থা—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্তাদি	... ৭২, ৭৩ (পাঃ টীঃ)
চিন্তের স্থিরত্বই আনন্দের কারণ	... ৩
চিদঘনমুক্তির অর্থ	... ১৪৮ (পাঃ টীঃ)
চিদাভাস	... ১৪৯, ১৫০
চৈতন্যের জ্ঞানে মায়ার নিবৃত্তি	... ৭৪-৭৬, ১৬৩

ছ

ছান্দোগ্যে ওঁকারের প্রশংসা	... ১০৯, ১১০
ছন্দঃ শব্দের অর্থ ও ছন্দাবারা সৃষ্টি	... ১১০

জ

জগৎ মিথ্যাভ-বিচার	... ৫০-৬৯
জগতের মিথ্যাভ-সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ	... ৫১
জগৎ মনের স্ফূরণ	... ৫৭, ৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
জগৎ কস্ম'ময়	— ৮৫, ৮৬
জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্ম	৪৭, ৫৬, ১৬৮, ১৬৯
জপতত্ত্ব	... ১১৪-১১৮
জাগতিক সব জ্ঞানই অশ্রুতাবে মানিয়া লওয়া	... ২১-২২
জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যযোগ	... ৭৪, ৭৬, ৭৭
জ্ঞান একবার হইলে উহা নষ্ট হয় না	... ১৮৬, ১৮৭
জ্ঞান সর্বব্যাপক, সমস্ত বস্তু জ্ঞানের উপর ভাসে	৪৫, ১৬৮, ১৬৯
জ্ঞাননিষ্ঠা ও কস্ম'নিষ্ঠার পার্থক্য	... ৮১, ৮২
জ্ঞান ও ধ্যানের পার্থক্য	... ১৮৫, ১৮৮
জ্ঞানমার্গ শৃঙ্খল ও নীরস কি না	... ৬৯, ৭০
জ্ঞানফল উপরিত না আসিলে জ্ঞান নিষ্ফল	... ১১১
জ্ঞানবস্তু	... ১৪০
জ্ঞানভূমিকা ৭টী	... ১১৩
জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীর দেহপাত হয় না	... ৭৫
জ্ঞানীর কস্ম' অকস্ম'স্বরূপ	... ১১১, ১১২
জ্ঞানীর গতাগতি নাই	১১৫, ১১৬
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রারম্ভ নাই	... ১৪৪, ১৪০, ১৪৫ (পাঃ টীঃ)
জ্ঞানীর আচরণ প্রায়ই শূন্য হইয়া থাকে	১৪৩, ১৪০
জ্ঞানীর ব্যবহার নানাপ্রকার হইতে পারে	... ১৪০-১৪২
জ্ঞানীর বিভূতি থাকে কি না	... ১৪৩, ১৪৪
জ্ঞানীর ব্যবহারম্বারা সব সময় জ্ঞানীকে চেনা যায় না	১৪০, ১৪১
জ্ঞানীর দেহপাত যে ভাবেই হউক বা যে স্থানেই হউক, উহাতে কিছু আসে যায় না	১৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জ্ঞানী সমাধি-পরায়ণ হইবেন কিনা	... ১৮৪, ১৮৫
জ্ঞানীর ক্ষুধা-পিপাসা থাকে কি না	... ১৮২, ১৮৩
জ্ঞানীর সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক কর্মকদলতা থাকে	... ৭৭
জীব	৩৩, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ১৪৯, ১৫০
জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি	... ১৯০, ১৯২, ১৯৪
জীবের শক্তি ভগবানের শক্তির নিকট নগণ্য	... ১৭০, ১৭১

ত

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যবিচার	... ৭৫ (পাঃ টীঃ)
তপঃ	... ১৩৬
তাত্ত্বিক মত	... ২৪১-২৪৪
তিন গুণের পরিচয়	... ৮৩, ৮৪
তিন গুণস্বারা কিরূপে কর্ম কৃত হও	... ৮৬, ৮৮
তিনদেহবিচার	... ৪০-৪৪
তিনদেহ—জীব ও ঈশ্বরের	... ৯৯
তিতিক্ষা	... ২৯ (পাঃ টীঃ)
তীর সংবেগে মুক্তি আসন্ন	... ১৫
তৈজস	... ৯৮, ৯৯
ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ	... ১৭৯-১৮২

দ

দম	... ২৯ (পাঃ টীঃ)
দৃষ্টি তিনপ্রকার—আধ্যাত্মিকাদি	... ১০
দৃশ্যানুবিম্ব ও শব্দানুবিম্ব সমাধি	... ১৫৬
দর্শন-সৃষ্টিবাদ	... ২৫৭-২৬৯
দেখা যায় বলিয়াই জগৎ মিথ্যা	... ৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দেবভাগগ মনুষ্যাগগকে অনুগ্রহ করেন	২২৩
দেবভাগগ মিশ্রসত্ত্ব	২১৭, ২১৮
দেবযানপথ	২২৬
দেবাসুর-তত্ত্ব	২১৬-২২৮
দেহ-দোষ-বিচার	১১-১২
দৈব ও আসুর সম্পদন ও উহাদের ফল	১১৬, ১১৭
দৈবী ও আসুর সম্পৎ	২১৬
দ্বৈতাত্মবৈতবাদ	২৫১, ২৫২
দ্বৈততাব ব্রহ্মস্বরূপ	৬১
'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈতাদি' শব্দ আপেক্ষিক হইলেও 'অদ্বৈত' প্রভৃতি শব্দ	
ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক	৫৯, ৬০
ঘ	
হৃদ্যদোষবিচার	১৩
হৃদ্যপালন করিয়া ভারতের পতন হয় নাই	২২
হ্যানেস সময় বেশী বিষয়চিত্তা দেখা যায় কেন	১২৪, ১২৫
হাংগা	১৩৮, ১৩৯
হান	১৩০, ১৪১
ন	
নাটকের দৃষ্টান্তস্বারা ঈশ্বর ও জীবের ভেদ প্রদর্শন	১৪০, ১০৫
নাদবিশুদ্ধ-তত্ত্ব	১০৫-১০৯
নাদানুসন্ধান	১০৯
নিগদুগব্রহ্ম	৪৯, ৫০, ৫৮-৬১
নিগদুগ শব্দের লক্ষ্যার্থ	৬০
নিগদুগ জ্ঞান স্বাভাবিক	৬০
নিগদুগের উপর হয় কি না	৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নিগূঢ় ও সগূঢ় ভক্তি	... ১৬৪
নির্ম্মলকম্প সমাধি উহার অভ্যাস ও উহার ফল	১২৭, ১২৮, ১৪৭-১৪৮
নিত্যানিত্য বস্তুবিশেষ	... ২৯ (পাঃ টী)
নিয়ম	... ১৩৫, ১৩৬
ন্যায় ও বৈশেষিক মত ও উহার সহিত অবৈতমতের পার্থক্য	২৪৬ ২৪৭

প

পঞ্চকোষ বিচার	৩৪-৩৮
পঞ্চ তন্ত্রাধি ও উহার কার্য্য	... ৯৬, ৯৭
পঞ্চাঙ্গ বিদ্যা	১৯৭
পঞ্চীকরণ-প্রণালী	৯৯
পর-বৈরাগ্য	৮, ১৪২
পরমহংস—বিবিধ	৯ ১০ (পাঃ টীঃ)
পরিণামবাদ	... ১০২, ১০৩ (পাঃ টীঃ)
পরোক্ষ ও অপারোক্ষ জ্ঞান	... ১৪-১৭ (পাঃ টীঃ)
পিতৃদান-পথ	... ১৯৬, ১৯৭
পুরাণ বেদের ব্যাখ্যা, পুরাণ পাঠের ফল	১
পুরুষ	... ৪৪, ৩২
পুরুষকার অহংকার নয়	১১৮
পূজার অর্থ সমস্ত তত্ত্বকে ব্রহ্মে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া	২২৩
পূজাতত্ত্ব	... ২২৪-২২৮
পূজায় শব্দ, ঘণ্টা প্রভৃতি কেন বাজান হয়	... ১০৮
পূজায় ওঁকারের উচ্চারণ পুনঃ পুনঃ কেন করা হয়	... ১০৯
পূজার ফল শাস্তি	... ২২৮
প্রকৃতির বৈষম্যে সৃষ্টি	... ৯৩, ২০২
প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য	... ৪১, ৪২

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
প্রতিবিশ্ববাদ	... ২৩৩, ২৩৪
প্রত্যাহার	... ১৩৮
প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ	... ১৩০, ১৩১ (পাঃ টীঃ)
প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য	... ১৩৪
প্রমাতৃভাস্য ও সাক্ষিভাস্য	... ১৫৯
প্রাণময় কোষ	... ৩৬
প্রাণের সাহায্যে দেবতাগণের অসদৃশ জয়	... ২১৮, ২১৯
প্রাণ দেবতার শ্রেষ্ঠতা	... ২১৯
প্রাণায়াম	... ১৩৭, ১৩৮
প্রার্থনা—তিন প্রকার	... ৯১ (পাঃ টীঃ)

ফ

ফলব্যাপ্তি ও বৃত্তিব্যাপ্তি	১৫৫, ১৬১, ১৬২
-----------------------------	---------------

ব

বর্ণাশ্রমবিভাগ হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে	... ২০৫
বর্ণ বংশগত ও ঈশ্বর সৃষ্টি	... ২০৫
বাক্যের ৪ টী অবস্থা	... ১০০, ১০১
বাচ্যার্থ শব্দের অর্থ	... ২৩০
বাহ্যপৃষ্ঠক সমাধি	... ১৮
বাহ্যসামান্যবিকরণ	... ২৩২
বাসনা	... ১২১, ১২০
বিজ্ঞানবাদী বোধমত	... ২৪৮, ২৪৯
বিদ্যাদানে পূর্বাচাৰ্যগণের সাবধানতা	... ২৩, ২৪
বিন্দু তত্ত্ব, বিন্দুর স্পন্দন জগৎ	... ১০৬-১০৮
বিজ্ঞানময় কোষ	... ৩৭, ৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিকল্পবাদ	১০৬ (পাঃ টীঃ)
বিবর্ত্ত ও পরিণামের পার্থক্য	... ১৫৮ (পাঃ টীঃ)
বিরুদ্ধার্থ্যতি	... ১৪২
বিভূতির ধ্যানধারা ভগবানে স্থায়ী ভক্তি লাভ হয়	... ১৬৪-১৬৬
বিভূতিতে চিন্তাধারণ করা সহজ হয়	... ১৬৫
বিরোট্ ও বিশ্ব	... ৯৮, ৯৯
বিশিষ্টাধৈতবাদ ও উহার সহিত অধৈতমতের পার্থক্য	... ২৪৯-২৫১
বিষয় - দৃষ্ট ও আনন্দপ্রবিক	... ১০২, ১০৩
বিষয়জ্ঞান কিরূপে হয়	... ১৫৪-১৫৭
বিশেষজ্ঞান	... ৪৯
বুদ্ধি—	... ৫৭, ৯৭
বুদ্ধি—প্রমাণ, বিপর্যয়াদি	... ১০০, ১০১ (পাঃ টীঃ)
বুদ্ধিজ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক সামান্যজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নহে	... ৪৬, ৭৫ (পাঃ টীঃ)
	... ১৬১, ১৬২
বোধ বা জ্ঞান বস্তুতন্ত্র	... ১৮৬, ১৮৭
বৈরাগ্য কাহাকে বলে	... ৮
বৈরাগ্য ও অভ্যাস	— ১০২, ১৫৩
বৈরাগ্য—শমন ও মর্কট	... ৯
বৈরাগ্য —পর ও অপর	... ৮
বৈরাগ্য —মন্দ, মধ্যম, তীব্র	... ৯
বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান হয় না	— ৮-৯, ১১
বৈরাগ্য, উপরতি, জ্ঞান	... ১৮৯, ১৯০
বৈষয়িক সুখ নানা দৃঃখের কারণ	... ১-২
ব্রহ্মচর্য	... ১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্রহ্মজ্ঞান কাহার হয় এবং কিরূপে হয় ...	১৪৩-১৪৮, ১৬০-১৬৩
ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ও উহার ফল ...	১৬১, ১৬২
ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন ...	৬১
ব্রহ্মে অনাভিব্যক্ত শক্তি স্বীকার করিলে উহা সগুণব্রহ্ম ...	৬৪

ড

ভগবানে দৃষ্টি না থাকিলে সাম্য অসম্ভব	২০৩, ২০৪
ভূমাই পুথ ...	২
ভোগায়তন ও ভোগ্যবস্তুর উৎপত্তি	৯৮
চাৰিত্তজ্ঞান কিরূপে হয় ...	১৫৭, ১৫৮
চাৰিত্তকালে কতদূৰ্গত্বরূপ সৰ্ব্বাংশে আবৃত হয় না ...	৫৫, ৫৬, ১৫৯

ম

মৎকম্ম'পরম অবস্থা ...	৭৮, ৭৯
মধ্যম অধিকারীর কিরূপে জ্ঞানলাভ হয়	৭৬, ১৪৫-১৪৮
মন ...	৩৭, ৯৭
মনের উপর লক্ষ্য রাখার সাধনা	১২৫
মহন্তত্ব ...	৯৪, ৯৫
মনোময়কোষ	৩৭
'মাতৃকা' শব্দের অর্থ ...	১০৭
'মামেব য়ে প্রপদ্যন্তে'—ইহার তাৎপৰ্য্য ...	১২৬
মায়া, প্রকৃতি, অজ্ঞান ৪৮-৫০, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ১০৪, ১১২, ১১৩	
মাস্তাত্যাগের উপায় ঈশ্বরচিন্তা মায়ায় চিন্তা নহে ...	৫৮, ৫৯, ১২৬
মিথ্যা-সৃষ্টির ব্যাখ্যা কেন ...	৯১
মিথ্যাব্যবহাৰে মিথ্যার নাশ হয় ...	৬৩, ৯১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মিথ্যাচারের দোষ-প্রদর্শন	... ১৪০-১৪৪
মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম	... ২১৮
মৃদু-ক্লেশ—তীর, মধ্যম, মন্দ	... ৯-১১
মৃথ্যাসামান্যীকরণ্য শব্দের অর্থ	... ২০২
মৃথ্য-সংন্যাস	... ৯, ১০ (পাঃ টীঃ), ৭৪
মৃথ্য অধিকারীর মহাবাক্যবিচার শ্রবণমাত্রই জ্ঞান হইতে পারে	৭৪, ৭৫, ১৪২
মূর্ত্তি-ধ্যান-প্রণালী	... ১০৯-১৪১
ষ	.
যজ্ঞ-তত্ত্ব	... ২১৮-২২৮
যম	... ১০৩-১০৫
যাহারা বেদোক্ত কৰ্ম্ম করে না, তাহাদের গতি	... ১৯৮
যোগ	... ১২৭-১৩০
যোগীর আহার (বিধি ও নিষেধ)	... ১১৯-১২০
ঝ	
ঝড়-সর্প-দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন	... ৫২-৫৪
রাজযোগীর সাধন	... ১২৫-১২৬
জ	
জন্ম-পূর্ব্বক সমাধি	... ১৪১, ১৮৫ (পাঃ টীঃ)
জঙ্গমা ত্রিবিধ	... ২০০-২০২
জ	
জ্যোতিষ শব্দের অর্থ	... ২৩০
জক্তি-বিশিষ্টাধৈত-বাদ	... ২৫৮
জক্তি স্বরূপতঃ মিথ্যা	... ৭১, ৭২
জন্ম হইতে সৃষ্টি হয়, উহার শাস্ত-প্রমাণ	... ১০১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শব্দ রূপের কারণ কেন	১১১, ১১২
শব্দের চারিটি অবস্থা—বৈখরী, মধ্যমা প্রভৃতি ...	১০০, ১০১
শব্দানুবিবন্ধ-সম্বন্ধ ...	১৪৬, ১৪৭
শব্দের শক্তি ও লক্ষণা ...	২৩০
শাস্ত্র বিশ্বাস কারিব কেন ...	১৯, ২০
শব্দ-সম্বন্ধ কাহাকে বলে ...	২১৮
শব্দাশ্রিত-বাদ	২৫৩-২৫৫
শূন্যবাদী বোধমত ...	২৪৭, ২৪৮
শৌচ ...	১৩৬
শ্রদ্ধা কাহাকে বলে ও শ্রদ্ধার ফল ...	১৬-১৯
শ্রদ্ধা কিরূপে অর্জন করিতে হয়	১৭-১৯
শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন ...	১০ (পাঃ টীঃ)
শ্রবণদ্বারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় জ্ঞানই হইতে পারে	১৮৬
স	
সকাম-কর্মীর গতি ...	১৯৬, ১৯৭
সঙ্গুণ উপাসনার ক্রম ...	৭৭-৮০
সং, চিৎ ও আনন্দ ...	৫৪-৫৬, ১৬৮, ১৬৯
সত্তা তিন প্রকার—পারমাণ্বিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক—	৬১-৬৩, ২২৯
সত্য ...	১০৪
সংতোষ —	১৫৬
সম্বন্ধ (সম্প্রজ্ঞাত) ৪ প্রকার —	১৪১
সম্বন্ধ-বিষয় ও উহাদের ত্যাগের উপায় ...	১৪৭, ১৪৮
সদ্যোমুদ্রিত ...	৭৬, ১৯৬
সম্বন্ধ জ্ঞান নহে, চিত্তের অবস্থা ...	১৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাংখ্যমত ও উহার সহিত অবৈতমতের পার্থক্য	২৪৪ ২৪৬
সাংখ্যযোগের অধিকারী	... ২৯ (পাঃ টীঃ) ৭৪
সামান্যচেতন	৪৯
সামান্যজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নয়	... ৪৬, ১৬২, ১৬৩
সাম্যবাদ—গীতার	... ২০১, ২০২
সাম্যবাদ—ভারতীয় ও বহিরাগত	... ২০৩
সাক্ষী ও সাক্ষিভাস্য—	৪৮-৪৯, ১৪৯, ১৫০, ১৬০
‘সিদ্ধিলাভ দৃষ্টকর,’ ভাবনার দোষ—	... ১২২, ১২৩
স্বপ্ন-বিচার—	... ৩৮-৪০, ৪৩, ৪৪
স্বপ্ন-বিচার ও নির্বিকল্প সমাধির পার্থক্য	... ৪৩, ৪৩ (পাঃ টীঃ)
সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদ	... ২৩৭
সৃষ্টি-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য তদ্ব্য-লক্ষণে স্বাক্ষর নির্দেশ	... ৯৩
স্বপ্ন-বিচার	... ৪১-৪২
স্বাধ্যায়	... ১৩৬
স্বাধীদোষবিচার	... ১৩-১৪
স্বল পঞ্চভূতের ২৫ টী তত্ত্ব	... ৯৯
স্বল, সূক্ষ্মাদিভেদে ঈশ্বর ও জীবের তিন দেহ	... ৯৯
সূত্রাত্মা	... ৯৫
স্বতঃস্বেচ্ছা-বাদ	... ২৫২-২৫৩
হ	
‘হংসঃ’ মন্ত জপ ও উহার ফল	... ১১৫
হিরণ্যগভ	... ৯৫
ক	
ক্লেদ ও ক্লেদজ	... ১৮২ (পাঃ টীঃ)
কর্ণিক বিজ্ঞানবাদ	... ২৪৮-২৪২

Prabuddha Bharat, December—1954.

ADVAITAMRITAVARSHINI—By Amulapada Chattopadhyaya. Published by the Author, 14/3C, Balaram Bose Ghat Road, Calcutta-25. Pages 274. Price Rs. 2-8.

It is a work of worthy endeavour and contains as the title indicates, valuable and thought-provoking writings on the salient features of monistic Vedanta, with special reference to the philosophy of the Bhagavad Gita. Advaita Vedanta, as expounded by Shankaracharya and interpreted and commented upon by successive scholars, past and present, is now more or less widely recognized and studied as the acme of philosophic thought and experience. The aim of the author is to make this book an easy and reliable treatise on the philosophy of Advaita or non-dualism, at the same time discussing in detail the metaphysics of the Gita from the standpoint of Advaita. The subject-matter is dealt within seventeen well-written essays and contains the gist of Vedantic thought, together with copious quotations and references drawn from other systems of Hindu philosophy. The Gita forms the leitmotif of the author's work, while he has made a commendable attempt at revealing the monistic theme that pervades the Gita teaching. The author's liberal and non-dogmatic exposition of Advaita is praiseworthy. He has at the same time discussed the role of dualistic rituals and forms of worship. The author has described with much clarity and conviction, the spiritual practices according to the paths of Karma (unselfish action), Yoga, and Bhakti and has shown them to be complementary to and helpful in attaining the highest realization of nondual Reality. The book can serve the Bengali-reading public as a short and intelligible introduction to Hindu religious and philosophic thought and as an expository study in the metaphysics of the Bhagavad Gita.

সূচীপত্র

(দ্বিতীয় ভাগ)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অবতারবাদ কি বেদমত ?	১—১১
২। বেদপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রমাণ	
আত্মপ্রত্যয় ও অহংপ্রত্যয়	১২—১৮
৩। দেহ ও কাল	১৯—২৯
৪। শক্তিতত্ত্ব	৩০—৪১
৫। শব্দ-প্রমাণ	৪২—৫২
৬। বুদ্ধি-জ্ঞানের স্বরূপ ও উহার ফল	৫৩—৫৮
৭। স্বরূপানুভূতিঃ সাধনা	৫৯—৬৬
৮। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও উহার সমাধান	৬৭—৭৬

আনন্দ

বাহ্যঃপর্লোঃসত্ত্বায়া বিন্দত্যাখ্যানি ধংসদুঃখম্ ।

স ব্রহ্মযোগঃসত্ত্বায়া সূখমক্ষয়মন্নতে ॥ গীতা ৫।২১

আনন্দ জীবের স্বরূপ । তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন,—আনন্দাশ্যৈব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—‘অর্থাৎ এই ভূত-সমুদয় নিশ্চয় আনন্দ হইতে জন্মগ্রহণ করে, জাত হইয়া আনন্দ-দ্বারাই জীবিত থাকে অতকালে প্রয়াণ করিয়া আনন্দেই প্রকাশ করে’ । সমুদ্র হইতে বিদ্যুত যে জলকণা হিমালয়ের শৃঙ্গে গিয়া পড়িয়াছে, সমুদ্রই তাহার স্বরূপ । আপনস্বরূপ সমুদ্রে ফিরিবার জন্য ঐ জলকণাটীর সতত ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে, তাই সে সতত চঞ্চল ; তাহার ঐ চঞ্চলতার নিবৃত্তি হইবে তখন, যখন সে স্বীয় স্বরূপ সমুদ্রকে ফিরিয়া পাইবে । এইরূপ স্বীয় আনন্দস্বরূপ হইতে অজ্ঞান-প্রভাবে বিচ্যুত জীবের আনন্দস্বরূপকে ফিরিয়া পাইবার সতত ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে । তাই সে চঞ্চল, তাই সে পদত্রেয় মধ্যে, বিস্ত্রেয় মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আনন্দ পাইবার জন্য উহাদের দিকে ধাবিত হয় ; আনন্দলাভের আশাতেই জীব ভালমন্দ নানাপ্রকার কৰ্ম্ম করে । কিন্তু ঐ চেষ্টা অজ্ঞানান্ধাকারে প্রকৃতপথে চালিত হয় না বলিয়া জীব প্রকৃত আনন্দ পায় না । কিন্তু যখন জীবের চেষ্টা প্রকৃতপথে চালিত হইয়া ফলবতী হইবে, তখন স্বীয় আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া উহার চঞ্চলতা ও কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হইবে ।

সব জীবই যে আনন্দ চায় এ বিষয়ে সকলে একমত, কিন্তু প্রকৃত নিরঙ্কুশ স্থায়ী আনন্দ অল্প জীবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে । স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদি অবলম্বন করিয়া যে আনন্দ বা সূখ উৎপন্ন হয়, উহা স্থায়ী নিরঙ্কুশ আনন্দ নহে, কারণ ঐ বিষয়সকল নানা দুঃখেরও কারণ হইয়া থাকে । স্ত্রী-পুত্রাদি অসৎ, অবাধ্য, মূর্খ অসদৃশ প্রভৃতি হইলে দুঃখ, মৃত্যুমুখে পতিত হইলে দুঃখের সীমা থাকে না । বিস্ত্রেয় অর্জনে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, উহার রক্ষণ করিতেও অনেক

ভয় ও দঃখ, আবার উহার নাশও দঃখ । এইরূপ গৃহ ক্ষেত্রাদি বিষয় লইয়া অপরের সহিত বিবাদ, মারামারি ইত্যাদিবারা নানাপ্রকার অশান্তি ও দঃখকষ্ট । নিজের শরীর অসুস্থ হইলে দঃখ । সর্বোপরি মৃত্যুদঃখ—মৃত্যু ঘনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, রাজা ও প্রজা কাহাকেও অব্যাহতি দেয় না । নানাপ্রকার দঃখ জীবের লাগিয়াই আছে । বিষয় অবলম্বন করিয়া মানুষ একআধটু সুখ পায় ঝুটে । কিন্তু, উহা দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়, আবার শত জ্বালা ঐ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় । সুখ বা আনন্দ বিষয়ের মধ্যে থাকে না, থাকিলে বিষয়সকল সর্বদা সুখ প্রদান করিত । একই বিষয় একজনের নিকট সুখের এবং অপরের নিকট দঃখের কারণ হয় । একই শীতল বায়ু, সুস্থকায় ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করে, অপরপক্ষে রোগী ব্যক্তির নিকট উহাই দঃখের কারণ । একই খাদ্য একজনের নিকট তৃপ্তিদায়ক ও সুখপ্রদ, অপরের নিকট উহাই অতৃপ্তিকর ও দঃখপ্রদ । আবার একই স্ত্রী পুত্র, বিস্তৃত প্রভৃতি কোন সময় সুখের, কোন সময় দঃখের কারণ । বিষয়সকল খণ্ড ও নাশশীল বস্তু ; খণ্ড ও নাশশীল বস্তু স্থায়ী আনন্দ প্রদান করিতে পারে না । যে বস্তু অখণ্ড ও অবিনাশী উহাকেই মাত্র অবলম্বন করিলে প্রকৃত স্থায়ী আনন্দলাভ করা যায় । তাই ছান্দোগ্য বলেন—“নাশেপ সুখমস্তি, যো বৈ ভূম্বা তৎ সুখম্ ।” ৭.২৩।১ অর্থাৎ খণ্ড বস্তুতে সুখ নাই, যাহা ভূম্বা বা বৃহৎ তাহাই সুখ । যিনি ভূম্বা তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা । “অয়মাশ্বা ব্রহ্ম” (মাণ্ডুক্য)—‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ । ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—“অহমাশ্বা গুড়াক্ষেণ সর্বভূতাস্থিতঃ” । ১০।২০ । অর্থাৎ ‘হে গুড়াক্ষে ! আমি সর্বভূতের হৃদিস্থিত আত্মা’ যেমন প্রদীপের অগ্নিদ্বারা অগ্নির পরিচয় হইলে মহাপ্রলয়েরও অগ্নির ধারণা করা যায়, এইরূপ আত্মস্বরূপের পরিচয় হইলে সর্বভূতস্থিত পরমাশ্বার বা ব্রহ্মের ও ধারণা করা যায় ।

আত্মা সকলের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে হেতু আত্মা আনন্দস্বরূপ । আত্মা দঃখস্বরূপ হইলে জীবের আত্মাতে প্রীতি থাকিত না । চিনি মিষ্ট, উহা

যে বস্তুতে মাখান হয়, উহাও মিশ্র হইয়া যায়। এইরূপ আত্মা নিরতিশয় প্রিয় বলিয়া উহাকে যাহাতে মাখান হয়, তাহাও প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মার সহিত সম্বন্ধহেতুই স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদি প্রিয় হয়। অপরের স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদি আমার প্রিয় নয়। যে আত্মার সহিত সম্বন্ধহেতু স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয় হইয়া থাকে, সেই আত্মা যে নিরতিশয় প্রিয় হইবে ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথায়? তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তদু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।” ইত্যাদি। অর্থাৎ—‘হে মৈত্রিয়! পতির প্রীতির জন্য স্ত্রী পতিকে ভালবাসে না, আত্মপ্রীতির জন্য পতিকে ভালবাসে’, অর্থাৎ পতিকে ভালবাসিয়া স্ত্রীর নিজেরই প্রীতি হয়, উহা না হইলে সে পতিকে ভালবাসিত না। এইরূপ মাতাপিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, উহাও পুত্রের প্রীতির জন্য নহে, আত্মপ্রীতির জন্য। দর্ভিক্ষের সময় দেখা যায়, মাতাপিতা নিজের দেহরক্ষার জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, পুত্রাদিকে বিক্রয় করেন, এবং পুত্রের অঙ্গের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্নায়ু ভক্ষণ করেন! সুতরাং দেখা গেল আত্মাই সকলের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আত্মা আনন্দের আকর; আত্মাভিন্ন অন্য কোথাও আনন্দ নাই। অখণ্ড আত্মানন্দই বিষয়ের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া খণ্ড খণ্ড আনন্দরূপে আমাদের নিকট অনুভূত হয়। কুকুর যখন শব্দক অশ্লিষ্ট চর্চণ করে, তখন তাহার দাঁত কাটিয়া রক্ত বাহির হয়। কুকুর কিস্তি মনে করে হাড়ের মধ্য হইতে রক্ত আসিতেছে, তাই আগ্রহের সহিত সে হাড় চর্চণ করিতে থাকে। এই প্রকার বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়ে যে আনন্দ পায়, উহা তাহার নিজেরই স্বরূপভূত আত্মানন্দ। কিস্তি সে মনে করে ঐ আনন্দ বিষয় হইতে আসিতেছে, তাই সে শব্দক বিষয়েরই পুনঃ পুনঃ চর্চণ করে।

যে বস্তু আত্মার যত নিকট সে বস্তু আমাদের তত প্রিয়। অপর ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রাবিত্তাদি অপেক্ষা আমরা পুত্রাদি আত্মীয়কে আধিক ভালবাসি। পুত্রাদির কঠিন রোগ হইলে ক্ষেত্রাবিত্তাদি ত্যাগ করিয়া

উহাদের বিনিময়ে পুত্রের চিকিৎসা করাইয়া থাকি, যেহেতু ক্ষেত্রবিস্তারি অপেক্ষা পুত্র আত্মার অধিকতর নিকটবর্তী, সেইজন্য অধিকতর প্রিয়। পুত্র অপেক্ষা নিজের দেহ প্রিয়, যেহেতু পুত্র অপেক্ষা দেহ আত্মার নিকটতর বস্তু। পুত্র অপেক্ষা আমরা নিজের দেহকে অধিক ভালবাসি উহার দৃষ্টান্ত পূর্বে দর্ভিক্ষের বর্ণনায় দেওয়া হইয়াছে। দেহ হইতে প্রাণ আত্মার অধিকতর নিকট, সুতরাং দেহ হইতে প্রাণ অধিক প্রিয়। যদি কাহারও প্রথমে প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়া পরে একটী অঙ্গ কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সে আনন্দিতই হয়, কারণ প্রাণত রক্ষা পাইল। দেহের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সে প্রাণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। প্রাণরক্ষার জন্য অনেকে শরীরের বিষাক্ত অঙ্গ কাটিয়া ফেলেন। প্রাণ অপেক্ষা মন (সংকল্প-বিকল্পযুক্ত অস্তঃকরণ) প্রিয় যেহেতু মন আত্মার আরও নিকটবর্তী। মনের সন্তোষের জন্য অনেকে প্রাণ বিসর্জন করেন। কুপথ্য সেবন করিলে প্রাণ বিপন্ন হইবে ইহা জানিয়াও রোগী ব্যক্তি মনের সন্তোষের জন্য কুপথ্য সেবন করিয়া প্রাণকে বিপন্ন করেন। মাতা মনের সন্তোষের জন্য পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় প্রাণ বিসর্জন করেন। এইরূপ সুদেশভক্ত মনের সন্তোষের নিমিত্ত দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করেন। মন অপেক্ষা বুদ্ধি (নিষ্কল্যাঙ্কিতা বৃত্তিবিগ্ণষ্ট অস্তঃকরণ) আত্মার নিকট, সেইজন্য মন অপেক্ষা বুদ্ধি প্রিয়। সেইজন্য যোগিগণ অধিক আনন্দলাভের আশায় মনের চঞ্চলতা ও সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করিয়া উহাকে স্থির ও নিষ্কল্যাঙ্কিতা করিতে অভ্যাস করেন। বুদ্ধি হইতে আনন্দময়কোষ আত্মার নিকট, সেইজন্য আনন্দময়কোষ বুদ্ধি অপেক্ষা প্রিয়। সুষুপ্তিকালে (স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রায়) বা সমাধিকালে জীব দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আনন্দময়কোষ অবস্থান করে। সুষুপ্ত বা সমাধিত পুরুষকে জাগাইতে গেলে তিনি যে অতিশয় বিরক্ত হন, তাহার কারণ এই যে সুষুপ্ত বা সমাধিকালে তিনি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন, ঐ আনন্দ ছাড়িয়া তাহার পুনরায় মন, বুদ্ধি আদিতে ফিরিয়া আসিতে

ভাল লাগে না। জীব আনন্দময়-কোষেই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ ভোগ করে, যেহেতু আনন্দময়-কোষ আত্মার অতি সন্নিহিত ও নিকটতম। কিন্তু ঐ আনন্দ আনন্দময়-কোষের নিজের নহে, একমাত্র আত্মাই আনন্দস্বরূপ; অপর কাহারও আনন্দ নাই, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। আত্মানন্দই পঞ্চকোষে প্রতিফলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আনন্দরূপে প্রতীত হয় মাত্র। (আত্মানাত্মবিচার প্রবন্ধে পঞ্চকোষবিচার দ্রষ্টব্য)। আনন্দময়কোষ আত্মার উপর প্রথম আবরণ। ঐ কোষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মানন্দ সৰ্ব্বপ্রকার বৈষয়িক আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। আত্মার দ্বিতীয় আবরণ বিজ্ঞান-ময়কোষ বা বুদ্ধি। ঐ কোষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মানন্দ পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণতর ভাবে প্রকাশ পায়; এইরূপ আত্মার উপর মন প্রাণ প্রভৃতির যেমন যেমন আবরণ পড়িতে থাকে, আত্মানন্দও তেমনই তেমনই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। প্রকৃত আত্মানন্দ অনুভব করিতে হইলে চিন্তকে বিষয়বিরত করিয়া পঞ্চকোষের অপবাদপূর্বক আত্মাতেই সমাহিত হইতে হয়। আত্মানন্দ অনুভূতি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ একই বস্তু। আত্মানন্দ জন্য বস্তু নহে অর্থাৎ উহা কোন বিষয় হইতে বা সাধনাবারা উৎপন্ন হয় না। সাধনা কেবল বাধা-অপসারণ জন্য। সাধনাবারা বাধা অপসৃত হইলে স্বতঃসিদ্ধ সহজ আত্মানন্দ ফুটিয়া উঠে মাত্র। আত্মানন্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশ লইয়া জীবগণ, তরতমভাবে আনন্দী হইয়া থাকে। তাই বৃহদারণ্যক বলেন—‘এতসৌব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্ৰামূপজীবীভূত’। ৪।৩

এখন দেখা যাক্ জীব কিরূপে আনন্দ পায়। আনন্দস্বরূপ ভগবান্ প্রত্যেক জীবের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থিত। আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। যেমন মলিন ও চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে স্পষ্ট দেখা যায় না, এইরূপ মলিন ও চঞ্চলচিন্তে আত্মা স্পষ্ট প্রতিভাত হন না। যেমন নিম্নল ও স্থির জলে সূর্যকে স্পষ্ট দেখা যায়, এইরূপ নিম্নল ও প্রশান্ত চিন্তে আনন্দস্বরূপ আত্মা স্পষ্ট প্রতিভাত হন। বিষয়বাসনাবারা চিন্তা মলিন ও চঞ্চল থাকিলে সূর্যস্বরূপ

আত্মার অনুভূতি হয় না। তাই গীতার ভগবান্ বলিলেন—‘অশান্তস কৃতঃ সদ্ভবঃ’। ২।৬৬ অর্থাৎ ‘অশান্তের সদ্ভব কোথায়’? বিষয়প্রাপ্তিতে আমাদের মনে যে কিছুকালের জন্য আনন্দ হয় উহাও কিছুকাল চিত্তের বিহবৎ জনাই হইয়া থাকে। মনে করুন ‘টাকা’ ‘টাকা’ করিয়া চিত্ত আশ্রিত হইয়াছে এমন সময় কিছু টাকা পাইলেন, তখন টাকাবিষয়ে চিত্তের চঞ্চলতা কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হইল। তখন ঐ চঞ্চলতাশূন্য চিত্ত আত্মপ্ৰতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারিল। তাই আনন্দ হইল অথবা বৈষয়িক সূত্রে চিত্ত সম্যক চঞ্চলতাশূন্য হয় না বলিয়া সম্যক আনন্দও অনুভূত হয় না। টাকা প্রাপ্তিতে যে আনন্দ হইল, উহা হারাই হইল না। যেহেতু, কিরূপে টাকা রক্ষা করিব, টাকা খরচ হইয়া যাইবে, চোরে চুরি করিবে ইত্যাদি ভাবনা চিত্তকে পুনরায় আশ্রিত করিয়া তুলিল, আনন্দও নষ্ট হইল।

সমস্ত বৈষয়িক সূত্রেই এই প্রকার। মনে করুন সূন্দর অভিনয় দেখিতেছেন এবং চিত্ত আনন্দ হইতেছে। এই আনন্দ কোথা হইতে আসিল? আনন্দ অভিনয় হইতে বহির্গত হইয়া আপনার ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। আনন্দ আপনার স্বভাব, উহা কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করে না। কেবল চিত্তের চঞ্চলতার জন্য উহার উপলব্ধি হয় না। অভিনয় দেখিবার সময় আপনার চিত্তের চঞ্চলতা কাটিয়া গিয়াছে উহা স্ত্রীপুত্রাদি নানা বিষয় এবং সংসারের নানা দর্জাবনা তুলিয়া গিয়া তৎকালে একাগ্র হইয়াছে। তাই সেই বিবর্তিতে আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা যাইতেছে, সেইজন্য আপনি আনন্দ পাইতেছেন। অপরপক্ষে যদি আপনার বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রাদির অসন্তোষ অসুখ থাকে এবং আপনি বন্ধুগণের পাঙ্গায় পড়িয়া কোনদিন অভিনয় দেখিতে যান, তবে সেইদিন সূন্দর অভিনয়ও আপনাকে আনন্দ প্রদান করিবে না। যেহেতু, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রাদির অসুখ থাকায় আপনার চিত্ত সেইদিন একাগ্র হইতে পারিবে না।

সুতরাং দেখা গেল আত্মা আনন্দস্বরূপ ; নিঃশব্দ ও স্থিরচিত্তেই আত্মানন্দের
অনুভূতি হয় । আপনি যদি নিঃস্বপ্নে বসিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে পারেন,
তবে অবশ্যই আপনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিবেন, ইহাতে বাহ্য বিষয়ের
অপেক্ষা নাই । যত যত বাহ্যবিষয় হইতে উপরত হইয়া আপনি আত্মস্বরূপে
স্থিতলাভ করিবেন, আপনার আনন্দ ততই বাড়িতে থাকিবে এবং
পরিণামে সম্যক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আপনি নিরঙ্কুশ স্থায়ী পরমানন্দ
প্রাপ্ত হইবেন । দৃঃখ আপনার স্বভাব নয়, তাই আপনি দৃঃখ চান না । দৃঃখ
আগন্তুক ও অজ্ঞানে কল্পিত এবং মিথ্যা, সেইজন্য উহার নিবৃত্তি সম্ভব ।
দৃঃখ সত্য বস্তু হইলে উহার নিবৃত্তি সম্ভব হইত না । আত্মস্বরূপের অজ্ঞান
জন্য দৃঃখ কল্পিত হয়, আত্মস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ, দৃঃখের নিবৃত্তি
ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় । মহাবাক্য-বিচারদ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয় । সেই
বিচার আবার অশুদ্ধচিত্তে ফলদায়ক হয় না । অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য বৈরাগ্য,
শ্রদ্ধা, যোগ, ভক্তি, আসদ্ভাবের পরিহার প্রভৃতিরও প্রয়োজন । তাই
শ্রীভগবান গীতায় ঐ সমস্ত বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন । আমরাও পরবর্তী
প্রবন্ধ-সমূহে বিচার, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি সাধনসমূহ দেখাইব এবং উহাদের
তত্ত্বও আলোচনা করিব ।

— — —

বৈরাগ্য ও যুযুক্ষুত্ব

‘অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহ্যতে ।’ গীতা ৬।৩৫

(‘হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চলে মনের নিগ্রহ করা যায়’) ।
‘ত্রৈলোক্যমুন্মীকার্থেষু হানিত্যভেন নিষ্করাং । নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধিৰ্যৎ তদবৈরাগ্য-
মিতীৰ্যতে ।’ (সম্বৎসরোত্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ—শঙ্করাচার্য্য) । অর্থাৎ ‘এই
লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবিষয় সকল অনিত্য এই প্রকার নিঃশেষহেতু
বিষয়সকলে যে নৈস্পৃহ্যশূন্যতা ও তুচ্ছবুদ্ধি উহাই বৈরাগ্য নামে অভিহিত । এই
গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—

‘যেষামাশা নিরাশা স্যাৎ দারাপত্যধনাদিষু । তেষাং সিধ্যতি নান্যেযাং
মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ’ । অর্থাৎ ‘পত্নী, পুত্র, অর্থ প্রভৃতিতে যাহারা আশা
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদেরই মোক্ষের দিকে অনুকূলগতি সিদ্ধ হয়, অপরাধ
হয় না ।’

বৈরাগ্য দুই প্রকার :—(১) অপর বৈরাগ্য (২) পরবৈরাগ্য ।
(১) বিষয় সকল অনিত্য, পরিণামে দুঃখকর এবং ভোগদ্বারা বিষয়তৃষ্ণার
নিবৃত্তি ও শান্তি নাই, ইত্যাদি বিচার করিয়া বিষয় সকলের উপর যে বিরক্তি
এবং উহাদিগকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, উহা ‘অপরবৈরাগ্য’ । সত্যস্বরূপ
আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে অসত্য বস্তুসকলের উপর স্বতঃই যে বৈরাগ্য
আসে, উহা ‘পরবৈরাগ্য’ । অপরবৈরাগ্য ক্রমশঃ পর-বৈরাগ্যের কারণ হয় ।
সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা বিষয়ের দোষদর্শন করিয়া প্রথমে চিন্তে
বৈরাগ্যের উৎপাদন আবশ্যিক । যে পুরুষের বৈরাগ্য নাই, তিনি জ্ঞানের চর্চা
ভক্তির চর্চা, অভ্যাস যাহা কিছু করুন না কেন, উহা ফলবতী হয় না । বৈরাগ্য
হইতে জীবের মূমুক্শুত্ব বা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির ইচ্ছা হয় । যেমন যে

ব্যক্তির পিপাসা পাইয়াছে, তাহারই নিকট জলের আদর, এইরূপ যে ব্যক্তির মৃদুস্বভাব আসিয়াছে, তাহারই নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গের ও বেদান্তবিচারের প্রকৃত আদর। অতিশয় নিদ্রাতুর ব্যক্তি যেমন যে কোন স্থানে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে বিছানা বালিসের অপেক্ষা রাখে না, এইরূপ তীব্র বৈরাগ্যবান্ মৃদুস্বভাব সাধক যে কোন একটা সাধন অবলম্বন করিয়া উহাতে ডুবিয়া যান ও সিদ্ধি লাভ করেন। অপরপক্ষে যেমন অনিদ্রাগ্রস্ত রোগীর ভাল বিছানাতেও ঘুম আসে না, এইরূপ বৈরাগ্যহীন বিষয়চিন্তায় ব্যাকুল ব্যক্তির নিকট উত্তম সাধনসমূহও ফলদায়ক হয় না।

অপর বৈরাগ্য তিন প্রকার হইতে পারে যথা :—(১) মন্দ (২) মধ্যম (৩) তীব্র। বৈরাগ্যের তারতম্যানুসারে মৃদুস্বভাব ও (১) মন্দ (২) মধ্যম এবং (৩) তীব্র এই ত্রিবিধ হইতে পারে। স্ত্রী পুত্রাদির নাশে যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যের উদয় হয়, উহা মন্দ-বৈরাগ্য। এই প্রকার বৈরাগ্যকে ‘অশানবৈরাগ্য’ বা ‘মর্কটবৈরাগ্য’ও বলা হয়। ‘অশানে’ মৃতদেহ দেখিয়া যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যের উদয় হয়, উহা ‘অশানবৈরাগ্য’। ‘মর্কট’ যেন অস্থির এই বৈরাগ্যও সেইরূপ অস্থির, সেইজন্য ইহা ‘মর্কট-বৈরাগ্য’। এই বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না বলিয়া শাস্ত্রে এই প্রকার বৈরাগ্যে কোন সংন্যাসের ব্যবস্থা নাই। মধ্যম বৈরাগ্যে বিষয়ের অনিত্যতা বুঝিয়া বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা থাকিলেও পূর্ব সংস্কারবশতঃ ঐ ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে উহা ফলবতী হয় না। মন্দ ও মধ্যম বৈরাগ্যে গৃহে থাকিয়া চিন্তাশুদ্ধির কর্মসকল করা কঠব্য। মধ্যম-বৈরাগ্যে সংন্যাসগ্রহণ করিয়া সাধন করা যাইতে পারে। তীব্র বৈরাগ্যে ব্রহ্মলোক হইতে শ্রাবণপর্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই কার্কাবস্থাৎ হেয়বুদ্ধির উদয় হয়। এই প্রকার বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য শাস্ত্রে পরমহংস* সংন্যাসের ব্যবস্থা আছে। ‘মোক্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে, অদ্যই

*পরমহংস ত্রিবিধ :—(১) বিবাহিত (২) বিম্বান্। যাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের বা ইহজন্মের পুণ্যপুণ্যের পরিপাকবশতঃ সংসারে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, যাহার চিত্ত নিশ্চল ও অব্যাকুল,

স্বরা কেন ? আগে সব ভোগ করিয়া লই এবং কষ্ট'বা কর্ম্মর েষ করি, পরে মৃত্তির জন্য চেষ্টা করিব'। এই প্রকার মৃমৃক্ষাকে মন্দ মৃমৃক্ষা কহে। সংসারে ভয়ানক তাপগ্রয় দর্শন করিয়া [তাপ বা দুঃখ তিন প্রকার :—(১) আধ্যাত্মিক (২) আধিভৌতিক (৩) আধিদৈবিক। (১) শারীরিক জ্বরাদি ও কাম, ক্রোধ লোভাদি—ইহারা আধ্যাত্মিক দুঃখ। (২) আধিভৌতিক দুঃখ—সর্প বাঘাদি ভূত বা প্রাণী হইতে জাত। (৩) আধিদৈবিক দুঃখ—দেবতাগণ-কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ—যেমন বিদ্যাহ, বজ্রপাতাদিজনিত দুঃখ] বেদান্তবিচার সাহায্যে পরম বস্তুটি অপাততঃ বুঝিয়াও যদি কেহ স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, কি সংসারেই থাকিব এইরূপ উভয় কোঠায় দোলায়মান হয়, তবে তাহার ঐ মৃমৃক্ষা, মধ্যম ত্রিবিধ তাপদ্বারা সন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সর্বপ্রকার বিষয়সমুহই অনর্থের মূল জানিয়া যে মৃমৃক্ষাধারা বিষয়সকল পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, উহা তীব্র মৃমৃক্ষা।

তিনি তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য যে সংন্যাসগ্রহণ করেন, উহাই 'বীর্বিদ্যাসংন্যাস'। আর যদি কাহারও পূর্ব পূর্ব সুকৃতিবশতঃ গৃহস্থাশ্রমেই জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু জ্ঞানফল চিত্তবিদ্রাব্ধি ও জীবন্মুক্তিসুখের আবির্ভাব না হয়, তবে তিনি ঐ সকল লাভের জন্য যে সংন্যাস গ্রহণ করেন উহা 'বিশ্বংসংন্যাস'। তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সভায় অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া শেষে চিত্তবিদ্রাব্ধি এবং জীবন্মুক্তির জন্য এই প্রকার সংন্যাস গ্রহণ করেন। বীর্বিদ্যাসংন্যাসীর সাধন হইতেছে ব্রহ্মনিষ্ঠ সংস্কার নিকট বেদান্তের প্রবণ এবং উহার মনন ও নির্দিধাসন। বেদান্তশাস্ত্রের সম্যক্ পথলোচনা করিয়া উহার একমাত্র পরব্রহ্ম-চৈতন্যে তাৎপর্য এইরূপ অবধারণকে 'প্রবণ' কহে। প্রবণস্বারা চৈতন্যমাণ্ডের জ্ঞান হইলেও যদি পূর্বসংস্কারবশতঃ সংসার আসিয়া পড়ে, তবে প্রীতি ও ষ্টীতি দ্বারা উহার যে নির্দামকরণ উহাই 'মনন'। প্রবণ মনন দ্বারা সংসারের নাশ হয়। কিন্তু বিক্ষেপ থাকিয়া যায়। অর্থাৎ অনাধি বাসনার প্রাবল্যে পুনরায় জগতের এবং দেহাদির উপর সত্যাত্মিক আসিয়া পড়ে। এই অধ্যাস নিবৃত্তির জন্য নির্দিধাসনের প্রয়োজন। প্রবণমনন দ্বারা অবভাসিত পরব্রহ্মচৈতন্যে চিত্তবৃত্তির যে একতানপ্রবাহ উহাই নির্দিধাসন।

চিত্তবিদ্রাব্ধি ও জীবন্মুক্তি সুখের জন্য বিশ্বংসংন্যাসী, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস করেন। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় পরস্পর পরস্পরের সহায়ক। (এ বিষয়ে জানিতে আগ্রহ থাকিলে বিদ্যারণ্যমুনিঃস্বরকৃত 'জীবন্মুক্তি-বিবেক' অথবা শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়কৃত উহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)।

“নিষ্টপুর্ণাশ্রিত্য পাত্ৰম্ভূত্যা তুরয়া যথা । জহাতি গেহং তদ্বচ্চ তীর্থ
মোক্ষোচ্ছয়া স্বিজঃ ॥ স এব সদ্যস্তরতি সংসৃতিং গদ্বৰ্ণনগ্রহাৎ । বস্তু তীর্থ-
মৃদুস্বভাবঃ স্যাৎ স জীবন্তেব মৃচ্যতে ; জন্মান্তরে মধ্যমন্তু তদন্যন্তু যুগান্তরে ।”
(সৰ্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ) ।

অর্থাৎ লোকে যেমন অগ্নিস্বারা অতিশয় উত্তপ্ত পাত্রকে উঠাইয়াই ত্যাগ করে,
এইরূপ স্বাক্ষণ তীর্থ মোক্ষোচ্ছাবশতঃ শীঘ্রই গৃহ ত্যাগ করেন । যিনি তীর্থ-
মৃদুস্বভাব তিনি জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করেন । যাহার মৃদুস্বভাব মধ্যম তিনি
পরজন্ম এবং যাহার মৃদুস্বভাব মন্দ তিনি যুগান্তরে মোক্ষলাভ করিতে পারেন ।
ভগবান্ শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—“বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ” (৪২৬
শ্লোঃ) অর্থাৎ বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান’ । “অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্যৈব
দৃঢ়প্রবোধঃ” (৩৮২ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সমাধি হয়, সমাহিত
পুরুষেরই দৃঢ়জ্ঞান লাভ হয় ।’ আরও বলিয়াছেন—“এতয়োন্মাদতা যত্র বিরক্তত্ব-
মৃদুস্বভাবোঃ । মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদেতংৈমাত্ততা ।” (৩১ শ্লোঃ) অর্থাৎ
যেখানে বৈরাগ্য ও মৃদুস্বভাবের মন্দতা দেখা যায়, সেখানে মরুভূমিতে কল্পিত
জলের ন্যায় শমাদি সাধন মিথ্যা ভাগমাত্রে পর্যাবসিত হয় । অতএব মোক্ষলাভ
করিতে হইলে বৈরাগ্য ও মৃদুস্বভাবের একান্ত প্রয়োজন ।

পুনঃ পুনঃ বিচারস্বারা বিষয়ের দোষদর্শন করিতে অভ্যাস করিলে বিষয়ে
রমণীয়তাবুদ্ধির নাশ হয় ও বৈরাগ্যের উদয় হয় ; অবিচারিত চিন্তেই
বিষয়সকল রমণীয় বোধ হইয়া থাকে । দেহ, কামিনী, কাঞ্চন প্রভৃতিতে আসক্তি
মানবগণকে দৃঢ়ভাবে সংসারে আবদ্ধ করে । সুতরাং প্রথমে ঐ সকলের
দোষানুসন্ধান করা কর্তব্য । দেহ নানাবিধ রোগের আকর, নশ্বর, মলের
ভাণ্ডার ও অশুচি । ইহার যতই যত্ন করা যাক না কেন, একদিন ইহা কৃত্রিম
ব্যক্তির ন্যায় জীবেকে অবশ্যই ত্যাগ করিবে । এই জীবন নদীস্বরূপ—জন্ম,
মৃত্যু ইহার দুইটি তট, সুখদুঃখ ইহার তরঙ্গ, যৌবনের উল্লাস ইহার পক্ষ ।
রাগদ্বৈষরূপ মেঘস্বারা বর্ষিত হইয়া এই নদী ভূতলে দেহ বিস্তার করিয়াছে ।

লোভমোহরূপ আবর্ত তুলিয়া এই নদী শত উপাত-পূর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কামাদি ছয়টি কুস্তীর জীবকে সর্বদা গ্রাস করিতে উদ্যত। এই জীবননদী দ্বিবিধ তাপদ্বারা তপ্তা, অথচ মূঢ়বুদ্ধিগণ ইহাকে শীতল ভাবে। সাগরে জল-রাশির মিলন ও বিচ্ছেদের ন্যায় এখানে শত্রু, পুত্র, বন্ধু, বাণ্যবাদির সহিত এই মিলন, এই বিচ্ছেদ। সংসারে কালশয্যায় শয়ন করিয়া মোহনিদ্রার ঘোরে জীব কত অসার আশার স্বপ্ন দেখে। কালরূপ মর্ষক যে প্রতিমুহূর্তে তাহার আয়ু কল্পন করিতেছে জীব তাহা দেখিয়াও দেখে না, জানিয়াও জানে না। আয়ু একবার গত হইলে আর ফিরিয়া আসে না। মোহগ্রস্ত জীব কালের সংবাহন করে না। কালে মানুষের দেহ, কেশ, দন্ত ইত্যাদি জীর্ণ হয়, কেবল ত্বক্কাই জীর্ণ হয় না। অঙ্গ গলিত হইল, চুল পাকিল, মাড়ী দন্তশূন্য হইল, হস্তস্থিত বস্ত্রী কপিতে লাগিল, তখনও মানুষ আশা ছাড়িতে পারে না। যেমন সপের গলমধ্যে স্থিত হইয়াও ভেদ সম্মুখস্থ কীটপতঙ্গাদি ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়, এইরূপ কালরূপ সপের গলে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইতে থাকিলেও মানুষ শেষ পর্যন্ত ভোগের আশা ত্যাগ করিতে পারে না। ভোগদ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন উহা বর্ষিতই হইতে থাকে, এইরূপ ভোগদ্বারা ভোগেচ্ছা উত্তরাস্তর বর্ষিতই প্রাপ্ত হয়। ভোগেচ্ছাই মৃত্যুর অপর রূপ। কালে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, সাগর দেশে এবং দেশ সাগরে পরিণত হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত লয় পান। তবে এই ক্ষণস্থায়ী দেহের জন্য এত আশা কেন? ভগবান্ শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন :—

‘শরীর-পোষণার্থী’ সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতে। গ্রাহং দারুণিষা যস্য
নদীং তস্তং স ইচ্ছতি।’ (৮৬ শ্লোকঃ)

অর্থাৎ ‘যিনি শরীর-পোষণার্থী’ হইয়া আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাষ্ঠমূলে কুস্তীরকে ধরিয়া নদী উত্তীর্ণ হইতে চান।

ধন ও ধনের চিন্তা মানুষকে ভগবচ্ছিত্তা বা আত্মচ্ছিত্তা হইতে দূরে লইয়া যায়। ধনের দ্বারা মানুষের লোভ, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—‘বরং একটি ছদ্মের ছিদ্র দিয়া একটী উটকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধনী লোককে স্বর্গে লইয়া যাওয়া তদপেক্ষা কঠিন’। কালি, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্বর্গকেই বাসস্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গ বা অর্থমধ্যে কালি বাস করেন। সেইজন্য অর্থ থাকিলে সেই অর্থের বিনিময়ে সর্ববিধ ভোগ ও দৃষ্টিমগ্ন হইয়া যায়। আমাদের অনন্ত বাসনা ঐ অর্থের মধ্যে সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করে। অর্থ মানুষের নানাবিধ দুঃখের কারণ। ইহার অর্জনে, রক্ষণে ও ব্যয়ে দুঃখ। ধনবান্ পিতার পুত্র হইতেও অর্থের জন্য ভয় হয়। অনেক সময় ধনলোভে পুত্র পিতাকে হত্যা পর্যন্ত করিয়া থাকে। ধনবান্ ব্যক্তির ধনের জন্য রাজভয়, চোরভয় এবং আত্মীয়বর্গের নিকটও ভয় হয়। অর্থের জন্য লোকের সঙ্গে নানা বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়। অর্থচ্ছিত্তা চিন্তাকে সাতিশয় চঞ্চল ও উদ্ভ্রমিত করিয়া তোলে। অর্থচ্ছিত্তায় অনেক ধনী লোকের রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না। শরীরের ক্ষয় হয়। এই জন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ অর্থের এইসকল দোষ দর্শন করিয়া উহার জন্য আগ্রহ ত্যাগ করেন।

স্বর্গলোকের চিন্তা মানুষকে নরকের দ্বারে লইয়া যায়। লোক অবিচারিত-চিন্তে ক্রিমি-কীটসকুল স্বর্গদেহের রমণীয়তা কল্পনা করে। বিচারপূর্বক দর্শন করিলে স্বর্গদেহের উপর রমণীয়তাবৃষ্টির নাশ হয়। স্বর্গশরীর মাংস, অস্থি, বসা, স্নায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত, মৃৎ শ্লেষ্মা উৎপাদন করে, নাসিকা ও চক্ষু হইতে মল ও অশ্রু নির্গত হয়, দেহ নানাবিধ মলে পূর্ণ। কামের দ্বারা মোহিত পুরুষ ঘৃণিত দৃষ্টি দ্বারা স্বর্গদেহের এই দোষসকল দেখিতে পায় না, স্বর্গলোকের হাবভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নয়নকটাক্ষ প্রভৃতি অতি রমণীয় ও মধুর জ্ঞান করে। স্বর্গলোকের মদুমগ্ন লোকে কামাশ্রিত পুরুষ অধরসদৃশজ্ঞানে পান করে, কিন্তু ঐ লোকে মদুমগ্ন হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পড়িলে উহা দেখিতেও ঘৃণা হয়। রস,

রক্ত, মাংস প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্ত্রীদেহে রমণীয় কিছুই পাওয়া যায় না। তথাপি শকুনি যেমন ভাগাড়ে লোলূপ দৃষ্টিপাত করে, এইরূপ কামাণ্ড পুরুষও স্ত্রীদেহরূপ মাংসপিণ্ডে লোলূপ দৃষ্টিপাত করে। স্ত্রীদেহরূপে কল্পিত সৌন্দর্য্য উহা দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই দেহে আর পুরুষের আকর্ষণ থাকে না। আজ যাহা প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, কাল তাহাই চিত্তাকোষ্ঠে আরক্ত মৃতদেহ। স্ত্রী অসতী হইলে নানা দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টান্ত, এমন কি মৃত্যুর পর্য্যন্ত কারণ হয়। যে স্ত্রীকে আমরা প্রাণপ্রিয় মনে করি সেই প্রেমসী দেবে গোবরছড়া অমঙ্গল হবে বলে' (রামপ্রসাদ)। যে স্ত্রীদেহকে আমরা এত সুন্দর দেখি, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ উহার কোন সৌন্দর্য্যই দেখে না। স্ত্রীলোকের উন্নত স্তন, সুগোল নিতম্ব প্রভৃতি উহারা খাদ্যস্রোতে সানন্দে ভক্ষণ করে। কামরূপ কিরাত মনুষ্যরূপ বিহঙ্গগণকে আবশ্য করবার জন্য স্ত্রীলোকরূপ ফাঁদ পাতিয়াছে। বিবেকী মনুষ্যগণ উহাতে পতিত হন না। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—‘সংসার-মৃত্যোবলিনঃ প্রবেষ্টং, স্ত্রীণি চ মহান্তি লোকে।

কান্তা চ জিহ্বা চ কনকশ্চ তানি, রত্নশ্চি যতস্য ভ্রূং ন মৃত্যোঃ’। অর্থাৎ বলবান্ সংসাররূপ মৃত্যুতে প্রবেশ করবার তিনটী দ্বার; স্ত্রী, জিহ্বা ও স্তব্ধ। যিনি এই তিনটীকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না।

ইন্দ্রিয়গণও মানুষকে প্রভাবিত করে। গীতায় কথিত হইয়াছে যে, বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যে কোন ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, সে ইন্দ্রিয়ই মনের প্রজ্ঞা হরণ করিয়া উহাকে নাশ করে। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভঙ্গ ইহারা এক একটী ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে গিয়া নাশ প্রাপ্ত হয় বা দৃঃখে পতিত হয়। দেখ কুরঙ্গ বা হরিণ ব্যাঘ্রের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভ্রুতির জন্য বিনষ্ট হয়। মাতঙ্গ বা হস্তী মাতঙ্গিনীর অঙ্গস্পর্শসুখলোভে খাতে ধরা পড়ে। পতঙ্গ রূপের লোভে অগ্নিতে পড়িয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চক্‌রিন্দ্রিয় পতঙ্গকে বিপদে পতিত করে। মীন বা মৎস্য রসেন্দ্রিয়ের জন্য

বিনাশ প্রাপ্ত হয় হয়। ভুজ বা স্রমের ঘাণে শ্রমের তৃপ্তির জন্য বিনষ্ট হয়। এক এক ইন্দ্রিয়ের সেবা-স্বারা ই যখন এক একটী জীব নাশ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন যদি আমরা সেবে-শ্রমের সেবা করি, তবে বিরূপে রক্ষা পাইবে ?

পুণ্যোক্তরূপ বিচার দ্বারা চিন্তকে বিষয়বিরত করিতে হইবে এবং উহাকে আত্মচিন্তায় বা ভগবচ্চিন্তায় লাগাইতে হইবে। বিষয়ের দোষদর্শন-পুণ্যক উহা হইতে যে বিরতি, উহা বৈরাগ্য। বিষয়বিরত চিন্তকে পুনঃ পুনঃ আত্মচিন্তায় বা ভগবচ্চিন্তায় লাগানই অভ্যাস। অভ্যাস ও বৈরাগ্য পরস্পর পরস্পরের সহায়ক। পক্ষী যেমন উল্লসপক্ষের সাহায্যে উড়ীন হয়, এইরূপ বৈরাগ্য ও অভ্যাসের সাহায্যেই মোক্ষরূপ প্রাসাদে আরোহণ করা যায়। বৈরাগ্য ও মৃদুস্বভাব বাড়াইবার জন্য সংসঙ্গ ও সদৃশ্য পাঠ করা উচিত। প্রকৃত বীতরাগ পুরুষের নিকটে থাকিলে সহজেই বৈরাগ্য হইবে। যোগবিশিষ্টের বৈরাগ্য-প্রকরণ, আচার্য্য শঙ্করকৃত মোহমুগের প্রভৃতি এবং বৈষ্ণবগণের নানাগ্রন্থে সুন্দর সুন্দর বৈরাগ্যের কথা আছে। ঐ সকল পাঠ করিলে চিন্তে বৈরাগ্যের সংস্কার পড়িবে। সংসঙ্গ ও সংস্কারদ্বারা বৈরাগ্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া কালে মন্দ-বৈরাগ্যও তীব্রবৈরাগ্যে পরিণত হয়। তখন জ্বলন্তগৃহস্থিত ব্যক্তির বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতার মত ত্রিতাপদগ্ন জ্বলের সংসার-গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুলতা আসিবে। তখন মুক্তি আসে। 'তীব্রসম্মেগানামাসন্নঃ' (পতঞ্জলি)।

— — —

শ্রদ্ধা জীবের পরম সম্পদ । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—“গুরুবেদান্ত-
বাক্যেষু বুদ্ধিধৰ্ম্মা নিশ্চয়াত্মিকা । সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধা নিদানং মূর্ত্তিসম্বন্ধে ॥”
অর্থাৎ ‘গুরু ও বেদান্তবাক্যসমূহ যে সত্যই, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিকে
শ্রদ্ধা কহে, শ্রদ্ধাই মূর্ত্তির কারণ’ । গীতায় কৃষ্ণভগবান্ বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধাবান্
লভতে জ্ঞানম্” । ৪।৩৯ অর্থাৎ ‘শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে’ । পঞ্চদশী
বলিয়াছেন—‘অশ্রদ্ধা পরোক্ষঃ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এবং অবিচার অপরোক্ষ
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক’ । শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

“দেবে চ বেদে চ গুরৌ চ মন্ত্রে, তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ ।

শ্রদ্ধা ভবত্যস্য যথা যথাহঁতঃ, তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পদংসাম্” ॥

(সৰ্ববেদান্তীসংঘাতসার) ।

*দশজন লোক নদী পার হইতেছিল । নদী পার হইরা উহারা ভাবিল, ‘আমরা দশজনই আছি-
কি না গুণিয়া দেখা বাড়ক’ । গণনার কালে উহাদের প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করিল ;
সুতরাং প্রত্যেকের গণনার নর জন হইল । তখন উহাদের নিশ্চয় হইল আমাদের একজন অবশ্যই
জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে । তখন উহারা উহার জন্য কান্দিতে লাগিল । এমন সময় একজন
অভ্রান্ত ব্যক্তি ঐস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহাদের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । উহারা
তাঁহাকে সব বলিল । তিনি গুণিয়া দেখিলেন দশজনই আছে এবং বুঝিলেন উহারা ভ্রমে
পড়িয়াছে । তখন সেই ব্যক্তি উহানগকে বলিলেন, ‘দশম ব্যক্তি আছে, মারা যার নাই’ । ইহা
শুনিয়া ঐ লোকগণ মনে আশা ও বলের সঞ্চার হইল, ‘কিন্তু দশম কোথায় আছে তাহা জানিতে
না পারিরা দশম গুণ আশ্রয় হইতে পারিল না । তখন সেই অপদ্রব্য উহাদের একজনকে গণনা
করিতে বলিলেন । ঐ ব্যক্তি নর পর্যান্ত গণনা করিয়া যেমন থামিয়াছে, তিনি তাহার বক্ষের দিকে
অঙ্গুলি ফিরাইরা দরা বলিলেন, ‘তুমিই দশম, । তখন ঐ ব্যক্তিগণের দশমপদ্রব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত
কাটিয়া গেল । ‘দশম আছে’ এই বাক্য শুনিয়া উহাদের দশমপদ্রব্য সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান উপস্থ
হইয়াছিল উহাই উহাদের দশমপদ্রব্যসম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান । পরে ‘তুমিই দশম’ এই বাক্যে অপরোক্ষ
জ্ঞান জন্মিয়াছিল । এইরূপ শ্রদ্ধালু শিষ্য সদগুরুর নিকট ‘সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন’
এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন । পরোক্ষজ্ঞানে ব্রহ্ম নাই’
এইরূপ অসম্ভাপনক অজ্ঞানের আধরণ-শক্তি নষ্ট হয় এবং শোক-মোহাদিও অনেকটা নিবারিত

অর্থাৎ ‘ইন্টসেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ’, মহাপুরুষ এবং ঐষধ এই সকলের উপর যেমন যেমন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হইবে, পুরুষগণের তেমনই তেমনই সিদ্ধির উদয় হইবে’। বহু শাস্ত্রেই শ্রদ্ধার প্রশংসা দেখা যায়। শ্রদ্ধাহীন নর সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতে না শিখিয়া একবারে ভগবানে শ্রদ্ধা প্রদান করা অসম্ভব; যেহেতু ভগবান্ অতিশয় সূক্ষ্মবস্তু। সেইজন্য প্রথমে গুরু, দেবতা প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করিতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বন্দুক ছাড়িতে অভ্যাস করে, প্রথমে তাহাকে একটি বড় বস্তু অঁকিয়া দেওয়া হয়। প্রথম শিক্ষার্থীর নিক্ষিপ্ত গুলি ঐ বড় বস্তুটীতে পড়ে না। কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাস পাকিলে তাহার নিক্ষিপ্ত গুলি ঠিক ঐ বস্তুর মধ্যে পড়ে। তখন বস্তুটি ক্রমশঃ ছোট করিয়া দেওয়া হয় এবং লক্ষ্যার্থীও অভ্যাসের পরিপাকে ঐ ক্রমশঃ ছোট বস্তুগুলিতে লক্ষ্য নিক্ষেপ করিতে পারে এবং পরিশেষে একটি বিন্দুতেও লক্ষ্য ঠিক আসিয়া পড়ে, এইরূপ ভগবানে শ্রদ্ধা দিবার পূর্বে মাতা, পিতা, আচার্য্য প্রভৃতি গুরুগণকে শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করিতে হয়, তবেই শেষে ভগবানে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারা যায়, নতুবা কোন প্রকারে উহা সম্ভব হয় না। তাই শ্রুতি শিক্ষা দিলেন—‘মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব’ ইত্যাদি। অর্থাৎ ‘মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে’।

ভগবান্ বা ভগবতী জগৎপিতা বা জগন্মাতা। অর্থাৎ পিতৃ বা মাতৃকে শ্রদ্ধা করিবার পূর্বে খণ্ড পিতৃ ও মাতৃকে শ্রদ্ধা করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তির প্রদীপের অগ্নির সহিত পরিচয় না থাকে, তবে তাহাকে মহাপ্রলয়ের অগ্নি কিরূপ তাহা বঝান যায় না। এইরূপ যে ব্যক্তির মাতাপিতার মধ্যে মাতৃয়ের ও পিতৃয়ের পরিচয় না হইল, তাহাকে জগদম্বার অথবা পরমপিতা হয়। কিন্তু যখন শ্রদ্ধালু ও উপযুক্ত শিষ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকটে ‘তত্ত্বমস্যাং’ মহাবাক্য-সকলের বেদান্তবিচার শ্রবণ করেন, তখন তাহার ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইপ্রকার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় এবং অজ্ঞানের অগবনাপাদক আবরণ শক্তির নাশ হয়। তখন সর্বদৃশ্যের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। (‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের বিচার সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)

পরমেশ্বরের বিষয় বোঝান যায় না। সেইজন্য আমরাদিগকে দুর্গাপূজার পূর্বে পিতৃপক্ষে মাতাপিতা প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীপূজার অধিকার লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রে মাতৃপিতৃশ্রদ্ধার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের উপর শ্রদ্ধা ভুবনবিখ্যাত। ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের উপর শ্রদ্ধায় ও সাধনায় তৃপ্ত হইয়া স্বর্গস্থ মন্দাকিনী মন্ত্ৰে পতিতপাবনী গঙ্গারূপে প্রবাহিতা হইয়াছেন। গঙ্গা ভগীরথের বিগলিতরূপা পিতৃশ্রদ্ধা। গঙ্গাস্নান মানুষকে পাপ, তাপ, রোগ এবং শোক প্রভৃতি হইতে দূর করে কিন্তু গঙ্গাস্নানকালে যদি পিতৃশ্রদ্ধা উদ্ভূত না হয়, তবে প্রকৃত গঙ্গাস্নান হইল না। গঙ্গা মূর্তিমতী পিতৃশ্রদ্ধা বলিয়া দেব বা দেবীপূজায় গঙ্গাজল হইতেছে প্রধান উপকরণ। ভীষ্ম গঙ্গাদেবীর পুত্র, সেইজন্য তাহার মধ্যেও অটল পিতৃশ্রদ্ধা ফুটিয়াছিল। পিতৃসত্যপালনের জন্য ভীষ্মদেবী বিবাহ করেন নাই, সেইজন্য তাহার পুত্র নাই। কিন্তু তাহার মহত্বের প্রতিদানে আজ আমরা সমস্ত হিন্দু তাহার পুত্র-পৌত্রস্বরূপ হইয়া তাহার তর্পণ করিয়া থাকি।

যে মাতাপিতার নিকট আমরা কত উপকার পাই, যাহাদের গুণ কখনও গোপন হয় না, তাহাদিগকেই যদি আমরা শ্রদ্ধা দিতে না পারি, তবে যে অপরাধকেও শ্রদ্ধা দিতে পারিব, ইহা মিথ্যা কথা। আবার যদি কেহ বলেন,—“আমি মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভ্রাতাভগ্নির সহিত আমার সম্ভাব নাই, তবে বৃদ্ধিতে হইবে, ঐ ব্যক্তির মাতাপিতার উপরও প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই। যিনি ভ্রাতাভগ্নির মধ্যে মাতাপিতার ছাপ দেখিতে পান না, তিনি কি প্রকার মাতৃপিতৃভক্ত? তর্পণমন্ড্রে দেখিতে পাই, পরমপিতার পূজার যোগ্যতা লাভ জন্য তাহার সন্তানগণকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হয়। পরমপিতার সন্তান নয় কে? সেইজন্য তর্পণমন্ড্রে দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, সপ, বিহগ, তরু, পশু, মিত্র প্রভৃতি সকলেরই তর্পণদ্বারা তৃপ্তিসাধন করিবার বিধি আছে। শ্রাদ্ধতর্পণের মন্ত্ৰগুলি ঋষিদের দৃষ্টি ধ্যে কত উদার ছিল, উহা ‘সম্বৎখল্বিদং ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার প্রমাণ দিতেছে।

মাতাপিতার ন্যায় আচার্য্য ও অন্যান্য গুরুগণও শ্রদ্ধার পাঠ । রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । 'মাতৃদেহো ভব' ইত্যাদি বাক্যে বেদে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে উহাই দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থ । পুরাণ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বেদের ব্যাখ্যাস্বরূপ । বেদ সকলে বর্ণিতে পারে না ; পুরাণগ্রন্থে বেদ সহজে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পুরাণ-পাঠেও বেদপাঠের তুল্য ফল হয় ; অবশ্য ভক্তি শ্রদ্ধা থাকা চাই । যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিবেন, এবং উহাদের আদর্শমত নিজের জীবন গঠন করিবেন, তিনি রামচন্দ্র বা কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গে সমস্ত বেদ দীক্ষিতে পাইবেন । প্রত্যেক আয়স্মতানের পুরাণগ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যিক । ইহাতে হৃদয়ে শ্রদ্ধার বীজ উদ্ভূত হইয়া সংস্কারের সাহায্যে উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে এবং কালে উহা প্রকাণ্ড শাস্তিরূপ বৃক্ষে পরিণত হইবে । নানাবিধ সদগুণরাশি ঐ বৃক্ষের সুগন্ধ পুষ্পরূপে উহার শোভাবর্ধন ও চতুর্দিক আমোদিত করিবে । সংসারপথে পরিশ্রান্ত পথিকগণ ঐ বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া শীতল ও স্নিগ্ধ হইবে । পরিশেষে ঐ বৃক্ষ মোক্ষফল প্রসব করিবে এবং জীবরূপ পক্ষী তাহা খাইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবে ।

যদি বলা হয়, শাস্ত্রকে এরূপ অশ্রদ্ধাভাবে মানিব কেন ? তদন্তরে বলি, তাহার শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা আসিয়াছে, উহা তাহার পূর্বজন্মের বা ইহজন্মের বহু স্মৃতি ও বিচারের ফল । স্মৃতিদ্বারা পাপক্ষয় না হইলে এবং বিচারদ্বারা সংশয়ের নিরাস না হইলে গুরু ঈশ্বর ও শাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা আসে না ; সুতরাং প্রকৃত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কখনও অশ্রদ্ধ নয় । বিষয়ভোগ-স্পৃহাশূন্য, ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং সমাধিদ্বারা পুত ও জাগ্রতচিন্ত ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া বিষয়ভোগলোলুপ, তহজ্জারী, নাস্তি ও চঞ্চলচিন্ত কোন সুপুণ্ড্রি ব্যক্তির বাক্যে শ্রদ্ধা করিব ? আপনার আমার মত, আপনার আমার বক্তৃতা, আপনার আমার কবিতা আমাদের জীবনকালেই লোকে ফেলিয়া দেয় ; আর

যদিও বা তাহা না দিল, তবে আমাদের দেহান্তে উহাদের কতদিন আদর থাকিবে তাহাই ত ভাবিবার বিষয়। কাল কতদিন উহাকে সহ্য করিবে? উহা কি কালপরীক্ষিত? অপরপক্ষে কোন অজানা যুগ লইতে শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যের আদর চলিয়া আসিতেছে। আজও রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতির আদর পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। দ্রোণদর্শী কবি বাণ্মণীক প্রভৃতি জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও কি বৃদ্ধা যায় না, যে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা করিব কেন? যিনি বুদ্ধিমান তিনি এই সকল পর্যালোচনা করিয়া শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হন। যিনি দূরদর্শী তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একই কালে দেখিতে পান, সেইজন্য কোন প্রবাহে ভাসিয়া বেড়ান না, কিন্তু সূর্যপদর্শী ব্যক্তিগণ যখন যে প্রবাহ আসে, উহাতে খড়্গুটার ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়। কখনও কাহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া মাথায় তুলিয়া উন্নতভাবে নাচে, আবার পরমুহূর্তে তাহাকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অদূরদর্শী এই ব্যক্তিগণ অহংকারবশে শাস্ত্রমৰ্যাদা ভাঙিতে বাধ্য। ষাঁহার শাস্ত্রবিশ্বাসী তাঁহাদিগকে অশ্ব, গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করে এবং নিজেদের সংস্কারের পূর্বে অহংকারবশে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সংহার করিয়া থাকে। শাস্ত্রোজ্জ্বলা এবং সাধনসম্পন্ন বুদ্ধি ব্যতীত অহংকারকে ধরা যায় না। অনেক সময় বাহ্য ত্যাগাদি এবং শূভ-আচরণের মধ্যেও অহংকার ও স্বার্থ লুকাইয়া থাকে, উহা পরে ধরা পড়ে। আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ঋষিদের ও শাস্ত্রের প্রতি কটুদৃষ্টি করেন। এই সকল স্ত্রীলোক আধুনিক শিক্ষাগর্বে গর্বিতা। শিক্ষার প্রকৃত যে সকল গুণ যেমন—ধৈর্য্য, সংযম, দয়া, সত্য, সরলতা প্রভৃতি ইহারা এগুনি অর্জন করেন না। ইহারা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া দেখেন নাই বা দেখিলেও চণ্ডলচিত্ততা-হেতু গভীর শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। ঋষিদের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া যদি তাঁহারা আদর্শ জননী ও সদগুণভূষিতা দেবী হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণও দোষমুক্ত হইয়া সংসারের শ্রীবুদ্ধিসাধন করিবে।

নতুবা কেবল সম অধিকারের দাবীদ্বারা প্রকৃত সমস্যার সমাধান না হইয়া ভটিলাতার সৃষ্টি করিবে। এবিষয়ে অধিক বলার অবকাশ এখানে নাই। মূৰ্খব্যক্তিগণই বলিতে না পারিয়া ঋষিষ্যাক্যের ও শাস্ত্রের নিন্দা করে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—“Fools rush in where angels fear to tread.” অর্থ ‘দেবদূতগণ যে স্থান মাড়াইতে ভয় পায়, মূৰ্খব্যক্তিগণ তথায় ছুটিয়া যায়’।

তথাপি জগৎ বৈচিত্র্যময়, আর বৈচিত্র্যই সৃষ্টি। এখানে যত বিরোধী ভাবধারা উহার মধ্য দিয়া এক ভগবানেরই বিকাশ হইতেছে। স্মৃতরাং শাস্ত্র-বিরোধী ভাব দেখিয়া অন্তরে বিরক্ত, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। এই যে জগৎ আমরা দেখিতেছি উহা ভগবানের মূর্তি। ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; আমাদের কৰ্ম্মসংস্কারের মধ্য দিয়া দেখায় তিনি অনুকূল ও প্রতিকূল-ভাবে প্রতীত হন। সোনার শিব আর সোনার ডাকাত স্বর্ণাংশে কি প্রভেদ আছে? নামরূপ মিথ্যা, স্বর্ণই সত্য। প্রতিকূল মূর্তিতে ভগবান্ আমাদের সাধনা ও শৈশ্যের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। আমরা যেন তাঁহার বাহারূপে মোহিত হইয়া পরীক্ষায় ‘ফেল’ না হই। স্মৃতরাং সম্বন্ধস্থিত ভগবান্কে সর্বদিকে নমস্কার।

প্ৰশ্নে অশ্রুতাবে শাস্ত্র মানিতে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তদন্তরে আর একটী কথা বলিবার আছে। আচ্ছা বলুন দেখি, জগতে যাহা কিছু জ্ঞান আপনি অর্জন করিয়াছেন, তাহা অশ্রুতাবে মানিয়া লওয়া কি না? মনে করুন জ্যামিতি শিখাইল ‘রেখা তাহাকে বলে, যাহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নাই’। আপনি অমনি স্মবোধ শিশুর ন্যায় এই অসম্ভব বাক্য মানিয়া চলিলেন, কই আপত্তি করিলেন না ত? আবার আপনি বলিলেন, ‘এই বস্তুটী ৬ ইঞ্চি লম্বা, ইত্যাদি। আমি যদি বলি, বস্তুটী ৬ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি কিছুই নহে। মানুষের স্বাভাবিক চক্ষু উহাদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য ৬ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি এই

প্রকার ব্যবহার করে মাত্র । চক্ষুতে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ৬ইঞ্চি বস্তুই ১০ ইঞ্চি দেখাইবে ; আবার বস্তুসকলকে আমরা যেমন আমাদের সংস্কারমত দীর্ঘ প্রস্থ, উচ্চাদি দেখি, কুরুর প্রভৃতি জীবগণ উহাদিগকে সেরূপ দেখে না । সুতরাং বস্তু সকলের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বলা শক্ত । তথাপি আমাদের ব্যবহারের সুবিধা-জন্য উহাদিগকে দীর্ঘ, প্রস্থাদিরূপে ধরিয়া লওয়া হয় । আবার আমরা জানি দুই আর দুই চার হয় ; কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক যদি প্রমাণ করিয়া দেন, দুই আর দুই পাঁচ হয়, তখন আমাদের ইহাই মানিতে হইবে । আবার যদি কাহাকেও ভিজ্ঞাসা করা হয়, অমুক ব্যক্তি যে তোমার পিতা তাহা কোন প্রমাণে জানিলে ? তাহাকে উত্তর দিতে হইবে—‘মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ।’ এইরূপ মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি পরমপিতার পরিচয় দিয়াছেন ও জীবের প্রকৃত মঙ্গলের পথ নির্দেশ করিয়াছেন, আপনাকে প্রথমে তাহা মানিয়া লইতে হইবে । যদি সবই মানিতে পারেন, তবে যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হইবে তাহা মানিতে এত আপত্তি কেন ? ইহাই ত অহংকার ও বুদ্ধিবিভ্রম ।

আজকাল অনেকে বলেন ‘ধর্ম’ ‘ধর্ম’ করিয়া ভারতের অবনতি হইয়াছে । ইহার উত্তর ‘ধর্ম’ ‘ধর্ম’ করিয়া ভারতের অবনতি হয় নাই । আমরা প্রকৃত ধর্মোচরণ করি নাই বা ধর্মের কপট আচরণ করিয়াছি, উহাই আমাদের এবং জগতের অবনতির কারণ । নোষ ধর্মের নহে, যে ধর্ম আচরণ করিবে, উহার আচরণকারীর আচরণের দোষে ধর্ম দূষিত হয় না । সুতরাং ধর্ম পরিত্যাজ্য নহে । যাহাতে লোকে প্রকৃত ধার্মিক হয়, প্রথম হইতেই উহার শিক্ষা দেওয়া উচিত । প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, লোভী প্রভৃতি হন না ; পরন্তু তিনি নিভীক, উদারচিত্ত, সমদর্শী, সত্যবাদী, নির্লোভ ইত্যাদি হইয়া থাকেন । সুতরাং জগতের প্রকৃত কল্যাণ ধর্ম-পালনে, ধর্ম-ত্যাগে নহে । ধর্ম রক্ষিত হইবে ধর্মই সকলকে রক্ষা করেন ।

অনেকে আবার বলেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ নাই। ইহাও ঠিক নহে। হিন্দু-শাস্ত্রমতে ধর্মকে ভিত্তি করিয়াই সংসারাত্মকে অর্থ ও কামের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা অর্থ ও কাম অনর্থের হেতু হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, যে ভগবান্ চারিধণের সৃষ্টি করিয়া উহাদের নিম্নস্তরূপে পুনরায় ধর্মের সৃষ্টি করিলেন। ধর্মই সত্যবস্তু—উহা রাজারও নিয়ন্তা। কোনটী ধর্ম, কোনটী অধর্ম, মানুষ বিষয়বাসনাকলুষিতচিত্তে উহা বোধিতে পারে না। শাস্ত্র দেখিয়া ধর্মাদ্বৈত নিরূপণ করিতে হয়। তাই গীতার ভগবান বলিলেন :—

“তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্য-বাবিহৃতৌ।” ১৬/২৪। মানুষ অহংকারবশে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মানে না। অর্জুন যে যুদ্ধ হইতে বিাত হইতে চাহিয়াছিলেন উহাও মোঃ এবং অহংকারবশেই। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—
“অথচেষু ভ্রমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনশ্যসি”। ১৮/৫৮ অর্থাৎ ‘যদি তুমি অহংকার-বশে আমার কথা না শোন, তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে’। ধর্ম সকলকে ধরিয়া রাখে। ‘ধর্ম’ শব্দের ব্যাপক অর্থ ভগবান্ ; যেহেতু ভগবান্ ই সচ্চিদানন্দ-রূপে সকলকে ধরিয়া আছেন।

যাহা হউক আমরা এইস্থলে অবান্তর আলোচনার সমাপ্তি করিয়া মূল বিষয়ে অগ্রসর হইব। মহাভারত হইতে পরম পবিত্র উপমন্দির উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া পূর্ব্বকালে আচার্য্যের উপর কিরূপ শ্রদ্ধা রাখা হইত তাহা দেখাইব। পূর্ব্বকালে শিষ্যগণকে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া সেবারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদ্যাার্জন করিতে হইত। গুরুগণও শ্রদ্ধা, ধৈর্য্য প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে কঠোর সেবাকার্য্য নিযুক্ত করিতেন। সেবারা নিম্নলিখিত শিষ্যকে অল্প উপদেশ দিলে অধিক কার্য্য হয়, তাহা পূর্ব্বকর গুরুজন বিদিত ছিলেন। কারণ মূল্য দিয়া যে জিনিষ ক্রয় করা হয়, তাহার আদর বেশী হয়, সস্তায় কিনিলে তাহা হয় না, সে মৰ্য্যাদাবোধ থাকে না।

এখনকার দিনের মত তখন উপদেশ এত সস্তা ছিল না, কারণ কবিগণ

শাস্ত্রের উপদেশের মৰ্যাদা বৃদ্ধিতে, তাহারা কখনই উৎসাহে বীজবপন করিয়া বৃথা শক্তিকর্য করিতেন না। প্রথমে সেবাদি করাইয়া লইয়া শিমোর হৃদয়ক্ষেত্রে উৰ্বর করিয়া লইতেন। ঐ সেবাদিম্বারা শিমোর মৈষ্যের ও একনিষ্ঠতার পরীক্ষা হইত, চিত্ত শৃঙ্খল হইত ও বিদ্যার প্রতিক্ষক অহংকারের ক্ষয় হইত। যেমন আদ্র্কাষ্ঠের রস শ্কাইয়া লইয়া উহাতে পরে অগ্নিসংযোগ করিলে উহা জ্বলিয়া উঠে, এইরূপ গুরু সেবাদিম্বারা শিমোর বিষয়-সরসতা শ্কাইয়া লইয়া পরে উহাতে জ্ঞান-অগ্নি সংযুক্ত করিয়া দিতেন; ইহাতে সহজেই শিমোর প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইত, ইহার নামই বিদ্যা। এই বিদ্যার ফল সৰ্বত্র সমদর্শন। ইহা এখানকার মত অন্ধকারে সমদর্শন নহে।

উপমন্যু আপোদধৌম্য ঋষির শিষ্য। গুরু উপমন্যুকে গো-সেবা-কৰ্ষ্যে নিবৃত্ত করিলেন। উপমন্যু গুরুর আদেশমত দিনের বেলায় গুরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং গুরুকে প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন। একদিন গুরু উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কবে উপমন্যু। তোমাকে ত বেশ হৃষ্টপদুষ্ট দেখাইতেছে, তুমি কি খাইয়া জীবিকা নির্বাহ কর’? উপমন্যু উত্তর করিলেন, প্রভো! আমি ভিক্ষাম্বারা জীবিকা নির্বাহ করি’। গুরু বলিলেন, ‘তুমি আমাকে নিবেদন না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিও না’। উপমন্যু ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া সেইদিন হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুকে প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গুরু পুনরায় উপমন্যুকে বলিলেন—‘উপমন্যু। আমি ত তোমার ভিক্ষা গ্রহণ করি, তথাপি তোমাকে পদুষ্টের ন্যায় হৃষ্টপদুষ্ট দেখাইতেছে, ইহার কারণ কি’? উপমন্যু বলিলেন, ‘দেব। আমি প্রথমবার ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আপনাকে প্রদান করি’ পরে দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিয়া উহাম্বারা জীবিকা নির্বাহ করি। গুরু বলিলেন,—‘ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। কারণ, এই প্রকার দ্বিতীয়বার ভিক্ষাম্বারা তুমি অন্যান্য ভিক্ষাজীবীদিগের জীবিকার বিঘ্ন উপস্থাপন করিতেছ এবং লোভী হইয়া পড়িতেছ’। সেইদিন হইতে উপমন্যু

শ্বিতীয়বার ভিক্ষা ত্যাগ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে গরু পুনরায় উপমন্যকে বলিলেন—‘উপমন্য। তোমার ভিক্ষায় আমি গ্রহণ করি। তুমি শ্বিতীয়বার ভিক্ষাও কর না, তথাপি কি প্রকারে পূর্ববৎ হ্রষ্টপদুট রহিয়াছে’। উপমন্য বলিলেন—‘দেব। আমি গরুগন্ডলির দৃশ্যবারা জীবিকা নিম্বাহ করিতেছি’। গরু বলিলেন, ‘ইহাও তোমার উচিত হইতেছে না, যেহেতু আমি তোমাকে ঐরূপ করিতে বলি নাই’; সেইদিন হইতে উপমন্য গরুর দৃশ্য খাওয়া ত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে গরু পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘উপমন্য। তুমি প্রথমবারের ভিক্ষায় গ্রহণ কর না, শ্বিতীয়বার ভিক্ষাও কর না, দৃশ্যও খাও না, তথাপি তোমাকে পূর্ববৎ হ্রষ্টপদুট দেখিতেছি কেন’? উপমন্য বলিলেন ‘প্রভো। বৎসগণ মাতৃতন্যপানকালে যে ফেন উৎগীরণ করে, আমি তাহাই পান করি’। গরু বলিলেন—‘বৎস। এই বাছুরগন্ডলি অত্যন্ত দয়ালু সেইজন্য দয়াপরবশ হইয়া তোমার জন্য প্রচুর ফেন উৎগীরণ করে। ইহাতে তাহাদের জীবিকার ব্যাঘাত হয়, অতএব ঐরূপ করাও উচিত নয়’। পূর্বেবক্তপ্রকারে গরু উপমন্যর আহারের পথ সব দিক্ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এমতাবস্থায় গরু চরাইতে চরাইতে একদা তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িলেন, তথাপি গরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া একটী আকন্দ গাছ হইতে কতকগন্ডলি পাতা ছিঁড়িয়া উহাই ভক্ষণ করিলেন। আকন্দপাতা বিষাক্ত; পরিপাককালে উহা তাহার শরীরে বিষক্রিয়া উৎপাদন করিল। উপমন্য ক্রমশঃ অশ্ব হইয়া গেলেন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তিনি গরু চরাইতে লাগিলেন এবং গরু চরাইতে চরাইতে একাট কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

এদিকে গরু সন্ধ্যার পরও উপমন্য ফিরিলেন না দেখিয়া উন্মিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং শিষ্যগণ সম্ভাব্যাহারে তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উপমন্যর সাড়া পাইলেন। গরু উপমন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কিরূপে কূপের

মধ্যে পড়িলে' ? উপমন্যু আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিল। উপমন্যুর গদ্যভাষি দেখিয়া গদ্য স্তম্ভিত ও প্রীত হইলেন। গদ্য বলিলেন 'উপমন্যু ! তুমি অশ্বিনীকুমারব্রাহ্মণের স্তব কর, তাঁহারা দেবলোকের চিকিৎসক, তোমাকে তাঁহারা চক্ষুমান করিবেন'। ইহা শুনিয়া উপমন্যু স্বক্ৰমস্ততুল্য বাক্যদ্বারা তাঁহাদের স্তব আরম্ভ করিলেন। মহাভারত বলিয়াছেন—“স্নেহাত্মদুঃখচরমে স্বগ্ভি-
ব্ধগ্ভিঃ”। উপমন্যু কিরূপে এই বৈদিক মন্ত্র শিখিল ? গদ্যরূপে তাঁহাকে গোচারণকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রসকল শিক্ষা দেন নাই। ইহার উক্তর শ্রবণ করুন। বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে স্বচ্ছন্দে ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত। পরমগদ্য ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন, যেহেতু ঈশ্বর সর্বব্যাপক—‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহৈব জর্দন তিষ্ঠতি’। গীতা ১৮/৬১ সেইজন্য প্রত্যেক জীবের মধ্যেও বেদ আছে। বেদ প্রত্যেক জীবের স্বাভাবিক ছন্দঃ। কিন্তু অসুরভাবদ্বারা আক্রান্ত হইলে ঐ ছন্দঃ কাটিয়া যায়। অহংকারই সেই অসুররাজ। কাম, ক্রোধ, লোভ ইহার সেনাপতিগণ ; হিংসা, কটিলতা প্রভৃতি অসংখ্য সৈন্য। আসুরশক্তির প্রভাবে বেদ ও যজ্ঞ আবৃত থাকে। কিন্তু যিনি উপমন্যুর ন্যায় অহংকারকে গদ্যরূপে চরণে সমাক্ষিপণ করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট বেদ স্বতঃই স্ফুর্তি পাইবে। যেমন বায়ুগতির মূখ হইতে “মা নিষাদ” ইত্যাদি ছন্দোবদ্ধ শব্দ স্বতঃই নিগত হইয়াছিল। ঈশ্বর সকলের গদ্য—“স পূর্বেষামপি গদ্যঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ”। পত্রঞ্জলি। ঈশ্বর সকলের অন্তরে বিরাজিত। বাহ্য লৌকিক গদ্যও সেই ঈশ্বরগদ্যের স্ফুর্তি। লৌকিক গদ্যকে ঈশ্বর ভাবনা করিলে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর গদ্য ঘরা দেন। তাই শাস্ত্র বলেন—“গদ্যো মনুষ্যবুদ্ধিঃ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাং। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিঃ কদ্বাণো নরকং ব্রজঃ”। অর্থাৎ ‘গদ্যতে মনুষ্যবুদ্ধিঃ মন্ত্রে চাক্ষর-ভাবনা এবং প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিলে নরকে বাইতে হয়’। বিদ্যা জ্বরদান্ত-পূর্বক আদায় করা যায় না অথবা অর্থদ্বারাও উহা ক্রয় করা যায় না ; প্রাণ-দ্বারা উহার অর্জন করিতে হয়।

যাহা হউক উপমন্ডার মতবে তদৃষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমার স্বয় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—“উপমন্ডা । আমরা তোমার প্রতি সন্তদৃষ্ট হইয়াছি ; তোমাকে একটা পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর’ । কিন্তু উপমন্ডা বলিলেন—‘হে অশ্বিনীকুমার-স্বয় । আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া এই পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিষ না’ । অশ্বিনীকুমারস্বয় তাহাকে প্রলুপ্ত করিলেও তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন না । অন্য উপমন্ডার গুরুভক্তি ! এত বিপদে, এত কষ্টেও তাহার গুরুভক্তি টলিল না । গুরুর উপর বিরক্তি, ক্রোধ, বিদ্বেষ কিছুই তাহার হইল না । এই শ্রদ্ধা ও বৈধ্য কি শিক্ষণীয় নহে ? এই প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা যাহার আছে, তাহার কি বিদ্যালোভে বিলম্ব হয় ? বহু সৎকৃতি ও বিচার যখন ফলীভূত হয়, তখন গুরু, ঈশ্বর ও শাস্ত্রে এইপ্রকার শ্রদ্ধা দেখা যায় । দেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতির কষ্ট এইপ্রকার শ্রদ্ধাশীল শিষ্যকে বিচলিত করিতে পারে না । নতুবা সাধনা না করিয়া কেবল মূখে ‘আমি দেহ নহি’ ‘আমি প্রাণ নহি’ ‘আমি মন, বুদ্ধি নহি’ ‘আমি ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাণ্য উচ্চারণ করিলেই সর্বদুঃখনাশক বিদ্যার লাভ হয় না ।

ষষ্ঠ উপমন্ডা কোনক্রমেই গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টকভক্ষণে সম্মত হইলেন না । তখন অশ্বিনীকুমারস্বয় অধিকতর প্রীত হইয়া তাহাকে চক্ষুদান করিলেন । গুরুও তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন—“সর্বো চ তে বেদাঃ প্রাতি-ভাস্যন্তি সর্বাণি চ ধর্মশাস্ত্রাণি” । অর্থাৎ ‘সমস্ত বেদ এবং সকল ধর্মশাস্ত্র তোমার প্রতিভাত হইবে ।

এই প্রকার মহাভারতে অর্থাধি-পরাক্রমতারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে । মূল রামায়ণ, মহাভারতে জীবের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সুন্দর-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সমাজনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম রাজনীতি, রণনীতি, কূটনীতি মোক্ষধর্ম প্রভৃতি কোনটাই বাদ নাই । তাই চািলত আছে ‘যা নাই ভারতে (মহাভারতে), তা নাই ভারতে’ (ভারতবর্ষে) । হিন্দু জাতিকে পাশ্চাত্যজাতির নিকট সভ্যতা শিখিতে হইবে না । পাশ্চাত্য আসুর-সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে

কালে উহা আরও উদ্ঘাটিত হইবে। সুতরাং এখন পাশ্চাত্যের মোহ ত্যাগ করিয়া করিয়া আমাদের নিজের ঘরের ধনরাজির খোঁজ লইবার সময় আসিয়াছে।

করুণাময় ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা আমরা যেন গড়্‌ডালিকা* প্রবাহে পড়িয়া গুরু, শাস্ত ও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া, সংশয়াত্মা হইয়া বিনষ্ট না হই। “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”। গীতা। ৪/৬০। আমাদের আগন্তুক মোহ কাটিয়া যাক, স্বধর্ম ফুটিয়া উঠুক। ঋষিদের উদার ও সম দৃষ্টি, ভয়শূন্যতা, তেজ প্রভৃতি আমাদের ফিরিয়া আসুক, আমাদের জাতীয়তাবোধ উদ্ভূত হউক। আমরা যেন শব্দ ঋষিবাক্যে মোটামুটি শ্রদ্ধা করিয়াই ক্ষান্ত না হই। যেন গুরুশ্রদ্ধা, উপাসনা প্রভৃতি জ্ঞানলাভ-উপায়ে তৎপর ও সংযতোদ্ভিন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা অঁচির পরাশাসিত লাভ করি। গীতার ভগবদ্-বাক্য আমাদের অন্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হউক :—

“শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতোদ্ভিন্নঃ।

জ্ঞানং লভ্যা পরাং শান্তিমচিরৈর্গাধিগচ্ছতি ॥

অক্লৃষ্টাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিন্যশ্যতি।

নায়েং লোকোহস্মিন ন পদো ন সন্ধিং সংশয়াত্মনঃ” ॥ ৪/৬০, ৬১

গুরুশাস্ত্রবাক্যে ঋষি হন শ্রদ্ধাবান্, স্বাক্ষরিত জিতেন্দ্রিয় লভেন এ জ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি’ অঁচিরে ই’হার, নিস্বাণ-পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয় আর ॥

অনাশ্রিত, শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা নর, বিনষ্ট হইয়া থাকে এ সব পামর।

ইহলোক নাহি পার্থ ! সংশয়-আত্মার, পরলোকও নাহি আছে, নাহি

সঙ্গে তার।

“ও তৎ সৎ” ॥

*কোন একস্থান দিয়া একটি ভেড়ার পাল বাইতেছে। অগ্নের ভেড়াটী যে দিক দিয়া যার, সব ভেড়াই সেইদিকে যায়। যদি সামনের ভেড়াটী কোন গাছের ছায়া দেখিয়া উহাকে ঝাল মনে করিয়া কোন স্থানে লক্ষ প্রদান করে, তবে সব ভেড়াই ঐস্থানে লক্ষ প্রদান করিবে। এইরূপ অস্বভাবের বাহাড়া কহাও অনুসরণ করে, বিচার করে না, উহাদের সম্বন্ধে ‘গড়্‌ডালিকা প্রবাহে চলিতেছে’ এই প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

আত্মানুবিচার

“নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ” গীতা ২।১৬

অসতের অস্তিত্ব নাই, সতের অভাব নাই’

দীর্ঘ সংসাররোগের বিচারই মহৌষধ। ভগবান্ গীতার প্রথমেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মানুবিচারের কথা পাড়িয়াছেন। এই বিচারই সাংখ্যযোগ, ইহা সাক্ষাৎ মোহনাশক। যদিও অতিশয় শূন্যচিন্তা, তীর বৈরাগ্যবান্ সাধনচিন্তাটের সম্পন্ন সংন্যাসিগণই এই সাংখ্যযোগের মূখ্য অধিকারী, তথাপি এই আত্মানুবিচারে গৃহস্থগণেরও গৌণ অধিকার আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ‘আত্মানুবিবেক’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—তস্য (সাধনচতুষ্টিসম্পন্নস্য) আত্মানুবিবেক-বিচারে অধিকারঃ নান্যস্য।” অর্থাৎ সাধনচতুষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরই আত্মানুবিচারে অধিকার আছে, অন্যের নাই’। পরে বলিয়াছেন—“সাধনচতুষ্টিসম্পত্ত্যভাবেহপি গৃহস্থানাম্ আত্মানুবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব শ্রেয়ো ভবতি।” অর্থাৎ ‘সাধনচতুষ্টিসম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থগণের আত্মানুবিচার করিলে প্রত্যবায় হইবে না, বরং অতীব শ্রেয়ঃই হইবে’। আত্মানুবিচার শ্রবণ করিয়া যদি অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ নাও হয়, তথাপি ঐ বিচারে অনেক লাভ আছে। যেহেতু উহাতে হৃদয়ে বল আসে, শোক-মোহের

* বেদান্তের মূখ্য অধিকারী—সাধনচতুষ্টিসম্পন্ন প্রমাতা বা জীব।

সাধনচতুষ্টিঃ—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (২) ইহামৃতফলভোগবৈরাগ্য (৩) শমদমাদি ৬টী সাধনসম্পত্তি (৪) ম.মুক্তত্ব।

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ব্রহ্ম নিত্য, তন্নিমিত্ত সমস্ত অনিত্য শ্রুতি ও স্বীকৃত দ্বারা এই প্রকার বিবেচনা।

(২) ইহামৃতফলভোগবৈরাগ্য—ইহলোক বা পরলোকে ফলভোগ কামনা না করা।

(৩) সাধন-সম্পত্তি—(১) শম—অন্তরীন্দ্র মনের নিগ্রহ। (২) দম—বাহ্যরীন্দ্রনিগ্রহ।

(৩) উপরতি—স্বাদিবিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি। (৪) তীতিক্ষা—শীত-উষ্ণাদি বস্তু-সহনশীলতা। (৫) সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তাভিনিবেশ। (৬) শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

(৪) ম.মুক্তত্ব—মোক্ষের জন্য প্রবল ইচ্ছা।

বেদান্তের গৌণ অধিকারী—বেদাদি। শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যপক্ষপাতিত্ব, শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার, সাধুসঙ্গ ও গুরুভক্তি প্রভৃতি দ্বারা মধ্য দৃষ্ট হয়।

অনেকটা লাঘব হয় এবং অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। নিষ্কামবশ্ম, পূজা, ভক্তি প্রভৃতি পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব না জানিলে ঠিক্ ঠিক্ হয় না। কারণ দেবতার পরিচয় না হইলে কাহার পূজা হইবে? সেইজন্যই ভগবান্ অজ্ঞানকে প্রথমে সাংখ্যজ্ঞানের কথা শুনাইয়াছেন। অশ্বকর বাড়ীতে চলাফেরা করিতে গেলে পতনের ভয় থাকে, কিন্তু হাতে আলো থাকিলে সে ভয় থাকে না—এইরূপ জ্ঞানপূর্বক পূজা ও লোক-ব্যবহার পতনের কারণ হয় না। সুতরাং আমরাও প্রথমে বিস্তৃতভাবে আত্মা ও অনাত্মার বিচার করিব। যেহেতু এই বিচারই, বেদান্তশাস্ত্রে, গীতাশাস্ত্রে এবং অন্যান্য ঋষিপ্রণীতগ্রন্থে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ।

আত্মানুবিচার—আত্মা কোন্ বস্তু? ইহার ধারণাজন্য আমরা প্রথমে চিৎ ও জড় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। (১) চিৎ—সর্ববস্তুত্ব প্রকাশক এবং নিজেরই নিজের প্রকাশক, যিনি স্বীয় প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না অর্থাৎ যাহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, সেই স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা চিৎ, বা চেতনা বা জ্ঞান। আত্মার প্রকাশ সূর্য্যচন্দ্রাদির জড় প্রকাশের ন্যায় নয়; জড় চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞান না থাকিলে উহাদের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রুতি বলেন—“ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতরকং। নেমা বিদ্যাত্তো ভাতি কুতোহক্ষ্মণিঃ ॥ তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বাং। তস্য ভাস্য সর্বমিদং বিভাতি।” (কঠোপনিষৎ মন্ডক)। ‘সেই বন্ধে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি প্রকাশ পায় না কিংবা বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তাহারই প্রকাশে সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়।’ চেতন আত্মা সর্বদা একরূপ। অনেকের ধারণা আছে, নড়াচড়া চেতনের স্বৰ্ণ। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ‘চিৎ বা চেতনা’ শব্দ ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। চেতনা পরিপূর্ণ বলিয়া সর্বদা শান্ত, স্থির ও অচল। নড়া চড়া জড়ের স্বৰ্ণ।

(২) জড়—যাহা নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না এবং অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা স্বীয় প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও উপর

(চৈতন্যের উপর) নির্ভর করে, তাহা জড় । জড় সর্বদা দৃশ্য, পরিবর্তনশীল ও বিনাশী ; চৈতন্য উহার বিপরীত ।

চৈতন্য ও জড়কে জানিতে হইলে নিজের দিকে বৃষ্টির মত ফিরাইতে হইবে । আমার দেহ আছে, আমি জানি । আমি দেহের জ্ঞাতা Subject দেহ আমার জ্ঞেয় বিষয় Object । আমি দেহকে প্রকাশ করি, দেহ আমার প্রকাশের বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে । দেহ পরিবর্তনশীল ও নান্দ্রশীল—বাল্যকালের দেহ যৌবনকালের দেহের সঙ্গে মেলে না ; আবার যৌবনের দেহ বার্ধক্যের দেহের সহিত মেলে না ; কিন্তু বাল্যকালে যে আমি, যৌবনেও সেই আমি এবং বার্ধক্যেও সেই আমি । এইরূপ মন, বৃষ্টি প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল । মন এখনই হির এখনই অহির, এখনই সবল এখনই দুর্বল, এখনই সুখী, এখনই দুঃখী । বৃষ্টির এই মূহুর্তে এই নিশ্চয়, অপর মূহুর্তে অন্য প্রকার । বাল্যকালের বৃষ্টি একপ্রকার, যৌবনকালের অন্যপ্রকার এবং বার্ধক্যের অন্যপ্রকার । দেহ, মন প্রভৃতির পরিবর্তন আমি সর্বদা একরূপে থাকিয়া জানিয়া যাই । আমি চৈতন্য ; দেহ, মন, বৃষ্টি প্রভৃতি জড় । আমি সকলকে প্রকাশ করি । দেহ, মন, বৃষ্টি প্রভৃতি আমার প্রকাশের উপর নির্ভর করে । কিন্তু আমি নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য দেহ, মন প্রভৃতির উপর নির্ভর করি না । আমি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করি, সেইজন্য আমি সুপ্রকাশ চৈতন্য । দেহ, মন, বৃষ্টি প্রভৃতি নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না এবং অপরেরও প্রকাশ করিতে পারে না । তবে দপর্গে প্রতিফলিত সূর্য যেমন ঘটপটাদি প্রকাশ করে, এইরূপ চৈতন্য আমি মন, বৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইলে মন, বৃষ্টি আমার আলোকে আলোকিত হইয়া অন্য বস্তু প্রকাশ করিতে পারে । যেমন দপর্গে প্রতিফলিত সূর্য যে ঘটপটাদি প্রকাশ করে, ঐ প্রকাশ তাহার নিজস্ব নয় । এই প্রকার আত্মস্বরূপ জ্ঞানসূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত মন, বৃষ্টি প্রভৃতি যে অন্যবস্তুকে জানে বা প্রকাশ করে, ঐ জ্ঞান বা প্রকাশ মন ও বৃষ্টির নিজস্ব নয়, উহা চৈতন্য বা জ্ঞান-

স্বরূপ আত্মারই। তবেই হইল আত্মানাবিচারে দুই প্রকার বস্তু পাইলাম। একটী সৰ্ব্বদা একরূপ—দেহ, মন, বৃষ্টি প্রভৃতি বা উহাদের পরিবর্তন সকলের প্রকাশক চেতনা আত্মা; অপরটি বহুরূপী, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—চেতন আত্মার দৃশ্য জড়-অনাত্মা। একটী স্থিতি, অপরটী গতি। একটী স্থির শাস্ত মহাকাল (পদ্রুশ), অপরটী চঞ্চলা, নৃত্যরতা মহাকালী (প্রকৃতি)। স্থির মহাকাল বন্ধ পাতিয়া দিয়াছেন, কালীর নৃত্যের জন্য। এইরূপ স্থিতির বন্ধেই গতির খেলা। এই যে পরিবর্তনশীল (দেহ, মন প্রভৃতি অথবা জগতের যাহা কিছু) বস্তুগর্ভিত, উহার একটী মূলশক্তির বিকার বা পরিণাম। সাংখ্যমতে উহার নাম প্রকৃতি, বেদান্তমতে উহার নাম মায়া বা অজ্ঞান। চেতন আত্মা দেহাদি পদ্রুর অপেক্ষায় পদ্রুশ নামে অভিহিত হন এবং দেহাদি পদ্রুর অপেক্ষা না থাকিলে নিগূর্ণরক্ষ নামে অভিহিত হন।

চেতন আত্মা জড় দেহাদির প্রকাশক। প্রকাশক এবং প্রকাশ্যবস্তু ভিন্ন হয়। সূর্য যেমন গঙ্গাজল, মদ্য প্রভৃতিকে প্রকাশ করিয়াপ প্রকই থাকেন এবং উহাদের গুণদোষ প্রাপ্ত হন না, এইরূপ অসংগ আত্মা জড় দেহ, মন, বৃষ্টি প্রভৃতি বা উহাদের বস্তু স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বালা, যৌবন, জরা, সূত্র, দৃঃত্ব, কতৃঃত্ব, ভোক্তৃ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও একই থাকেন এবং উহাদের গুণদোষে লিপ্ত হন না। সূত্র, দৃঃত্ব স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব, বালা, যৌবন, জরা প্রভৃতি এই আছে, এই নাই; কিন্তু আত্মার অভাব কোন সময় সম্ভব নয়। সেইজন্য আত্মা সৎ বা সত্য; আত্মাভিনয় যাহা কিছু তাহা অসৎ। সৎ কখনই অসৎ হয় না এবং অসৎও সৎ হয় না। যদি কোন বস্তুর কোন কালে অভাব দৃষ্ট হয় তবে ঐ বস্তুর কোন কালেই বাস্তবসত্তা নাই, অর্থাৎ উহা মিথ্যা। সেইজন্য আচার্য্য গোড়পাদ বলিয়াছেন—“আদ্যন্ত চ যন্নাশ্তি বর্তমানেহপি তত্ত্বা”। (মাণ্ডুক্যকারিকা) অর্থাৎ এদি ও অন্ত যাহা নাই, বর্তমানেও তাহা নাই। যেমন রজ্জুসর্প—স্মৃতির পূর্বে রজ্জুই ছিল, সর্প ছিল না, স্মৃতিকালে রজ্জুকেই সর্পরূপে দেখা গেল, স্মৃতি কাটিয়া গেলে রজ্জুই আছে, সর্প নাই। মাঝখানে যে সর্প দেখা

গেল, উহা বাস্তবিক নাই, উহা ভ্রান্ত-দর্শনমাত্র। এইরূপ আত্মাভিন্ন অন্য কোন বস্তুর বাস্তবসত্তা নাই। আত্মা হইতে যে উহাদের পৃথকসত্তা-স্বীকার, উহা ভ্রান্তদর্শনের ফল। যতক্ষণ ভ্রান্তির নিরাস না হয়, ততক্ষণ চিৎ ও জড় উভয়কে স্বীকার করিয়া উহাদের বিচার করা ভিন্ন উপায় নাই। বিচার দ্বারা ভ্রান্তির নিরাস হয় এবং ক্রমশঃ অবৈততত্ত্বে স্থিতি হয় ; তখন চৈতন্য জড় এই বিভাগ লুপ্ত হইয়া যায়।

সূর্য্যে যেমন অশ্বকারের অন্ত্রপ্রবেশ হয় না, তেমনই চৈতন্য জড়ের অন্ত্রপ্রবেশ হয় না। তথাপি অজ্ঞানপ্রভাবে চিৎ ও জড়ের অব্যবহৃতঃ চিৎ যেন জড়ের সহিত মিশিয়া গিয়া জড়ের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই চৈতন্যের জীবনপ্রাপ্তি। যেমন কোন গোল, চতুষ্কোণ বা অন্য আকারের লৌহে অগ্নি অন্ত্রপ্রবিষ্ট হইলে ঐ অগ্নি গোল, চতুষ্কোণ ইত্যাদি আকারে প্রতিভাত হয়, কিন্তু অগ্নির ঐ আকারসকল নাই, লৌহের আকারই অগ্নিতে আরোপিত হয় মাত্র, এইরূপ চিৎ বা জ্ঞানের কোন আকার না থাকিলেও উহা যেন জড়ের সহিত মিশিয়া গিয়া ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, দেহজ্ঞান, সূক্ষ্মজ্ঞান, দৃশ্যজ্ঞান, অহংজ্ঞান ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়। অব্যবহৃতঃ চিৎ, জড়ের স্বর্মে আপনাতে আরোপিত করিয়া (চাপাইয়া) দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে আপনার ক্ষয়বৃদ্ধি মনের সূক্ষ্মদৃশ্যাদিতে আপনার সূক্ষ্ম দৃশ্য ইত্যাদি অনুভব করিয়া যেন বশ হইয়া পড়েন। ইহাই চিৎজড়গ্রন্থি বা হৃদয়গ্রন্থি—ইহাই চৈতন্যের বশজীবনপ্রাপ্তি—ইহাই সকল অনর্থের মূল। আবার বহু জন্মের পূণ্যফলে যখন জীব বিবেকদ্বারা এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া সর্বসংশয়শূন্য হইতে পারেন, তখন তিনিই মুক্ত শিব। চিৎ ও জড়ের মধ্যে জড় চৈতন্যের উপর নির্ভর করে। চিৎ বা জ্ঞান না থাকিলে জড় কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে? চিৎ ব্যতীত জড়ের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। স্বর্ণকে বাদ দিয়া বলয়, কেশর, কুন্ডল, হার প্রভৃতির পৃথক সত্তা নাই; এক স্বর্ণেরই বলয়াদি বিভিন্ন নাম—“বাচরস্তুগং বিকারো নামধেয়ং লোহমিতোষ সত্যম্”। ছান্দোগ্য ৬।১। অর্থাৎ ‘নাম কেবল

ব্যবহার-সিঞ্চির নিমিত্ত একটা বাক্যারম্ভ শব্দ মাত্র, স্বেণ'ই সত্য'। এইরূপ চিৎ বা জ্ঞানকেই অজ্ঞানবশতঃ বিভিন্ন নামে এবং নানা কল্পিতরূপে জগৎ বা জড় বলিয়া অভিহিত করা হয় মাত্র। ঐ নামরূপসকলের চিৎ ব্যতীত পৃথকসত্তা না থাকায় এবং উহারা দৃশ্য, পরিচ্ছিন্ন, উদয়-অস্তশীল ও পরিবর্তনশীল হওয়ায় মিথ্যা।*

উপরে যাহা বলা হইল উহা অষ্টৈতবেদান্তের সংক্ষেপ সারমর্ম। এক্ষণে আমরা উহার বিস্তার করিব। শাস্ত্রে চিৎজড়গ্রন্থিভেদের জন্য যে পঞ্চকোষের বা তিন দেহের বিচার করা হইয়াছে, উহা দেখাইব এবং জগতের মিথ্যা-সম্বন্ধে শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

পঞ্চকোষবিচার

কোষ ৫টি যথা :—(১) অন্নময়কোষ (২) প্রাণময়কোষ (৩) মনোময়কোষ (৪) বিজ্ঞানময়কোষ (৫) আনন্দময়কোষ। কোষ শব্দের অর্থ তরবারির খাপ। খাপ যেমন তরবারিকে আবৃত করে, এইরূপ প্ৰত্যেক পাঁচটি কোষ আত্মস্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে অন্নময়কোষ সর্বাপেক্ষা স্ফুল বলিয়া বাহিরের কোষ। উহার অভ্যন্তরে উহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রাণময় কোষ। উহার অভ্যন্তরে মনোময়, তাহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং তাহার অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ এবং এই পঞ্চকোষের অভ্যন্তরে আত্মা অবস্থিত।

(১) অন্নময়কোষ—শরৎ, হস্তপদাদি-বিশিষ্ট এই স্ফুলদেহ অন্নময়কোষ। মাতাপিতা-কর্তৃক ভুক্ত অন্ন হইতে ইহা জাত, অন্নের দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং অন্নের অভাবে ইহার নাশ হয়; সেইজন্য ইহার নাম অন্নময়কোষ। এই অন্নময়-কোষ বা স্ফুলদেহ আমি নহি কারণ :

* 'অন্ন' ও 'মিথ্যা' শব্দের অর্থে কিছু পার্থক্য আছে। যাহা ওষুতঃ নাই এবং দেখাও যায় না উহা অন্ন'। যেমন—বস্ত্র্যাপ্ত, নবশস্য প্রভৃতি। যাহা ওষুতঃ না থাকিলেও অজ্ঞান-বশতঃ প্রতিভাত বা দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা। যেমন রক্ত-সর্প, শৃঙ্খি-রক্তত ইত্যাদি। মিথ্যা বস্তুদ্বয় জ্ঞানিতকালে একটা ভাংকা'লক অস্তিত্ব স্বীকৃত।

ক আমরা বলি, 'আমার দেহ', ইহা হইতে বদ্বা উচিত, আমি দেহ নহি। 'আমার বই' বলিলে বই আমি হই না। ঐ বই পূর্বে আমার সঙ্গে ছিল না, কিন্তু আমি ছিলাম। যে দিন হইতে ঐ বই কিনিলাম, সেইদিন হইতে উহার সহিত 'আমার' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিলাম। দুইটী পৃথক বস্তু ব্যতীত স্থাপন হয় না। এইরূপ এই দেহ লাভ করিবার পূর্বে আমি থাকি এবং ইহার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে 'আমার দেহ' এইরূপ ব্যবহার করি। এই দেহ নাশের পর অন্য দেহ লাভ করিলে উহাকেই 'আমার' বলিব। সুতরাং আমি ও দেহ পৃথক বস্তু। অবশ্য 'আমি দেহ' এই প্রকারও লোকে মনে করিয়া থাকে। ভুলবশতঃ চিৎ ও জড়কে মিশাইয়া ফেলিয়া ঐ প্রকার মনে করা হয়। কেবলমাত্র চৈতন্য বা কেবলমাত্র জড়ের দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার চলিতেছে সব চিৎ ও জড়ের অবিরুদ্ধবশতঃ মিশ্রণে।

(খ) আমার দেহ আছে, আমি জানি। আমি জ্ঞাতা, দেহ জ্ঞেয় বস্তু। জ্ঞাতা (Subject) ও জ্ঞেয় বস্তু (Object) এক হয় না।

(গ) যখন আমি স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নরাজ্যে কত কি দেখিতে পাই—যেন কাশী গিয়াছি, রাস্তা ঘাট, মন্দির, লোক, জন, কত কি দেখিতেছি। তখন আমার মনঃকল্পিত অন্য একটা দেহও হইয়াছে। ঐ দেহ লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং সব কিছু দেখিতেছি। এই শূন্যদেহ কাশী যায় নাই, বিছানার পড়িয়া আছে। সুতরাং স্বপ্নে যে কাশী দেখিতেছি, উহাতে শূন্যদেহের অপেক্ষা নাই। জাগ্রৎকালের শূন্যদেহকে বাদ দিয়াই স্বপ্নের ব্যবহার চলিতেছে। আমার নিকট শূন্যদেহ পড়িলেও 'আমি' জ্ঞান ঠিক আছে। জাগিয়া উঠিয়া বদ্বিতে পারি যে, যে আমি জাগ্রৎকালে সবকিছু দেখি বা জানি, সেই আমিই স্বপ্নকালেও সব কিছু জানি বা দেখি। অন্য একটা আমি উহা দেখে না। সুতরাং শূন্যদেহ বাদ পড়িলেও 'আমি' জ্ঞানের হানি হয় না, সুতরাং শূন্যদেহ আমি নহি।

(ঘ) যদি আমার একখানি হাত কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে দেহটা পূর্ণবাপেক্ষা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দেহ আমি হইলে আমি জ্ঞানেরও হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ‘আমি জ্ঞান’ পূর্ববৎ থাকে। অতএব দেহ ও আমি পৃথক।

(ঙ) দোকানদারের নিকট চাউল, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া খাইলাম। ঐ জড় দ্রব্যাদি জড়দেহের বর্ষিত হইল। যখন ঐ চাউল, দাল প্রভৃতি রস, রক্ত, মাংসাদিরূপে পরিণত হইল তখনও উহা জড়ই রহিল। এমন কি আহারের সূক্ষ্ম অংশ হইতে যে মন উৎপন্ন হয়, উহাও জড়। যেহেতু জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হয় না। উহা হইলে কতকগুলি জড় বস্তু মিলাইয়া বিজ্ঞানবলে মনুষ্যাদি জীব উৎপন্ন করিতে পারা যাইত। চাউল প্রভৃতি যতক্ষণ দোকানদারের কাছে আছে, ততক্ষণ উহাকে আমি বলি না। উহাদের দেহরূপে যে পরিণতি তাহা আমি হইব কিরূপে? দেহের ক্ষয়বর্ষিতে ‘আমি জ্ঞান’ কিছু বাড়িও না কমেও না। সুতরাং দেহ আমি নহি এবং যেহেতু আমি দেহ নই, সেইহেতু আমি বালক, যুবা, বৃদ্ধ, শূন্য, কৃশ প্রভৃতি নই এবং স্বাক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি জাতিও আমি নই। বাল্য, যৌবন প্রভৃতি দেহের ধর্ম।

(২) প্রাণময়কোষ—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের (বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু) সহিত মিলিত পঞ্চপ্রাণকে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) প্রাণময়কোষ বলে। (সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময়কোষ সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত। প্রাণের ধর্ম, ক্রিয়া, পিপাসা প্রভৃতি। ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয়শক্তি বুদ্ধিতে হইবে। চক্ষুরাদি গোলক ইন্দ্রিয়শক্তির কার্য্য করিবার যন্ত্র মাত্র। প্রাণময়কোষ আমি নহি। যেহেতু :—ক) বাক্যে বলি ‘আমার প্রাণ’—সুতরাং প্রাণ ‘আমি’ নহি ‘আমার’। অর্থাৎ আমি হইতে ভিন্ন।

(খ) আমার প্রাণ আছে, আমি জানি। আমি জ্ঞাতা চেতন, প্রাণ আমার জ্ঞেয় বলিয়া জড়। জ্ঞাতা ও জ্ঞান এক বস্তু নয়।

(গ) নিদ্রাকালে প্রাণ চলিতে থাকে, তথাপি চোরাদি গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেও প্রাণ জানিতে পারে না, সূতরাং প্রাণ জড়। আমি চেতন, আমি প্রাণ ও উহার বস্তু কদা পিপাসাদিকে প্রকাশ করি, উহাদের উদয়, অস্ত দেখিতে পাই, সূতরাং প্রাণ হইতে ভিন্ন।

(ক) মনোময়কোষ—পঞ্চজ্ঞানেन्द्रিয়ের (শ্রোত্র, বাক, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ) সহিত মিলিত মনকে ‘মনোময়কোষ’ বলে। মন সংকল্পবিবক্ষণাত্মক এবং চিন্তার সমষ্টি। মনের বস্তু সূখ, দুঃখ, ভয়, শোক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি। মনোময়কোষ আমি নহি যেহেতু :—

(ক) বাক্যে বলি ‘আমার মন’, সূতরাং আমি মন নহি।

(খ) আমার মন আছে আমি জানি। মনের বস্তু সূখ দুঃখ ভয় শোক প্রভৃতি সবই আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়। আবার সূক্ষ্মপু বা সমাধিকালে মনের অভাবও আমার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। মনের অভাবে আমার অভাব হয় না। সূতরাং আমি মন নহি; আমি মনের সর্বাংশের জ্ঞাতা, চেতন আত্মা। মন আমার জ্ঞেয় বলিয়া জড়। অনেকে মন ও বুদ্ধিকে চেতন মনে করেন। এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, মন ও বুদ্ধি জড় হইলেও দেহ, ঘট, পটাদি জড়বস্তু অপেক্ষা ও সূক্ষ্ম। প্রস্তর ও দর্পণে সূর্য্য পতিত হইলেও প্রস্তরে ঐ সূর্য্য ভাল প্রতিফলিত হয় না, দর্পণে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়। দর্পণে সূর্য্য প্রতিফলিত হইলে দর্পণকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ দেখায়। এইরূপ জড় দেহাদিতে চৈতন্যজ্যোতিঃ পড়িলেও উহারা চৈতন্যজ্যোতিঃদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না; সূতরাং সহজেই বুদ্ধি যাহা উহার জড়। কিন্তু মন ও বুদ্ধি সাত্ত্বিক ও স্বচ্ছ বলিয়া আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠে ও চেতনবৎ প্রতীত হয়।

(৪) বিজ্ঞানময়কোষ—পঞ্চজ্ঞানেन्द्रিয়ের সহিত মিলিত বুদ্ধিকে (নিষ্কর্মাতিত্বকা অস্তঃকরণবৃত্তি) বিজ্ঞানময়কোষ বলে। বিজ্ঞানময়কোষের বস্তু নিষ্কর; দেহাদিতে ‘আমি’ এইরূপ নিষ্করজন্য কল্পদ্ব্যবোধ। যে সকল

সৃষ্টিদ্বারা দেখান হইল মনোময়কোষ আমি নহি, ঐসকল সৃষ্টিদ্বারা বলা যায় বিজ্ঞানময়কোষও আমি নহি। বিজ্ঞানময়কোষ ও অন্যান্য কোষের ন্যায় বিকারী জড়, পিচ্ছিল, দৃশ্য ও বাহ্যিক (বেহেতু সৃষ্টিপুতে বাদ পড়ে)।

(১) আনন্দময়কোষ--আনন্দ প্রতিবিশ্ববিশিষ্ট তমোবৃত্তিই আনন্দময়কোষ, ইহাকে কারনদেহও বলা হয়। আনন্দময়কোষে অভিমানী জীব সৃষ্টিপুত্রে সক্ষম অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা আত্মীয় আনন্দ ভোগ করেন। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় ইন্টেলেক্ট বা লাভে আনন্দময়কোষের দৃষ্টি বিকাশ হয়। আনন্দময়কোষও আমি নহি, যেহেতু আনন্দময়কোষ আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়। আনন্দময়কোষও উপাধি, প্রকৃতির বিকার এবং পদ্যের কার্য।

সৃষ্টিবিচার--“তদ্যথাশ্মিতাকালে শ্যোনা বা সুপর্ণা বা বিপরিপতা প্রান্তঃ সংহত্য পক্ষী সঙ্লয়ায়ৈব বিদ্যত এবমেবায়ং পদ্যং এতন্মা অত্যন্তা বাবতি যত্র সুপ্তো ন কংচন কামং কাময়তে ন কংচন স্বপ্নং পশ্যতি”। (বৃহদারণ্যক ৪৩)। অর্থাৎ ‘যেমন শোন বা সুপর্ণ পক্ষী আকাশে বিচরণ করিয়া প্রান্ত হইয়া পক্ষবৎ সংকুচিত করতঃ নিজ নীড়ের দিকে ঘাবিত হয়, তেমনই এই পদ্য (জীব) সৃষ্টি-স্থানের দিকে ঘাবিত হন। এই স্থানে সৃষ্টি হইয়া তিনি কোন কামনা করেন না, কোন প্রকার স্বপ্নও দর্শন করেন না’। সৃষ্টিপুত্রে জীবের অজ্ঞানময় চারিটী কোষে অভিমান থাকে না, সেইজন্য তৎকালে ঐ সব কোষের কামনাজনিত কোন কথনও তাহার নাই। এই কালে চিন্তার কোন স্পন্দন নাই, সেইজন্য কোন আশ্রয় নাই। বিষয় অনুভবের কোন ক্রেশ নাই বলিয়া সমস্ত পদ্যের এখানে অভাব। যেমন কোন ভারবাহী ব্যক্তি গিরিশ্র তার নামাইয়া বৃক্ষের শীতল ছায়ায় সুখে বিশ্রাম করে, এইরূপ সৃষ্টিপুত্রে জীব বিষয়চিন্তার তার নামাইয়া সৃষ্টিপুত্রে শীতল ছায়ায় সুখে বিশ্রাম করিয়া থাকে। এইকালে জীব প্রচুর আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, সেইজন্য জীব আনন্দময়। এই জন্য মাণ্ডুকা শ্রুতি ইহাকে “আনন্দময়ঃ” “আনন্দভূতঃ” বলিয়াছেন। জীবকে সৃষ্টি হইতে জাগাইতে গেলে সে যে

কৃত্যত বিরক্ত হয় তাহা হইতে বৃদ্ধা যায় যে জীব সৃষ্টিপ্তিকালে অত্যাশ্রিত আনন্দে থাকে, ঐ অবস্থা হইতে তাহার বিষয়ে আসিতে ভাল লাগে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—“অদ্বৈতং প্রিয়রা শ্রিয়া সংপরিষ্বস্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাশ্রিতম্। এবম্ এব অয়ং পুরুষ প্রাশ্বেনাত্মনা সংপরিষ্বস্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাশ্রিতম্। তস্মা অস্ম্যতঃ আপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকাস্রিতম্”। ৪৩। অর্থাৎ ‘যেমন কোন পুরুষ প্রিয় শ্রী কতৃক সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ও আশ্রিত কিছুই জানিতে পারে না, তেমনই এই পুরুষ (শূন্যভিমানী তৈজস আত্মা) প্রাশ্বে আত্মাধারা আলিঙ্গিত হইয়া (আনন্দে নিমগ্ন থাকায়) বাহ্য আশ্রিত কিছুই জানিতে পারেন না (অর্থাৎ ঐ আনন্দের সহিত যেন একাকারভাব প্রাপ্ত হন)। ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত রূপ’। ঐ শ্রুতি আরও বলেন—“অত্র পিতাহপিতা ভবতি, মাতাহমাতা, লোকা অলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদা, অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি” ইত্যাদি। “অনশ্বাগতং পুণ্যেন অনশ্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সম্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি” অর্থাৎ ‘এইস্থলে (সৃষ্টি অবস্থায়) পিতা, অপিতা, মাতা, অমাতা, লোক সকল অলোক, দেবগণ অবদ এবং বেদসকল অবদ হইয়া যায়, চোর অচোর হয়’। ‘তখন জীব পাপ ও পুণ্যে সঙ্গরহিত হন, তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে উদ্ধীর্ণ হন’। পরে ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন—“ষষ্ঠে তন্নপশ্যাতি পশ্যান্ বৈ তন্ন পশ্যাতি নহি দ্রষ্টৃদৃষ্টে বিপারিলোপো বিদ্যাতেহবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্বিতীয়মস্মি ততোহন্যদ্বিত্যং যৎ পশ্যেৎ।” ৪৩২। অর্থাৎ ‘এ অবস্থায় তিনি দেখেন না, (তবে কি তাহার দৃষ্টির অভাবজন্য তিনি দেখেন না? ইহার উত্তরে পুনরায় বলিতেছেন) তিনি দেখিয়াও দেখেন না (অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির অভাব হয় না, তথাপি দেখেন না), দ্রষ্টার (সাক্ষী আত্মার) দৃষ্টি অবিনাশী; সুতরাং উহার বিলোপ ঘটে না); (তবে দেখেন না কেন?) তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু থাকে না, যাহাকে তিনি আপনা হইতে বিভক্ত করিয়া দর্শন করিবেন’। দেখান হইল সব লয় হইলেও আত্মপ্রকাশের লোপ হয় না।

আত্মা স্বরূপপ্রকাশ (মন, বুদ্ধিাদি সাধনব্যতীতই আত্মার ভান বা প্রকাশ হয়)।
সুদৃপ্তিকালীন সাক্ষী আত্মার দিকে দৃষ্টি করিয়া প্ৰবৃত্তি উত্তিসকল করা
হইয়াছে। জীবের দিকে দৃষ্টি করিলে জীব তখন প্রকৃষ্টরূপে অস্ত; (প্র + অস্ত =
প্রাস্ত এবং জীবই আনন্দভুক্ত—সাক্ষী ভোক্তা নহেন। প্রশ্ন হইতে পারে—
সুদৃপ্তিকালে মন ও বুদ্ধি থাকে না, তবে জীব কোন কারণাবারা সুদৃপ্তির ঐ
আনন্দ ভোগ করেন। ইহার উত্তর পঞ্চদশী দিয়াছে :—

“সুদৃপ্তপ্ৰবৃত্তিগে বুদ্ধিবৃত্তির্বা সুখবিশ্বিতা। সৈব তদ্বিশ্বসহিতা লীনানন্দ-
ময়স্ততঃ ॥৬৪

অন্তর্মুখোহয়মানন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা। তদুত্তে চিদ্বিশ্ববৃত্তাভিরক্তানোৎস-
বৃত্তিভিঃ ॥৬৫

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সৃক্ষা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। ইতি বেদান্তিসিদ্ধান্তপারগাঃ
প্রবদন্তি হি ॥” ৬৬

“অজ্ঞানবিশ্বিতা চিৎ স্যান্মুখমানন্দভোজনে।” ৭২। (ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ—
পঞ্চদশী) অর্থাৎ ‘সুদৃপ্তির প্ৰবৃত্তিগে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয় ছাড়িয়া যেমন যেমন
অন্তর্মুখ হইতে থাকে, তেমন তেমন স্বরূপভূত সুখের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিতে
থাকে। অনন্তর সুখপ্রতিবিশ্বসহিত সেই বুদ্ধি (অজ্ঞানে) লীন হইলে উহাকে
আনন্দময় বলা হয়। অন্তর্মুখ সেই আনন্দময় তখন (সুদৃপ্ত অবস্থায় চৈতন্য-
প্রতিবিশ্ববৃত্তি অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, সুখাদিবিষয়ক সত্ত্বগুণের পরিণাম-বিশেষ-
রূপ বৃত্তিসকলদ্বারা সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন’।

‘অজ্ঞানবৃত্তিসকল সৃক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিসকল স্পষ্ট। বেদান্তের পারদর্শী
জ্ঞানিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন; অজ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যই সুদৃপ্তগত
ব্রহ্মানন্দ ভোগের সাধন।

তিনবেহ বিচার—দেহ তিনটী (১) স্থলদেহ—অন্নময়কোষ।

(২) সূক্ষ্মদেহ—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ।

(৩) কারণ দেহ—আনন্দময়কোষ।

(১) শূলদেহ—জাগ্রৎকালে আত্মা প্রধানভাবে শূলদেহে অভিমানী ও দক্ষিণ চক্ষু অবস্থিত। এই কালে ইনি বাহ্যবিষয়ের প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ইনি মৃদুতা, চক্ষুঃ প্রভৃতি সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই উনিশটী ইহার বিষয়-উপলব্ধি-স্বর। ইনি শূল বিষয়ভোজী—ইহার নাম বৈশ্বানর বা বিশ্ব।

(২) সূক্ষ্মদেহ—স্বপ্নকালে আত্মা প্রধানভাবে সূক্ষ্মদেহে অভিমানী। এই-কালে ইনি অতঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মনের সংস্কারস্বরূপ উপস্থাপিত সূক্ষ্ম আন্তর বিষয় সকলের প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও পূর্বোক্তপ্রকার সপ্তাঙ্গ ও একোনিবিংশতি মূখ্যবিশিষ্ট। ইনি বাসনাময় বিষয়সকল ভোগ করেন; এই অভিমানী আত্মার নাম তৈজস। যেহেতু স্বপ্নকালে রথ, অশ্ব, পথ আদি না থাকিলেও এই আত্মা অবিদ্যা (বাসনা) প্রভাবে ঐ সকল সৃষ্টি করেন ও উহাদিগকে প্রকাশ করেন। শ্রুতি বলেন ‘ন তত্র রথা, রথ-যোগা ন পশ্যানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে’ (বৃহদারণ্যক ৪।৩)। স্বপ্নকালে যে রথ, অশ্ব, পথাদি দৃষ্ট হয়, উহা দেখিবার জন্য বাহিরের চন্দ্রসূর্যের আলোক দরকার হয় না। আত্মা স্বীয় তৈজস্বারাই উহাদিগকে প্রকাশিত করেন।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি জাগ্রৎকালের বস্তুসকলের স্মৃতি নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সন্নিবর্তনশীল বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে অনুভবটি ‘এই’ ‘এই’ আকারের হয়। যথা—‘এই (সম্মুখস্থ) হস্তী’, ‘এই পর্বত’ প্রভৃতি। পূর্বপ্রত্যক্ষ বস্তুটী যদি দূরে (দেশ বা কালিক দূরে) থাকে, অথচ ঐ বস্তুটী আমাদের চিত্তে ভাসে তবে উহাকে স্মৃতি বলা হয়। স্মৃতি স্থলে ‘সেই’ এই আকারের অনুভব হয় যেমন—‘সেই হস্তী’ ‘সেই পর্বত’ ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বদৃষ্ট বস্তুটীর পুনরায় প্রত্যক্ষ হইলে যে স্মৃতির উদয় হয় উহার নাম ‘প্রত্যভিজ্ঞা’। প্রত্যভিজ্ঞান্ধলে (সংস্কারপূর্বক) ‘সেই এই, এই আকারের অনুভব হয়। যেমন পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তকে পুনরায় সম্মুখে দেখিয়া বলা হয় ‘সেই এই দেবদত্ত’। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি ‘সেই, (দূরস্থ) আকারে অনুভূত না হইয়া ‘এই’ (সম্মুখস্থ) আকারে

অনুভূত হইয়াছিল অর্থাৎ 'এই হৃদয়' 'এই পর্বত' রূপে অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহারা স্মৃতি হইলে 'সেই' 'সেই' আকারে অনুভূত হইত 'আমি স্বপ্নে রথাদি দেখিয়াছিলাম' এইরূপই অনুভব হয়। 'আমি রথাদি স্মরণ করিয়াছিলাম' এই প্রকার অনুভব হয় না। সুতরাং স্বপ্নজগৎ জাগ্রতের স্মৃতি ইহা অনুভববিবৰ্দ্ধক কথা। আরও যেহেতু বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, সেইহেতু উহাদের তৎকালিক সত্তাও স্বকারণ্য, কারণ যে বস্তু অসৎ বা একবারে নাই, যেমন বম্বা পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। আত্মা অনাদি অবিদ্যাশক্তিদ্বারা স্বাপ্নবস্তুগুলিকে তৎকালে অনির্বচনীয়রূপে সৃষ্টি করেন। উহাদিগকে একবারে নাই বলা চলে না, যেহেতু উহারা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। আবার জাগ্রতে উহারা থাকে না সুতরাং আছেও বলা যায় না। আবার উহাদের স্বরূপ সদসৎ (সৎ + অসৎ) ও বলা যায় না। কারণ একই বস্তুতে একইকালে সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধভাব থাকিতে পারে না। সেইজন্য স্বপ্নের বস্তুগুলির স্বরূপ অনির্বচনীয় বা মিথ্যা এবং উহারা সাক্ষিতাস্য। বস্তুটির প্রত্যক্ষজ্ঞান না হইলে উহার স্মরণ সম্ভব হয় না। স্বপ্নে এমন অনেক বস্তু দেখা যায়, যাহা পূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই। যেমন স্বপ্নে নিজের গিরশ্বেদ নিজেরই প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু উহা কখনও পূর্বে প্রত্যক্ষ হয় নাই। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি জাগ্রতের স্মৃতি নয়, আত্মা উহাদিগকে তৎকালে নিদ্রাদিদোষসহিত অনাদি অবিদ্যাবারা সৃষ্টি করেন। শ্রুতিও তাহাই বলিলেন। রজতে যে সর্প বা শূক্রেতে যে রক্ত দেখা যায়, উহারাও পূর্বে দৃষ্ট সর্পের বা রক্তের স্মৃতি নয়। উহারাও অবিদ্যাপ্রভাবে অনির্বচনীয়রূপে উৎপন্ন হয় এবং সাক্ষিতাস্য (অর্থাৎ সাক্ষী উহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করেন)। স্মৃতির কত দূরে থাকে বলিয়া স্মৃতিতে ভয়, পলায়ন, লোভ প্রভৃতির কারণ নাই; কিন্তু রজতে যে সর্প দেখা যায় বা শূক্রেতে যে রক্ত দেখা যায়, উহাদের জন্য ভয়, পলায়ন, লোভ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং উহাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, স্মৃতি নয়। ঐ সর্প বা রক্তের স্বরূপও অনির্বচনীয় বা মিথ্যা।

(৩) কারণদেহ (স্ফুটপ্তবিচার) স্ফুটপ্তকালে আত্মা কারণদেহে অভিমানী, ইহার নাম প্রজ্ঞা। কারণদেহই অজ্ঞান। বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ সেইরূপ এই দেহ স্ফুট ও স্থূল দেহসকলের কারণ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিষয়সমূহ স্ফুটপ্তকালে দেখা যায় না। তখন উহারা অজ্ঞানে লীন হইয়া বীজভাবে অবস্থান করে। অশ্বকার যেমন দিবসের বহুপ্রকার বস্তুসমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া একভাবে প্রতীত করায়, সেইরূপ অজ্ঞান স্ফুটপ্তকালে পুরুষের মনঃকল্পিত দ্বৈত বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া এক অভাবরূপে প্রতীত করায়। অজ্ঞান থাকে বলিয়াই তখনও অতিস্ফুটভাবে (বীজভাবে) ভেদ-বিশিষ্ট বৃক্ষ থাকে স্ফুটপ্তভঙ্গে অজ্ঞান হইতে ভেদবৃক্ষ আবার ফুটিয়া উঠে। কাহারও চক্ষু বীষিয়া যদি কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং চক্ষু বীষিয়াই ঐ স্থান হইতে ফিরাইয়া আনা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি যেমন যে স্থানে গিয়াছিল উহার বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, চক্ষু খোলা থাকিলে জানিতে পারিত, এইরূপ ঈশ্বরনির্গতিবশে বৃক্ষের চক্ষুঃ আবৃত-অবস্থায় জীব স্ফুটপ্তিতে নীত হয় এবং ঐ প্রকারে স্ফুটপ্ত হইতে জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসে।* স্ফুটপ্তকালে জীবের বৃক্ষ অজ্ঞানে লীন হয়, সুতরাং বস্তুস্বরূপ বা আত্মস্বরূপের জ্ঞান না হওয়ায় তাহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু নির্বিকল্পসমাধিকালে জীবের সাক্ষর স্ফুট ও শূন্য বৃক্ষ বিদ্যমান থাকে; ঐ শূন্য বৃক্ষের পরিপাকদশায় জীব আত্মস্বরূপের অন্তিমসাক্ষাৎকার করিয়া সর্বদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন এবং পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। তাই আচার্য্য গোড়পাদ বলিয়াছেন :—

‘নাঅ্যানং ন পরণৈব ন সত্যং নাপি চানন্তম্। প্রাপ্তঃ কিঞ্চ ন সংবেত্তি

তদ্যং তৎসর্বদৃক্ সদা।

* স্ফুটপ্তকালে অন্তঃকরণবৃত্তি থাকে না; কিন্তু আদ্যাবৃত্তি বা অজ্ঞানবৃত্তি থাকে; এই বৃত্তি সূক্ষ্ম ও অশ্পষ্ট। নির্বিকল্পসমাধিতে সূক্ষ্ম সাক্ষরক অন্তঃকরণবৃত্তি থাকে, উহাই অশব্দ-কার্য বা ব্রহ্মকার্য বৃত্তি।

শৈতস্যাগ্ৰহণং ত্লাম্ভয়োঃ প্রাক্ত-ত্ৰ্যয়োঃ। বীজনিদ্রায়ুতঃ প্রাক্তঃ সা চ

ত্ৰ্যয়ো ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ প্রাক্ত (স্ফুটপ্রতিমানী জীব) আপনাকে কিংবা অপরকে, সত্য কিংবা মিথ্যা কিছই জানে না। কিন্তু তরীষ (জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্ফুটপ্তির অতীত আত্মা) সর্বদা সর্বদক্। প্রাক্ত এবং তরীষ এই উভয় অবস্থাতেই শৈতের অগ্রহণ ত্লাম্ভ ; কিন্তু প্রাক্ত বীজনিদ্রায়ুত, তরীষে বীজ-নিদ্রা বা অজ্ঞাননিদ্রা নাই।' শৈতের অগ্রহণই তত্ত্বজ্ঞান নহে। শব্দ বর্ণিত্বারা 'আমি ব্রহ্মই' এইপ্রকার অবাধিত দৃঢ় নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান।

আত্মার তিনটী দেহ, আত্মার তিনটি পদ বা গৃহ। তিনটি পদে আত্মা শয়ান থাকেন বলিয়া তিনি পদ্রুপ নামে অভিহিত হন; যেমন কোন ব্যক্তির তিনটী গৃহ থাকিলে তিনি ঐ তিনটী গৃহে যাতায়াত করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ঐ গৃহ তিনটি হইয়া যান না বা ঐ তিনটী গৃহের নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না, এইরূপ আত্মাও শূন্য, সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটী দেহপদে গমনাগমন করিয়াও ঐ তিনটী দেহ হইয়া যান না, বা উহাদের নাশে আত্মার নাশ হয় না। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থা বাদ পড়ে, আবার স্ফুটপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার বাদ পড়ে, জাগ্রদবস্থায় স্ফুটপ্তি-অবস্থা বাদ পড়ে। সুতরাং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্ফুটপ্তি এই অবস্থার অনিত্য ও মিথ্যা। আমি কিন্তু সর্বদা একরূপে থাকিয়া ঐ তিন অবস্থার উন্নয়ন অন্তর্দেখিয়া যাই, সেইজন্য কখনও বাদ পড়ি না। সেইজন্য আত্মস্বরূপ আমিই সদবস্তু। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে একটা খণ্ড 'আমি' 'আমি' ভাব থাকে, উহা অহংকারযুক্ত আত্মা। স্ফুটপ্তিকালে ঐ খণ্ড অহংকারের অন্তর্ভব হয় না, উহা তখন বীজভাবে অজ্ঞানক্ষেত্রে লীন থাকে, দেখা যায় না, যে চৈতন্যদ্বারা ঐ খণ্ড 'আমি' ভাব বা স্ফুটপ্তিকালে উহার অভাব জানিতে পারা যায়, উহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। আত্মস্বরূপে আমি বা তুমি ভাব নাই। জাগ্রদাদি তিনটী পদ অসদ্বস্তুর ন্যায় কলহান্ ও আত্মাকে অনর্থকালে নিপাতিত করে,

সুতরাং উহারা ত্রিপদাসদর । যে বিবেকবান্ পদরূষ বিচারদ্বারা ঐ তিনটি পদকে বা অসদরকে নাশ করিতে পারেন, তিনিই ত্রিপদনাশন মহাদেব বা মহান্ দীপ্তিশালী আত্মা ।

আত্মাই ব্রহ্ম —পূর্বোক্ত বিচারদ্বারা দেখা গিয়াছে, আমি পঞ্চকোষের বা তিন দেহের প্রকাশক আত্মা । শ্রুতি বলেন—‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ অর্থাৎ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ অর্থাৎ সর্বব্যাপক বৃহৎ পরমাত্মা । গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—‘পরমাত্মোতি চাপদ্রাক্তো দেহেহস্মিন্ পদরূষঃ পরঃ’ । ১৩।২৩। অর্থাৎ ‘এই দেহে বর্তমান থাকিলেও পদরূষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; তাহাকে পরমাত্মাও বলা হয় ।’ চৈশ্বর্যরূপ আমার উপর কেবল যে আমার দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ভাসিতেছে তাহা নহে । ঐ জ্ঞানের উপর বাহিরের ঘট, পট, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত ভাসিতেছেন । ঐ জ্ঞান আমার ব্যক্তিগত অহংকারের সম্পত্তি নয় । আমার ‘আমি’ ‘আমি’ ভাবও ঐ জ্ঞানের উপর ভাসিতেছে । আমি তুমি, তিনি, ইহা, উহা, অন্তর, বাহির, দেশ, কাল সব ঐ জ্ঞানের উপর ভাসিতেছে । ঐ জ্ঞান বাদ দিয়া কাহাকেও দেখান যায় না । ঐ জ্ঞান অখণ্ড ও সর্বব্যাপক । স্বরূপতঃ অখণ্ড থাকিয়াও ঐ জ্ঞান উপাধিষোকে খণ্ড খণ্ড ঘট পটাদি জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয় । কিন্তু সকলক্ষেত্রেই জ্ঞান এক অখণ্ড ও সমরস, জ্ঞানকে উদয় অস্ত নাই । যেমন জলকে বাদ দিয়া তরঙ্গ দেখান যায় না, এইরূপ জ্ঞানকে বাদ দিয়া জ্ঞেয়বস্তুর দেখান যায় না । যেমন তরঙ্গের প্রতি অঙ্গুপরিমাণটাই জল, এইরূপ জ্ঞেয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুপরিমাণটাই জ্ঞান । অতএব জ্ঞান পূর্ণ সৈশ্বঘনবৎ নিবিড় ও একরস । জ্ঞানে এমন কোন রস নাই, যেখানে দ্বিতীয় কিছুর চুকিতে পারে, সুতরাং জগৎ নাই—‘নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ’ । গীতা ২।১৬। তথাপি এই যে বৈতজাল দেখা যাইতেছে ইহা অঘটন-ঘটন-পটীরসী মায়াশক্তি বা অজ্ঞানের প্রভাব । এই অজ্ঞান কি, পূর্বে তাহার কিছুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইতেছে ।

অজ্ঞান-পরিচয়—যে শক্তি আত্মস্বরূপে আবরণ করিয়া রাখে, উহাই অজ্ঞান। শাস্ত্র বলেন, তজ্ঞান কোন কত নহে, অথচ বস্তুবৎ প্রতিভাত হয়। ইহা আত্ম বা চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া ভাসে, চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয় অথচ আশ্রয়ের বিষয়, চৈতন্যকেই যেন ঢাকিয়া রাখে। ইহা অন্যদি অর্থাৎ ইহার আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহা অনন্ত নহে, যেহেতু তত্তজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের অন্ত হয়। অন্ত হয় বলিয়া অজ্ঞানকে ‘সং’ বলা যায় না, আবার অজ্ঞান অনন্ত হয় বলিয়া ইহাকে বস্তুপদ্বয়ের ন্যায় অসংও বলা যায় না। আবার সদসংও বলা যায় না। যেহেতু একই বস্তুতে একই কালে দুইটি বিরুদ্ধবস্তু থাকিতে পারে না, বস্তু উহার ধারণাও করিতে পারে না। অজ্ঞান সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ—অনির্বচনীয়; ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ (তদুচ্চ)। ইহা অভাব রূপ নহে। কারণ যাহা নাই, তাহার জ্ঞানের দ্বারা নাশ হইবে কিরূপে? অজ্ঞান অর্থে বস্তু (ব্রহ্মের) প্রকৃতস্বরূপের বিশেষজ্ঞানের অভাব এবং ব্রহ্মকে অন্যরূপে জ্ঞান বুদ্ধিতে হইতে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই যে বিশেষজ্ঞানের অভাব ও ব্রহ্মকে অন্যরূপে জ্ঞান, ইহার নাশ হয় ‘আগ্নি শূন্য, বৃক্ষ, নিবিঁকার চৈতন্য’ এইরূপ ব্রহ্মাকারা বুদ্ধিস্বারা। সামান্যজ্ঞান (নিগদ্যব্রহ্ম) অজ্ঞানের নাশক নহেন। বঃ সামান্যজ্ঞানের কপায় অজ্ঞান ভাসিতে পারে। সেইজন্যই আমরা সূক্ষ্মতর অজ্ঞানকে সাক্ষী আত্মা দ্বারা জানিতে পারি। অজ্ঞানের শক্তি ত্রিবিধঃ—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণশক্তিস্বারা অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া ফেলে এবং বিক্ষেপশক্তিস্বারা অজ্ঞান ব্রহ্মকেই জগদ্রূপে প্রদর্শন করে। পরমার্থদৃষ্টিতে অজ্ঞান নাই, ব্রহ্মই আছেন। অজ্ঞান অজ্ঞগণকর্তৃক স্বীকৃত; অজ্ঞগণের অজ্ঞানবিষয়ে যে অনুভব, ইহাই তাহাদের নিকট অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। জ্ঞানিগণ ইহাকে স্বীকার করেন না। যতক্ষণ অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, ততক্ষণ ইহাকে স্বীকার করিয়া অজ্ঞানাত্মবিচার এবং অন্যান্য সাধনা করা ব্যর্থত ইহা হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। আত্মসাক্ষাৎকার

হইলে অজ্ঞান থাকে না, সেইজন্য বিচার ও অন্য সাধনের প্রয়োজনও থাকে না। সূর্য্যের অশ্ৰুকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইরূপ জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য জগৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের মূলে এই অজ্ঞান আছে, আবার উহার মূলে উহার আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানও আছে। জগতের যে কোন একটী বস্তু লইয়া বিচার কর, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়কেই পাইবে। ঘট একটী জাগতিক বস্তু, উহার মূল অনুসন্ধান কর। ঘটের মূল কি? উত্তরে বলা যায়, ঘটের মূল মাটি। মাটি আসিল কোথা হইতে? উত্তরে বলা যায়, উহার কারণ জল হইতে। জল আসিল কোথা হইতে? এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে থাকিলে আমরা কিছূদূর পর্যন্ত উত্তর প্রদান করিতে পারিব। কিন্তু পরিশেষে আমাদেরকে ‘জানি না’ বলিয়া অজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন—“We do not know what matter and force really are but we shall explain them by some of their properties” অর্থাৎ ‘পদার্থ ও শক্তি বাস্তবিক কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কতকগুলি ধর্ম বা লক্ষণদ্বারা ব্যাখ্যা করিব’। প্রত্যেক বস্তুর মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ‘জানি না’ বলিয়া খামিতে হইবে। এক অজ্ঞানশক্তি আমাদেরকে বস্তুস্বরূপ দেখিতে দেয় না। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানিলে উহা ব্রহ্মভাবে প্রতিভাত হইবে। যেহেতু, “সংবৎ খণ্ডদং ব্রহ্ম”। অর্থাৎ ‘এই জগতের সমস্তবস্তুই ব্রহ্ম’ যেমন একই রজ্জু ভ্রান্তিকালে সর্প, মালা, জলধারা ইত্যাদি বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রজ্জুদর্শনকালে এক রকমেই (রজ্জু বলিয়া) দৃষ্ট হয়, এইরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ভ্রান্তিকালে নানা নামরূপবিগিষ্ট, বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, ভ্রান্তি অপগত হইলে এক ব্রহ্মভাবেই ফুটিয়া উঠেন। প্রত্যেক বস্তুর নাম ও রূপ অজ্ঞান বা মায়ী হইতে উৎপন্ন, ঐ অজ্ঞান জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত ভাসিতে পারে না।

অজ্ঞান বা মায়ার-শক্তিদ্বারা বন্ধে ঈশ্বর ও জীবনকল্পনা।

প্রত্যেক বস্তুর দুইটী রূপ। একটী ঘটাপ্ররূপ বাস্তবরূপ, অপরটী ঘট উৎপত্তি হইবার পূর্বে মূর্তিকারে অবস্থিত, তাহা অব্যক্তরূপ বা অজ্ঞান। অব্যক্ত রূপটী ব্যক্ত রূপের কারণ। আমরা প্রত্যেক বস্তুর মূলে 'না জানা' রূপ অজ্ঞানের সম্মান পাইয়াছি। ঐ প্রত্যেকটী 'না জানা' ব্যক্তি বা খণ্ড অজ্ঞান। সৃষ্টিতকালে আমাদের সমষ্টি অজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। যেহেতু, সৃষ্টিতথিত পদার্থ স্বরূপ করেন, 'বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'। এই অনুভব সকলের, এমন কি ব্রহ্মার পর্য্যন্ত একই প্রকার। 'কিছুই না জানা' হইতেছে সর্ববিশয়ের অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই জগৎের কারণ। সৃষ্টিতকালে আমি অজ্ঞানকে অনুভব করিয়াছিলাম। নতুবা, জাগিয়া উঠিয়া উহা স্বরূপ করিয়া বলিতে পারিতাম না; যেহেতু অনুভব ব্যতীত স্মৃতি হয় না। সৃষ্টিতকালের অজ্ঞানের আমিই একমাত্র সাক্ষী বা সাক্ষাৎ প্রকাশক। ঐ অজ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে মন, বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয় না। বস্তুতঃ আমিই প্রকাশস্বরূপ (আমি = চৈতন্যস্বরূপ আত্মা)। মন, বুদ্ধি, অহংকারাদি আমার জ্ঞানালোকেই আলোকিত হয়।

সৃষ্টিতকালে থাকেন ঈশ্বর, তদাশ্রিত অজ্ঞান এবং অজ্ঞানে লীন জীব। সৃষ্টিতকালের সেই মায়াবীজস্বরূপ অজ্ঞান এক। ঐ অজ্ঞান অশেষ জগৎের বাসনাস্বরূপ। ঈশ্বর সেই মায়ার সাক্ষী বা প্রকাশক সেইজন্য সর্বজ্ঞ ও মায়াবীজ (অর্থাৎ মায়ার ঈশ্বরের বংশ)। যখন মায়ার অপেক্ষা না থাকে তখন, ঈশ্বরই নিগূঢ়ব্রহ্মনামে অভিহিত হন। সৃষ্টিতকালে জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানে লীন থাকে, সুতরাং জীবও লীন অবস্থায় অবস্থান করেন। সৃষ্টিতকালে জীব অজ্ঞানে (অতিসূক্ষ্মভাবে) অভিমানী, সেইজন্য অজ্ঞানের বশীভূত। 'কিছুই না জানার' অর্থ হইতেছে, 'জাগ্রৎকালে ঘটপটাদি বাহ্য কিছু জানিয়াছিলাম, তাহার কিছুই জানিতেছি না'। জানিবার বাসনা আছে, কিন্তু বিশেষ ও খণ্ড করিয়া জানিবার বুদ্ধিাদি বস্তু নাই, সেইজন্য জানিতে অক্ষম। কিছুই না জানার মধ্যে সর্ববিশয়

জানিবার বাসনা লুকাইয়া আছে। অবাস্তুর মধ্যে জগতের ব্যক্ত রূপটী লুকাইয়া আছে। অজ্ঞানের অপর পারে জীবের দৃষ্টি না যাওয়ায়, জীব পুনরায় বিষয়ে জাগিয়া উঠে এবং পূর্ববৎ অজ্ঞানই থাকিয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির বিচার করিয়া দেখিলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপের সম্বন্ধ পাওয়া যায়। চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা উপাধিযোগে ঈশ্বর, জীব প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ব্যাপক শূন্যসত্ত্ব প্রধান মায়া-উপাধিতে ইনি নিত্যমুক্ত ঈশ্বর; আবার খণ্ড বুদ্ধি-উপাধিতে ইনিই জীব। আত্মা যখন 'ঘট' নামক বিশিষ্ট খণ্ডবস্তুরূপে জানেন, তখন বুদ্ধির সাহায্যে উহা জানেন। ঘট-জ্ঞানে 'ঘট' এই নাম ও আকারটী বুদ্ধির দেওয়া; জ্ঞানের কোন আকার নাই। জ্ঞান যেন ঘটাকারে আকারবান্ হইয়া ঘটজ্ঞান-রূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই বিশেষজ্ঞান। যে চৈতন্য বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা 'ইহা ঘট' 'ইহা পট' এই প্রকার বিশেষজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই বিশেষচৈতন্য, জীব। ঘটের সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক ঘটিবার পূর্বে ঐ ঘট স্বক্কেতন্য দ্বারা অজ্ঞাতরূপে প্রকাশিত থাকে, এবং ঘটের সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক ঘটিলে ঐ ঘট জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হয়। ঘটবিষয়ক জ্ঞানও সাক্ষী বা ঈশ্বরের প্রকাশের উপর নির্ভর করে, তবে আকারের নামের জন্য বুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। এই বুদ্ধি অজ্ঞান হইতে জাত অজ্ঞান বা মায়া ঈশ্বরের শক্তি। সুতরাং জীব যাহা বুদ্ধি দ্বারা জানেন, উহাও ঈশ্বরই জীব সাজিয়া বুদ্ধি দ্বারা জানেন। সাক্ষী, আত্মা বা ঈশ্বর বুদ্ধির কোন বিষয়ের জ্ঞান বা অজ্ঞান উভয়কেই সমানভাবে, প্রকাশ করেন। বুদ্ধির চক্ষু আবৃত হইলেও সাক্ষিচৈতন্যের স্বরূপভূত দৃষ্টি আবৃত হইবার নহে। আত্মার প্রকাশকে কেহই বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধি জানুক বা নাই জানুক এই উভয় অবস্থাই সাক্ষী দ্বারা স্বতঃই বিনাবাধায় প্রকাশিত হয়। আত্মার ঐ প্রকাশ সর্বত্র সমান বলিয়া উহাকে 'সামান্যচৈতন্য' বলা হয়। সূক্ষ্মদৃষ্টির বা মহাপ্রলয়ের অজ্ঞান, যাহা হইতে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, উহা সামান্যচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত। উপাধির দিকে দৃষ্টি করিয়া চৈতন্য সামান্য অথবা বিশেষ, নতুবা চৈতন্য চৈতন্যই। জীবের বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের উপাধি শূন্যসত্ত্বপ্রধান সর্বব্যাপক মায়াশক্তিকে

বাদ দিলে জীব ও ঈশ্বর উভয়ক্ষেত্রে চৈতন্য এক। উপাধিবিজ্ঞিত শব্দে চৈতন্যই সত্যবত্ত্ব। উপাধি দৃশ্য সত্ত্বরাং জড়, পরিণামী, পরিচ্ছিন্ন ও নাশশীল। চৈতন্যব্যতীত অজ্ঞানের বা অজ্ঞান-প্রসূত কোন উপাধির পৃথক সত্তা নাই। সেইজন্য অজ্ঞান বা মায়া বা তৎকার্য মিথ্যা বা তত্বতঃ নাই। অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সৃষ্টিও নাই, সত্ত্বরাং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও নাই। দৃষ্টা, দৃশ্য ভাবও নাই, একমাত্র নিগূঢ় ব্রহ্মই আছেন; তিনিই পরম সত্য, আর সব আপেক্ষিক সত্য। ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’। ব্রহ্মনামা-বলীমালা, শঙ্করাচার্য্য। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই অপন্ন নহেন’। ‘ন ক্ৰিষ্ণং জায়তে জীবঃ সন্তবোহস্য ন বিদ্যতে। এতদ্ভদ্রস্তমং সত্যং যত্র ক্ৰিষ্ণং ন জায়তে’ ॥ মাণ্ড্যুকারিকা, গোড়পাদ। অর্থাৎ ‘কোন জীবই জন্মে না, উহার উৎপাদকও কেহ নাই ইহাই শ্রেষ্ঠ সত্য যে ব্রহ্মে কিছুই জন্মে না’। ইহাই অশ্বৈতাবাদীর পরম ও চরম সিদ্ধান্ত। ইহার নাম অজাতবাদ। গীতার ‘নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্যঃ।’ অর্থাৎ অসত্তের অস্তিত্ব নাই এবং সত্ত্বের অভাব নাই, এই বাক্য অজাতবাদেরই সমর্থক।

জগৎমিথ্যাবিচার

শঙ্কা—এই যে দেদীপ্যমান জগৎ দেখিতেছি ইহা মিথ্যা? ইহা তো পাগলের উক্তি।

উত্তর—ইহা পাগলের উক্তি নহে জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণের জন্য সংক্ষেপে কতকগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ ও ষড়্ভুক্তিপ্রমাণ দিতেছি। অশ্বৈতবাদিগণ জগৎকে মিথ্যা বলেন, কিন্তু ষড়্ভুক্তি অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ ইহাকে স্বীকার করিয়া চিস্তাশুদ্ধির জন্য জপ, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি করিতে বলেন। চিস্তাশুদ্ধি হইলে ঐ সকল ত্যাগ করিয়া বেদান্তের শ্রবণমননাদিবারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে বলেন। সাংখ্য, নৈয়ায়িক প্রভৃতি অপর সমস্ত বাদিগণই জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন না। জগৎ সত্য কি মিথ্যা ইহা লইয়া বহু বাদবিবাদ আছে, এস্থলে উহাদের উল্লেখ সম্ভব নহে। আমাদের নিম্ন অশ্বৈতবাদিগণের

সিদ্ধান্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিসম্মত। তবে প্রকৃত বৈরাগ্য ও চৈতন্য না থাকিলে অজ্ঞানবাদের সিদ্ধান্ত ঠিক, ঠিক গ্রহণ করা দুষ্কর। প্রথমে জগতের মিথ্যাত্বসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, দেখা যাউক।

‘মনসৈবেদমাপুৰ্য্য নেহ নানাশ্চি ক্ৰিয়ন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাণোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।’ (কঠোপনিষৎ ২।১।১১ ও বৃহদারণ্যক ৪।৪)। অর্থাৎ ‘শুদ্ধমন-স্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য, এই লোকে নানা বলিয়া কিছুই নাই, যিনি নানা দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।’ এস্থলে ‘নানা নাই’ বলাতে এবং ‘নানাঈদর্শনকারী মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন’ বলাতে জগৎকে মিথ্যা বলা হইল। যেহেতু নানাঈ জগৎ এবং যাহা না থাকিয়াও প্রতিভাত হয় উহাই মিথ্যা। ‘ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃষ্টিঃ’ (শ্বেতাস্বতর ১।১০)। ‘অস্তু বিশ্বমায়ার নিবৃষ্টি হয়’ বলায় বিশ্বকে মিথ্যাই বলা হইল। ‘যত্ব হি ত্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।’ (বৃহদারণ্যক ২।৪)। অর্থাৎ ‘যখন ত্বৈতের ন্যায় হয়, তখন একজন অপরাধনকে দেখে।’ এখানে ‘ত্বৈতের ন্যায় হয়; বলায় ত্বৈতকে মিথ্যাই বলা হইল। ‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবান্তীয়ম্’ (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। ‘হে সৌম্য। সৃষ্টির পূর্বেই এক সমগ্রই ছিলেন, তিনি এক, অম্বিতীয়’। এই বাক্যেও তিনি ‘এক অম্বিতীয়’ বলায় ত্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল না, সুতরাং উহা মিথ্যা। ‘ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্’ (মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪।২) অর্থাৎ ‘ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াময়, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যাদর্শন’ ইত্যাদি বাক্যে জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বলা হইল। ‘শান্তং শিবমশ্বেতম্’ (মাণ্ডুক্য) অর্থাৎ ‘শান্ত, শিব, অশ্বেত’—এই বাক্যও অশ্বেতবাদের সমর্থক। এইরূপ অশ্বেতবাদের ও জগৎমিথ্যাত্বের সমর্থক অনেক শ্রুতিবাক্য আছে। শ্রুতিতে সর্বত্র বহুঈদর্শনের নিন্দা ও একঈদর্শনের প্রশংসা থাকায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনপূর্বক একমাত্র অশ্বেততত্ত্ব প্রতিপাদনে যে শ্রুতির তাৎপর্য্য, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এক্ষণে আমরা জগতের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিব।

(১) দেখা গেলেই যে জগৎ সত্য হইবে তাহা ঠিক নহে। স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট নগর সত্য বলিয়াই দেখা যায়, জাগ্রতে উহা মিথ্যা। এইরূপ যতক্ষণ আমরা অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত ততক্ষণই জগৎ সত্য। অজ্ঞাননিদ্রা কাটিয়া গেলে জগৎ মিথ্যা। স্নানিতবশতঃ ব্রহ্মজুতে সর্প দৃষ্ট হয়, স্নানিত কাটিয়া গেলে সর্প মিথ্যা। এইরূপ স্নানিতবশতঃ ব্রহ্মে জগদ্দর্শন হইয়া থাকে, স্নানিত কাটিয়া গেলে ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। যদি শঙ্কা কর, পূর্বে সত্য সর্প দেখা গিয়াছে, সেইজন্য ব্রহ্মজুতে সর্প-স্নানিত হয়, সুতরাং সত্য সর্প অবশ্যই আছে, সুতরাং ব্রহ্ম ও সর্প উভয়ই সত্য। এইরূপে ব্রহ্মে যে জগদ-স্নানিত হয়, উহাতে ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই সত্য। ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মজুতে সর্প-স্নানিতর কারণ, সর্পবিষয়ক সংস্কার, সর্প নহে। যখন ব্রহ্মজুতে আমরা সর্প দেখি, তখন পূর্বদৃষ্ট কোন সর্প-বাক্তি (নির্দিষ্ট সর্প) তথায় দৃষ্ট হয় না। সর্পজাতির সংস্কার একটি নতুন সর্প-বাক্তি সৃষ্ট ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সর্প-স্নানিতর কারণ নহে, সংস্কারই কারণ। যদি পুনরায় শঙ্কা কর, সত্য সর্প না দেখিলে সর্পের সংস্কার হইবে কেন? উত্তরে বলা যায় সংস্কার অনাদি। বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়াছে, কি অঙ্কুর হইতে বীজ হইয়াছে, ইহাদের কোনটী আদি তাহা বলা যায় না। যদি বল সর্প দেখিয়াই সর্পের সংস্কার হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ আমার সর্প গ্রহণে যোগ্যতা না থাকিলে বাহিরের সর্পকে আমি সর্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যোগ্যতা থাকা মানে হইতেছে, সূক্ষ্ম বা বীজভাবে আমার মধ্যে সর্প থাকা। বটবীজের বটগাছ হইবার যোগ্যতা আছে মানে সূক্ষ্মভাবে উহার মধ্যে বটগাছ আছে। সুতরাং সর্প ও সর্পসংস্কারের মধ্যে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কোনটি আদি তাহা বলা যায় না। সেই হেতু সর্প ও সর্পজ্ঞান উভয়ই অনিবৰ্চনীয় বা মিথ্যা।

পূর্বে বলা হইয়াছে প্রত্যেক বস্তুর দুইটি রূপ : একটী বাক্তি, অপরটি অব্যক্ত। সূক্ষ্মপ্তর অজ্ঞানে জগতের সকল পদার্থই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। ঈশ্বর সংস্কার সমষ্টিরূপ সেই অজ্ঞানের দৃষ্টা ও নিয়ন্তা। ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই অজ্ঞান

জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বর অজ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে যে জগৎ ব্যক্ত হয়, উহাদের সর্বত্র অন্তর্গত থাকিয়া সৃষ্টির বীজাবস্থা, সূক্ষ্মাবস্থা ও সূত্রাবস্থা প্রকাশ করেন, এইজন্য তিনি সর্ববজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বরচৈতন্য বুদ্ধিতে আভ্যন্তরীণ হইয়া বিশেষ জীবচৈতন্য সাজেন। তখন বুদ্ধি তাহাকে বিশিষ্ট খণ্ডবস্তুসকল যাহা দেখায় তিনি তাহাই মাত্র জানিতে পারেন। জীবভাবের তলায় ঈশ্বরভাবটী থাকিয়া উহাকে ধরিয়া রাখে। ঈশ্বর সকল জগৎকে এককালে জানিতেছেন, এজন্য তিনি সর্ববজ্ঞ। জীব কিন্তু খণ্ডে অভিনিবেশবশতঃ অজ্ঞ। সুতরাং বাহিরের সর্প যে তাহার ঈশ্বরভাবব্যাপ্তি কল্পিত তাহা বুদ্ধিতে পারে না। সর্বব্যাপক চৈতন্য খণ্ডদেহে অভিনিবেশবশতঃ যেন খণ্ড জীব হইয়া যান এবং স্বপ্নকালের স্বপ্নপদার্থের ন্যায় দেহের অপেক্ষায় ইহা ভিতর, ইহা বাহির এই প্রকার কল্পনা করেন। তখন তিনি দেখেন, সর্প আমার বাহিরে রহিয়াছে, আমি সর্প হইতে ভিন্ন, সর্প সত্য, ইহাকে দেখিয়া আমার সর্পজ্ঞান হইল। কিন্তু সাধনার পরিপাকে যতই তাহার দেহাদি উপাধির ত্যাগ ও খণ্ডভাব বিসর্জন হয়, ততই তাহার ভিতর-বাহির-ব্যাপ্ত, সর্বব্যাপক অখণ্ড স্বরূপটী ফুটিয়া উঠে। তখন তিনি অনুভব করেন, ‘আমি আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক চৈতন্য; আমিই ভিতর বাহির সর্বকালকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। স্বপ্নকালে যেমন আমিই ভিতর বাহিররূপে বিকৃত হই, এইরূপ জাগ্রৎকালেরও এই ভিতর বাহির ভাব আমারই বিস্তার।’ এই প্রকারে যতই তাহার ব্যাপক ব্রহ্মভাবটি ফুটিতে থাকে, ততই তাহার সাক্ষাৎ অনুভব হয়, যে জগৎ আমার সংকল্পমাত্র, উহা আমার আশ্রয়েই ভাসে, এবং আমাতেই লয় হয়, আমি ছাড়া উহার পৃথকসত্তা নাই, সুতরাং জগৎ মিথ্যা।

জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট। জগৎ জীবের সংকল্প না হইলেও উহাকে ঈশ্বরসংকল্প বলিতে হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। তাহার বাহিরই বা কোথায়? যদি সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে বাহির হইতে বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তিনি সৃষ্টিকর্তাই বা হন কিরূপে?

সুতরাং বলিতে হইবে সৃষ্টি ঈশ্বর-সংস্কপ। অনিবৰ্ণনীয় মায়াশক্তিয্বারা ঈশ্বর সত্য জগৎ না থাকিলেও অনাদি সংস্কার হইতেই জগৎ সৃষ্টি করেন। “স্বাপ্নবর্ষমকল্পয়ৎ।” (সম্ব্যামস্ত)। সুতরাং সর্পসংস্কারলাভজন্য সত্য সর্প থাকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং সংস্কার সর্পের কারণ অথবা সর্প সংস্কারের কারণ। ইহার আদি খুঁজিয়া না পাওয়ায় উহাকে অনাদি, অনিবৰ্ণনীয় মায়াশক্তির খেলা বলিতে হইবে। এই মায়াশক্তিই ব্রহ্মে আদি, অনাদি, কার্ষ্য কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া লোকের মোহ উৎপাদন করিতেছেন। যেমন অশ্বকার ও আলোকের মিশ্রণে ছায়ানৃত্য দেখা যায়, এইরূপ অব্যবহৃতঃ অজ্ঞান ও জ্ঞানের মিশ্রণে ভেদদৃষ্টিমূলক জগতের দর্শন হইয়া থাকে। জ্ঞানালোকের উদয়ে উহার নাশ হয়, এক ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং জগৎ মিথ্যা।

(২) জগৎ দেখা যায় বলিয়াই উহা মিথ্যা। প্রকৃত সত্যবস্তুর দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয় না। “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪) অর্থাৎ (হে মৈত্রেয়ী!) ‘সকলের বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিবে’? আবার যাহা অসৎ যেমন কথ্যাপদ, উহাও দৃশ্য হয় না। জগৎ কিংদৃশ্য হয়, সুতরাং উহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না, আবার সদসৎও বলা যায় না। যেহেতু, একই বস্তু একই কালে সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ অনিবৰ্ণনীয় বা মিথ্যা।

(৩) জগৎ বলিতে আমরা নামরূপাত্মক বস্তুসকলকে বুঝি। প্রত্যেক বস্তুর নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিবস্তুই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সত্যের বহু রূপ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সত্যসম্বন্ধে প্রকৃত কোন ধারণাই হইবে না। জাগতিক বস্তু খণ্ড ও নাশশীল বলিয়া সত্যবস্তুও খণ্ড এবং নাশশীল হইবে; ইহা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ। সত্যবস্তু একটীমাত্রই হইয়া থাকে; উহা দেশপরিচ্ছিন্ন, কালপরিচ্ছিন্ন বা বস্তুপরিচ্ছিন্ন হয় না অর্থাৎ উহা সর্বদেশে, সর্বকালে এবং সর্ববস্তুতে অনুগত থাকে। নাম ও রূপ উদয়-

অন্তর্শীল, সেইজন্য উহাদের সত্যত্ব নাই। ব্রহ্মবস্তুর সত্যত্ব নামরূপে দৃষ্ট হয়। যেমন কেয়ূর, বলয়, হার, ইত্যাদিতে স্বর্ণই দৃষ্ট হয়। কেয়ূর, বলয়, হার, প্রভৃতির নাশ হইলেও স্বর্ণের নাশ হয় না। সুতরাং স্বর্ণই সত্য, কেয়ূরাদি মিথ্যা। এইরূপ জাগতিক নাম ও রূপের নাশ হয়; কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বীহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ ভাসে, তাহার নাশ হয় না, তিনিই সত্য, নাম ও রূপ মিথ্যা। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটী বিদ্যমান থাকে। উহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী ব্রহ্মরূপ ও শেষের দুইটী জগতের রূপ। ব্রহ্মরূপ সত্য বলিয়া জগতের সর্ববৃহৎ অনুগত থাকে। যাহা কিছু বলিবে উহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য, সুতরাং সৎ সর্বগত। আবার চিৎ বা জ্ঞানও সর্বগত; যেহেতু, জ্ঞানশূন্য কোন বস্তু দেখান যায় না। আনন্দও সর্বগত, যেহেতু, তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আনন্দ হইতে ভূতগণ জাত হয়, আনন্দ-দ্বারা বর্জিত থাকে এবং অশেত আনন্দেই প্রবেশ করে'। যদি প্রশ্ন কর, আনন্দ যে সর্বগত ইহার যুক্তি-প্রমাণ কি? তদন্তরে বলি, সৎ চিৎ ও আনন্দ মূলে একই বস্তু। যদি কোথায়ও আমার সত্তার বা জ্ঞানের অভাব না হয়, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু না থাকে, তবে আনন্দের ব্যাঘাত করিবে কে? "দ্বিতীয়াং বৈ ভদ্রং ভবতি"। (বৃহদারণ্যক ১।৪।২)। অর্থাৎ 'দ্বিতীয়বস্তু হইতে ভয় হয়'। সর্ববস্তুতে আত্মদর্শন হইলে আনন্দ যে সর্বগত ইহার অনুভব হইবে। দেখ রজ্জুতে সর্পলান্তিকালে রজ্জুর সর্বাংশ আবৃত হয় না। উহা হইলে রজ্জুতে 'ঘট, পট', ইত্যাদি লান্টি হইতে পারিত। এইরূপ ব্রহ্মে জগদলান্তিকালে ব্রহ্মের সর্বাংশ আবৃত হয় না। 'সৎ' অংশ কখনই আবৃত হয় না। সেইজন্য নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তিরও নিজের অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় হয় না। চিদংশ কিছু আবৃত হয়, শাস্ত্রাদি শুনিলে ও বিচার করিলে ঐ আবরণ ফ্রমশঃ কাটিয়া যায়। আনন্দাংশ সর্বাপেক্ষা বেশী আবৃত। শ্রবণমনদ্বারা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলেও আনন্দ সহজে ফুটিতে চায় না। নির্দিব্যাসনদ্বারা আত্মতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিবক্ষ-শূন্য অপরোক্ষজ্ঞানব্যতীত সর্বদাম্হারী আনন্দ লাভ করা যায় না। তামসিক

বুদ্ধিতে কেবল সৎ মাত্র, রাজসিক বুদ্ধিতে সৎ ও চিৎ এবং শুদ্ধসাত্বিক বুদ্ধিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটাই প্রতিভাত হয়। আনন্দ যে সর্ববর্গত উহা শুদ্ধসাত্বিক বুদ্ধিই ধরিতে পারে। নাম ও রূপ যে মিথ্যা উহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

(৪) জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অজ্ঞানোৎপন্ন নাম-রূপের মূখোস্ পরিয়া ব্রহ্মই মাতারূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, শ্বশুররূপে, মিত্ররূপে, শত্রুরূপে সৃষ্টিরূপে, পালনরূপে, সংহাররূপে, অহংরূপে, ইদংরূপে, ধর্মরূপে, অধর্মরূপে, অশৈবতরূপে, শৈবতরূপে, নানা আকারে আমাদের সর্বদিকে বিরাজিত। যেমন পিতা প্যাণ্ট, কোট ইত্যাদি পরিলে শিশু পিতাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু বয়স্ক পুত্র উহা পারে, এইরূপ জ্ঞানবিষয়ে যতক্ষণ আমরা শিশু ততক্ষণ নামরূপের আবরণে আমরা ব্রহ্ম-বস্তুকে চিনিতে পারি না এবং 'ইহা আমার অনুকূল, ইহা আমার প্রতিকূল' ভাবিয়া সুখদুঃখে পতিত হই। কিন্তু জ্ঞান পরিপক্ব হইলে বয়স্ক পুত্রের ন্যায় আমরা সর্ব নামরূপের মধ্যেও সেই পরমপিতাকে আমাদের স্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারি।

এখন দেখা যাউক আমাদের ভ্রমদর্শনের মাত্র কত কিরূপ? মনে কর ইষ্টক একটী বস্তু। ঐ ইষ্টকসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এইরূপ—'উহা চতুষ্কোণ, শক্ত, ভারী, লাল, ইত্যাদি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ চতুষ্কোণ, শক্ত ইত্যাদি বিশেষণ। বিশেষণ কোন বস্তু হয় না। যাহাতে বিশেষণ লাগান হয়, উহাই বস্তু। উহা কি? উত্তর দিতে হইবে মাটি। আবার যদি প্রশ্ন করি মাটি কি? তবে তোমাকে পুনরায় কতকগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উত্তর দিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ববিশেষণশূন্য মূল বস্তুটী কি? উহাই সৎ, নিগূঢ়ব্রহ্ম। ইনি সর্বনিষেধের অবাধ, ইহাকে বাদ দেওয়া যায় না। উহাকেই আমরা অজ্ঞান-কণ্ঠে নিম্ন সংস্কারের অনুরূপ দর্শন করিতেছি। নিগূঢ়ে যে গুণযোগ ইহা আকাশে মসীলেপনের ন্যায় সম্ভব নয়, তথাপি অঘটনঘটন-পটেরসী মায়াস্বরাই যেন উহা সম্ভব হয়।

এ জগৎ মনের স্ফূরণ । সূক্ষ্মদৃষ্টিকালে মন থাকে না বলিয়া জগৎ অনদ্ভূত হয় না । মন জাগিলে তবে সংসার উঠে । যেমন মৃত্তিকা বাদ দিয়া ঘট দেখান যায় না, এইরূপ মনকে বাদ দিয়া জগৎ দেখান যায় না, সুতরাং জগৎ মনোময় । আবার জ্ঞানকে বাদ দিয়া মনকে দেখান যায় না, সুতরাং মন জ্ঞানময় এবং জগৎও জ্ঞানময় । জগতের জ্ঞান হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, অথচ উহা পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হয়—ইহাই মায়াশক্তির প্রভাব । যেমন কোন যন্ত্রের অগ্নি জ্বালিয়া উহাকে, ঋজু, বক্র, গোল ইত্যাদি যেরূপভাবে ঘুরাইবে, অগ্নিকে সেইরূপ ঋজু, বক্র, গোল ইত্যাদিরূপে দেখা যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু ঋজু, বক্রাদিভাব নাই । এইরূপ মন যেরূপে স্পন্দিত হয়, জগৎ সেইভাবেই দৃষ্ট হয় । বাস্তবিক কিন্তু মনবাতীত জগৎ বলিয়া কিছুই নাই । স্পন্দিত মনই জগদ্রূপে দৃষ্ট হয় । একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক—‘ঘট দেখিলাম’ ইহার অর্থ কি ? মন স্পন্দিত হইল ‘ইহা শূন্যলোদর, ইহা কম্বুগ্রীব, ইহা জলধারণ করে, ইহা প্রয়োজনীয়’ ইত্যাদিরূপে । মনের কতকগুলি স্পন্দনের সমষ্টিই ঘট । মন স্পন্দিত না হইলে ঘট দেখান যাইবে না । সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বা সমাধিতে মন স্পন্দনশূন্য হয় বলিয়া জগৎ থাকে না । চৈতন্যরূপ আকাশে মনরূপ ঐন্দ্রজালিক যে ভাবে স্পন্দন উৎপন্ন করে, চৈতন্য সেইভাবেই দৃষ্ট হন । মায়াতে সবই সম্ভব । ইহা হইতে পারে, ইহা হইতে পারে না, এরূপ কোন নিয়ম নাই । একদেশে এককালে বাহা সম্ভব, তাহাই অন্যদেশে, অন্যকালে অসম্ভব । ‘আমি জন্মিয়াছি, আমার দেহ আছে, আমি বড় হইলাম, আমি মরিব, ইহা সূক্ষ্ম, ইহা শূন্য, ইহা কাষ্য, ইহা কারণ, ইহা দেশ, ইহা কাল’ ইত্যাদি সমস্তভাবই চিদাকাশে মনের স্ফূরণ ও স্পন্দনমাত্র । ইহা বায়োস্কাপের ‘ক্যান্‌ভ্যাসে’ ছবির ন্যূতের মত । ক্যান্‌ভ্যাস বাদ দিলে ছবির ন্যূত দাঁড়াইতে পারে না । এইরূপ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া সংসার-ন্যূত দাঁড়াইতে পারে না । সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা । ‘ইহা সূক্ষ্ম, ইহা শূন্য, সময়ের হ্রস্ব, দীর্ঘত্ব সবই মনের স্ফূরণ, সমস্তই মিথ্যা । স্বপ্নকালে স্বপ্নের দেওয়াল, স্বপ্নের দেহ ইত্যাদি শূন্য । স্বপ্নের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া

যায় এবং কষ্টও হয়। জাগিলে কিন্তু স্বপ্নের দেহাদি সৃষ্টি এবং মনোময় বলিয়া বোধিতে পারা যায়। স্বপ্নে যাহা শূন্য জাগতে উহা সৃষ্টি। আবার একমুহূর্ত তন্দ্রার মধ্যে লোকে কত কি দেখে, যেন কত সময় কাটিয়া যায়। যোগবান্ধিত রামায়ণে* দেখা যায় রাজা লবণ (আত্মা), (মনরূপ) ঐন্দ্রজালিক* দ্বারা মোহিত হইয়া একমুহূর্ত তন্দ্রার মধ্যে কত কি দেখিলেন—অশ্বপুষ্ঠে আরোহণ, বিশাল অরণ্যপ্রাপ্তি ও তাহাতে অবস্থান, চণ্ডালকন্যার দর্শন, চণ্ডালদেশে গমন, চণ্ডাল কন্যাকে বিবাহ, চণ্ডালরূপে চণ্ডালদেশে বহুবৎসর অবস্থিতি চণ্ডালকন্যার গর্ভে পুত্রকন্যার উৎপাদন, চণ্ডালদেশে দর্ভিষ ইত্যাদি সমস্তই ঐ মুহূর্ত সময়মধ্যে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিলেন। জাগতে যাহা এক মুহূর্ত, তাহাই স্বপ্নে দীর্ঘকাল।

আবার দেখ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অবস্থান। কিরূপে এইসকল অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়? ইহার উত্তর ইহাই অঘটনঘটনপট্টয়সী মায়ার প্রভাব। মায়াতে সমস্তই সম্ভব। পুনরায় দেখ, জীব স্বপ্নকালে হিতা নামক অতি সূক্ষ্ম নাড়ীতে অবস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড পর্বতাদি দর্শন করে, কিরূপে ইহা সম্ভব? ইহাই মায়া। মায়ার ঠিক স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়াও মায়ার সম্যক স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারিবে না। মায়াকে জানিতে যাওয়াও মায়ার প্রভাব। যেমন কোন বালকের যদি ভূতের ভয় হয়, তবে ভূতের আলোচনা ও চিন্তা দ্বারা তাহার ঐ ভূতের ভয় দূর হইবে না বরং বাড়িতে থাকিবে। এইরূপ মায়াদ্বারা আক্রান্ত জীব মায়ার চিন্তা ও আলোচনা করিলে উহাতে মায়া নিবৃত্ত না হইয়া উহার প্রভাব বাড়িতে থাকে। মায়া যে চৈতন্যের উপর ভাসে, মায়া উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরূপে স্থিত ঐ চৈতন্যের প্রপন্ন হইলে মায়া ক্রমশঃ থামিয়া যায়। শাস্ত্রে যে সৃষ্টি আদি মায়িক রাজ্যের

*মাতৃকাংকা, যোগবান্ধিত রামায়ণ, বিবেকভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মস্থিতিলাভের পক্ষে সহস্রক অষ্টমুহূর্ত গ্রন্থ। ঐ সকলের দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত ও অজ্ঞাতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কণনা আছে, উহার উদ্দেশ্য 'শাখাচন্দ্রন্যায়', চৈতন্যকে ধরাইয়া দেওয়া। সৃষ্টি সত্য' এইভাবে বস্তুমূল করিয়া দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে। বিচারাদিম্বারা ভ্রমাংশের তিরস্কার হইয়া অধিষ্ঠান-অংশের প্রধানতা হয়। পরে সম্যক্ জ্ঞান-লাভ হইলে মায়া বলিয়া কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং উহার অনাদি, অনির্ধ্বচনীয় প্রভৃতি নামও থাকিয়া যায়। বিচারকালে উহাদিগকে মানিয়া লওয়া হয়, বুদ্ধির বুদ্ধিব্যবহার সহায়তার জন্য। সুতরাং মায়া বা অজ্ঞান অথবা তৎসৃষ্ট জগৎ মিথ্যা বা তত্বতঃ নাই। নিগূঢ় ব্রহ্মমাত্র আছেন।

প্রঃ—আচ্ছা 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার মনে করা ত অহংকারের পরিচয় ?

উঃ—'আমি ব্রহ্ম' যিনি ঠিক্ ঠিক্ ইহা অনুভব করিয়া বলেন, ইহা তাহার অহংকারের পরিচয় নহে। কারণ 'আমি ব্রহ্ম', ইহা অনুভব করিতে হইলে নিজের খণ্ড অহংকারভাব বিসর্জনপূর্বক সর্বব্যাপক বৃহৎ ব্রহ্মভাবের ধারণা করিতে হয়। অহংকার ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মভাবের অনুমতি হয় না। এই প্রকার জ্ঞানী ভক্ত ব্যবহারকালে 'অহং' বা 'আমি' শব্দ প্রয়োগ করিলেও সর্বদা উহার মিথ্যাত্বে নিশ্চয়বান। অপরপক্ষে যাহারা জীব ও ব্রহ্মের একতা স্বীকার করিতে চান না, তাহারা 'আমি দীন' 'আমি হীন' এই ভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র ও খণ্ড বজায় রাখিয়া অহংকারেরই পোষণ করেন।

প্রঃ—আচ্ছা ব্রহ্ম যদি নিগূঢ় হন তবে ত নিগূঢ়ই ব্রহ্মের গুণ হইল ?

উঃ—নিগূঢ় শব্দে আমি গুণশূন্যতাকেই লক্ষ্য করিতেছি। যদি নিগূঢ় শব্দে তোমার গুণের ধারণা আইসে, তবে উহাকে ত্যাগ কর। বাস্তবিক সগুণের অপেক্ষায় যে নিগূঢ় উহা সগুণই বটে। ব্রহ্মে কিন্তু পরমার্থতঃ জগতের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ কোন কালেই জগৎ নাই। যে বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই, তাহার নিষেধও সম্ভব নয়। তথাপি অনাদি অজ্ঞানবশতঃ আমরা জগৎ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য শ্রুতিও আমাদের অনুকূল হইয়া অধ্যাপ (ব্রহ্মে জগতের আরোপ) ও অপবাদম্বারা ("নেতি" "নেতি" রীতিতে) ব্রহ্মসম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাস্তবিক সগুণ, নিগূঢ়, চৈত, অশ্বেত, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি

কোন শব্দই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নিগূঢ় ব্রহ্ম বা শূন্যচৈতন্যে পৌঁছায় না তথাপি নিগূঢ়, অবৈত, সত্য প্রভৃতি শব্দের সাধকতা আছে। উহারা আমাদের বহুদর্শনরূপ অবিদ্যাবৃত্তির নাশ করিয়া একত্বদর্শনরূপ বিদ্যাবৃত্তির উদয় করিয়া দেয়। অবিদ্যার নাশ হইলে সগূঢ়, নিগূঢ়, ঐশ্বর্য, অবৈত প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিকল্প স্বতঃই নিরস্ত হইয়া ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। নিগূঢ় ব্রহ্ম শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করা হয়।

আমাদের একের ধারণা দুই, তিন প্রভৃতির ধারণার পূর্বেই হইয়া থাকে। এক না শিখিয়া কেহ দুই, তিন শিখে না। দুই, তিনের মধ্যে এক অনুগত থাকে। অর্থাৎ $২ = ১ \times ২$ । $৩ = ১ \times ৩$ । ইত্যাদি। কিন্তু একের ধারণায় দুই, তিন অনুগত থাকে না। এখানে দুই তিনের নিষেধ করিতে হয়। সুতরাং অবৈত, নিগূঢ়, শূন্য, অসঙ্গ ইত্যাদি শব্দের মেরুপ ঐশ্বর্যের নিষেধ-পূর্বক ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উৎপাদন করিয়া অজ্ঞান-নাশের সামর্থ্য আছে, ঐশ্বর্য, সগূঢ়, প্রভৃতি শব্দের তাহা নাই। সুতরাং শব্দারণ্য হইতে সদগুরুর সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন— “অভাবরূপা বস্তু নাঐশ্বর্যে ঘৃণিত।” অর্থাৎ ‘অভাবরূপ বস্তু’ সকল ঐশ্বর্যকে হনন করে না। যেমন ভূতলরূপ অধিকরণে স্থিত ঘটের অভাব হইলে সেই ঘটাভাব ভূতলরূপ অধিকরণকে প্রকট করে, এইরূপ ব্রহ্মরূপ অধিকরণে কল্পিত ঐশ্বর্য জগতের অভাব, ব্রহ্মরূপ অধিকরণকে প্রকট করে।

জীব অজ্ঞানাবস্থায় ঐশ্বর্যদর্শন করে। সেইজন্য শাস্ত্র প্রথমে তাহার অনুকূল হইয়া ঐশ্বর্যবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপদেশ করেন। এখানেও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করান। ইহার পর শাস্ত্র ‘নেতি’ ‘নেতি’ রীতিতে ব্রহ্মে ঐশ্বর্যভাব প্রতিপাদন করেন। উহা হইতে ঐশ্বর্যভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। এখানে ঐশ্বর্যভাবটী ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়ায় উহাও নিগূঢ় ব্রহ্ম নহে। ইহার পর ঐশ্বর্যভাব দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হয়, সেই ঐশ্বর্যভাব-উপলব্ধিত ব্রহ্মবিষয়ে নির্বিকল্প-নিষ্কর বা জ্ঞান হইয়া থাকে। “একমেবা-

‘স্বতীয়ম্’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য এই ঐশ্বতাব-উপলক্ষিত নির্বিকল্পক ব্রহ্মনিষ্ঠ্যে। সন্দ্বৈতন্যের প্রতিপত্তিতে উহাদের তাৎপর্য নাই। যেহেতু, সন্দ্বৈতন্য স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্য সিন্ধ। ঐশ্বতাবটী ব্রহ্মের উপলক্ষণ অর্থাৎ নিকটস্থ লক্ষণ। উপলক্ষণ লক্ষিত বস্তুর সহিত সর্বদা থাকে না। উহা ব্রহ্মের পরিচয় করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়ে। যেমন কাক উপলক্ষিত গৃহের জ্ঞানে প্রথমে কাকবিশিষ্ট গৃহের জ্ঞান আবশ্যক হয়। পরে কাক উড়িয়া গেলেও গৃহের জ্ঞান থাকিয়া যায়—এই গৃহ-জ্ঞান সর্বিকল্পক অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই ত্রিপটীযুক্ত। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানস্থলে ঐশ্বত ও ঐশ্বতাবরূপ উপাধিস্বর নিরস্ত হইয়া ব্রহ্মমায়ে পর্য্যবসিত হয়। এই জ্ঞান নির্বিকল্পক, এস্থলে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপটী বাধিত হইয়া যায়।

প্রঃ—আচ্ছা ঐশ্বতাব ত অভাবস্বরূপ। তাহা হইতে ভাবস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইবে?

উঃ—ঐশ্বতাব যতক্ষণ ঐশ্বতের অপেক্ষা রাখে, ততক্ষণ প্রকৃত ঐশ্বতাব হয় না। প্রথম অবস্থায় উহার আবশ্যক হইলেও যত যত বৃদ্ধি অন্তর্দ্বন্দ্বীন হয়, ততই উহা ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ উহা ঐশ্বতের অপেক্ষা রাখে, ততক্ষণ ঐ ঐশ্বতাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বতাব ব্রহ্মস্বরূপই। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া এবং ব্রহ্ম-স্বরূপতা-প্রাপ্তি একই কথা। ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি’—‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন।’

প্রঃ—শাস্ত্রে যে পারমাণ্বিক, ব্যাবহারিক প্রভৃতি সত্তার কথা শুন্য যায়, উহাদের স্বরূপ কি প্রকার?

উঃ—সত্তা ত্রিবিধ (১) পারমাণ্বিক (২) ব্যাবহারিক (৩) প্রাতিভাসিক। যে সত্তা কোনকালে বাধ হয় না, উহা পারমাণ্বিক সত্তা। যে সত্তা ব্যাবহারিকালমাত্র স্থায়ী এবং ব্রহ্মজ্ঞানে যাহার বাধ হয় সেই সত্তা ব্যাবহারিক—যেমন জগতের সত্তা। যে সত্তা প্রাতিভাসিকালমাত্র স্থায়ী, ব্যাবহারিক সত্তাবারা যাহার বাধ হয়, সেই সত্তা প্রাতিভাসিক—যেমন রজ্জুসর্প। (পরিশিষ্ট, ত্রিবিধ সত্তা

দৃষ্টব্য)। পরমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা অপেক্ষা অধিকসত্তাক (অধিক-
কালস্থায়ী), আবার ব্যবহারিক সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা অপেক্ষা অধিকসত্তাক।
সুতরাং ব্যবহারিক সত্তা পারমার্থিক সত্তা অপেক্ষা ন্যূন-সত্তাক এবং প্রাতি-
ভাসিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক। একই সত্তাবিশিষ্ট বস্তুগুলি
সমসত্তাক। যেমন জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পংখ, বৃক্ষ, ঘট প্রভৃতি বস্তুগুলির সত্তা
ব্যবহারিক বলিয়া উহারা সমসত্তাক আবার স্বপ্নদৃষ্টবস্তুগুলিও এইরূপ সম-
সত্তাক; উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক। এক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু অপর সত্তাবিশিষ্ট
বস্তুর বিষমসত্তাক। যেমন রজ্জুর সত্তা ব্যবহারিক এবং উহাতে কল্পিত সপের
সত্তা প্রাতিভাসিক। এখানে ব্যবহারিক রজ্জু ও প্রাতিভাসিক সপ ইহারা
বিষমসত্তাক। অধিকসত্তাক বস্তু ন্যূনসত্তাক বস্তুর সাধক (উপকারক) ও বাধক
(নাশক) উভয়ই হইতে পারে। সেইজন্য চৈতন্যসত্তাকে (পারমার্থিকসত্তাকে)
আশ্রয় করিয়া ব্যবহারিক জগৎ ভাসে এবং ব্যবহারিক রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া
প্রাতিভাসিক সপ ভাসে। অন্যদিকে ব্যবহারিক রজ্জুজ্ঞানে প্রাতিভাসিক
সপের নাশ হয় এবং পারমার্থিক চৈতন্যসত্তার জ্ঞানে ব্যবহারিক জগতের নাশ
হয়। এইরূপ সমসত্তাক বস্তুও পরস্পরের সাধক ও বাধক হয়। যেমন সুবর্ণ
ও অলংকার উভয়ের সত্তা ব্যবহারিক বলিয়া উহারা সমসত্তাক; সেইজন্য ব্যাব-
হারিক সুবর্ণ ব্যবহারিক অলংকারের সাধক। এইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট প্রাতিভাসিক
স্বপ্ন দ্বারা স্বপ্নের প্রাতিভাসিক অলংকার নিম্মিত হইতে পারে। অন্যদিকে
ব্যবহারিক ধন ব্যবহারিক দারিদ্র্য নাশ করে এবং স্বপ্নের প্রাতিভাসিক ধন
স্বপ্নের প্রাতিভাসিক দারিদ্র্য নাশ করে। কিন্তু ন্যূনসত্তাক বস্তু অধিকসত্তাক
বস্তুর উপকারও করে না বা উহার নাশও করে না। শূন্যতে কল্পিত প্রাতি-
ভাসিক রজতদ্বারা ব্যবহারিক অলংকার প্রস্তুত হয় না। আবার ব্যবহারিক
সাধনাদি দ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হয় না। (জ্ঞান প্রযত্নসাধ্য নহে—শূন্য
চিস্তে ব্রহ্মানিষ্ঠ গুরুদ্বয় মদ্য হইতে শূন্য মহাবাক্য-বিচারই জ্ঞানের কারণ)। প্রাতি-
ভাসিক রজত ব্যবহারিক শক্তিকে নাশ করিতে পারে না; আবার জগতের

ব্যবহারিক সত্তা চৈতন্যের পারমাণ্বিক সত্তার নাশ করিতে পারে না। জগতের মিথ্যাত্ব বিচারকালে এইগুলি স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য।

প্রঃ—তৈত মিথ্যা হইলে শাস্ত, গুরুও ত মিথ্যা হইয়া পড়ে। মিথ্যা দ্বারা কিরূপে মিথ্যার নাশ হইবে?

উঃ—মিথ্যা দ্বারা মিথ্যার নাশ হইতে দেখা যায়। যেমন স্বপ্নের মিথ্যা দারিদ্র্যের নাশ স্বপ্নের মিথ্যা ধনের দ্বারা হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জাগ্রৎ-কালের সত্য ধন স্বপ্নজগতের মিথ্যা দারিদ্র্য নাশ করিতে পারে না। এইরূপ মিথ্যা তৈতের নাশ, মিথ্যা বেদ ও গুরু প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে।

প্রঃ—নিগূর্ণের ধারণা কিরূপে হইবে?

উঃ—নিগূর্ণ প্রত্যেকের স্বরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ। সেইজন্য উহার বৃদ্ধিতে ধারণা করিতে হয় না, বা করাও যায় না। আশ্চিত্বশতঃ যে সগূর্ণের জ্ঞান আসিয়াছে বৃষ্টি-জ্ঞান দ্বারা উহারই নাশ দরকার। নিগূর্ণজ্ঞান স্বাভাবিক। মূলে নিগূর্ণজ্ঞান না থাকিলে সগূর্ণজ্ঞান হয় না। সগূর্ণ বলিতে কাহাতে গূর্ণ-যোগ হইল? উহা সগূর্ণ না নিগূর্ণ? সগূর্ণে গূর্ণযোগ হয় বলিলে অনবস্থাদোষ হইবে। অর্থাৎ আবার প্রশ্ন উঠিবে, পূর্বে সগূর্ণটী কাহাতে গূর্ণযোগ করিয়া হইল? এইপ্রকার প্রশ্নের কোথায়ও বিশ্রাস্তি ঘটিবে না, উহাই অনবস্থাদোষ। আবার নিগূর্ণেই বা গূর্ণযোগ কিরূপে সম্ভব? সূর্য কি কখনও অন্ধকারযুক্ত হয়? নিগূর্ণে গূর্ণযোগ সত্য সম্ভব নয়। তথাপি অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া দ্বারা উহা যেন সম্ভব হয়। মায়াই ব্রহ্ম দেশ, কাল, কার্য-কারণক্রম, তৈতৎ সগূর্ণত্ব প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদন করিয়া জীবকে মোহিত করিতেছেন, আবার অতৈতৎ, নিগূর্ণত্ব অসঙ্গত্ব প্রভৃতি জ্ঞান আনয়ন করিয়া উহাকে মুক্ত করিতেছেন। পরে স্বতঃই তৈতৎ, অতৈতৎ, সগূর্ণত্ব, নিগূর্ণত্ব, বস্তুত্ব, মূর্ত্তিত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া জীবের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া বাইতেছে। নিগূর্ণ শব্দে অতৈতৎবাদিগণ সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন।

প্রঃ—শব্দব্রহ্মে অজ্ঞান বা মায়া আসিল কিরূপে ।

উঃ—তুমি শব্দব্রহ্মে সমাহিত হও । তবেই অনুভব করিবে মায়া নাই, সূতরাং প্রসন্নও থাকিয়া যাইবে । নতুবা মায়া (দেহ, কাল, কার্য), কারণ, উহাদের ক্রম প্রভৃতি প্রসব করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন উঠাইতে থাকিবে ।

প্রঃ—যদি বলা যায় ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্—ব্রহ্মশক্তি অভিযুক্ত হইলে তখন সেই শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকে সগুণব্রহ্ম বলা হয় । আবার যখন ঐ শক্তি অনভিযুক্ত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে তখন উহাকে নিগূঢ়গুণব্রহ্ম বলা হয় । ‘নিগূঢ়’ বলিতে গুণশূন্যতা বুঝায় না, কেবল হেয়গুণের নিষেধ বুঝায় । পরন্তু ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর ।

উঃ—অষ্টোত্তমতে ব্রহ্মে শক্তি অনভিযুক্তভাবে থাকিলেও গুণ থাকিয়া গেল, সূতরাং উহাও সগুণব্রহ্ম । সূতরাং শাস্ত্রে যে ‘নিগূঢ়’ শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ করিতে হয় সগুণ । এই প্রকার অর্থ কষ্টকল্পনা । শাস্ত্র কি নিগূঢ় শব্দ প্রয়োগ করিয়া জীবকে ব্রাহ্মত্বপথে চালিত করিলেন ? আর ব্রহ্ম যদি কেবল কল্যাণগুণেরই আকর হন, তবে অকল্যাণগুণের আকর কে ? জগতে অকল্যাণও দেখা যায়, শাস্ত্রেও অকল্যাণের উল্লেখ আছে । তবে কি অকল্যাণগুণ সমূহের পৃথক্ ঈশ্বর আছেন ? এই প্রকার অর্থও কষ্টকল্পনা । যে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্ উহা সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর । সর্ব মিথ্যা হওয়ায় সর্বশক্তিমত্ত্বও মিথ্যা । নিগূঢ় ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু । আর যে বলা হয় শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ ; উহাও ‘ব্রাহ্মর শির’ এই বাক্যের ন্যায় ঔপচারিক । নিগূঢ়ব্রহ্মই মায়াশক্তিবারা শক্তি ও শক্তিমান্ রূপে প্রতীত হন ।

ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য বিবেক বা নিষেধ্য বিশেষণ বাহ্য কিছু শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে, উহাদের উদ্দেশ্য নিষেধমুখে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করান । যেমন ‘ব্রহ্ম সত্য’ ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের অভাব । এইরূপ ‘ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ’ বলিলে পরপ্রকাশের অভাব বুঝায় । ‘ব্রহ্ম নিত্য’ বলিলে ব্রহ্ম কাল-পরিচ্ছিন্ন নহেন অর্থাৎ কাল-পরিচ্ছিন্নের অভাব বুঝায় । এইরূপ কিছু বলিলে ব্রহ্মে দেশ-

পরিচ্ছিন্নতার অভাব বঝায়। ব্রহ্ম পূর্ণ বলিলে ব্রহ্মে বস্তু-পরিচ্ছেদের অভাব বঝায়। নিত্য, বিভূ প্রভৃতি শব্দের ব্রহ্মে ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রঃ—কিন্তু বৈষ্ণবগণ তো বলেন—‘জগৎ মিথ্যা নহে এবং জীব অণুচৈতন্য ও ঈশ্বর বিভূচৈতন্য। অণুচৈতন্য কখনও বিভূচৈতন্য হইতে পারে না।’ ‘জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম এক’ আচার্য্য শঙ্করের এই ভ্রান্ত মত শ্রীচৈতন্যদেব কতৃক খণ্ডিত হইয়াছে।’

উঃ—পূর্বে জগতের মিথ্যাত্ববিষয়ে শ্রুতি ও ষড়্ভুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। চৈতন্যদেবের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থের মতই চৈতন্যদেবের মত বলিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত। চৈতন্যদেবের প্রকৃত মত কি ছিল, উহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। হয়তো তিনি অশ্বৈত্ববাদীই ছিলেন, তবে সাধারণের জন্য তিনি সময়োপযোগী ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ—তিনি আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্তিত দশনামী সংন্যাসীর শিষ্য। আবার তিনি শ্রীধর স্বামীকে মান্য করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী ভাগবতের ‘জন্মাদ্যস্য যতোহদ্ব্যং’ ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগৎকে স্পষ্ট ভাষায় রজ্জুসদৃশং মিথ্যাই বলিয়াছেন। আর মূল ভাগবতেও জগৎকে স্থানে স্থানে মিথ্যাই বলা হইয়াছে এবং জীবব্রহ্মের একত্বের কথাও আছে। যেমন—“এবং দ্রষ্টার দৃশ্যত্বমারোপিতমবদ্ব্যম্ভিঃ” (১।৩।৩১) অর্থাৎ ‘এইপ্রকারে অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ দ্রষ্টা-পদার্থে দৃশ্যত্বের আরোপ করে।’ ‘অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে যো বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ। ব্রহ্ম স্বয়ং-জ্যোতিরতো বিভাতি, ব্রহ্মেন্দ্রিয়াথ্যাবিকারচিহ্নম্।” (১১।২৮।২২) অর্থাৎ ‘বৈকারিক এই রাজস সৃষ্টি অবিদ্যমান হইয়াও প্রতিভাত হইতেছে। অতএব স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়সকল, উহাদের অর্থ বিষয় সকল, মন, পঞ্চভূত প্রভৃতি নানা বিচিত্ররূপে প্রতীত হইতেছেন।’ যাহা অবিদ্যমান হইয়াও প্রতিভাত হয়, উহাকেই মিথ্যা বলে। আবার দ্বাদশাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—“অহং ব্রহ্ম

পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্” (১২।৫।১১) অর্থাৎ ‘আমি ব্রহ্মরূপ পরম ধাম এবং আমিই ব্রহ্মরূপ পরম পদ।’ এই বাক্যে জীবব্রহ্মের একত্বের কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাগবত লীলা-প্রধান গ্রন্থ হইলেও উহার চরম-তাৎপর্যের অষ্টেতবাদেব তাৎপর্যের সহিত পাঠ্য নাই। অষ্টেতসিদ্ধান্তে উঠিবার সোপান-স্বরূপ ঐশ্বর্যলব্ধনে, কর্ম, উপাসনা ভক্তি প্রভৃতি অষ্টেতমতেও স্বীকৃত। অবশ্য কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে দৃষ্ট এক স্থানে জ্ঞানের প্রতি এবং অষ্টেতমতের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। যদিও এই গ্রন্থে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, তথাপি ইহা সাম্প্রদায়িকতা দোষ হইতে মুক্ত নয় এবং ভারতের সর্বত্র সূর্যগণ-কর্তৃক ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতও নয়। উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-দর্শনের নিষেধ করা হইয়াছে, যেমন— ‘অথ যো অন্যাং দেবতাম্ পাস্তেহনোহসাধনোহমশ্মীতি স ন বেদ পশুদেব স দেবানাম্” (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০) অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া অন্য দেবতায় এইরূপে উপাসনা করে যে, সেই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, সে দেবতাগণের নিকট পশুর তুল্য।’ অর্থাৎ দেবতাগণ তাহার মূর্ত্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। আবার ছান্দোগ্যেও বলা হইল— “অথ যেহনাথাহতো বিদুঃ অন্যরাজানস্তে ক্ষয়্যন্ত্যোকা ভবন্তি” (৭।২।৫।২) অর্থাৎ ‘ইহা অপেক্ষা (ব্রহ্মের বা আত্মার সর্বাঙ্গিক ভাব অপেক্ষা) যাহারা অন্যরূপ জানে, যাহাদের অন্য রাজা বা প্রভু আছে, উহারা ক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়।’ এই প্রকার বহু শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য থাকা সত্ত্বেও দ্বৈতবাদিগণ সম্যক্ বৈরাগ্যের অভাববশতঃ জগৎকে মিথ্যা বলিতে ও জীব ও ব্রহ্মের—একত্ব স্বীকার করিতে ভয় পাইয়া থাকেন এবং পাছে ভোগের নাশ হয়, এইজন্য গোলকাদি অপ্রাকৃত লোকে অপ্রাকৃত ভোগের কল্পনা করেন।

চৈতন্যের আবার অর্থাৎ, বিভিন্ন ভাব কি? চৈতন্য সর্বদা একরূপ ও দেশ-কালের অতীত। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাব দেশকালের অধীন এবং প্রকৃতিরাজ্যে স্থিত। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানের সহিত অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে মিলাইয়া

ফেলিয়া চৈতন্য নিজেকে অগ্নু বা বিভূ মনে করেন। চৈতন্য বা জ্ঞানব্যতীত অগ্নু, বিভূ ভাবকে প্রমাণ করিবার উপায় নাই। সেইজন্য অগ্নু ও বিভূ ভাব জ্ঞানসত্তার অধীন হওয়ায় উহারা মিথ্যা। যাহারা বলেন চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারা অদ্বৈতবাদের চরমসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। যাহার অবয়ব আছে, উহার খণ্ডন হয়। সন্দেহাৎ আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম নিগূঢ় ব্রহ্মের কিরূপে খণ্ডন হইবে? অদ্বৈত সিদ্ধান্তে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকৃত নয়। সন্দেহাৎ কে কাহাকে খণ্ডন করিবে? সন্দেহাৎ অদ্বৈতবাদীর খণ্ডনের ভয় নাই। কিন্তু বৈতবাদীর নিকট দ্বিতীয় বস্তু সত্য বলিয়া স্বীকৃত। সন্দেহাৎ তাহার খণ্ডনের ভয় আছে।

প্রঃ—কেহ কেহ বলেন—‘আচার্য্য শঙ্করের অনুভূতি নিগূঢ়ের উপরে উঠে নাই। নিগূঢ়ের উপরে পুরুষোত্তম তত্ত্ব রহিয়াছে, উহা সগূঢ় ও নিগূঢ় উভয়ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

উঃ—শঙ্কর ‘নিগূঢ়’ শব্দে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, উহা আপেক্ষিক নিগূঢ় নহে। নিগূঢ়ের আর উপর কল্পনা সম্ভব নয়। যাহার উর্ধ্ব, অধঃ থাকে, অথবা যাহা উর্ধ্ব, অধঃ ভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ উহা নিগূঢ় হইতে পারে না—উহা সগূঢ়। আচার্য্য শঙ্করও নিবারণশব্দে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—“ন চোর্ধ্বং ন চার্ধো ন চাস্তনং বাহ্যম্” ইত্যাদি—অর্থাৎ ‘নিগূঢ়’ ব্রহ্ম, উর্ধ্ব অধঃ, অন্তর, বাহির ইত্যাদি ভাব নাই।’

প্রঃ—শ্রুতিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা, ঈশ্বর যখন সত্য তখন তাহার লীলা মিথ্যা হইবে কেন?

উঃ—ঐশ্বর্য্যালোক সত্য হইলেও তৎপ্রদর্শিত ইন্দ্রজাল তো মিথ্যাই হইয়া থাকে। এইরূপ পরম মায়াবী ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্টি জগৎও মিথ্যা। শ্রুতিতে যেমন ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ অজশ্রুতিও আছে। যেমন—“দিব্যো হ্যমৃগঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হ্যজঃ” (মৃণ্ডকোপনিষৎ—২।১।২) অর্থাৎ ‘সেই পুরুষ দিব্যও অমৃগ, তিনি সর্ববস্তুর ভিতরও বাহির এবং

জন্মহীন।’ “অজায়মানো বহুধা বিভাজ্যতে” (উক্ত নারায়ণোপনিষৎ) অর্থাৎ ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুপ্রকারে ভাত হন।’ এখন সৃষ্টিশ্রুতির সহিত ঐ সকল অজশ্রুতির সামঞ্জস্য করিতে গেলে বিবর্তবাদ স্বীকার করিতে হয়। রজ্জ্ব যেমন রজ্জ্বরূপে থাকিয়াও আমাদের দৃষ্টিবশতঃ আমাদের নিকট সর্পরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপে ঠিক থাকিয়াও আমাদের অনাদি অজ্ঞানবশতঃ আমাদের নিকট নানাকারে জগদ্রূপে প্রতীত হইতেছেন—ইহাই বিবর্তবাদ। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত—ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত কারণ।

সৃষ্টি যদি ঈশ্বরের লীলা হয়, তবে সেই ঈশ্বরের লীলা কিরূপ, উহা আমাদের বুদ্ধিবার উপায় নাই। লৌকিক লীলার অনুসরণ করিয়া আমরা ঈশ্বরের লীলা বুঝিতে পারি না। একজন রাজার যে রাজী দেখায় উহাতে উহার উদ্দেশ্য থাকে, লোকদিগকে চমৎকৃত করিব ও অর্থোপার্জন করিব। সুতরাং প্রশ্ন উঠে ঈশ্বরের লীলায় এরূপ কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা ; আর উদ্দেশ্য থাকিলে ঈশ্বর আপ্তকামই বা কিরূপে হন ? আরও প্রশ্ন উঠে লীলাকারী লীলা দেখাইতে দেখাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং উহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রশ্ন উঠে ঈশ্বর লীলা করিতে করিতে এরূপ পরিশ্রান্ত হন কিনা এবং তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় কিনা ? সুতরাং সৃষ্টি বা ঈশ্বরলীলা সত্য নয়। শ্রুতিও বলিলেন—‘যায়তীং লেলায়তীং’ (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭) অর্থাৎ ‘যেন তিনি ধ্যান করিতেছেন, যেন তিনি ক্রীড়া করিতেছেন।’ অদ্বৈতবাদীর ইহাই সিদ্ধান্ত যে সৃষ্টি-বর্ণনায় শ্রুতির তাৎপর্য নাই। কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশতঃ আমরা যে সৃষ্টি দেখিতেছি সৃষ্টিশ্রুতি দ্বারা উহার মাধ্যমে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করান হইয়াছে। সৃষ্টি যদি সত্য হইত, তবে বিভিন্ন শ্রুতি বা শাস্ত্রের সৃষ্টিবর্ণনায় পাৰ্থক্য থাকিত না, কারণ সত্যবস্তুর সকলের নিকট একরূপেই প্রতীত হয়। সৃষ্টিবর্ণনা দ্বারা শ্রুতি তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিতেছেন। মনে কর, একটি পুকুরের পাড়ে বা তটে

তালগাছ আছে। দূরে একস্থানে গুরু ও তাঁহার শিষ্য বসিয়া আছেন। গুরু ঐ পদকুরটি জানেন, কিন্তু শিষ্য জানে না। কিন্তু সে দূর হইতে তালগাছ দেখিতে পাইতেছে। এখন শিষ্যের পিপাসা পাইয়াছে। শিষ্য দূর হইতে যে তালগাছ দেখিতে পাইতেছে, উহার মাধ্যমে গুরু উপদেশ করিলেন ‘ঐ তাল-পদকুরে যাও জল পাইবে।’ এখানে জলই লক্ষ্য বস্তু, তালগাছ নয়। এইরূপ শ্রুতিতেও—‘যতো বা বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন তাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজজ্ঞাসস্ব, তদ্বশ্ৰুতি’ (তৈত্তিরীয় ৩.১) অর্থাৎ ‘যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করে, যাহা দ্বারা জাত প্রাণী জীবিত থাকে এবং মৃত্যুকালে যাহাতে প্রবেশ করে, তুমি উহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, উহা ব্রহ্ম।’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সৃষ্টির মাধ্যমে তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে—সৃষ্টিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

প্রঃ—কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি সব পথেই তো মুক্তি লাভ করা যায়, তবে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—ঐতাবলম্বনে কর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ জীবের মুক্তির কারণ হয়—জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কেবল কর্ম ও উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—‘তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ, পশ্চাৎ বিদ্যাতেহয়নার’ (শ্বেতাশ্বতর—৩.৮) অর্থাৎ ‘তাহাকেই জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অন্য পথ নাই।’

প্রঃ—কিন্তু জ্ঞানমার্গ তো শূন্য ও নীরস, ভক্তিমার্গ সরস ও আনন্দ-দায়ক।

উঃ—প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্ত এক অবস্থায় স্থিত। ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন—‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে’ (৭.১৭) অর্থাৎ ‘উহাদের মধ্যে জ্ঞানীভক্ত আমাতে নিত্যযুক্ত ও একভক্তি বলিয়া শ্রেষ্ঠ।’ আবার গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের সহিত দ্বাদশ অধ্যায়ের

ভক্তের লক্ষণের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উহা হইতেও বুঝা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাহাকে জ্ঞানী না তদ্বিশয়ে পরম-প্রীতি বা ভক্তি হইবে কেন? অষ্টোত্তমোত্তরবার্ণার পর জীবন্মুক্তের সর্বত্র সমদর্শনরূপ পরাভক্তির উদয় হয়। “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ডভক্তিং লভতে পরাম্” (গীতা ১৮।৫৪)। সর্বত্র সমদর্শনের ফলে জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বতঃই সহজানন্দ ফুটিয়া উঠে—উহাতে কোন বিষয়ের অপেক্ষা থাকে না। লম্বর যেমন মধুপানের সময় গুণগুণ শব্দ বন্ধ করিয়া মধুপানের আনন্দের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সমাহিত জ্ঞানী-পুরুষের বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দ-রসপানে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার বাহিরে চঞ্চলতা থাকে তা—তাঁহার এই আনন্দ নিম্নতরঙ্গ, উদার, প্রশান্ত ও বিচ্ছেদহীন। কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক জ্ঞান করায়, তাঁহাদের আনন্দ-প্রবাহের বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁহারা কখনও মিলন-জনিত উৎকট আনন্দ-প্রাপ্ত হন, আবার কখনও বিরহজনিত তীব্র দুঃখ অনুভব করেন। তাঁহাদের এই আনন্দ তরঙ্গান্বিত ও চঞ্চল—উহাতে ভোগের জের আছে। তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহারেও নন্দন, কুন্দনরূপে সেই চঞ্চলতা আবি্যক্ত হয়। নদী সমুদ্র হইতে যত দূরে থাকে, ততই উহার বেগ, চঞ্চলতা ও লাফালাফি। কিন্তু যতই উহা সমুদ্রের নিকটবর্তী হয়, ততই উহার বেগ, চঞ্চলতা প্রভৃতি কমিয়া যায়; এবং শেষে সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইলে নদী সমস্ত চঞ্চলতা হারাইয়া সমুদ্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। যদি শব্দা কর, সমুদ্র তো স্বাভাবিক ভাবে তরঙ্গান্বিত হয়, তদন্তরে বলি—বায়ুর প্রভাবেই সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, নতুবা স্থিরই সমুদ্রের স্বভাব। কিন্তু অষ্টোত্তমোত্তরবার্ণা দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় ঐ স্বরূপানন্দের তরঙ্গান্বিত ও চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা নাই। পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ পাঁচ অধ্যায়ে আনন্দ-সংগ্ৰহ অনেক সূত্রে বিচার করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিতে পারেন

প্রঃ—আপনি কি বলিতে চান শক্তিও মিথ্যা ?

উঃ—হঁা স্বরূপতঃ শক্তিও মিথ্যা। নতুবা ‘জগৎ মিথ্যা’ এই কথার মানে হয় না। শক্তিই ব্যক্তাবস্থায় জগৎ। শক্তি মিথ্যা হইলে তবেই জগৎ মিথ্যা হয়। আর মূলা শক্তিই অজ্ঞান। শক্তিকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কার্য্য দেখিয়া শক্তির অনুমান করা হয়। যেমন দাহ-কার্য্য দেখিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তির অনুমান হয়। শক্তির কার্য্য নামরূপাত্মক এই জগৎ দৃশ্য, জড়, পরিণামী ও নাশশীল, সূতরাং মিথ্যা। কার্য্য মিথ্যা হইলে কার্য্যের জননী শক্তিও মিথ্যা হইয়া পড়ে। যেহেতু কার্য্য, কারণের (উপাদান কারণের) গুণ প্রাপ্ত হয়। যদি নামরূপ সত্য হয়, তবে উহা হইতে আর বৈরাগ্যের কি প্রয়োজন? আর শ্রুতি যে বলিলেন, ‘তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ। পরাৎপরং পদ্রুশমুপৈতি দিব্যম্’ (মুণ্ডক ৩।২।৮)। অর্থাৎ ‘বিদ্বান্ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পদ্রুশকে প্রাপ্ত হন,’ নামরূপ হইতে বিমুক্তির বা কি প্রয়োজন? সুতরাং শক্তি ও উহার কার্য্য মিথ্যা, কিন্তু অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য।

গীতায় ভগবান্ বলিলেন, ‘জগৎ আমার একাংশ স্থিত’—‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’ (১০।৪২)। আবার ঋগ্বেদে পদ্রুশসূক্তে বলা হইয়াছে, ‘পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি’। অর্থাৎ ‘এই বিশ্ব ব্রহ্মের একপাদে অবস্থিত, অপর ত্রিপাদ অমৃত ও উর্ধ্বে অবস্থিত।’ যদিও নিরবয়ব ব্রহ্মের অংশ বা পাদ সম্ভব নয়, তথাপি শ্রুতি জীবের বুদ্ধ্যারোহণের নিমিত্ত পাদ কল্পনা করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রহ্মের এই চতুর্থ পাদটী অপর ত্রিপাদের ন্যায় অমৃত কিনা? যদি এই পাদ অমৃত হয়, তবে যে এই পাদে জগতের প্রতিবস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম তাহার দ্বারা আক্রান্ত কিনা? যদি ব্রহ্ম জগতের পরিণামী কারণ হন, তবে জগতের উৎপত্তিস্থ, বিনাশিত্ব প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্মে আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের বিবর্ত্ত-কারণ বলিলে এই দোষ হয় না। দ্ব্যস্তিতবশতঃ মরুভূমিতে যে জল দেখা যায়, উহা মরুভূমিকে সিক্ত বা কন্দমাঙ্ক

করে না। মিথ্যা জগৎরূপ কাব্য বা উহার কারণ শক্তি, অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্য-
ব্রহ্মকে বিকৃত করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ‘শক্তিতত্ত্ব’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং ‘জগৎ মিথ্যা’ এই বাক্যকে পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া
যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শাস্ত্রীয় ও সংস্কৃত বুদ্ধি না থাকায় আমাদের
অধিকাংশই পাগল। চিত্তের পাঁচটী অবস্থা (*) (১) ক্ষিপ্ত (২) মূঢ়
(৩) বিক্ষিপ্ত (৪) একাগ্র (৫) নিরুদ্ধ। সাধারণ মানুষের চিত্ত ক্ষিপ্ত ও মূঢ়
অবস্থায় থাকে।

(১) ক্ষিপ্ত—যে অবস্থায় চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে।
ক্ষিপ্তচিত্ত রজঃপ্রধান ও চঞ্চল।

(২) বিক্ষিপ্ত—যে অবস্থায় চিত্ত কখন কখন স্থির হয়, পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই
চিত্ত সঙ্ঘমিশ্রিত রজঃপ্রধান।

(৩) মূঢ়—যে অবস্থায় চিত্ত আলস্যভারাক্রান্ত হয়, ঘুমাইয়া পড়ে—এই অবস্থা তমঃ প্রধান।

(৪) একাগ্র—যখন একটীবশত্বে (যোরবশত্বেটী মাত্রই) চিত্তের সম্মুখে ভাসে; ধ্যান ও ধ্যান
ভাবিয়া গিয়া যোরবশত্বে সীত একাকারভাব প্রাপ্ত হয়, চিত্তের সঙ্ঘপ্রধান এই অবস্থায়
নাম ‘একাগ্র’।

আমাদের চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে কত অসংলগ্ন চিন্তা উঠে, তাহা যদি আমরা
লোকের নিকট অকপটভাবে প্রকাশ করি, তবে উহারা আমাদের পাগল
বলিবে। তবেই হইল অস্তরের পাগলামি চাপা দিয়া জামা, জুতা, বুট
ইত্যাদি পরিয়া আমরা ভদ্র ও বুদ্ধিমান সাজিয়া থাকি। আমাদের চিত্তের
পাগলামির চিকিৎসা-জন্য ঈশ্বর, গুরু ও শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হয়।
যোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করত মহাবাক্য-বিচারদ্বারা তত্ত্বদর্শন হইলে চিত্তের
পাগলামি চিরতরে সারিয়া যায়, তখন দেখা যায় ‘একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আমিই
আছি, দ্বিতীয় নাই’। তখন সর্বদুঃখ দূর হইয়া পরমানন্দ ফুটিয়া উঠে।
শাস্ত্র বলেন—

‘ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চান্ধবৎ।

রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা’

অর্থাৎ ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম রস বা আনন্দস্বরূপ,

তাহাকে লাভ করিলেই আনন্দী হওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।’ ‘শান্তং শিবমশ্বেতম্’। (মাণ্ডুক্য)।

[গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রধানভাবে আত্মানুবিচার করা হইয়াছে, অন্যান্য অধ্যায়ের স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।]

(৫) একাগ্রতার পরিপাকে চিত্তের বিশুদ্ধ হইলে পরে প্রকৃতি-পদ্বত্বের বিবেকবারা পদ্বত্বের সাক্ষাৎকার হয়। উহার পর স্বতঃই বুদ্ধি পদ্বত্ব-নিষ্ঠ হইতে থাকে। ক্রমশঃ ধ্যান ও ধ্যায় এই দ্বিপদটি লয় প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার চিত্ত নিরুদ্ধ-প্রধান।

সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ

‘জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।’ গীতা ৩।৩

ভগবান্ গীতায় জ্ঞানযোগদ্বারা সংন্যাসী সাংখ্যগণের এবং কর্মযোগদ্বারা গৃহস্থ নিঃক্রম কর্মযোগগণের, এই দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন।

জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যযোগ—যাঁহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের বা ইহজন্মের মুকৃতিবশতঃ সংসারে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত অতিশয় শূন্য তাঁহারা (‘পুত্রৈষণায়াচ বিতৈষণায়াচ লোকৈষণায়াচ বদ্যায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরতি’—বৃহদারণ্যক ৩।৫।১) ‘পুত্রৈষণা, বিতৈষণা (এষণা = কাম) এবং লোকৈষণা হইতে বদ্যুখিত বা জাগরিত হইয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।’ তথায় শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট দেবান্তর্বিচার শ্রবণ করেন। ইহারা বেদান্তের মূখ্য অধিকারী। এই মূখ্য অধিকারীর* অধ্যারোপ ও অপবাদ-পূর্বক সদ্গুরুর নিকট ‘তত্ত্বমস্যাংদি’ মহাবাক্যের বিচার শ্রবণমাত্রেই ‘আমি শূন্য, বদ্য, মূর্ত্ত, ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম’ এই প্রকার অখণ্ডাকারা বা ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। চিদাভাস-সমাম্বিত এই অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি আত্মা হইতে অভিন্ন অজ্ঞাত পর-ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া ব্রহ্ম-বিষয়ক আবরণলক্ষণ যে

* অধ্যারোপ = অসম্পূর্ণরূপ বস্তুতে সম্পূর্ণরূপের ন্যায় বস্তুতে অবস্থার আরোপ। ব্রহ্মে জগৎ না থাকিলেও, আকাশে নীলতার ন্যায়, আরোপিত জগৎ প্রতীত হয়।

যেমন ‘তালপুকুর’ এই শব্দে তালগাছের সাহায্যে পুকুরকে দেখান হয়, এইরূপ গুরু জগৎ-দর্শনকারী অল্প শব্দেই নৃন্তি আঁশ বর্ণনা করি। (অধ্যারোপদ্বারা) উহার মূলে যে ব্রহ্ম আছেন তাঁহার ইঙ্গিত করেন। “সংসৃতঃ পণিগপাদংহং” ইত্যাদি (গীতা ১৩।১৩)—অধ্যারোপের দৃষ্টান্ত।

অপবাদ = ‘নৌত’ ‘নৌত’ রীতিতে বিচার। বস্তুতে সম্পূর্ণের ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে জগদ্ভ্রম বহিয়াছে। যে বিচারদ্বারা জগদ্জ্ঞানটী নষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানটী অবাধিত থাকিয়া যায়, তাহাকে অপবাদ বলে। “অশব্দমপর্ণমরূপমব্যাহং” (কঠোপনিষৎ ১।৩।১৫) অপবাদের দৃষ্টান্ত। মহাবাক্য ৪টি—(১) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঋগ্বেদ)। (২) তত্ত্বমসি (সামবেদ)। অহং ব্রহ্মাশ্মি (যজুর্বেদ)। অন্নমাক্ষা ব্রহ্ম (অথর্ববেদ)। মহাবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধক।

অজ্ঞান উহাকে নাশ করে। দর্পণের নাশ হইলে যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত মূখেরও নাশ হয়, প্রকৃত মূখমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ অজ্ঞানের নাশ হইলে অজ্ঞানোৎপন্ন জগতের এবং তদন্তর্গত চিদাভাসের অর্থাৎ জীবন্তেরও নাশ হয়, ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। এই যে জীব ও জগতের নাশের কথা বলা হইল, ইহা দ্বারা ইহা বৃদ্ধিতে হইবে না যে, অজ্ঞানের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীব ও জগৎ অদৃশ্য হইয়া যায় এবং দেহের পতন হয়। জ্ঞানের উদয়ে জগতের উপর সত্যত্ববৃদ্ধির বাধ হয় অর্থাৎ ব্যুত্থান অবস্থায় জগৎ দেখা গেলেও উহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। সুপ্ত হইতে জাগ্রত পদবৃদ্ধের সুপ্তদৃষ্ট বস্তু সকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলের উপর সত্যত্ববৃদ্ধি হয় না, এইরূপ

‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের অর্থঃ—ভাগভাগলক্ষণাব্যারা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হয়। ‘তৎ’ (সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম), তদম্ (তদ্বৎ জীব) অসি (হও)। ‘তৎ’ পদের বাচ্যার্থ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) হইতেছে মারোপাধিবৃদ্ধ সর্বব্রহ্ম, সর্ববশক্তিমান্, সঙ্গুলব্রহ্ম বা ঈশ্বর। লক্ষ্যার্থ হইতেছে সর্ব-উপাধি-বর্জিত শূন্য-চৈতন্য বা নিগূর্ণ-ব্রহ্ম। ‘তদম্’ পদের বাচ্যার্থ হইতেছে অবিকার বশীভূত অস্পংশক্তিমান্ বস্তু জীব, লক্ষ্যার্থ হইতেছে উপাধি-বর্জিত কূটস্থ বা সাক্ষিচৈতন্য। ঈশ্বর ও জীবের উপাধি সকল বাদ দিলে উভয়েরই স্বরূপ শূন্যচৈতন্য। ইহাতে সর্বব্রহ্মত্ব, সর্ববশক্তিমত্ত্ব অস্পষ্টত্ব, অস্পংশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি নাই। মহাবাক্যসঙ্গে যে জীব ও ব্রহ্মের একতা দেখান হইয়াছে তাহা সর্ব, অস্প, পরোক্ষত্ব, অপারোক্ষত্ব প্রভৃতি বাদ দিয়া শূন্য চৈতন্যস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া। নতুবা বাচ্যার্থে জীব ও ঈশ্বরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জীবের কখনও ঈশ্বরের ন্যায় সর্বব্রহ্মত্ব, সর্ববশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি হয় না। ‘তৎ’ ও ‘তদম্’ পদার্থের শোধন করিয়া উভয়ের একত্ব সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন ‘তদম্’ পদার্থের শোধন করিলেই হইল, ‘তৎ’ পদার্থের শোধনের প্রয়োজন নাই, ইহা ঠিক নহে। উভয় পদার্থের শোধন না হইলে “আমি শূন্য, বৃদ্ধ ও মূলস্বরূপ অম্বর ব্রহ্ম” ইত্যাকার অখণ্ডবৃদ্ধি বা ব্রহ্মাকার বৃত্তির উদয় হয় না, সুতরাং অজ্ঞানেরও নাশ হয় না। ‘তদম্’ পদার্থের শোধনাব্যারা ব্রহ্ম-বিষয়ক পরোক্ষভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়; যে হেতু জীব-বৃদ্ধির সাক্ষী কূটস্থচৈতন্য নিত্য অপারোক্ষ; কিন্তু উহাব্যারা আত্মার অব্রহ্মভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না। আবার কেবল ‘তৎ’ পদার্থের শোধনাব্যারা আত্মার অব্রহ্মভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলেও পরোক্ষভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং ‘তদম্’ই ‘তৎ’ এবং ‘তৎ’ই ‘তদম্’ এই প্রকারে বৃদ্ধিবৃত্তির একতানতা বিধেয়। তবেই ব্রহ্মকারাবৃত্তির (প্রতিবন্ধ-শূন্য) উদয়ে মূল অজ্ঞানের নাশ হইবে। স্মরণ রাখা উচিত শূন্যচৈতন্য অজ্ঞানের নাশক নহেন, অখণ্ডাকার বৃত্তিস্থ চৈতন্যই অজ্ঞানের নাশক। সাংখ্যাদিবাদিগণ ‘তৎ’ পদার্থের শোধন করিয়াও কেন বহু-জীববাদী হইলেন, ইহাও বিবেচ্য।

অজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে প্রবৃত্ত পুরুষেরও জগতের স্মৃতি হইলেও উহাতে সত্য বৃদ্ধি হয় না। মিথ্যা জ্ঞান থাকায় ঐ স্মৃতিও ক্রমশঃ থাকিয়া যায়। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীব ও জগতের একবারে নাশ হইলে জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুসম্প্রদায় থাকিত না।

কিন্তু ষাঁহার পূর্বোক্ত মূখ্য অধিকারীর ন্যায় বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধি নাই, শুদ্ধামান্দ্য আছে, এইরূপ ব্যক্তি সদৃগুরুর নিবট বেদান্তবিচার শ্রবণ করিয়া 'আমি ব্রহ্ম' এইপ্রকার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিলেও উহা প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হয় না। 'অতদ্বোধোহাপরোক্ষোহষ্ট মহাবাক্যবিচারণাৎ। ন দৃঢ়ঃ শ্রবণা-দীনাচাৰ্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ'। (পঞ্চদশী—তৃপ্তিদীপ্ত ৯৭ শ্লোঃ)। অর্থাৎ মহাবাক্যবিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও প্রথমোৎপন্ন ঐ জ্ঞানের দৃঢ়তা থাকে না। সেইজন্য শঙ্কর, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যাবৎ জ্ঞানের দৃঢ়তা না হয় তাবৎ শব্দমাদিসাধন সহিত পুনঃ পুনঃ বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন করিতে বলিয়াছেন। এই তৃতীয় প্রকার অধিকারীর তত্ত্বনিষ্ঠা থাকিলেও বিপরীত-ভাবনার নিবৃত্তি হয় না; অর্থাৎ পূর্ব সংস্কারবশতঃ তাঁহার দেহাদিতে অধ্যাস (দেহাদিকে সত্য আত্মা বলিয়া ভ্রম) এবং জগতের উপর সত্যত্ববৃদ্ধি আসিয়া পড়ে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, তাঁহার পূর্বে উপাসনাদি দ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় নাই। তথাপি পুনঃ পুনঃ বেদান্তের শ্রবণমননাদি করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হইয়া থাকে। প্রকৃত অধিকারী পুরুষ ও বুদ্ধজ্ঞানলাভজন্য সংন্যাস লইয়া যে বেদান্তের শ্রবণমননাদি করেন, উহাই সাংখ্যযোগ বা জ্ঞাননিষ্ঠা। এইটি নিবৃত্তিমার্গ। জ্ঞাননিষ্ঠা সাংখ্যযোগীর বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন ব্যতীত অন্য কৰ্তব্য নাই। সাংখ্যযোগের ফল সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ এই লোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি। বহু জন্মের পুণ্যপুণ্যের পরিপাকে কোন কোন মহাত্মা গৃহস্থাশ্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ

করেন। তিনিও চিত্তবিশ্রান্ত ও জীবমুক্তি সুখ-লাভের জন্য সংন্যাসাশ্রমে গিয়া মনোনাশ ও বাসনাঙ্কয়ের অভ্যাস করেন। আবার জ্ঞানলাভের পর কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন এবং নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া আপনার পূর্ব-আশ্রমোচিত কর্মসকল নির্লিপ্তভাবে করিয়া যান। অস্ত্র ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেই কর্মের অনুসরণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করে। বশিষ্ঠ, জনক প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা জ্ঞানিগণের কর্মকুশলতা অধিক থাকে, যেহেতু কর্ম তাঁহাদের লিপ্ততা থাকে না। সেইজন্য ভয়, মোহ, অবসাদ ও দুর্বলতা প্রভৃতিও থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানী হইয়াও দশ উপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ও বহু দেবদেবীর স্তবাদি লিখিয়া গিয়াছেন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধগণের প্রভাব দূর করিয়াছেন। রাজর্ষি জনক এবং জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠের কর্মকুশলতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অবশ্য জ্ঞানিগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহারপরায়ণ না হইয়া সমাধিপরায়ণ হইয়া থাকেন, যেমন জড়ভরত, প্রভৃতি। কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসনকালে সাধকের দ্বারা লোকব্যবহারাদি কর্ম সম্ভব হয় না।

কর্মযোগ বা নিকামকর্ম—প্রকৃত সাংখ্যযোগের অধিকারী অতি বিরল অধিকাংশ লোকেরই পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি থাকে। এষণা বা কামনা থাকিলে লোকে কর্ম করিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় সংন্যাস গ্রহণ করিয়া বেদান্তের শ্রবণ-মননাদি করিলে বিশেষ কোন লাভ হয় না। সুতরাং এইপ্রকার অধিকারীকে শাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিকাম-কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। নিকামকর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে সাংখ্যজ্ঞানে অধিকার লাভ হয়। নিকামকর্মী সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় ইত্যাদিতে সমান জ্ঞান করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম করিয়া যান— ইহাই কর্মযোগ। কর্মযোগে অহংকারের বা ভাবাবেগের স্থান নাই। কর্ম-

যোগী কেবল কৃষ্ণানুরোধে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট জপ পূজা, ধ্যান, হস্ত, দান, তপস্যা, পরোপকার ভাবে দয়া প্রভৃতি শৃঙ্খলমের অনুষ্ঠান করিয়া যান। শাস্ত্রোক্তবিধানে কর্ম করিতে গেলে অহংকারবশে নিজের ইচ্ছামত চলা যায় না, সুতরাং অহংকার প্রতিপদেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অহংকার আদর প্রাপ্ত না হইলে ভীষক ক্রমশঃ ত্যাগ করে। নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ অহংকার ক্ষীণ হয় ও কর্মযোগ শিথিল হয়। অহংকার যতই ক্ষীণ হয়, সাধক ততই বৃদ্ধিতে পারেন যে প্রতিপদেই উহার উপর ভগবানের করুণা বর্ষিত হইতেছে। সাধক দেখেন ভগবান্ সর্বশক্তিমান্। তিনি ইচ্ছা করিলে মূহুর্ত্তমধ্যে সকলের দুঃখ দূর করিতে পারেন। জীব উহারে বিস্মৃত হইয়াই দুঃখ পায়, স্মরণ-ভুলই মরণ। আনন্দময়রূপ ভগবানের শরণ লইলে দুঃখ দূর হয়। দুঃখ-নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই। ভগবান্ বিপদে প্রাণকর্তা এবং সর্বসময়ের বান্ধব। জীব অতিশয় পাপ করিলেও সকল বান্ধব-বান্ধব ত্যাগ করিলেও, ভগবান্ কোন অবস্থায়ই ভীষকে ত্যাগ করেন না। তিনিই, “গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুর্যঃ”। গীতা ৯.১৮ অর্থাৎ তিনিই সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, ভোগ-স্থান, রক্ষক এবং সুর্য। সাধক দেখেন আমার সাহ্য কতটুকু? আমি কতটুকু সংসারের উপকার বা দুঃখ দূর করিতে পারি? আমি সংসাররূপ রজ্জ্বমণ্ডে ভগবানের দ্বারা নির্মমিত হইয়া দারুপ্তলিকায় ন্যায় নৃত্য করিতেছি। যেমন কোন জালিক ভাল কিতোর করিলে অসংখ্য মৎস্যগণ উহার মধ্যে পড়িয়া আবদ্ধ হয় ও বিনষ্ট হয়, কেবল সেই মৎস্যটিই রক্ষা পায় যে জালিকের পায়ের কাছে আসিয়া আশ্রয় লয়, এইরূপ ভগবান্ এই সংসারে মারাজাল বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, উহারে ভীষরূপ মৎস্যগণ আবদ্ধ হইতেছে এবং দৃষ্ট ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল সেই ভীষটাই রক্ষা পায় যে ভগবৎচরণ আশ্রয় করে। এইরূপ বৃদ্ধিয়া সাধক সংসারে ভার, দেশের সেবার ভার প্রভৃতি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপর ছাড়িয়া দিয়া কর্মসংকোচ করিয়া লয়েন এবং কেবল ভগবানেরই প্রকা, কীৰ্ত্তন স্মরণ পাদসেবন, অর্চনা বন্দনা প্রভৃতি ভক্তি-উৎপাদক

কৰ্মসকল কৰিতে থাকেন। “শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।”
অৰ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাশ্রয়বিদনম্।” ইহাই গীতার
দ্বাদশাধ্যায়ে বৰ্ণিত ‘মৎকৰ্ম’পৰম’ অবস্থা। (গীতার ঐ অধ্যায়ে ৮ হইতে
১১ শ্লোক পর্য্যন্ত সগুণ উপাসনার ক্রম দেখান হইয়াছে; ঐ ক্রমই এখানে
প্রদৰ্শিত হইতেছে)। ‘মৎকৰ্ম’পৰম্’ অবস্থায় সাধকের অহংকার আরও ক্ষীণতা
প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিপাকে সাধক কৰ্মরাজ্য হইতে যোগ ও ভক্তির
রাজ্যে প্রবেশ করেন। এতক্ষণ বিশ্বাসে সাধনা চলিতেছিল, এখন ইষ্টমূর্ত্তির
দৰ্শনের জন্য সাধকের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি অন্য সমস্ত কৰ্ম ত্যাগ
করিয়া চিত্তকে বিষয়বিরত করিয়া উহাকে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যানে একাগ্র করিতে
থাকেন, ইহাই ‘অভ্যাসযোগ’। প্রণবের চিন্তা, গুরু-পাদুকাধ্যান, ষট্চক্রভেদের
অভ্যাস প্রভৃতি অভ্যাসযোগের অন্তর্গত। প্রণবের ধ্যান সগুণ বা নিগুণ
উভয়ভাবেই করা যাইতে পারে। অভ্যাসযোগের অবলম্বন যাহাই হউক
না কেন, উহাতে ভগবদ্‌বুদ্ধ্যি থাকা আবশ্যিক। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে বৰ্ণিত
আত্মসংস্থযোগ নিগুণ উপাসনার অন্তর্গত। অভ্যাসযোগের পরিপাকে সাধক,
জ্যোতির্ময়, নয়নাভিরাম মনোহর ইষ্টমূর্ত্তির দৰ্শন পান। ইষ্টদেবতা জীবন্ত
ও উজ্জ্বলভাবেই সাধকের নিকট প্রকাশিত হন, তাহার সহিত কথাবার্তা পর্য্যন্ত
চলে। ইষ্টমূর্ত্তি-দৰ্শনে সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না। কারণ, এতক্ষণ তিনি
বিশ্বাসে মাত্ৰ সাধনা করিতেছিলেন, ধরিবার ছুঁইবার কিছু পান নাই, এখন
পাইলেন। ইষ্টমূর্ত্তি তাহার সাধনার আগ্রহ বাড়াইবার জন্য তাহাকে দৰ্শন দেন
বটে, কিন্তু তাহাকে সগুণ উপাসনার আরও উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার জন্য
পরক্ষেণেই অতীত হইয়া যান। তখন সাধকের চিত্ত সর্বদা ভগবানকে লাভের
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সাধক ঈশ্বর ও গুরুদ্ব্যপায় ভগবানের
শক্তি মাধুর্য্য, গুণ, লীলা প্রভৃতির ধ্যানে নিমগ্ন হইতে থাকেন। তিনি দৌষ্টে
পান যে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিশেষরূপে
অভিব্যক্ত মূর্ত্তি। ভগবানই জীবকে ধরা দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ

করিয়েছেন। ক্রমশঃ সাধকের নিকট জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভগবানের মূর্তি বলিয়া বোধ হয় এবং ভগবৎকৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া যায়। অতঃপর সাধক ভগবানের আদ্য, সর্বব্যাপক, ভেজোন্ময়, সগুণ, বিশ্বরূপ দেখিতে পান। সাধক ঐ রূপের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বস্তুমানের সমস্ত ঘটনা একত্র অর্ধস্থিত দেখিতে পান। ঐ রূপের পরিচ্ছেদ নাই, উহার আদি অন্ত কিংবা মধ্য কিছুই জিয়া পাওয়া যায় না। উহার সহস্র সহস্র শির, সহস্র সহস্র করচরণ; চন্দ্রসূর্য্য উহার নয়ন, বায়ু উহার নিঃশ্বাস ইত্যাদি। সাধকের এতদবস্থায় বুদ্ধিতে বাকি থাকে না, যে ভগবান্ বিশ্বরূপ সর্বদিকে বিরাজিত। এতদবস্থায় আর ভগবানকে হারাইবার ভয় নাই, আর বিচ্ছেদও নাই। ইহাই সগুণ সাধনার সর্বোচ্চ যুক্ততম অবস্থা। এই অবস্থায় আপনিই কস্মের ন্যাস বা ত্যাগ হইয়া যায়। সতী স্ত্রী যেমন স্বামীর সেবা করিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া যান, সেবা আপনিই বশ হইয়া যায়, এইরূপে সাধক কস্মযোগের পরিপক্ক অবস্থায় ভুক্ত হইয়া ভগৎস্বামীর ধ্যানে এরূপ তন্ময় হইয়া পড়েন, যে কস্ম আপনিই বশ হইয়া যায়। এইরূপ যুক্ততম সাধককে ভগবান্ বুদ্ধিযোগ বা তত্ত্ববিচার প্রদান করেন। ঐ বিচার দ্বারা ভক্ত সাধক ভগবানের নিগূঢ়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন।

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি” তে ॥ গীতা ১০।১০।

অর্থাৎ ‘সেই সততযুক্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনকারী আমার ভক্তগণকে আমি এইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন’।

নিষ্কাম কস্ম সাধককে ক্রমশঃ কস্ম হইতে ভক্তির দিকে এবং ভক্তি হইতে জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। নিষ্কাম কস্মের ক্রমশঃ রূপ হইতে গুণে এবং গুণ হইতে স্বরূপে লক্ষ্য পড়ে। কস্মযোগ ক্রমমুক্তির পথ। ফল পাকিলে বোটা হইতে আপনিই খসিয়া যায়, এইরূপ নিষ্কামকস্মের পরিপক্কাবস্থায় কস্ম

আপনিই ছাড়িয়া যায়। কৰ্মকে জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না বা ছাড়াও যায় না। মোহবশে বা কায়ক্ৰেশভয়ে কৰ্মত্যাগ করাকে ভগবান্ অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৭৮ শ্লোকে তামস ও রাজস ত্যাগ বলিয়া উহাদের নিন্দা করিয়াছেন এবং ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নিকামকৰ্মের অন্ত্ৰ্স্থানকারী পুরুষকে “স সংন্যাসী চ যোগী চ” অর্থাৎ ‘তিনি সংন্যাসী এবং যোগী’ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ঈশ্বরে ফলাপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধিতে কৰ্মব্যাকৰ্মের অন্ত্ৰ্স্থানই সাত্ত্বিক ত্যাগ—ইহা গৌণ-সংন্যাস। গৌণ-সংন্যাস মূখ্য-সংন্যাসের কারণ হয়। গৌণ-সংন্যাস হইতে কিরূপে ক্রমশঃ মূখ্যসংন্যাস লাভ হয়, অষ্টাদশ অধ্যায়ে দশম শ্লোকে “ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।” ইত্যাদি বাক্যে উহা দেখান হইয়াছে। ‘ফলত্যাগী নিকাম কৰ্মীর সত্ত্বগুণ অতিশয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় এবং আত্মানাত্মবিবেকের মেধা জন্মে। উহার ফলে তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ছিন্ন-সংশয় হন’। ‘সংন্যাস’ শব্দের অর্থ সম্যক্ ন্যাস বা ত্যাগ। আত্মজ্ঞানেই সৰ্বকৰ্মের প্রকৃত সংন্যাস হইয়া থাকে “সৰ্বং কৰ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।” ৫।৩৪ (গীতা)। অর্থাৎ ‘হে পার্থ! জ্ঞান হইলে সৰ্ব কৰ্ম শেষ হইয়া যায়’।

একই ব্যক্তির একই কালে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কৰ্মনিষ্ঠা এই উভয় নিষ্ঠাই হইতে পারে না এবং জ্ঞান ও কৰ্ম উভয়ে মিলিতভাবে মোক্ষের কারণ নয়। জ্ঞান ও কৰ্মের মধ্যে জ্ঞানই মূর্ত্তির কারণ, কৰ্ম মূর্ত্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। জ্ঞান ও কৰ্ম আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিপরীত। কৰ্মই অজ্ঞান জ্ঞানে কৰ্ম নাই। জ্ঞাননিষ্ঠা শূন্যচেতন্যাবিবৰক, সত্ত্বাং কৰ্ম, কৰ্ত্তা, ফল প্রভৃতি ভেদদৃষ্টির নাশকারক। কৰ্মনিষ্ঠা কৰ্ত্তা, কৰ্ম, ফল ইত্যাদি ভেদদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। জ্ঞাননিষ্ঠা সকল ভেদদর্শনের নাশকারী বলিয়া সদ্যোমূর্ত্তিপ্ৰদায়ক। কৰ্মনিষ্ঠা সকাম হইলে উহা কৰ্ত্তা, কৰ্ম ও ফল ইত্যাদি ভাবের পোষণকারী এবং উহাদিগকে জীবিত রাখিয়া জীবকে মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না। কিন্তু নিকামকৰ্ম ক্রমশঃ কৰ্ত্তা, কৰ্ম, ফল ইত্যাদি

ভাবে ক্ষীণ করিয়া ক্রমশ্চিন্তি আনিয়া দেয়। সেইজন্য যোগ (নিস্কাম-কর্ম-যোগ) কর্মের কৌশল। “যোগঃ কর্মসু কৌশলম্”। গীতা ২।৫০

গৃহস্থাশ্রমে কর্মযোগদ্বারা চিন্তাশুদ্ধি সম্পাদন করতঃ কর্মজাতিসিদ্ধি বা জ্ঞান নিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। কর্মজাতিসিদ্ধি লাভ হইলে নৈকর্ম্য সিদ্ধির জন্য নিঃসর্জনে গিয়া বেদান্তের শ্রবণমননাদি করিতে হয়। কর্মদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, হইলে উহা অনিত্য হইত। জ্ঞান আত্মস্বরূপ ও সত্যবস্তু। বিচারদ্বারা ঐ আত্মস্বরূপের নিরূপণ হইয়া থাকে। কোটী কোটী কর্মদ্বারা বস্তুস্বরূপের জ্ঞান হয় না। “বস্তুসিদ্ধিবিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ।” (বিবেক চূড়ামণি—শঙ্করাচার্য্য)। “পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়া-মাত্মকৃতঃ কৃতেন” (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। অর্থাৎ ‘কর্ম-উপার্জিত লোক-সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। অনিত্য কর্মদ্বারা অকৃত যে ব্রহ্ম তাহাকে লাভ করা যায় না।’ তথাপি অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে কর্মেরই প্রয়োজন। যেহেতু, নিষ্কাম কর্মদ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি না হইলে উহার বিচারের যোগ্যতাই আসে না।

[গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কামকর্মের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং অষ্টাদশ প্রভৃতি অধ্যায়েও স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।]

প্রকৃতি ও কস্ম-পরিচয়

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কস্মাণি সৰ্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তা হি মীতি মন্যতে” ॥ গীতা ৩।২৭

অর্থাৎ ‘প্রকৃতিজাত গুণ হইতে কস্মসকল কৃত হয়। আত্মা অহংকারের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া ‘আমি কৰ্ত্তা’ এইরূপ মনে করেন।’

প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা কস্ম কৃত হয়। প্রথমেই তিন গুণের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। সত্ত্বগুণ নিম্নলিখিত প্রকাশ-স্বভাব ও সুখদায়ক। রজোগুণ চঞ্চলতা, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতির উৎপাদক। তমোগুণ মলিন, আবরণস্বভাব ও বাধাস্বরূপ। কাহারও মধ্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তখন সে সুখ প্রাপ্ত হয়, সকল বিষয় বুদ্ধিতে পারে, শরীর ও মন হালকা বোধ হয়। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার বিষয়ে লোভ, কস্ম করিবার প্রবৃত্তি, চঞ্চলতা, অশান্তি প্রভৃতি দেখা যায়। তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উদ্যমহীনতা, নিদ্রা, আলস্য প্রমাদ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। দ্বিগুণের স্বভাব এই যে উহারা সৰ্বদা একত্র অবস্থান করিবে এবং একটী অপরাধটিকে অভিভূত করিয়া প্রবল হইবার চেষ্টা করিবে। কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে, একেবারে চলিয়া যায় না। সেই অভিভূত অবস্থায় উহাদের চেষ্টা চলিতে থাকে, সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করিবার জন্য। এইরূপ কখন রজোগুণ প্রবল হয় বা কখনও তমোগুণ প্রবল হয়। একটী গুণের প্রাবল্য হইলে অপর দুইটি গুণ অভিভূত অবস্থায় থাকিয়া উহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে। আমাদের মধ্যে সৰ্বদা এই তিন গুণের খেলা দেখিতে পাই। চিন্তে সত্ত্বগুণ প্রবল হইল, চিন্তা বেশ লঘু বোধ হইতেছে, বেশ সুখ পাইতেছি, শাস্ত্রবাক্য শুনিলে ভাল লাগিতেছে ও বুদ্ধিতে পারিতেছি, পরস্পরে রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঐ ভাবকে ডুবাইয়া দিল, চিন্তা চঞ্চল হইয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল বিষয়সম্পত্তি বাড়াইতে হইবে অর্থ চাই, ছেলদিগকে

মানুষ করিতে হইবে, উহাদের বিষয়সম্পত্তি ও অশ্বের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে, শাস্তাচিত্রায় অতিবাহিত করিলে চলিবে কেন? অতএব কৰ্ম করা প্রয়োজন। আবার কখন তমোগুণ প্রবল হইয়া নিদ্রা, আলস্যাদি দেখা দিল, উহারা আমার কৰ্মশক্তিকে বাধা দিল।

এখনে দেখা যাউক (১) কৰ্ম কাহাকে বলে। (২) উহার উদ্দেশ্য কি। (৩) তিনগুণদ্বারা কিরূপে কৰ্ম কৃত হয়।

(১) কৰ্ম কাহাকে বলে—অতি সূক্ষ্মই হউক বা অতি শূন্যই হউক যে কোন স্পন্দন, চলন, কম্পন, বা গতিই কৰ্ম। অভীষ্ট বস্তুলাভে কোন বাধা থাকিলে ঐ বাধা অপনারণ জন্য কৰ্ম হইয়া থাকে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিষম্। বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবৈশ্চৈবাত্র পশ্যনম্ ॥ শরীর বাহুঃ স্নোভিযৎ কৰ্ম প্রভজতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পশ্যতে অসং হেতবঃ ॥’ ১৮।১৪।১৫

অর্থাৎ ‘মানুষ শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কোন ন্যায্য বা অন্যায় কৰ্ম করে উহাদের সকলের পাঁচটী কারণঃ—(১) অধিষ্ঠান (দেহ), (২) কৰ্ত্তা (কর্তৃত্ব বোধ) (৩) পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়গণ। (৪) প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা (৫) দৈবতার অনুগ্রহ। ইহাদের একটির অভাব হইলেও কৰ্ম হয় না। কৰ্ম করিতে গেলে শরীর চাই এবং শরীরে ‘আমি কৰ্ত্তা’ এইরূপ অভিমান চাই ইন্দ্রিয়গণ চাই, প্রাণাদি বায়ুর চেষ্টা চাই (বায়ুরোধ করিয়া সাধক সমাধিমগ্ন থাকিলে তাহার কৰ্ম হয় না।) ইন্দ্রিয়-দেবতাগণের অনুগ্রহও চাই। (দেবতা অর্থে দ্যুতিশীল বা প্রকাশশীল; দেবতাগণ রূপ রসাদি প্রকাশ করিয়া দিলে তবে উহাদের জন্য কৰ্ম হয়)।

‘অনিষ্টানিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্মণঃ ফলম্।

ভবতাত্যাগিনাং প্রেত্য নহন্ত সংন্যাসিনাং কচিৎ ॥’ গীতা-১৮।১২

অর্থাৎ ‘কৰ্মের ফল অনিষ্ট, ইষ্ট, ইষ্টানিষ্টমিশ্র। অস্তবাস্তিগণই মৃত্যুর পর এই ত্রিবিধ ফলভোগ করিয়া থাকে, জ্ঞানী সংন্যাসিগণের ঐ ফলভোগ হয় না’।

একমাত্র নির্বিকার চেতনাই কর্মশূন্য, তৎবাতীত সমস্তই কর্ম। শক্তি হইতেছে কর্মের অব্যক্ত বীজাবস্থা। শক্তিই পরিষ্কট হইয়া কর্ম নাম ধারণ করে। শূন্য কর্ম আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই : যেমন 'অব দৌড়িতেছে' এখানে অবের দৌড়ানরূপ কর্ম আমরা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু একখানি ইষ্টক স্থিরভাবে পড়িয়া আছে, উহার মধ্যেও কর্ম চলিতেছে, আমরা চক্ষুদ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, যেহেতু ঐ কর্ম অতি সূক্ষ্ম। বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া উহার অবধারণ করিতে হয়। ইষ্টকখানি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। ঐ অণু-পরমাণুগুলি একত্র সংহত (মিলিত) হইয়া ইষ্টক নাম ধারণ করিয়াছে। কাল-শক্তি ইষ্টকের উপর কাজ করিতেছে। মহাকালের শক্তি যে মহাকালী তিনি জগৎবৎসরূপ ভাঙবে মগ্না। তাহার নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও অব্যাহতি নাই। কালে ঐ ইষ্টকখানি ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে হইতে ধূলিকণারূপে পিণ্ডিত হইল। ইষ্টকখানির অণুপরমাণুগুলি পদার্থহীন ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে আগমন করিল—ইহাই হইল ইষ্টকখানির চূর্ণতারূপ পরিণামপ্রাপ্তি। আমাদের নজনের অন্তরালে প্রতিমুহূর্ত্তেই ইষ্টকখানির অণুপরমাণুর গতি বা স্পন্দন বা কর্ম হইয়াছে, কিন্তু উহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। জগতের প্রতিবস্তুই এমন কি ব্রহ্মলোকপর্যন্ত গতিশীল বা পরিণামশীল। কোন বস্তুই স্থির নাই, সকলেই ধাবমান : 'জগৎ' কথার অর্থই এই যে 'যাহা গমন করে'। সুতরাং জগৎ কর্মময়। জগতের প্রত্যেক বস্তু গতিশীল হইলেও আমরা দ্রুত গতিশীল বস্তুর অপেক্ষায় তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ধীরগতিবিশিষ্ট বস্তু-সকলকে স্থির মনে করি। এই স্থিরত্ব আপেক্ষিক মাত্র। একমাত্র স্থিরবস্তু আত্মা বা ব্রহ্ম। অটল, অচল, কূটস্থ* আত্মার তুলনায় সবই অস্থির,

* 'কূট' অর্থ কামারের নেহাই। নেহাই এর উপর কামার কত বিভিন্ন আকৃতির হাতা, বোঁড় ইত্যাদি গড়ে, নেহাই কিন্তু একরূপেই থাকে। এইরূপ আত্মার উপর প্রকৃতি নানা বিকারের সৃষ্টি করিলেও আত্মা নির্বিকার থাকেন। অথবা 'কূট' মানে গিরিশৃঙ্গ—অনেক মেঘাদির আঘাতেও

গতিশীল বা কর্মময়। কর্ম শারীর, বাচিক বা মানস যে প্রকারেরই হউক না কেন উহা স্পন্দন বা গতিযুক্ত। বাধা অতিক্রমের জন্যই স্পন্দন। বাধা অতিক্রম করিবার জন্য যে চেষ্টা, স্পন্দন বা গতি উহাই কর্মের স্বরূপ।

২ এই যে জগতের গতি বা স্পন্দন উহার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বলা যায়, ঐ গতি বা কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে পরমপদে স্থিতিলাভ। আত্মা বা ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ও অশ্বিতীয় সূতরাং আপ্তকাম ও আনন্দস্বরূপ। পূর্ণ আপ্তকাম বস্তুর স্পন্দন, গতি বা কর্ম কিসের জন্য হইবে? কিন্তু যে স্বরূপতঃ পূর্ণ ও অখণ্ড সে যখন অজ্ঞানপ্রভাবে যেন অপূর্ণ ও খণ্ড হইয়া যায়, যে আনন্দ স্বরূপ হইতে স্রুত, তাহারই পূর্ণতা লাভের জন্য, আনন্দলাভের জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহারই চঞ্চলতা, গতি বা কর্ম, স্বরূপস্থিতির জন্য। জীব সূর্য আনন্দস্বরূপে ফিরিতে চায়, কিন্তু সেই আনন্দ-প্রাপ্তি বিষয়ে জীবের অজ্ঞানই উহার বাধা, তাই জীব সেই বাধা অপসারণ জন্য, কর্ম করে। ঐ কর্মের ততক্ষণ নিবৃত্তি নাই যতক্ষণ স্রুতের উদয়ে অজ্ঞানরূপ বাধা অপসারিত হইয়া স্বরূপস্থিতি না হয়। এহলে ইহাও জানা আবশ্যক যে অজ্ঞান কখনও ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ আকৃত করিতে পারে না। উহা পারিলে জীবের আর কোনকালে স্বরূপে ফিরিবার উপায় থাকিত না। ঐশ্বিকালেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ জীবের নিকট সামান্যভাবে প্রকাশিত থাকে, কিন্তু বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে না।

৩) প্রকৃতিজাত তিন গুণবাহাই কর্ম কৃত হয়। প্রকৃষ্টিরূপে কর্ম করেন বলিয়া প্রকৃতির 'প্রকৃতি' এই নাম হইয়াছে। কর্ম শক্তির ব্যস্তাবস্থা। প্রকৃতির তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন মহাপ্রলয়। ঐ অবস্থায় সৃষ্টি বা কর্ম, বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে; দেখা যায় না। এই

গতিশীল এককর্ম থাকে। এইরূপে আত্মাও প্রকৃতির নানাপ্রকার চঞ্চলতার মধ্যে সর্বদা নির্বিকার। অথবা 'কূট' মানে মারা, বণ্ডনা, কূটিলতা প্রভৃতি—যিনি উহার মধ্যে নির্বিকারভাবে অবস্থিত তিনিই 'কূটস্থ'।

অব্যক্ত প্রকৃতিই মায়া বা অজ্ঞান । মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তিনি ঈশ্বর । ঈশ্বর শূন্যসত্ত্বপ্রধান বলিয়া মায়া তাহার দৃষ্টিকে অভিভূত করিতে পারে না । মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, তাহার বশ । ঈশ্বর ও মায়া উভয়েই অনাদি । ইহাদের কোনটীকে পৃথক্ভাবে দেখান যায় না । নিগূঢ় শূন্যচৈতন্যকে মায়ার অপেক্ষায় ঈশ্বর বলা হয় । জড় শক্তি বা মায়া ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত নিজে কোন কর্ম করিতে পারে না । শক্তিমান্ ঈশ্বর বীজ শক্তিকে ঈক্ষণ করিলে মায়ার গুণ-ক্ষোভ হয় অর্থাৎ সাম্য ভাঙ্গিয়া যায়, তিন গুণের বৈষম্য দেখা দেয় । তিন গুণের নানাপ্রকার বৈষম্য হইতে ক্রমশঃ নানাপ্রকার ভেদযুক্ত, অসংখ্য নাম-রূপশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হয় । ঈশ্বরের কটাক্ষপ্রেরিত হইয়া চৈতন্যের আলোকে চেতনবৎ হইয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জগৎরচনাকর্ম সম্পন্ন করেন । (সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) । জগৎ বলিতে বাহ্য কিছু বুঝায়, উহা ত্রিগুণের খেলা । সমস্ত কর্ম তিন গুণদ্বারা চলিতেছে । তিনগুণের কোন একটির অভাব হইলে কর্ম হয় না । তিন গুণের সাহায্যে কিরূপে কর্ম চলিতেছে, নিম্নে তাহা দেখান যাইতেছে :—

মনে করুন ‘ঘট’ নামক একটি বস্তু রহিয়াছে । সত্ত্বগুণ প্রকাশ করিয়া দিল—‘ইহা ঘট, জলধারণ করে, ইহা প্রয়োজনীয়’ ইত্যাদি । রজোগুণ ঘটপ্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিল । তমোগুণ আলস্যাদি আনিয়া ঘটলাভবিষয়ে বাধা উপস্থাপন করিল । সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল । ক্রমশঃ যখন রজোগুণের প্রাবল্য হইল, তখন আলস্য, শরীরের গুরুত্ব প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করিয়া ঘটপ্রাপ্তির জন্য শরীরের হুল কর্ম দেখা গেল । গীতায় বলা হইয়াছে—“জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা । করণং কর্ম কর্তৃণি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ” (১৮:১৮) অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক এবং ইন্দ্রিয়াদি করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি কর্মের আশ্রয় ।’

আবার দেখুন একটি অঙ্কুর বীজের মধ্যে অব্যক্তভাবে লুকাইয়া আছে ।

পূর্ণ পূর্ণ সংস্কারবশতঃ উহার অঙ্কুররূপে ফুটিবার জন্য সতত চেষ্টা আছে—
উহা রজঃশক্তি। একটি আবরণ বা তমঃশক্তি উহাকে অঙ্কুররূপে প্রকাশ হইতে
বাধা দিতেছে। সুতরাং রজঃ তমঃশক্তির মধ্যে যুদ্ধ বা কর্ম চলিতেছে।
সকলগুণের প্রকাশ মূলে থাকিয়া এই দুই গুণকে সাহায্য করিতেছে। কালে
রজঃশক্তি প্রবল হইয়া তমঃশক্তিরূপা বাধাকে সরাইয়া দিল, তখন অঙ্কুর
ফুটিয়া উঠিল। তমোগুণরূপ বাধাকে অপসারণের যে চেষ্টা এবং বাধা সরাইয়া
বীজান্বিত অণুপরিমাণগুণের এই যে অঙ্কুররূপে আগমন ইহাই কর্ম। মূলে
অব্যক্ত শক্তি, পরে প্রবৃত্তিরূপা সূক্ষ্ম কর্ম, পরে স্ফুল্লরূপে বর্মের অভিব্যক্তি।

পূর্বে যে ইষ্টকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, উহাতে যে শক্তি ইষ্টকখানিকে
প্রকাশ করিতেছে উহা সত্ত্ব। যে শক্তি উহাকে বিশীর্ণ করিতে চাহিতেছে
উহা ত্রিয়ারূপ রজঃ। যে শক্তি ইষ্টকের অণুপরিমাণগুণকে ধরিয়া রাখিয়া
ইষ্টকখানিকে স্থিত রাখিতে চায়, উহা স্থিতিশক্তিরূপ তমঃ। এই প্রকাশ-
শক্তি, ত্রিয়ারক্তি এবং স্থিতিশক্তিস্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণস্বারা সমস্ত
সৃষ্টিব্যাপার চলিতেছে ও যাবতীয় কর্ম নিঃপন্ন হইতেছে।

ভগবান্ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে এই তিন গুণের পরিচয় দিয়াছেন এবং
এক এক গুণের প্রাধান্যবশতঃ জীবের কিরূপ গতি হয়, তাহা দেখাইয়াছেন
এবং ঐ অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন।
সপ্তদশ অধ্যায়ের জীবের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রধানদ্বারা পূজা, আহার
যজ্ঞ, তপঃ প্রভৃতিও যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয় উহা দেখাইয়াছেন।
আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ২০ শ্লোক হইতে ৫৯ শ্লোক পর্য্যন্ত, গুণভেদে জ্ঞান,
কর্ম, কল্যাণ, বৃত্তি, ধর্ম, সত্য প্রভৃতিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয় উহা
দেখাইয়াছেন।

যদিও আত্মার কোন কর্ম নাই, আত্মা প্রকৃতি বা উহার বিকারসমূহের
নির্বিকার দ্রষ্টামাত্র, তথাপি অজ্ঞানপ্রভাবে আত্মা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির
বিকার বৃত্তির সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলেন এবং উহার সহিত যেন একী-

ভাব প্রাপ্ত হইলেন। অব্যবহৃতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের এই যে একতা-প্রাপ্তির ন্যায় ভাব উহাই ‘অস্মিতা’ বা সূক্ষ্ম অহংকার বা চিহ্নজড়-গ্রন্থি বা জীবভাব। ‘দৃগদর্শন-শক্ত্যারেক্যাত্তেবাস্মিতা’—পতঞ্জলি—সাধনপাদ ৬ সূত্র। অর্থাৎ ‘দৃকশক্তি বা পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি এই দুইটীকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে করার নাম ‘অস্মিতা’। ঐ অস্মিতা বা সূক্ষ্ম অহংকার হইতে পরে স্থূল অহংকার (নির্দিষ্ট দেহ, মন, বুদ্ধি, স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদিতে স্পষ্ট ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাব) ফুটিয়া উঠে। অহংকারের গন্ডীর মধ্যে পড়িয়া বিমূঢ় আত্মা বা জীব স্বীয় কৰ্ত্তৃত্বশূন্য নিষিদ্ধকর অসঙ্গ স্বরূপটী সামান্যভাবে দেখিয়াও স্পষ্টভাবে দেখিতে পান না। তখন অহংকারবিমূঢ় সেই আত্মা প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-স্বারা কৃত কৰ্মসকলকে নিজের কৰ্ম মনে করেন এবং নিজেকে ঐ সকল কৰ্মের কৰ্ত্তা ভাবিয়া ঐ কৰ্মসকলের ফল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন। ভগবান্ অষ্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ইহাদিগকে দৃশ্মতি বলিয়াছেন এবং ১৭ শ্লোকে “যস্য নাহং-কৃতো ভাবো বুদ্ধিষসো ন লিপ্যতে” অর্থাৎ ‘যাঁহার অহংকার নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে সূক্ষ্মতাকে তাহা দেখাইয়াছেন।

— — —

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম

কর্মণোহ্যপি বোধব্যং বোধব্যং বিকর্মণঃ

অকর্মণ্যং বোধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ৪ ১৭

অর্থাৎ ‘কর্মের গতি গহন, সেইজন্য, কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব জানা আবশ্যক’।

কর্মের গতি অতি গহন, উহা বদ্বিয়া উঠা শক্ত। অজ্ঞান বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া মোহবশে যদুশ গদরু ও আত্মীয়গণকে বধ করা পাপজনক কাৰ্য বলিয়া ঠিক করিলেন। সাধারণবুদ্ধিতে অজ্ঞানের ঐ প্রকার নির্ণয়কে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন—“অথ চেৎ ত্বমিমাং ধর্ম্যাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ শ্বশর্মং কীর্তিষ্ঠ হি ত্বা পাপমবাশ্যসি” ॥ গীতা ২।৩৩ অর্থাৎ ‘যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তোমার শ্বশর্ম ও কীর্তি নষ্ট হইবে এবং তোমার পাপ হইবে’। অতএব শাস্ত্রবিহিত কর্মের, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিকর্মের এবং তদ্ব্যবস্থার অবলম্বনরূপ অকর্মের তত্ত্ব জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ দেহাদির চেষ্টাকে কর্ম বলে এবং দেহাদিকে কোন কর্ম না করাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাকে অকর্ম বলে। কিন্তু কর্ম ও অকর্মের এই সংজ্ঞা সর্বত্র খাটে না। কারণ, অনেক স্থলে শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিয়াও উহা অকর্ম বা বিকর্মের তুল্য হয়, বিকর্মও কর্মরূপে পরিগণিত হয়। আবার অকর্মও কর্ম বা বিকর্মের তুল্য হয়। মনে করুন আপনি যজ্ঞ করিতেছেন, কিন্তু শ্রমশূন্য হইয়া যদি যজ্ঞ করা হয়, তবে মন্ত্র উচ্চারণ ও আহুতিপ্রদান করিলেও ঐ কর্ম অকর্মের তুল্য হইবে। আবার দত্তদ্বারা পূজা, দানাদি করিলে এইরূপ কর্ম বিকর্ম হইবে, উহার ফল বন্ধন। আবার হিংসা একটী বিকর্ম, কিন্তু কঠোর পক্ষে ধর্মযুদ্ধে অথবা যজ্ঞে পশুবধাদি কার্যে পাপের সঞ্চার

না হইয়া পড়াই হয়, সুতরাং উহা কর্ম। আবার আমার সামর্থ্য আছে, কিন্তু আন্তর্য্যায় কাৰ্য্যে অবহেলা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমার এই অকর্ম বিকর্মেরই তুল্য। সুতরাং কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব শাস্ত্র দেখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

‘‘তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যবাবিস্থিতৌ’’। গীতা ১৬।২৪। অর্থাৎ ‘হে অঙ্গদর্শন! কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য নির্ণয়বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ’।

কর্ম, অকর্ম ও অকর্মের কর্মদর্শন

‘‘কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎসনকর্মকৃৎ ॥ গীতা ৪।৮

অর্থাৎ ‘যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মদর্শন করেন, তিনি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যুক্ত এবং কৃৎসনকর্মকৃৎ’ (সমগ্রকর্মের অনুষ্ঠানকারী)।

প্রকৃতির মধ্যেই কর্ম আছে, আত্মাতে কোন কর্ম নাই। জ্ঞানী প্রকৃতি-পদার্থের বিবেকবারা আত্মাকেই স্বীয় স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তিনি জানেন প্রকৃতি বা কর্ম মিথ্যা। সুতরাং* প্রারম্ভবশতঃ কর্ম করিলেও ‘‘গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সংজতে’’। গীতা ৩।২৮। অর্থাৎ ‘গুণ ও কর্ম

* কর্ম তিন প্রকার :—[১] সঞ্চিত [২] প্রারম্ভ [৩] ক্রিয়মাণ।

[১] সঞ্চিত কর্ম—অনেক বা অতীত জন্ম হইতে যে কর্ম সঞ্চিত আছে।

[২] প্রারম্ভ কর্ম—অনেক সঞ্চিত কর্মের মধ্যে পরিপক্ব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছামত এই বর্ত্তমান দেহের আরম্ভক যে সকল কর্ম।

ক্রিয়মাণ কর্ম—জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ও পরে এই বর্ত্তমানদেহে যত্নকাল পর্য্যন্ত যে কর্ম, তাহাই ক্রিয়মাণ কর্ম। জ্ঞানের উদয়মাত্রই সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম নাশ ও নিবীজতা প্রাপ্ত হয়। ভোগদ্বারা প্রারম্ভ কর্মের ক্রমশঃ নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানী ঐ ভোগকে মিথ্যা বলিয়া জানেন। সমাহিত ও দৃঢ় জ্ঞানী আত্মানন্দে বিভোর থাকায় ঐ প্রারম্ভ কর্ম বা উহার ফল তাহার লক্ষ্যই হয় না, সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে প্রারম্ভ নাই।

প্রারম্ভ তিন প্রকার :—[১] ইচ্ছা প্রারম্ভ—কুপথ্য সেবনে রোগ বৃদ্ধি পাইবে ইহা জানিলেও রোগীর পূর্বসংস্কারবশতঃ কুপথ্য সেবনে ইচ্ছা হয়—এই প্রকার প্রারম্ভ ইচ্ছা-প্রারম্ভ। [২] অনিচ্ছা প্রারম্ভ—অনিচ্ছা সংস্কার পূর্বস্বভাব প্রেরিত হইয়া যে কর্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়। [৩] পরেচ্ছা প্রারম্ভ—নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকিলেও অন্যের প্রেরণায় যে কর্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়।

প্রকৃতির মতো আছে, আত্মার সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা জানিয়া তিনি কর্মে চিত্ত হন না। জ্ঞানীর কর্ম যে অকর্মস্বরূপ তাহা নিম্নলিখিত ভগবদ্ বাক্যসকল হইতে বুঝা যায়।

“তাং না কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥” ৪।২০ (গীতা)

অর্থাৎ ‘জ্ঞানী কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, নিজানন্দে তৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া কর্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না।

“নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মনোত ততর্দবিৎ ।

পশ্যান্ শব্দান্ স্পর্শান্ জিহ্বাস্পর্শান্ গচ্ছান্ স্বপন্থং স্বসন্থং ॥” গীতা ৫।৮

অর্থাৎ ‘যুক্ত ততর্দবিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন নিঃশ্বাসগ্রহণ ইত্যাদি করিয়াও মনে করেন, ‘আমি কিছুই করি না।’ সুতরাং জ্ঞানী কর্মে অকর্ম দর্শন করেন। আবার জ্ঞানী ইহাও জানেন যে চূপ করিয়া বসিয়া থাকাই নৈকর্ম্য বা সংন্যাস নয়। যদি অহংকার দূর না হইয়া থাকে তবে ঐ প্রকার অকর্ম জ্ঞানী কর্মই দেখেন। জ্ঞানী দেখেন অস্ত্র ব্যস্তির কর্মত্যাগ করার কোন দাম নাই। একদিন প্রকৃতিবশে উহাকে কর্ম করিতেই হইবে। সেই জন্য অজ্ঞানের তাত্ক্ষণিক নৈকর্ম্য ভগবান্ কর্মই দেখিতে পাইলেন এবং উহাকে কর্মস্বিকারী জানিয়া কর্ম করিতে উপদেশ দিলেন। হেতু দেখাইলেন ‘স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্মণা । কস্তং নৈচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যবশোহপি তৎ ॥’ গীতা ১৮।৬০

অর্থাৎ ‘হে কৌন্তেয় ! মোহবশতঃ যাহা এখন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, স্বভাবজাত নিজ কর্মে আবদ্ধ থাকায় পরে অবশ্যভাবেই তোমাকে উহা করিতে হইবে।

ততর্দবিৎ পুরুষই কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করিতে পারেন। তিনি কৃৎসনকর্মকৃৎ। যেহেতু যে আত্মজ্ঞানে সম্বন্ধের পরিসমাপ্তি হয়, সেই আত্মজ্ঞানই তাঁহার লাভ হইয়াছে।

সৃষ্টি-তত্ত্ব

মহাভূতান্যাহংকারো বৃন্দধরব্যাক্তম্বেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকশ পশু চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা দেহঃ সূক্ষ্মং সংঘাতচেতনা ধূতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ গীতা—১৩।৫।৬

অর্থাৎ 'পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, ঐশ্বর্য, ব্যোম) উহাদের কারণ অহংকার, বৃন্দধ, অব্যাক্তপ্রকৃতি—দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচটি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় (শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), ইচ্ছা, দেহ, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, সংঘাত (দেহ), চেতনা ও ধূতি—এই সবিকার ক্ষেত্রের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইল ।'

পরিপূর্ণ শূন্যচেতন্যে বা নিগূঢ়রূপে সৃষ্টি নাই । অনাদি অজ্ঞান, মায়া বা প্রকৃতি জীবের মোহ উৎপাদন করিয়া এক রূপকেই বহুরূপে প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, উহাই সৃষ্টি । চেতন্যাবিশিষ্টত প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টি কিতার করেন উহা দেখান হইতেছে । শ্রুতিতে যে সৃষ্টির বর্ণনা আছে, সৃষ্টি সত্য, ইহা প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য নাই । সৃষ্টিবাসনাবাসিত অজ্ঞ জীবকে সৃষ্টিবর্ণনার মধ্য দিয়া সৃষ্টির অবিষ্টানস্বরূপ চেতন্যে লক্ষ্য করানই উহার তাৎপর্য্য । ইহা তটস্থলক্ষণে স্বাক্ষের ইঙ্গিতপ্রদান । সৃষ্টি মিথ্যা হওয়ায় সৃষ্টি-বর্ণনায় শ্রুতির আদর নাই, সেইজন্য বিভিন্ন শ্রুতিতে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টিক্রম দেখা যায় ।

অব্যাক্ত মূল প্রকৃতি—ব্যাক্ত এই বিশ্বের মূল কারণ একটী অব্যাক্ত শক্তি । বেদান্ত উহার নাম দেন মায়া বা অজ্ঞান, সাংখ্য ইহাকে বলেন সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা মূলপ্রকৃতি । গুণত্রয়ের বৈষম্যে সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয় । মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ এক অব্যাক্ত কারণে লীন হয় । ঐ কালে দৃষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিপটী থাকে না । কিন্তু দৃষ্টার দৃষ্টের তখনও

লোপ হয় না, কেবল তৃতীয় না থাকায় দৃষ্টা আপনা হইতে ভিন্ন কাহাকেও দেখিতে পান না। এখানে যে 'দৃষ্টার দৃষ্টি' বলা হইল উহা 'রাহুর শির' এই বাক্যের ন্যায় ব্যাবহারিক মাত্র। রাহুর শির ভিন্ন অন্য অর্থ নাই। সুতরাং রাহু বলিলেই শিরকে বুঝায়। রাহু ও শির একই বস্তু। এইরূপ দৃষ্টা ও দৃষ্টি একই বস্তু। প্রলয়কালীন ত্রিপটী-বর্জিত অবস্থা যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনি প্রকৃতির অপেক্ষায় নিত্যমুক্ত ঈশ্বর। সৃষ্টি-কালেও ইনি প্রত্যেক সৃষ্টি-পদার্থে নিত্যমুক্ত সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছেন। নিম্নলিখিত চিদাকাশের এককোণে মায়া-মেঘ উঠিলে, যে চৈতন্য অন্তরে শূন্য, বৃক্ষ ও মূল্য-স্বরূপে থাকিয়াও সেই মায়াকে বশে রাখিয়া বাহিরে উহাদ্বারা জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচনা করেন, তাহাকে 'অন্তঃ'গামী ঈশ্বর' এই আখ্যা প্রদান করা হয়। চৈতন্য যখন মায়া-সম্পর্কহীন তখন তাহাকে নিগূঢ়রূপে বলা হয়। বেদান্ত বলেন, মায়া সম্পর্কহীন ঈশ্বরের অচিন্ত্য রচনা-শক্তি, ইহা সত্যসংকল্প ঈশ্বরের সংকল্পমাত্র। সংকল্পকর্তা ব্যতীত সংকল্পের পৃথক্ সত্তা নাই। সেইজন্য উহা মিথ্যা বা তদ্ভেদঃ নাই। সৃষ্টি-ব্যাপার জীবের অনাদি অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত ভাব মাত্র। অব্যক্ত প্রকৃতির ধারণা করিতে হইলে স্বীয় স্মৃতিপূর ধারণা করিতে হয়।

মহত্ত্ব—মহৎ-তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতির আদ্যাবিকার। মহাপ্রলয়ে কস্ম'বাসনা লইয়া জীবগণ অজ্ঞানে লীন থাকে। জীবগণের কস্ম'সকল ফলদানে উন্মুখ হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি ইচ্ছা হয় তখন তিনি আপনার মায়াশক্তিকে ঈক্ষণ করেন। মণির বলক যেমন স্বাভাবিক, এই ভগবদীক্ষণও সেইরূপ স্বাভাবিক ইহা ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি করণের উপর নির্ভর করে না।

'ন তস্য কায্য'ং করণং বিদ্যাতে, ন তং সমস্তাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাসাধ্যশক্তিবিবিশেষ, শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'। শ্বেতাস্ব তর—৩।৮। ভগবানের ঈক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে গুণক্ষোভ হয়। প্রথমে সাতিশয় শূন্য সমষ্টি সত্ত্বগুণের প্রাকল্য হয়। প্রকৃতির এই সত্ত্বপ্রধান

অবস্থার নাম ‘মহত্ত্ব’। ইহা প্রপঞ্চজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ। ইহা স্বরূপ-প্রকাশ নাহে, স্বরূপাভাস। মহত্ত্বের উপহিত যে চৈতন্য, তিনি যখন মহত্ত্বের সহিত একাকারভাব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে ‘হিরণ্যগভ’ বলা হয়। ঈশ্বর হিরণ্যগভকে স্বশরীর হইতে প্রকৃতিরূপ ক্ষেপে নিষ্ক্ষেপ করেন। ঐ প্রকৃতি চৈতন্য পুরুষের বীৰ্য্য ধারণ করিয়া চৈতন্যাদীপ্তা হইয়া আদিজীব হিরণ্যগভকে প্রসব করেন। হিরণ্যগভ সমষ্টি বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়-কোষে অহংঅভিমান-বিশিষ্ট এবং সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াক্রান্তিমান। ইনিই ‘সদ্রাত্না’—পটে সূত্র যেমন সৰ্ব্বত্র অনুসূত, ইনিও সেইরূপ জগতের সৰ্ব্বত্র অনুসূত। ‘সদ্রাত্না সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সৰ্ব্বজীবঘনাত্মকঃ। সৰ্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়া জ্ঞানাদি শক্তিমান্।’ পঞ্চদশী—চিদ্রদীপ ২০০। ইনিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। ঈশ্বরের কটাক্ষপ্রেরিত হইয়া ইনিই জগৎসৃষ্টি করেন। রাত্রির অন্ধকার কাটিবার সময় প্রত্যুষে যেমন বৃক্ষ, পর্বতাদি অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ হিরণ্যগভবিক্কার জগৎ অতি অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, ভেদ তখনও স্পষ্ট হয় না। হিরণ্যগভবিক্কার সৃষ্টির সূক্ষ্ম রেখাপাত হইতে থাকে। ঈশ্বরভাব হইতে এই যে হিরণ্যগভ-ভাবে আগমন, ইহা স্বাভাবিক অবদ্বিধিপর্ষক সৃষ্টি। হিরণ্যগভে আসিলে একটা সৰ্বব্যাপক প্রকাশের উদয় হয়।

অসৃষ্ট অবস্থা হইতে জীবের যে ব্যষ্টিবৃদ্ধি জাগরিত হয়, উহার মূলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকে, অহংকারপর্ষক ঐ জাগরণ সম্ভব হয় না। বৃদ্ধি ব্যষ্টিভাব লাভ করিবার পূর্বে মহত্ত্ব, সমষ্টি অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চভূততত্ত্ব (সূক্ষ্ম) প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে অতিক্রম করে। সূচীর শতপত্রভেদের ন্যায় জীব ঐ তত্ত্বগুলিকে পর পর অতিক্রম করিলেও এত দ্রুত অতিক্রম করে যে, সে উহাদের ধারণা করিতে পারে না। ধারণা করিতে না পারার কারণ বৃদ্ধির জাড়া। শূন্যচিত্ত যোগিগণ সমাধি-অভ্যাসকালে সূক্ষ্মবৃদ্ধির দ্বারা ঐ তত্ত্বগুলি অনুভব করেন। ব্যষ্টিভাব সমষ্টিভাবব্যতীত সত্ত্বালাভ করে না। সমষ্টিভাব সামান্য ও ব্যাপক, ব্যষ্টিভাব বিশেষ ও খণ্ড। সৃষ্টিকালীন অজ্ঞানে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাব উভয়ই লীন থাকে।

সমষ্টিভাব ব্যষ্টিভাবে আসিয়া সামান্যাকার ত্যাগ করিয়া বিশেষাকার ধারণ করে। সমষ্টি সূক্ষ্মদেহাভিমান যখনই উদ্ভিত হয়, ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহাভিমান তখনই উহার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করে, উহা ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়। ৩) অহংকার— অহংকার মহত্ত্বের বিকার। অহংকারতত্ত্ব তমঃপ্রধান। প্রকৃতি আরও বহির্মুখে স্পন্দিতা হইলে মহত্ত্ব হইতে সমষ্টি অহংকারের উদয় হয়। মহত্ত্বলুপ্তিতে অহংভাব অতি অস্পষ্ট। অহংতত্ত্বে ইহা কতকটা স্পষ্ট হয়। সমষ্টি অহংকার যখনই উদ্ভিত হয়, তখনই ব্যষ্টি অহংকারসকল উহার মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করে, উহারা পরে স্পষ্ট হয়। সেইজন্য অহংভাবের উদয়ের পরই ‘বহু স্যাম্,’ ‘বহু হইব’ এই ইচ্ছা ফুটিয়া উঠে। এইরূপে ব্যষ্টি অহংকারবিশিষ্ট ভোগকর্তা জীবগণ সমষ্টি অহংকার হইতে বিশেষ বিশেষ সত্তা লাভ করিয়া ভোগ করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু উহারা ইন্দ্রিয়াদি ভোগের করণসকল এবং ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্য বস্তুসকল ব্যতীত ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চতমাত্র হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি—ভোগকর্তা জীবের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমষ্টি অহংকার হইতে ১) আকাশ (২) বায়ু (৩) তেজ (৪) জল ও ৫) ক্রিতি এই পঞ্চতমাত্রের বা পঞ্চসূক্ষ্মভূতেষু উৎপত্তি হয়। তমাত্রগুণি সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র। যে শক্তিযারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে মানিতে পারা যায়, সেই শক্তিগুণিই তমাত্র। উহারা মূলে একটী শক্তি, উহাই অজ্ঞান। তমাত্রগুণি সেই অজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। বিষয়গুণি অপেক্ষা তমাত্রগুণি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক।

আকাশের গুণ—শব্দ।

বায়ুর গুণ—শব্দ + স্পর্শ।

তেজের গুণ—শব্দ + স্পর্শ + রূপ।

জলের গুণ—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস।

ক্রিতির গুণ—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস + গন্ধ।

আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্র তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া উহাদের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু সত্ত্ব ও রজঃ গুণও থাকে।

আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে শ্রোত্রোন্মেষের উৎপত্তি, উহার দেবতা দিক্।

আকাশের রজোগুণ হইতে বাণীন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, উহার দেবতা অগ্নি।

বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্বর্গীন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, উহার দেবতা বায়ু।

বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পানির উৎপত্তি, উহার দেবতা ইন্দ্র।

তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুর উৎপত্তি, উহার দেবতা সূর্য্য।

তেজের রজোহংশ হইতে পাদের উৎপত্তি, উহার দেবতা বামন।

জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বার উৎপত্তি, উহার দেবতা বরুণ।

জলের রজোহংশ হইতে উপস্থের উৎপত্তি, উহার দেবতা প্রজাপতি।

ক্ষিতির সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, উহার দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

ক্ষিতির রজোহংশ হইতে পায়ুর উৎপত্তি, উহার দেবতা যম।

আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সত্ত্বগুণ-সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়।

অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চারি প্রকার :—(১) মন, (২) বুদ্ধি (৩) চিত্ত (৪) অহংকার।

মনের কার্য্য সঙ্কল্প- বিকল্প, বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়, চিত্তের চিন্তন, অহংকারের 'অহংপনা'।

মনের দেবতা চন্দ্রমা, বুদ্ধির দেবতা রক্ষা, চিত্তের দেবতা বাসুদেব, অহংকারের দেবতা রুদ্র। পঞ্চতন্মাত্রের রজোগুণসমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার :—(১) প্রাণ (২) অপান (৩) সমান (৪) উদান (৫) ব্যান। প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়, ইহা দিবারাত্রিতে ২১,৬০০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে ইহার কার্য্য বহিন্‌য়ন (বাহিরে লইয়া যাওয়া)। অপানবায়ুর স্থান গৃহ্যদেশ। ইহা অধোগমনশীল; মল মূত্রাদি ত্যাগ ইহার কার্য্য। সমানবায়ুর স্থান নাভিদেশ—ভুক্ত অন্নের রস নির্গত করিয়া নাড়ীদ্বারা সংবশরীরে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইহার কার্য্য। আরও ইহা প্রাণ ও অপান বায়ুর সাম্য রক্ষা করে। মৃত্যুর সময় নাড়ীস্থ সমানবায়ু দুর্বল হইয়া পড়ে

সুতরাং প্রাণ ও অপানের সমতা রক্ষা করিতে না পারায় প্রাণের উৎক্রান্তি হয়। উদানবায়ুর স্থান কণ্ঠ,—ভুক্ত, পীত, অন্ন জল বিভাগ করিয়া দেওয়া ইহার কার্য্য; ইহা উর্ধ্বগমনশীল। ব্যানবায়ু সর্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকে—ইহার কার্য্য আকৃণ্ণন, প্রসারণ প্রভৃতি।

এইরূপে সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ হইতে ইন্দ্রিয়াদি ভোগকরণবিশিষ্ট ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহ-সকল ছুটিয়া উঠিল। ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্যকে তৈঃস কহে। তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে জাত আকাশাদি পঞ্চ-তত্ত্বাত্মের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে জীবের মন, বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ব্যষ্টি বুদ্ধি যদিও সাত্ত্বিক, তথাপি সেই সত্ত্ব মলিন সেইজন্য উহা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের যে সমষ্টিবুদ্ধি উহাতে সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক নৈশ্চল্যহেতু উহা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে না।

ভোগায়তন দেহের ও ভোগ্যবস্তুর উৎপত্তি—সূক্ষ্মদেহসকল উৎপন্ন হইলেও ভোগায়তন স্থূলশরীর ও ভোগ্য বস্তুসকল ব্যতীত ভোগ সম্ভব হয় না। সেইজন্য ঈশ্বরস্বর্গে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বাত্মের তমঃ অংশের পণ্টীকরণদ্বারা স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হইল। পরে উহারা ঈশ্বরনিয়তিবশে পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলদেহসকল উৎপন্ন করিল। সমষ্টি স্থূলদেহে যে চৈতন্য অভিমান করিলেন, তাহার নাম হইল 'বিরাট'। ব্যষ্টি স্থূলদেহে যে চৈতন্য অভিমান করিলেন, তাহার নাম হইল 'বিশ্ব'। ব্রহ্মাণ্ডই বিরাট্, পুরুষের দেহ। সেই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন বা লোক অবস্থিত। উর্ধ্ব সপ্তলোক এবং অধঃ সপ্তলোক। উর্ধ্ব সপ্তলোক—(১) সত্য (২) তপঃ (৩) জন (৪) মহঃ (৫) মরু (৬) ভূবঃ (৭) ভূঃ। অধঃ সপ্তলোক—(১) অতল (২) বিতল (৩) সূতল (৪) রসাতল (৫) তলাতল (৬) মহাতল (৭) পাতাল। ব্যষ্টিদেহের চতুর্বিধ শরীরঃ—(১) ছরায়ুজ মনুষ্যাদি। (২) অণ্ডজ—পক্ষী আদি। (৩) শুভ্রজ—ক্রিমিকীটাদি (৪) উভিজ—বৃক্ষাদি।

পঞ্চীকরণ প্রণালী

স্বক্ষুভূত বা তন্মাত্র

	স্থূল	আকাশ	—বায়ু	—তেজ	—জল	ক্ষিতি
(১) আকাশ		= ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০
(২) বায়ু		= ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০
(৩) তেজ		= ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০
(৪) জল		= ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০
(৫) ক্ষিতি		= ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০	+ ১০

পঞ্চমহাভূতের বা স্থূল পঞ্চভূতের ২৫টি তত্ত্ব

- (১) আকাশ—শোক ১০ কাম ১০ ক্রোধ ১০ মোহ ১০ ভয় ১০
 (২) বায়ু —প্রসারণ ১০ ধাবন ১০ বলন ১০ চলন ১০ আকৃণন ১০
 (৩) তেজ —নিদ্রা ১০ তৃষ্ণা ১০ ক্ষুধা ১০ ক্রান্তি ১০ আলস্য ১০
 (৪) জল —লালা ১০ স্বেদ ১০ মূত্র ১০ শূক্রে ১০ শোণিত ১০
 (৫) ক্ষিতি —রোম ১০ ত্বক ১০ নাড়ী ১০ মাংস ১০ অস্থি ১০

স্থূলস্বক্ষুদীভেদে ঈশ্বর ও জীবের তিন শরীর ।

কারণশরীর বা স্বক্ষুশরীর বা জিজ্ঞানময় স্থূলশরীর বা
 আনন্দময়কোষ মনোময় ও প্রাণময় কোষ অন্তরময়কোষ

- (১) ঈশ্বর, অন্তর্যামী (মুক্ত)—হিরণ্যগর্ভ —বিরাট—(সমষ্টি) ।
 (২) জীব, প্রাক্ত (বদ্ধ) —তৈজস —বিশ্ব—(বাষ্টি) ।

শঙ্কা=যাহা মিথ্যা, তাহার ব্যাখ্যা কিসের জন্য ?

উত্তর—মিথ্যার দ্বারাই মিথ্যার নাশ হয় । যেমন স্বপ্নের মিথ্যা দণ্ড, ভয় প্রভৃতি জাগরণ আনিয়া দেয় । যে রূপ যক্ষ, তাহার উপহারও তেমনই । স্বপ্নের যে দারিদ্র, স্বপ্নের যে ক্ষুধা, উহা জাগ্রৎকালের ধন বা খাদ্য দ্বারা নিবারিত হয় না । স্বপ্নের মিথ্যা ধন এবং খাদ্যদ্বারা উহার নিবারণ হয় । এইরূপ এই যে মিথ্যা সৃষ্টির স্বপ্ন আমরা দেখিতেছি, উহা মিথ্যা বেদ ও মিথ্যা গদ্যের কপায় এবং মিথ্যা সৃষ্টি-আদির মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয় ।

শব্দশক্তি ও সৃষ্টি

“ঐমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাহরন্যামনুস্মরনং,

যঃ প্রয়াতি ত্যজনং দেহং স য়াতি পরমাং গতিম্” ॥ গীতা ৮।১৩

অর্থাৎ ‘ও’ এই ব্রহ্মগাচক একাক্ষর শব্দকে উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

শব্দের শক্তি অসীম। জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর শব্দাঙ্কিকা বাগ্‌দেবীকে স্মার করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ বীজমধ্যে বৃক্ষবৎ ভগবানের অব্যক্ত কারণশরীরে লীন থাকে—ইহা মহাপ্রলয়াবস্থা। তখন না তেজঃ না অশকার, এই অবস্থা বাক্যমনের অগোচর। ঈশ্বরের সংকল্পপ্রভাবে যখন সেই অব্যক্ত বা অব্যাক্ত অবস্থা নামরূপদ্বারা অভিযান্ত্রি লাভ করে, তখন তাহাকে সৃষ্টি বলে। সংকল্প স্পন্দন বা কল্পন ব্যতীত সম্ভব হয় না, আবার স্পন্দন হইলেই উহার অন্য শব্দও উঠিবে। অবশ্য স্পন্দন যত সূক্ষ্ম, শব্দও তদনুযায়ী সূক্ষ্ম হইবে। স্পন্দন ব্যতীত সংকল্প হয় না, আবার শব্দ-ব্যতীত স্পন্দনও সম্ভব নয়। সুতরাং শব্দ-ব্যতীত কোন সংকল্প করা যায় না।

শব্দের চারিটি অক্‌শা :—(১) বৈখরী (২) মধ্যমা (৩) পশ্যন্তী ও (৪) পরা।

(১) বৈখরী—যে শব্দ উচ্চারিত হইতে অপরে শুনিতে পায়, যাহা অর্থ প্রত্যয় করিতে খর বা তীক্ষ্ণ, উহা বৈখরী বাক্ বা শব্দ।

(২) মধ্যমা—মধ্যমাবাক্ বৈখরী অপেক্ষা সূক্ষ্ম। যখন আমরা ধ্যান করি, সংকল্প করি, তখন মনে মনে সূক্ষ্মভাবে কথাই বলি, কিন্তু আমাদের সেই বাক্, অপরে শুনিতে পায় না—ইহাই মধ্যমা বাক্।

(৩) পশ্যন্তী—পশ্যন্তীবাক্ মধ্যমা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম । বাকের পশ্যন্তীদশায় শব্দ অর্থপ্রপঞ্চে প্রবৃত্ত হয় এবং বর্ণময়ী দেবতার আবির্ভাব হয় । ঋষিগণ সমাধি-
দ্বারা একাগ্রচিত্ত ও বাহ্যাবিস্মৃত হইয়া বাকের পশ্যন্তীদশায় বীজমন্ত্রসকল এবং
উহা হইতে আবির্ভূত দেবভাসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহার
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । যেমন ওঁকার মন্ত্রের ঋষি রুদ্রা, গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র ইত্যাদি ।

(৪) পরা—পরাবাক্ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম । সচিদানন্দ পরমেশ্বরে যখন মণির
কলকের ন্যায় স্বভাবতঃ সৃষ্টি-স্পন্দন ভাসে, তখন তাহা হইতে উৎখিত যে অতি
সূক্ষ্ম শব্দ, উহাই পরাবাক্ । ইহা আন্তরপ্রণব বিদ্যুৎ ।

যেমন কোন পদ্ব্যকিরণীতে লোষ্ট্র নিষ্ক্ষেপ করিলে প্রথমে জলে বিদ্যুৎরূপে
একটি স্পন্দন উঠিয়া উহাই স্পন্দিত হইতে হইতে পদ্ব্যকিরণীটিকে ব্যাপ্ত করিয়া
ফেলে, সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক স্পন্দনও চৈতন্যমূর্ত্তে অতি সূক্ষ্মাকারে বিদ্যুৎরূপে
উদ্ভিত হইয়া ঐ স্পন্দন বর্ণিত হইতে হইতে নামরূপাত্মক জগতের আকার ধারণ
করে ।

শব্দ হইতে যে সৃষ্টি হয়, ইহা মাণ্ডুক্য এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও পাওয়া যায় ।
মাণ্ডুক্য বলেন “ভিন্নতোতদক্ষরনিদং সৰ্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্
ভবিষ্যদিতি সৰ্ব্বমোক্তার এব । বচনাত্ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোক্তার এব” অর্থাৎ
এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ‘ওঁ’ এই অক্ষরাত্মক । তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বস্তুই ওঁকারাত্মক । এবং কালত্রয় (জাগ্রৎ,
সুপ্ত ও সুষুপ্ত) ও তাহার অতীতও বাহ্য কিছু তাহাও ওঁকারই । মাণ্ডুক্য
আরও বলিয়াছেন ‘অনুভব্যমান এই জগৎ ব্রহ্মই এবং অহংপ্রতীতিগোচর ‘বং’
পদার্থলক্ষণ এই আত্মাও অর্থাৎ জীবও ব্রহ্ম । ওঁকারবাচ্য সেই আত্মা চতুঃপাদ ।
প্রথমপাদ হইতেছে জাগ্রদভিমানী স্থূলভূক্ আত্মা বিশ্ব ইনি ‘অকার’
শব্দবাচ্য । দ্বিতীয়পাদ ‘উ’কার শব্দবাচ্য—ইনি সুপ্লাভিমানী সূক্ষ্মভূক্ আত্মা
‘তৈজস’ । তৃতীয়পাদ সুষুপ্তাভিমানী আনন্দভূক্ আত্মা প্রাক্ত—ইনি ‘ম’ কার
শব্দবাচ্য । ইহার পর চতুর্থ তুরীয়পাদ । তুরীয়পাদে সৃষ্টি নাই । সেইজন্য
উক্ত শ্রুতি ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ইনি অস্তঃপ্রাক্ত তৈজস নহেন, বহিঃপ্রাক্ত

বিশ্বও নহেন অথবা সৃষ্টিপুঙ্খকালের প্রজ্ঞানধন আত্মা প্রাপ্তও নহেন; ইনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অচিহ্ন ইত্যাদি। ইনি একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চশূন্য, শান্ত, শিব ও অশেষ। ওঁকারের এই তুরীয় পাদই সত্য, ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় না, অর্থাৎ কখন ইহাকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সৃষ্টি অবস্থায় পরম্পর ব্যতিক্রমী, সেইজন্য মিথ্যা। কিন্তু তুরীয় আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সৃষ্টি অবস্থায় অন্তর্গত থাকিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করেন আবার যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সৃষ্টির অভাব হয়, তখন তিনি স্বয়ংপ্রকাশরূপে অবস্থান করেন। যদিও সর্ব-উপাধিশূন্য আত্মার কোন অবস্থা সম্ভব হয় না, তথাপি জীবগণের বর্ষাধর আরোহননিমিত্ত শ্রুতি কৃপা করিয়া পাদ কম্পনা করিয়াছেন। ওঁকার হইতে সৃষ্টিব্যাখ্যা সৃষ্টিবিস্তারের জন্য নহে, পরন্তু অজ্ঞানবশতঃ ওঁকার হইতে এই যে সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে, উহাকে উপশান্ত করিয়া চতুর্থ তুরীয়পাদে লইয়া যাইবার জন্য। 'অ'কারকে 'উ'কারে এবং 'উ'কারকে 'ম'কারে লয় করিয়া শান্ত, শিব তুরীয়পাদে স্থিত হইবার জন্য। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত* ব্রহ্মতে প্রতিষ্ঠিতকালে যে সর্বদেখা যায়, তৎজনা ব্রহ্মস্বরূপ

* কারণবাদ তিনটি (১) আশ্রিত কারণ (২) উপাদান কারণ (৩) বিবর্ত কারণ।

(১) আশ্রিতবাদী বৈশেষিক, ন্যায় প্রভৃতির মতে অবয়বদ্বারা হইতে অবয়ববীর উৎপত্তি হয়। যেমন সূর্য হইতে বস্তুর উৎপত্তি। সূর্য হইতে বস্তুর উৎপত্তি দেখা যায়। সূর্য ও বস্তু এক বস্তু নয়, কিন্তু ভিন্ন। সূর্যের মধ্যে বস্তু ছিল না, কিন্তু উহার উৎপত্তি বা আশ্রিত হইল। এই মতে চেতন পরমেশ্বর হইতে জড় প্রকৃতির স্ভাব্য সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু কৃৎসক। যেমন ঘণ্টার নিমিত্ত-কারণ সেইরূপ ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ। ইহারা বলেন কারণে বিনাশে কারণের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য ইহাকে অসংকার্য্যবাদও বলা হয়।

(২) সাংখ্য প্রভৃতি পরিণামবাদীগণের মতে ঘটাদি কার্য্য মূর্তিকারূপ কারণে অব্যাক্তভাবে থাকে। ইহাকে সংকার্য্যবাদও বলে। কালে মূর্তিকা পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঘটরূপে ব্যক্ত হয়। এইমতে পদার্থ নির্গুন তিনি জগতের উপাদান কারণ নহেন, চেতন পদার্থের সাক্ষ্যে জড়প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

পদার্থের মতবাদীগণ এই বলিয়া বিবাদ করেন :—

সাংখ্য বলেন বাহ্য নাই, ভাষ্য হইতে কার্য্য জন্মবে কিরূপে? কারণ হইতে আবির্ভাবের নাম জন্ম, কারণে লয়ের নাম নাশ। যেমন মূর্তিকা হইতে ঘণ্টার আবির্ভাবই ঘণ্টার জন্ম, আবার মূর্তিকান্তে ঘণ্টার লয়ই উহার নাশ। তিলের মধ্যে তৈল থাকে বলিয়াই তিল পীড়ন

পরিত্যাগ করে না। কেবল ভ্রান্তদৃষ্টিবাস্তুই নিকট রজ্জু সপ'রূপে প্রতীত হয়। এইরূপ যদিও এক তুরীয় ব্রহ্মাত্মাই আছেন, তথাপি অজ্ঞানভিত্তিক জীবের ভ্রান্তদৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই যেমন নামরূপদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হইয়া জগদাকারে প্রতিভাত হন। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ থাকে, এই প্রকার ব্রহ্মে জগৎ নাই। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, যাহারা ঐ প্রকার মনে করে, তাহাদের বুদ্ধি বালকের মত। যদি এরূপ প্রশ্ন করা হয়, অজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? তদুত্তরে বলি, অজ্ঞান কোন বস্তু নয়, ইহা ভ্রান্তদর্শনমাত্র। ভ্রান্তির আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভ্রান্তির আদি দেখিতে পাইলে ভ্রান্তি উঠিবে কেন? দেশ ও কালের জ্ঞান হইতে লোকে আদি ও অন্তের খোঁজ করে। দেশ ও কাল-জ্ঞান, কার্য ও কারণভাব ইহারা, অজ্ঞানপ্রসূত। সন্তান যেমন মাতার জন্ম দেখিতে পায় না, সেইরূপ দেশ ও কাল, কার্য ও কারণভাবে বদ্ধ জীব অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পায় না। জীব যাবৎ অজ্ঞানের প্রভাবে থাকে, তাবৎ ইহা দেশ, কাল, কার্য, কারণ, কর্তা, কৰ্ম, ফল প্রভৃতি ভ্রান্তি প্রসব করিয়া প্রশ্ন উঠাইতে থাকে। অজ্ঞাননিদ্রা থামিয়া গেলে দেশ, কাল, কার্য, কারণ প্রভৃতি সমস্ত বিভাগ এক

করিয়া তৈল পাওয়া যায়, না থাকিলে পাওয়া যাইত না; বালককে পিঁড়ন করিয়া তৈল পাওয়া যায় না। সুতরাং আরম্ভবাদ বুদ্ধিযুক্ত নহে। আবার নৈয়ায়িকাদি আরম্ভবাদীরা বলেন যাহা বিদ্যমান আছে, তাহাত অ'ছেই, তাহার আবার উৎপত্তি কি?

আচার্য্য গোড়পাদের মতে পুণ্যবাস্তুবাদিগণ পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়া অজ্ঞাতবাদেই থাপন করিয়াছেন।

(৩) বিবর্তবাদ—বিবর্তবাদটি 'সংকারণবাদ'। কোন বস্তুর অবস্থান্তর না হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ তাহার যে অন্যরূপে প্রতীত, উহাই ঐ বস্তুর 'ববর্ত'। যেমন রজ্জুতে সপ'ভ্রাস্তিকালে রজ্জু, রজ্জুই থাকে, স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, অথচ উহা ভ্রান্তিবশতঃ সপ'রূপে প্রতীত হয়। ঐ স্থলে সপ' ও সপ'জ্ঞান রজ্জু (রজ্জুচেতন্য) সপ' ও সপ'জ্ঞানের বিবর্ত-কারণ। এইরূপে ব্রহ্মে ভ্রান্তিবশতঃ যে জগদর্শন হইতেছে, উহা দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের কোন হানি হয় নাই। ব্রহ্ম জগৎ ও জগৎজ্ঞানের বিবর্ত' অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ অর্থাৎ 'এক অভিন্ন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই; কিন্তু তিনি বিবর্ত'কারণ।'

উপাদান কারণ সর্বগ্রন্থই কার্যে অনুসূত থাকে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের সর্বগ্রন্থ অনুসূত। নিমিত্তকারণ কার্যে অনুসূত থাকে না। যেমন ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারকে ঘটে অনুসূত দেখা যায় না।

আত্মাই হইয়া যায়, সুতরাং প্রশ্নও থাকিয়া যায়। তাই শ্রুতি বলেন—“যত্র বা অস্মা সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কর্মভিবদেৎ”। বৃহদারণ্যক—২।৪।১৪ অর্থাৎ ‘যখন সব আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে? কাহার দ্বারা কি শ্রবণ করিবে? কাহার দ্বারা কি বলিবে?’ ইত্যাদি। রঞ্জিতে সর্ব বাস্তবিক নাই, এইরূপ ব্রহ্মে জগৎ বাস্তবিকই নাই। ভ্রান্তবাস্তুই জগদর্শন করে, অদ্রান্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ দর্শন করেন না।

যদিও চরমসিদ্ধান্তে তুরীয়পাদে, ঈশ্বর, তাঁহার সংকল্প বা বাক্যের কোন প্রভাব নাই, তথাপি যাবৎ অজ্ঞান থাকে এবং তৎকাল্য সৃষ্টি প্রস্তুত হইতে থাকে, তাবৎ সেই সৃষ্টি-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর সত্যসংকল্প বা স্বাধীন ঈশ্বর। ঈশ্বর নিত্যমুদ্র—বৈতরূপ ইন্দ্রজাল কখনও তাঁহার দৃষ্টিতে মোহিত করিতে পারে না। বৈতরূপ ঈশ্বরের অভেদদৃষ্টি নিত্য অব্যাহত, স্বরূপজ্ঞান অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় ঈশ্বরের নিত্য সহচর, তাঁহার জ্ঞান, ক্রিয়া ও বল স্বাভাবিক (“স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ”—শ্বেতাস্বতর ৬৮)। এইজন্য ঈশ্বর মায়াধীশ। যেমন কোন নাট্যকার স্বীয় সংকল্পে নাটক রচনা করেন এবং নাটকস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি বস্তুর ও ব্যাপারের মধ্যে অনুসৃত থাকিয়া উহাদিগকে ধরিয়া থাকেন এইরূপ ঈশ্বরও তাঁহার সংকল্পপরিচিতে এই জগৎনাট্যের প্রত্যেক ব্যক্তি, বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে অনুসৃত থাকিয়া উহাদিগকে ধরিয়া থাকেন। নাট্যকার যেমন নাটকের সর্বকিছু জানেন এবং সেই সর্বকিছুকে আপনার সহিত অভিন্ন ও জানেন, এইরূপ ঈশ্বরও জগতের সর্বকিছু জানেন এবং সর্বজগতের সহিত আপনার অভেদও অবগত আছেন। নাট্যকার যেমন নাটকের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিষয়ে স্বাধীন, ঈশ্বরও সেইরূপ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিষয়ে স্বাধীন। যেমন নাটকস্থিত ব্যক্তিগণ আপন আপন ব্যক্তিভাবে অভিনিবিষ্ট বলিয়া নাটকের সর্বত্র অনুসৃত নাট্যকারকে এবং নাটকের সর্বত্র দেখিতে পায় না ও পরস্পরের ভাবও অবগত নয়, এইরূপ জগৎনাট্যে স্থিত জীবগণ

আপনাপন ব্যাণ্টিভাবে অভিনিবিষ্ট ও মূখ্য বলিয়া জগৎনাট্যের সর্বত্র অনুসৃত নটরাজ ঈশ্বরকে বা তৎসৃষ্ট জগতের সর্বংশ দেখিতে পায় না এবং পরস্পরের আন্তরের ভাবও অবগত নয়। জীবসকলের ঈশ্বর-ব্যতীত পৃথকসত্তা না থাকিলেও অহংকারবশে পৃথকসত্তা কল্পনা করিয়া খণ্ড হইয়া উহারা বিবিধ সুখ দুঃখ ভোগ করে, আবার সৃষ্টির উদয়ে উহারা ঈশ্বরের উপাসনার প্রবৃত্ত হয় এবং অজ্ঞান-প্রসূত উপাধিগত খণ্ড খণ্ড ভাব বিসর্জনপূর্বক ঈশ্বরস্বরূপ লাভ করে। ঈশ্বরের যে শক্তি, উহার নাম বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া। উহা ঈশ্বরের জ্ঞানকে আবৃত করে না।

‘অভেদদর্শনং জ্ঞানম্’—অভেদ-দর্শনকে জ্ঞান কহে’। আলোক যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ ঈশ্বর উপাসিত হইলে তাহার জ্ঞানশক্তিরূপ বরণীয় ভগঃস্বারা (‘তৎ সর্বিত্ত্বেরণ্যং ভগঃ’—গায়ত্রীমন্ত্র) জীবগত অবিদ্যার বা অজ্ঞানের বা বহুদ্বন্দ্বের নাশ করিয়া উহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সুতরাং সর্বতোভাবে ঈশ্বরের আশ্রয়গ্রহণ করা কর্তব্য।

ওঁকারতত্ত্ব ও নাদবিন্দুতত্ত্ব।

পরমেশ্বর ওঁকারদ্বারা নিজেকে জগদ্রূপে বিবর্তিত করেন। ওঁকার বা প্রণব ঈশ্বরের প্রতীক। প্রণব ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—‘এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম’। (কঠোপনিষৎ ১:২।১৭)। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—‘তস্যা বাচকঃ প্রণবঃ ১:২৭’। ‘তৎপ্রপাদদর্থভাবনম্’ ১:২৮। অর্থাৎ ‘প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা নাম’। ‘উহার জপ ও অর্থভাবনা করা আবশ্যিক’। প্রথাসহকারে এই প্রকার করিলে ‘ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াতাবচ্চ’ ১:২৯। উহার দ্বারা প্রত্যক্চেতনোর সাক্ষাৎকার হয় ও সাধনার বিষয় সকলের নাশ হয়’।

প্রণব বা ওঁকারের ৫টি বিভাগঃ—(১) বিন্দু = ॰। (২) নাদ = —। (৩) ‘অ’কার (৪) ‘উ’কার (৫) ‘ম’কার। ব্রহ্মের বহুভবনের ইচ্ছা হইলে প্রথম ষে সৃষ্টান্তিসূক্ষ্ম স্পন্দন ও তর্জানিত শব্দ, তাহাই আন্তর-প্রণব বিন্দু। ইহাই

পরাশক্তি পরাবাক্। সৃষ্টি-উদ্দেশ্যী সেই পরাবাক আরও স্পন্দিত হইয়া বহিমুখে আসিয়া সঙ্ক্ৰান্তরূপে পরিণত হয়। নাদ হইতেছে শব্দ-সামান্য। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দের মধ্যে অন্তর্গত সমান ভাব। বিন্দু নাদের সর্বত্র অন্তর্গত থাকে। যেহেতু, কাণের কারণ থাকিবেই। শব্দসামান্য সেই নাদ আরও বহিমুখে স্পন্দিত হইয়া 'অ'কারাদি বিশেষ বিশেষ শব্দরূপে অভিযুক্ত হয়। পূর্বোক্ত শব্দসকলের পরিচয় দিবার নিমিত্ত 'অ'কারাদি অক্ষরাকারে লিখিত হয়। বিন্দু স্পন্দিত হইলে সরল বা বক্ররেখা হয়। অক্ষরাদি লিখিত অক্ষরগুলি সরল বা বক্ররেখার সমষ্টি-ব্যতীত অন্য কিছু নহে। রেখার ঘন-সন্নিবেশ হইতে তলের ধারণা হয় এবং তলদ্বারা বেষ্টিত বস্তুই ঘন বলিয়া মনে হয়। বিন্দু সমস্ত অক্ষরে অন্তর্গত থাকে। বিন্দুই স্পন্দিত হইয়া অক্ষরসকলরূপে প্রতিভাত হয়। পরাবাক্ই স্পন্দিত হইয়া জগদ্রূপ ধারণ করে। যেমন স্পন্দিত অলাত (অগ্রে অগ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড)* ঋজু বক্রাদি আকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্পন্দিত পরাবাক্ই জগদাকারে দৃষ্ট হয়। লয়ক্রমে বিশেষ বিশেষ শব্দসকল তাহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ ভাগ করিয়া শব্দসামান্য নাদরূপতা প্রাপ্ত হয়। নাদ আবার বিন্দুতে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিক্রমে পরাবাক্ বিন্দু হইতে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কারের আবির্ভাব হয়। ইহারা ত্রিবিন্দু-ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রথম বিন্দু হইতে অপর দুইটি বিন্দু বিভিন্ন হইবার কালে যে অনাহত রব উৎপন্ন হয়, উহাই সঙ্ক্ৰান্ত নাদ। 'অ'কার 'উ'কার ও 'ম'কার এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মাদি তিনটি দেবতা, সত্ত্বাদি তিনটি গুণ, ঋগাদি তিনটি বেদ, ভূবাদি তিনটি লোক এবং জাগদাদি তিনটি অবস্থা নিহিত আছে। এই তিনটি বর্ণের প্রপঞ্চ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি অপর সমুদয় বর্ণের সৃষ্টি করেন। পরে এই সকল বর্ণদ্বারা

* কোন কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রে অগ্নিসংযুক্ত করিয়া উহাকে বেগে ঋজু, বক্রাদি ঘেরূপ ভাবে স্পন্দিত করিলে, অগ্নিসংযুক্তীও তদ্রূপ প্রতিভাত হইবে, আবার স্পন্দন থামাইলে ঐ ঋজুবক্রাদি-ভাব দেখা যাইবে না। উহারা অলাত হইতে নির্গত হয় না, বা অলাতে লীনও হয় না। এইরূপ জগতের প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি নাই, লয়ও নাই। স্পন্দিত পরাবাক্ই দ্রাবিড়বংশজ জগদ্রূপে প্রতিভাত হয়।

হোত্রাদি যান্ত্রিক কার্যচক্রের নিমিত্ত তাহার চারিটি মূখ হইতে প্রণব ও ব্যাস্ত্রীত সহকারে চারিটি বেদ নিঃসৃত হয়। বেদ অখিল শব্দরাশি ও অনন্ত-রূপের কারণ এবং অনন্ত জ্ঞানের আকর।

আবার কেহ কেহ বলেন, বিন্দু ও নাদ হইতেই যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে মহান্ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি। হিরণ্যগর্ভ আবার সত্ত্বাদি গুণভেদে 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কার অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই ত্রিধা ভেদপ্রাপ্ত হন। 'অ'কার, 'উ'কার ও 'ম'কার হইতে অন্যান্য বর্ণসকল আবির্ভূত হয়। ঐ বর্ণসকল হইতে সাত প্রকার ছন্দঃ ও ভূরাদি সপ্তলোকের আবির্ভাব হয় বর্ণসকল জগৎকে প্রসব করেন বলিয়া মাতৃ-স্থানীয়া বা মাতৃকা। ঈশ্বর-সংকল্পে জগতের সৃষ্টি হয়। সংকল্প সঙ্কল্প বাক্। বর্ণসকলের সাহায্য ব্যতীত কোন সংকল্প করা যায় না। ঈশ্বরও 'অ'কার হইতে 'ক্ষ'কার পর্যন্ত বর্ণের সাহায্যেই সৃষ্টি করেন। স্মৃতরাং ৫০টি বর্ণই সমস্তবতী বা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি। আমাদিগকে পূজার সময় আং ইং কং খং ইত্যাদি শব্দ সকলকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ন্যাস করিতে হয়—এই ন্যাসের তাৎপৰ্য্য এই যে, সাধক তৎকালে ভাবিবেন তাহার শূলদেহের নাশ হইয়া তাহার দেহ বর্ণময় হইয়াছে। পূজার গভীর তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই ন্যাস কেবল ইহা 'হিংটিং-ছট্' বলিয়া উপহাসের বস্তু হইবে। নাদ ও বিন্দু জগৎসৃষ্টির মূল বলিয়া উহারা জগতের সর্বত্র অনুগত। ক্লীং, শ্রীং, প্রভৃতি বীজমন্ত্রে এক একটি নাদবিন্দু দেখা যায়। অর্থ হইতেছে নাদবিন্দু হইতে বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র আবির্ভূত। সাধক ক্, ল্, ঙ্, হ্, র্, ঙ্ প্রভৃতি শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপগুলিকে শব্দসামান্য নাদে লয় করিবেন, পরে নাদকে বিন্দুতে লয় করিবেন। যাবৎ বিন্দুর স্পন্দন না থামে, তাবৎ এ জগৎপ্রপঞ্চ থাকিবে না এবং আত্মসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। স্পন্দিত বিন্দুই মন এবং মনই জগৎরূপে প্রভীত হয়। মনের উৎপত্তিহল বিন্দু, সেইজন্য শ্রুতমতে বিন্দুধ্যানের উপদেশ দেওয়া হয়। 'অহং'শব্দেও নাদবিন্দু

অনুগত। ‘অহং’ শব্দের অনুস্বারটি নাদবিশদ্য রূপান্তর। ঐ নাদ বিশদ্য হইতে বর্ণমালার আদিবর্ণ ‘অ’কার এবং অন্ত্যবর্ণ ‘হ’কারের উৎপত্তি। ‘অ’কার এবং ‘হ’কারের মধ্যে অন্য সমস্ত বর্ণই রহিয়া গেল বা ‘অহং’ এর মধ্যে সৃষ্টিই থাকিয়া গেল। যখনই ‘অহং’ এর উৎপত্তি তখনই ‘ইদং’ বা জগৎ উহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে, যেহেতু ‘অহং’ ও ‘ইদং’ ভাব আপেক্ষিক, একটীকে বাদ দিয়া অপরটী থাকিতে পারে না। ‘অহং’ ভাবের উদয়ের পরই “অহং বহু স্যাম্” ইচ্ছা।

শূন্যশব্দ বা শূন্যনাদ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মনে করুন ‘ঔং’ ‘ঐং’ শব্দ ঘণ্টা বাজিতেছে। ঐ এক একটী বিচ্ছিন্ন ‘ঔং’ ‘ঐং’ শব্দ, শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপ যখন ঘণ্টাবাদ্য থামান হইল, তখনও শব্দ সম্পূর্ণ থাকিবার পূর্বে গোঁঙ ও একটি অবিচ্ছিন্ন শব্দ চলিতে লাগিল। উহাই শব্দসামান্য শূন্য বাহ্যনাদ। যখন ‘ঔং’ ‘ঐং’ শব্দ ঘণ্টা বাজিতেছিল, তখনও ঐ ‘ঔং’ ‘ঐং’ শব্দের মধ্যে ঐ নাদ অনুগত ছিল; কেবল শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপস্বারা সামান্যরূপটি আবৃত ছিল। নাদ যেখানে আসিয়া থাকিল বা লয় পাইল ইহা বিশদ্য। শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপ ত্যাগ করিয়া নাদে লক্ষ্য পড়িলে জীবের বুদ্ধি উদ্বিগ্নময়। সেইজন্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে যাহারা নাদ-প্রধান, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উহাদের আদর বেশী। আমাদের পূজাদিতেও ঘণ্টা, কঁসির, শব্দ প্রভৃতি নাদপ্রদান যন্ত্রের ব্যবহার হয়। যেহেতু পূজা ঈশ্বরমুখীন, এবং ঈশ্বর সর্বব্যাপক। বিশিষ্ট বস্তু সর্বব্যাপক হইতে পারে না। সেইজন্য ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ ভাবে অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান সর্বপ্রকার বিশিষ্টভাবের মূল। বিশেষ ভাবেই বন্ধন, সামান্য-ভাবে মুক্তি স্বাভাবিক। প্রথমে যে সকল বস্তুতে আমার জ্ঞান আছে, ঐ গুলিতে মমত্বভাব ত্যাগ করিয়া ভগবৎচরণে সমর্পণ করিতে হয়, পরে পূর্ণহৃদিত-কালে ‘অহং’ জ্ঞানকে চিরাগ্রেতে আহুতি দিতে হয়। সুতরাং দেখা গেল পূজা ত্যাগ শিক্ষা দিতেছে। পূজার ন্যায় নাদও ত্যাগ শিক্ষা দিতেছে; যেহেতু উহা

শব্দের বিশেষ বিশেষ রূপ ত্যাগ করিয়া সর্বব্যাপক বস্তুর ইঙ্গিত করিতেছে। সেইজন্য পূজার সময় নাদপ্রধান যন্ত্র বাজাইলে তবেই পূজার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। নতুবা যে সকল যন্ত্র নাদপ্রধান নহে (যেমন হারমোনিয়াম প্রভৃতি) ঐ সকল বাজাইলে সে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

মূলনাদের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে সূক্ষ্মনাদের বিষয় শ্রবণ করুন। সূক্ষ্মনাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রক্ষণ করিয়া অন্তরে উহার অনুভব করিতে হয়। সূক্ষ্ম আন্তর নাদ হইতে সূক্ষ্ম আন্তর বর্ণসকলের উৎপত্তি হয়, উহার আন্তর্মাতৃকা। ষট্চক্রভেদী সাধক চক্রে চক্রে ক্রমশঃ উহাদের লয় করিয়া উহাদিগকে আন্তরবিন্দু পরাবাকে লইয়া আসেন। পরে বিন্দুভেদ করিয়া পরমগুরু পরমশিবের সহিত মিলিত হন। যাহারা এই আন্তর নাদ-বিন্দুর তত্ত্ব এবং আন্তরনাদের আদর করেন, তাহারাই প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ। সেইজন্য সঙ্গীতের আদিগুরু সর্বভাগী মহাদেব নাদকে ললাটে ধারণ করিয়া আছেন। মহাদেব সঙ্গীতের বা সম্যক্ গীতির তত্ত্বজ্ঞ। যেমন গায়কগণ রাজার গুণগান করে : সেই রূপ নামরূপাত্মক এই জগৎ রাজরাজেশ্বর স্বপ্রকাশ চৈতন্যের গুণগান করিতেছে। মহাদেব ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া তত্ত্বশাস্ত্রে শিষ্যগণকে সেই গীতিই শিক্ষা দিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদও সেই গীতিই শিক্ষা দিতেছেন।

বেদ বাক্‌স্বরূপ ; এই জগৎও বাক্‌স্বরূপ বেদের মূর্তি, সুতরাং জগৎও বেদ। বেদের সেই গীতির মূল সূত্র হইতেছে ওঁকার, লক্ষ্য তদুরীযপাদ। এইজন্য বৈদিক ও তান্ত্রিক পূজাবিধিতে দেখিতে পাই, পদে পদে ওঁকারের উচ্চারণ করা হয় যেন সূত্র কাটিয়া না যায়। ওঁকার ব্রহ্মের প্রতীক। বাবার ‘ফটো’ যেমন বাবাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাও সেইরূপ ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ছান্দোগ্য দেখাইলেন, ওঁকার সমস্ত বেদের সার। ঐ শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘পুরুষস্য বাগ্‌ রসঃ, বাচ ঋগ্‌ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম উগীথো রসঃ’। ১।১।২ অর্থাৎ ‘বাক্য পুরুষের সার’, (যেহেতু, বাক্‌শক্তিহীন পুরুষ সকলের অবজ্ঞের)

‘বাক্যের রস ঋক্ বা ঋগ্বেদ’, (যেহেতু মন্ত্যাত্মক বেদভাগের উচ্চারণেই বাক্যের সাধকতা । ‘ঋগ্বেদের সার সামবেদ’, (যেহেতু ঋক্‌সমূহ গীতিসহকারে উচ্চারিত হইলেই শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তজনক হয়) । আর ‘উগীথ বা ওঁকার সামের সার’, (যেহেতু ওঁকার-বিরহিত সাম নিষ্ফল) ।

জগৎ ওঁকারের ‘স্পন্দন’ ওঁকার ‘স্পন্দিত’ হইয়া গায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হয় । গায়ত্রী আদি ছন্দঃ । ইনি বেদমাতা—ইনি ছন্দোবৎ বেদকে প্রসব করেন । ঐ ছন্দগুলি ওঁকারের ‘স্পন্দন-বাতীত’ আর কিছুই নয় । বৈদিক ছন্দঃ সকলের (১) ঈশ্বরের স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য আছে এবং (২) উহারা জীবসকলকে আসন্ন পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া উহাদিগকে বিষ্ণুর পরমপদ দেখাইয়া দিতেও সমর্থ । এক একটী ছন্দঃ বা ‘স্পন্দন’ এক একটী রূপের উৎপত্তির কারণ । বেদে কথিত হইয়াছে, ঈশ্বর গায়ত্রী-ছন্দঃ দ্বারা ব্রাহ্মণের, টিষ্টদ্রুপঃ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের এবং জগতীছন্দঃ দ্বারা বৈশ্যের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন । ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত এই বৈদিকসৃষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে ছন্দের সহিত হইয়া থাকে । ছন্দঃই সূত্র ! ছন্দোযুক্ত এই বৈদিকগৃহীতে দ্রুত নাই—ইহাই ঈশ্বরঐবত ! ‘ঈক্ষণাদিপ্রবেশাতা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা’ (পাদেশী চিত্রদীপ ২১৩) । অর্থাৎ ‘ঈক্ষণ হইতে প্রবেশ পৰ্য্যন্ত সৃষ্টি ঈশ্বর দ্বারা কল্পিত’ । ‘তৎসৃষ্টা তদেবান্দ্রাবিণঃ’ (তৈত্তিরীয়—২ ৬) অর্থাৎ ‘ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন’ । ঈশ্বরঐবতে অভেদজ্ঞান অব্যাহত বলিয়া ইহাতে দ্রুত নাই । জীব সকল সেই ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে আপন আপন অত্যন্ত করণবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া বশনদশা প্রাপ্ত হয় । মনে করুন একটী ঈশ্বরসৃষ্ট ‘মটীমূর্ত্তি’ আছে । উহাকে কেহ ভাবিল ‘ইনি আমার মাতা,’ কেহ ভাবিল ‘ইনি আমার কন্যা,’ কেহ ভাবিল ‘ইনি আমার স্ত্রী,’ আবার বাঘ ভাবিল ‘ইহা আমার খাবার’ । যদিও বাহিরে অবস্থিত ‘মটীমূর্ত্তি’র রূপ একই প্রকার, তথাপি জীবগণ অহঙ্কারবশে উহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আরোপ করিল এবং উহাদের সেই মনোময়ী ‘মটীমূর্ত্তি’র রূপও ভিন্ন ভিন্ন হইল । ইহাই জীবঐবত ।

জীববৈতই (অনাকুল ও প্রতিকুল ভাবের জন্য) বশ্বনের কারণ, নতুবা ঈশ্বরসৃষ্ট স্রষ্টামূর্তিতে বা ঈশ্বরবৈতৈ বশ্বনের কোন হেতু নাই । কারণ নিত্যমুক্ত ঈশ্বর সেই বৈতকে মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং জ্ঞানীপুরুষও তদ্রূপ জানেন ।

অহংকাররূপ অসুরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব ছন্দঃ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে । ছন্দঃ হইতে বিচ্যুত জীব ছন্দঃসকলে শায়িত পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় না, সুতরাং ভেদদর্শনজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করে । বাহ্ময় বেদ ঈশ্বরের নিঃবাস, অর্থাৎ নিঃবাসের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বা অবলীলাক্রমে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত । সূর্য্য হইতে নিঃসৃত সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যকে দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত বেদ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় । জীবের স্রষ্টার উদয়ে যখন বেদে শ্রদ্ধা হয়, তখন গুরুরূপে সে বুদ্ধিতে পারে, বেদোক্ত ছন্দঃই স্বাভাবিক । সেইজন্য সে নিজের জীবনের সুরকে বৈদিক সুরে বাধবার চেষ্টা করে এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ করে । ক্রমশঃ যতই সে আসুর পাপ হইতে মুক্ত হয়, ততই তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে শুদ্ধ বৈদিকবাক্যের বাস্কার উঠিতে থাকে এবং পরিশেষে বেদশায়ী পরমপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া জীব কৃতকৃত্য হয় । এক বেদ হইতে অসুর ও দেবতা উভয়ের উৎপত্তি । সৃষ্টি বলিলেই উহার মধ্যে দেবতা ও অসুর উভয়ই থাকিবে । যেহেতু সৃষ্টি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক । দেবতাগণ সত্ত্ব-প্রধান, অসুরগণ রজঃ ও তমঃপ্রধান । দেবতাগণ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া বেদের তাৎপর্য্য যে পরমেশ্বরে, উহা বুদ্ধিতে পারেন ; রজঃতমঃপ্রধান অসুরগণ তাহা পারে না ।

শব্দ উঠিতে পারে, পূর্বে যে বলা হইয়াছে, শব্দ হইতে রূপের বা আকৃতি-বিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তরে বলা যায় তৈত্তিরীয়শ্রুতি বলেন, ‘পরমাত্মা হইতে আকাশের, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় ।’ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মা প্রথমে আকাশের কল্পনা করিয়াছিলেন । আকাশের গুণ শব্দ । আকাশ হইতে ক্রমশঃ তেজের উৎপত্তি, তেজের গুণ

রূপ। আকাশ তেজের কারণ বলিয়া শব্দও রূপের কারণ। সূক্ষ্মভাবে শব্দ বা সংকল্প না উঠিলে রূপ বা আকার দেখান যায় না। সংকল্পশূন্য মন রূপ দেখে না। সূক্ষ্মপ্তিতে বা নির্বিকল্প সমাধিতে রূপ দেখা যায় না। সুতরাং শব্দ হইতে রূপের উৎপত্তি। ঈশ্বর-সংকল্পে জগৎ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্বে মায়াশক্তি শক্তিমান্ ঈশ্বরে লীন থাকে ; এই অবস্থায় প্রকৃতি-পদ্রুপের ভেদ নাই। ইহাই প্রকৃতির অব্যক্ত বীজাবস্থা। চেতন ঈশ্বরের সৃষ্টি-ইচ্ছা জাগিলে তিনি নিজ-শক্তিকে ঈক্ষণ করেন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পদ্রুপরূপে যেন দ্বিধা ভেদ প্রাপ্ত হন। বীজ হইতে অঙ্কুর নিগমনকালে বীজ যেমন দ্বিধা ভেদ প্রাপ্ত হয়, ইহা সেইরূপ। জীবরূপ অঙ্কুর নিগত হইয়া অশ্বত ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পদ্রুপরূপে মর্শন করে।

শাকা। আচ্ছা পরমেশ্বরের কিসের অভাব ছিল যে তিনি সৃষ্টি করিলেন? আবার অভাব থাকিলে তাঁহাকে পূর্ণই বা বলি কি প্রকারে? আরও ত আমরা বাহিরের কোন বস্তু না দেখিয়া সংকল্প করিতে পারি না। ঈশ্বর-সংকল্প কি এইরূপ? যদি এইরূপই হয়, তবে ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন, ইহার কোন অর্থ হয় না। আবার ঈশ্বর সর্বব্যাপক হইলে তো সর্বও থাকা চাই। আর সর্ব সত্য হইলে অশ্বতীয় তত্ত্বই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

উত্তর। ঈশ্বর পরিপূর্ণ ও অখণ্ডবস্তু। যেমন কোন মায়াবী বা সিংহযোগী নিজে এক থাকিয়াও লোকগণের নিকট নিজেকে দুই বা ততোধিক দেখাইতে পারেন, এইরূপ মায়াবীশ মহাযোগেশ্বর ভগবান্ মায়াশক্তিস্বারা বহু হইলে প্রকৃতপক্ষে বহু হন না। ঈশ্বরসৃষ্টি মণির ঝলকের ন্যায় স্বাভাবিক অবদীপ্তপূর্বক। বদীপ্তপূর্বক নহে বলিয়া ইহাতে দ্রুম নাই। এই সৃষ্টি যুগপৎ হইয়া থাকে। জীবগণ উহার ধারণা করিতে পারে না বলিয়া উহাদের নিকট দ্রুমপূর্বক সৃষ্টির কল্পনা করা হয়। ঈশ্বরসৃষ্টির কারণ নির্দেশ করা যায় না, যেহেতু ঈশ্বর কাৰ্য্যকারণের অধীন নহেন। কাৰ্য্যকারণ ভাৱের মূল হইতেছে ঈশ্বরসংকল্প মায়া। তিনিই কাৰ্য্য, তিনিই কারণ। ঈশ্বর কাৰ্য্য ও কারণ, দেশ,

কাল সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া থাকায় ঈশ্বরসৃষ্টিতে কার্য্য কারণ ক্রম নাই। অব্যক্তাচ্ছন্ন বিশেষ বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট জীবগণ স্বীয় বুদ্ধিধারা ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে কার্য্য কারণরূপে দেখিতে থাকে। ঈশ্বরসংকল্প যদি কোন কিছুই অধীন হইত, তবে শাস্ত্রে যে তাহাকে স্বাধীন, সত্যসংকল্প ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইত। কার্য্য কারণভাব ঈশ্বরের মায়াশক্তির খেলা। সত্যসংকল্প, স্বাধীন ঈশ্বর মায়াবৃত্তিধারা সহজেই যাহা যে রূপ সংকল্প করেন, তাহা সেইরূপেই মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া ভাসিয়া উঠে। সংকল্পমাত্রই ঈশ্বর দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ, আকাশাদি পণ্ড স্ফুটত, জীবের মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও শূন্যদেহ সকলের যুগপৎ সৃষ্টি করেন। ইহা ঈশ্বরের বিধমায়া। ভগবান্ দিব্যচক্ষু দান করিলে সমস্তই ভগবানের দেহে একইকালে অবস্থিত দেখা যায়। ইহাতে দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি বাধা থাকে না। জলে দৃষ্ট থাকিলে যেমন নানা আকারের তরঙ্গ দেখিয়াও উহা জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এই প্রকার বুদ্ধি হয়, এই প্রকার যিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি জগৎতরঙ্গসকল দেখিয়াও ঐ সকল সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত কিছুই নহে, ইহাই বোধ করেন। কোন বিশেষভাবে তাহার বুদ্ধিকে বাধা দিতে পারে না। ঈশ্বরের মায়াশক্তিই জীবের নিকট অজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। যেমন আকাশ সর্বব্যাপক হইয়াও ঘট উপাধিতে অভিনিবেশবশতঃ ঘটাকাশরূপে খণ্ড হইয়া পড়ে এবং ঘট উপাধির তুলনায় ইহা ঘটের ভিতরের আকাশ, ইহা ঘটের বাহিরে আকাশ এই প্রকার ভ্রম করিয়া থাকে, এইরূপ চেতন স্বরূপ সর্বব্যাপক আত্মা দেহাদি ঘটে অভিমানবশতঃ যেন জীব হইয়া পড়েন এবং দেহের তুলনায় ইহা অন্তঃ, ইহা বাহির এইপ্রকার ভ্রমে পতিত হন। ঈশ্বর-উপাসনাম্বারা চিত্ত সম্যক্ শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মস্বরূপ জীব দেখিতে পান, ভিতরবাহির ভাব তাহারই ঈশ্বর-সংকল্পের স্ফূরণ। ইহা স্বপ্নকালে দৃষ্ট ভিতর-বাহির ভাবের ন্যায়, নিজেরই বিস্তার। সর্বব্যাপক চেতন ঈশ্বরের বাহিরে কোন বস্তু না থাকায় আমাদের ন্যায় তাহার সংকল্প বাহিরের বস্তুর উপর নির্ভর

করে না। ঈশ্বর-সংস্পর্শ, বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত নয়, যেহেতু তিনি স্বাধীন ও সংস্পর্শকর্তা ঈশ্বরব্যতীত সংস্পর্শের পৃথক্ সত্তা নাই। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ না থাকিলেও জীব অজ্ঞানপ্রভাবে ইহা সৃষ্টি, ইনি ঈশ্বর এই প্রকার ভেদ দর্শন করে। ঈশ্বরের অজ্ঞান না থাকায় ঐ প্রকার ভেদদৃষ্টি নাই; তিনি মায়াশক্তিকে বশে রাখিয়া সৃষ্টি করেন, সংস্পর্শে বহু হইয়াও অভিন্নই থাকেন, সেইজন্য তাহার পূর্ণতা খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বর সর্বব্যাপক ইহার অর্থ, ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর ভিতর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ঈশ্বর ভিতর-বাহির পূর্ণ করিয়া থাকিলে অন্যবস্তুর থাকিবার স্থান কোথায়? সুতরাং ঈশ্বর সর্বব্যাপক মানেই সর্বমিথ্যা। যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট যে চান্দিতসর্প উহাকে রজ্জু ব্যাপ্ত করিয়া থাকে—সর্প সত্য হইলে রজ্জু উহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

এক্ষণে আমরা ইণ্টিমস্ট্রপে শব্দের প্রভাব দেখাইয়া বস্তুর উপসংহার করিব। জপ আঁতি উৎকৃষ্ট সাধনা—বিশেষতঃ কলির দুর্বল জীবের পক্ষে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, ‘যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি’ অর্থাৎ ‘যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ’। সর্বপ্রকার পাপরত দস্যু রজ্জাকর জপপ্রভাবে জ্ঞানগুরু বাল্মীকি হইয়াছিলেন। কোন একটি সাধনা লইয়া ডুবিতে পারিলেই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, নতুবা ভাসিয়া বেড়াইলে সিদ্ধির আশা নাই। জপ প্রাণময়কোষের সাধনা। মূখ্যপ্রাণ বলিতে হিরণ্যগর্ভ রক্ষাকে বুঝায়। আমরা সুষুপ্তি হইতে যখন জাগরিত হই, তখন একবার সুষুপ্তির সংস্কার আমাদের দিকে টানে, আবার জাগরণের সংস্কার জাগরণের দিকে টানে। এইরূপে কিছুক্ষণ টানাটানির পর জাগরণের সংস্কার প্রবল হইলে আমরা জাগিয়া উঠি। এইরূপ প্রলয়নিশা অবসানে হিরণ্যগর্ভ রক্ষা একবার সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ এইরূপ ব্যাখ্যান ও নিরোধ-সংস্কারের টানাটানি চলিতে থাকে। পরে ব্যাখ্যান-সংস্কার প্রবল হইলে সৃষ্টি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পরাভূত অবস্থায়ও নিরোধ-সংস্কারের কার্য চলিতে থাকে। ব্যাখ্যান ও নিরোধের এই যে টানাটানি, ইহাই মূখ্যপ্রাণ। হিরণ্যগর্ভ

রক্ষা জীবসকলের প্রণীত। রক্ষা কারণ, জীব কার্য। কারণের গুণ কার্যে আসিয়া থাকে। তাই জীবের মধ্যেও আমরা যে শ্বাসপ্রশ্বাসের টানাটানি দেখিতে পাই, উহাও মূখ্যপ্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণ জীবদেহে থাকিয়া সর্বদা ‘হংসঃ’ ‘সোহং’ জপ করিতেছে। প্রাণ নিষ্কামবশী বলিয়া তাহার অবসাদ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সকামভাবে বিষয়চিন্তা করে, সুতরাং উহারা শান্ত হইয়া পড়ে এবং সূক্ষ্মপ্তির ভ্রোড়ে উহাদের বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়; প্রাণ কিন্তু সূক্ষ্মপ্তিকালেও কার্য করিতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রাণ স্বভাবতঃই ‘হংসঃ’ এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিঃশ্বাস টানিবার সময় ‘হং’ শব্দে অন্তরে জীবচৈতন্যের দিকে এবং ফেলিবার সময় ‘সঃ’ এই শব্দে বাহিরে বিশ্বব্যাপক ঈশ্বরচৈতন্যের দিকে ছুটিয়াছে। এই যে ‘হংসঃ’ জপ স্বভাবতঃই চলিয়াছে, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বা একমনে ঐ জপ শুনিয়া যাওয়া সর্বোৎকৃষ্ট জপ। যে জপ স্বভাবতঃই চলিতেছে, যাহা করিতে হয় না, তাহাই ‘অজপা’। সেই ‘অজপায়’ লক্ষ্য রাখাই অজপাদাষণ। সাধক মূখ্য বশ করিয়া ‘হং’ এই শব্দ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে নাসিকাযারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন এবং ‘সঃ’ শব্দ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে নাসিকাযারা বায়ু ত্যাগ করিবেন। প্রতিদিন আসনে বসিয়া নিয়মিতভাবে কিছু সময় এইরূপ অভ্যাস করিবেন এবং অন্য সময়ও অর্থাৎ আসনে উপবেশন ব্যতীতও এইরূপ অভ্যাস করিবেন। অভ্যাস ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবেন। কিছুকাল এইরূপ করিলে আপনার মনের ও স্বাস্থ্যের অবশ্যই উন্নতি হইবে। জোর করিয়া নিঃশ্বাস বশ করিতে যাইবেন না।

গুরু যে বীজমন্ত্র প্রদান করেন, ভক্তি-সহকারে উহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে জপ কহে। ভক্তিসহকারে নিরন্তর জপ করিলে ইষ্টমূর্তির সাক্ষাৎলাভ হয়। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ লুক্কাইয়া থাকে, এইরূপ বীজমন্ত্রের মধ্যে ইষ্টদেবতা লুক্কাইয়া থাকেন। ভক্তিবীর সেচনযারা ঐ বীজ কালে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া মনুষ্যফল প্রদান করে অর্থাৎ ইষ্টদেবতা দর্শন দিয়া জীবকে জ্ঞান দিয়া

মুদ্র করিয়া দেন। পূর্বেই বলিয়াছি ঋষিগণ সমাধিনেত্রে ঐ বীজমন্ত্রসকল এবং ঐ সকল হইতে আবির্ভূত দেবতাসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বীজমন্ত্রগুণি এবং দেবতাসকলের ধ্যান রাখিয়া গিয়াছেন। চিত্তে যে সমাহিত ও শূন্য অবস্থায় ঐ মন্ত্র ও রূপসকলের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদের চিত্ত তদপেক্ষা অনেক নিম্নভূমিতে থাকায় আমরা প্রথম প্রথম উহাদিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কিন্তু পিতা যেমন পুত্রকে ‘ক’ এই অক্ষর লিখিয়া দিলে উহাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরে ‘ক’ লিখিতে হাত আনিয়া যায়, এইরূপ গুরুদ্বাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ জপ করিলে ক্রমশঃ চিত্তের পাপ ক্ষয় হইয়া মন্ত্র ও দেবতার স্বরূপ আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠে।

বীজমন্ত্র একটি শব্দ বা স্পন্দন। অবশ্য এই স্পন্দন সূক্ষ্ম এবং উচ্চতরের। আমাদের মনে কত যে সংকল্পবিক্ষেপ উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল স্পন্দন প্রথমে অতি সূক্ষ্মাকারে বিন্দুরূপে উদ্ভিত হয়, পরে উহা বাড়িতে বাড়িতে ইন্দ্রি, দেহাদি এবং বাহিরের জগতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনে করুন ক্রোধের স্পন্দন উদ্ভিত হইল—ঐ স্পন্দন যখন প্রথম উদ্ভিত হইল তখন উহা অতি সূক্ষ্ম একটি বিন্দুবেগ। ক্রমশঃ ঐ স্পন্দন বাড়িলে হাত পা পর্য্যন্ত কম্পিতে লাগিল। এবং উহা বাহিরেও আলোকের ভয়ক্রোধাদির স্পন্দন উৎপন্ন করিল। এইরূপ কোন দেশনেতার মস্তিষ্কে সামান্য একটি স্পন্দন, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে জগৎবদংসী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি দৈবী স্পন্দন, কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি আনন্দের স্পন্দন আসন্দের স্পন্দন ভগবান্ হইতে বাহিরে যাইতে চায়। ইহা শক্তির ক্ষয় করে, কিন্তু দৈবী স্পন্দন ঈশ্বর অভিমুখী হইতে চায়—ইহাতে বৃথা শক্তির ক্ষয় হয় না। ক্রোধ একটা আনন্দের স্পন্দন; যখন আপনি ক্রোধ হইলেন, আপনার শক্তি যেন বাহিরে ছুটিয়াছে, শক্তি ক্ষয়ের দিকে চালাইয়াছে। আবার ক্রোধকালে যদি আপনি ক্ষমা-বাক্তি অবলম্বন করেন, তবে দেখিবেন আপনার যে শক্তি বাহিরের দিকে

ছুটিতেছিল, উহা যেন গতি পরিবর্তন করিয়া আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে, ক্ষয়ের পূরণ হইতেছে। এই ক্ষয় ও পূরণ, অসুর ও দেবতা, সূর্য ও সোম লইয়াই জগৎ। যদিও দেবতারা সৃষ্টির অন্তর্গত, তথাপি উহাদের শরণ গ্রহণ করা কর্তব্য। ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন, 'দৈবী সম্পদ-বিমোক্ষায়'—১৬।৫ অর্থাৎ 'দৈবী সম্পদ মুক্তির কারণ।' দেবতাগণ প্রকাশ-স্বভাব। কিন্তু ঐ প্রকাশ অসুরভাবদ্বারা আক্রান্ত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। যখন অসুরবলের জন্য দেবতারা একত্র হন, তখন ঐ প্রকাশ বা জ্ঞান, বিদ্যারূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে বিনাশ করে, তখন জগতে শান্তি ফিরিয়া আসে এবং জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করে।

বন্যার জল অপগত হইলেও তাঁরের গাছপালায় উহার চিহ্ন রাখিয়া যায়, এইরূপ শব্দ বা অশব্দ চিত্তা অপগত হইলেও মৃদু, চোখ প্রভৃতিতে উহাদের রেখা রাখিয়া যায়। এইজন্য সচ্চিত্তাপরায়ণ ব্যক্তি সৌম্যদর্শন হইয়া থাকেন, অসচ্চিত্তাপরায়ণ ব্যক্তির মৃদুদিতে অসংচেতার ছাপ পড়ে ও পশুপ্রকৃতি ফুটিয়া উঠে। অবশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যক্তিগণই উহা বঝিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ ইষ্টমন্ত্রজপ দ্বারা যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, উহা অশব্দচিত্তার স্পন্দনকে বাধা দেয় এবং উহাকে ক্ষয় করে। এমন কি দীর্ঘকাল একনিষ্ঠভাবে জপাত্যাসে রত থাকিলে মনের অন্যবিষয় চিত্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। কোন একটি শক্তি যখন কার্য করে, তখন তাহার উপযুক্ত মন্ত্র চাই অর্থাৎ ঐ যন্ত্রের ঐ শক্তির বেগ বহন করিবার সামর্থ্য থাকা চাই অশব্দ চিত্ত ও ইন্দ্রির সাত্ত্বিক দেবশক্তির বেগ সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য অর্জুনের মত বীরও ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ জপের স্পন্দনে দেহীন্দ্রিয়াদির অশব্দ ক্ষয় হয়, উহাদের অণুপরিমাণ পর্য্যন্ত জপের ঐ স্পন্দনে স্থান পরিবর্তন করে। শ্রদ্ধাশীল জপকারীর মৃদুত্বের কঠোর রেখাগুলি তিরোহিত হইয়া এক অপূর্ণ স্বর্ণাঙ্গ শোভা ধারণ করে। এই প্রকারে অন্তরীন্দ্রিয়েরও পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন চিত্ত ভগবানের সাত্ত্বিক মূর্তি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে এবং ইষ্টমূর্তির

সাক্ষাৎকার হয়। ইহা পরম সত্য কথা, কিন্তু সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু গুরু ও শাস্ত্র-
বাক্যে অশ্রদ্ধা অথবা সংশয় থাকিলে কোন ফল হয় না। “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”
—গীতা. ৪।৫০। অর্থাৎ ‘সংশয়াত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয়’। সাধন না করিয়া
সিদ্ধির আশা করা অন্যায় আশ্রয়। যদি সাধনকালে বাধা আসে, উহাতে
হতাশ হইবার কিছু নাই, কারণ বাধা সরানই ত সাধনা। বাধা না থাকিলে
সাধনা কিসের জন্য হইবে? পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া
ঈশাসহকারে অগ্রসর হইলে সিদ্ধিলাভ হইবেই। ঈশ্বর-বিষয়ক প্রযত্নই পুরুষ-
কার, ভোগ্য বিষয়ের জন্য যে উদ্যম, উহা পুরুষকার নামের অযোগ্য, উহা উন্মত্ত-
চেতা। পুরুষকার ভগবানের বিচ্যুতি, উহা অহংকার নহে। “পৌরুষং নৃষুঃ”
—গীতা ৭।৮। অর্থাৎ ‘মনুষ্যাগণের মধ্যে আমি পুরুষকার-রূপে বিরাজিত’।
যখনই আমরা পুরুষকার করি, তখনই ভগবানকে অবলম্বন করি, যখন তাহা
করি না, তখন মায়ার কবলে পড়িয়াছি। পুরুষকারকে ভগবদমূর্তি ভাবিয়া
উহাকে প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য, উহাকে অহংকারের দ্বারা কলুষিত করা উচিত নহে।
অহংকারবশে পাপকার্য্য করিয়া ‘সবই ভগবান্ করাইতেছেন’ এই প্রকার উক্তি
মূর্ত্তিপ্ৰসূত এবং উহার ফল ধ্বংস। ঠিক্ ঠিক্ সাধনা করিলে ভগবান্
আসিনেই, আসিয়াই আছেন যেহেতু, তিনি পূর্ণ ও সৰ্ব্বগত। জপরূপ
শুদ্ধকর্ম্মদ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির অশুষ্ক ক্ষয় হইলে সেই নিঃশলিচিত্তে ওঁকারবাচ্য
পরমেশ্বরের মূর্ত্তি আপনিই ভাসিয়া উঠিবে। তখন সৰ্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ঘটিবে ও
পরমানন্দ লাভ হইবে। ইহার পর স্বতঃই দিব্যমায়াও নিবৃত্ত হইয়া ওঁকারলক্ষ্য
তুরীয় পরমপদে স্থিতি হইবে। “ওঁ তৎ সৎ”।

কতিপয় সাধন-সঙ্কেত

(১) সাধনভজনের জন্য একটি নির্জন ঘর থাকা চাই। যদি একটু স্থির হইয়া নির্জনে বসিবার অবকাশ না পাই, তবে মনের হিসাব লইব কখন ?

(২) ঐ ঘরে প্রত্যহ উপনিষাদাদি শাস্ত্র এবং গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যিক। আমাদের চিত্ত বিষয়চিত্তায় অভ্যস্ত। বিষয় ও বিষয়ী লোকের সঙ্গদ্বারা চিত্তের সদূর নীচে নামিয়া যায়। সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র পাঠ করিয়া চিত্তের সদূর উচ্চে বঁধিয়া লইতে হয়।

(৩) সংসঙ্গ করা কর্তব্য, উহা চিত্তের উন্নতি-সাধন-বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক।

(৪) বাক্-সংঘম অভ্যাস করা উচিত। বাক্যদ্বারাই লোকের চিত্ত বহিমুখে ছোটে, শক্তি ক্ষয় হয় এবং নিজের অহংকার প্রকাশ করিবার সুবিধা হয়।

(৫) আহার-সংঘম প্রয়োজন। অতিরিক্ত আহার করিলে শরীর ভার হয়, সাধনভজন ভাল হয় না। লঘু ও সাত্বিক আহার করা কর্তব্য। আহারের সহিত মনের সম্বন্ধ আছে। ছান্দোগ্য বলেন,—“অন্নমশিতং দ্রোণা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিশ্ঠো যাতুক্তঃ পদরীষঃ ভবতি, যো মধ্যমাত্ম্মাংসং যোহনিষ্ঠাত্ম্মনঃ” (৮।৫।১) ‘অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ’। ৬।৬ ও অর্থাৎ ‘ভুক্ত অন্ন দ্রোণা বিভক্ত হয়। অশ্বের যাহা শূলতম অংশ তাহা পদরীষ হয়, যাহা মধ্যম অংশ তাহা মাংস এবং যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মনরূপে পরিণত হয়’। ‘হে সৌম্য মন অন্নময়’। পুণ্যাদি সাত্বিক আহারও যদি ঈশ্বরে নিবেদিত না হয় এবং লোভ-পূর্ব্বক গ্রহণ করা হয়, তবে উহা সাত্বিক হয় না। আহারশুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয় এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধুবাস্মৃতি হয়। এস্থলে আহার বলিতে রূপ, রসাদি বাহ্য কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারা আহরণ করা হয়, উহারাও আহার।

যোগীর আহার বিধি—শালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মৃগের বৃন্দ,

পটোল, কঁকড়, ফুটী, রসুন, কঁচাকলা, মৌচা, খেঁড়, আলু, মটর, পলতা, হিণ্ড, নবনী, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, নারিকেল, বেদানা, কিশুমিশ্র, আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি।

যোগীর নিষিদ্ধ আহার—মাংস, দধি, লণ্ডন, শাক, কটু, অম্ল, তিক্ত, হিং, সরিষাটেল, বাসী ও ভাজা দ্রব্য, লবণ, তুলা, মদা, তাল, কঁঠাল, মসুর, কুমড়া, শাকের ডাঁটা, লাউ, কয়েংবেল, জামীরনেবু, কামরাসা প্রভৃতি।

(৬) প্রত্যহ আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি মহৎ বস্তুগুলিকে দর্শন করা উচিত এবং উহাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করা কর্তব্য। উহা দ্বারা চিত্ত মহৎ, উদার ও প্রশান্ত হয়। নিজেকে আকাশবৎ ব্যাপক ও অসঙ্গ ভাবিলে চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

(৭) পরের দোষ-অনুসন্ধানে আগ্রহ ভাল নয়। উহাতে ঐ দোষ অনুসন্ধান-কারীর মধ্যে আসিয়া যায়। নিজের দোষ অনুসন্ধান করিয়া উহার সংশোধন করা অত্যন্তমুখতার চিহ্ন। নিজের দোষ স্বীকার করিলে পাপের ক্ষয় হয় ও চিত্ত হালকা হয়। নিজের গুণ প্রকাশ করা মুখতার চিহ্ন, উহা দ্বারা অহংকারের বর্জন হয়।

(৮) অহিংসা, সত্য, সরলতা মর্ষভীয়ে দয়া প্রভৃতি দৈবী সম্পদ অর্জন করা আবশ্যিক, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি আসুর-সম্পদ ত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত। দৈবী সম্পদ ভীতকে ব্যাপকত্ব প্রদান করে; আসুর-সম্পদ একটি দেহে নিবদ্ধ রাখে।

(৯) অতীত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই, ভবিষ্যৎও বেশী ভাবিবার প্রয়োজন নাই, বর্তমানের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য।

(১০) অশ্রুচক্ষুয় ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরচিন্তা ত্যাগ করা উচিত নয়। ঈশ্বর অশ্রুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সর্বজীবের অশ্রু যোগাইতেছেন। পশুপক্ষীরা গোলা না বাঁধিলেও পরম্পিতা তাহান্নগকে নিয়মিতভাবে খাওয়াইতেছেন। অসহায় শিশুর জন্য মাতৃতন্যে দুগ্ধ আনিয়া দিতেছেন। তিনি আমায়ও অশ্রু

আনিয়া দিবেন’—এই সকল চিন্তা করিয়া ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাধন-ভজনে লাগিয়া যাইতে হয়। সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। টাকাকড়ি লোকবল ইত্যাদির উপর নির্ভর করিলে ঈশ্বর-বিশ্বাস শিথিল হয় ও আত্মবল কমিয়া যায়।

(১২) যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আজই করিতে আরম্ভ করা কর্তব্য। কতদিন শরীর থাকিবে তাহার ঠিকানা নাই। বৃদ্ধবয়সে সাধনার বাধা অনেক।

(১২) সাধনকালে ফলের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। যিনি যত ফলের আশা করেন, ফল তাহার নিকট হইতে তত দূরে পলায়ন করে। যিনি ফল-আশাশূন্য হইয়া কেবল কর্তব্যানুরোধে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া যান, তাহার শীঘ্র সিদ্ধি বা ফললাভ হয়। শাস্তিচিন্তে তত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। ফলের জন্য উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল চিত্তে তত্ত্ব আবৃত হইয়া পড়ে।

(১৩) মনকে স্থির করিবার জন্য নিজে অস্থির হইয়া উঠিলে কিরূপে মন স্থির হইবে? মন্তমাতঙ্গের ন্যায় মনকে ধৈর্য্যসহকারে ধীরে ধীরে বশে আনিতে হয়। অধিক জোর করিতে গেলে ফল বিপরীত হইবে।

(১৪) চতুর্দিক বশ এরূপ ঘরে স্থিত কোন প্রদীপের আলোক যদি কোন ছিদ্রপথদ্বারা বাহিরে আসে, তবে ঐ আলোককে রুদ্ধ করিতে হইলে যেমন ছিদ্রমুখে একটী অঙ্গুলীদ্বারা রুদ্ধ করা যায়, কিন্তু বহুদূরে গিয়া শবীরদ্বারাও রুদ্ধ করা যায় না, এইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া চিত্ত যখন বাহিরে বিষয়ে যাইতে চায়, তখন উৎপত্তি-মুখে উহাকে সহজে রুদ্ধ করা যায়, চিত্ত বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইলে উহাকে রুদ্ধ করা কঠিন হইয়া উঠে। একটী বৃক্ষকে অক্ষুরে নাশ করা সোজা, বৃক্ষাবস্থায় নাশ করা কঠিন। অতএব চিত্তের বহিমুখী অবস্থাকে উৎপত্তি-মুখেই নাশ করা কর্তব্য।

(১৫) দৃষ্ট একদিনের সাধনায় কিছুই হয় না। সাধনায় ধৈর্য্যসহকারে লাগিয়া থাকিতে হয়। আজ এক সাধনা, কল্য অন্য প্রকার, অপরদিন অন্যরূপ এইরূপ সাধনায় কোন ফলই হয় না। একটী সাধনা লইয়া ডুবিলেই

সিঁধি। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপই স্বচ্ছ, সুতরাং উহাতে ভাল করিয়া ডুবিলেই, উহার স্বরূপ প্রকাশ হয়। এষ্টটী প্রস্তরে যদি অবিরত বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে, কালে ঐ পাথরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইরূপ নিয়মিত ভাবে অঙ্গ সাধনাও ক'লে মোক্ষ আনিয়া দেয়।

(১৬) সাধনকালে কে কি বলে বা মনে করে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। পৃথিবীতে নানা প্রকৃতির লোক আছে, কেহ প্রশংসা করিবে, কেহ নিন্দা করিবে, কেহ বা ঠাট্টা করিবে। সন্তানকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে উহা সম্ভব হইবে না। আবার কাহারও নিন্দা বা প্রশংসাদ্বারা কোন ব্যক্তি প্রকৃত যাহা, তাহা হইতে কম বা বেশী হইয়া যায় না।

(১৭) সাধন বা জ্ঞানের গ্রহণকাৰ করিতে নাই, তাহা হইলে শিথিতে পারা যায় না বা অগ্রসর হওয়া যায় না। এই জগৎ আমাদের দর্শনাগার। এখানে প্রত্যেকেরই নিকট আমরা কিছু না কিছু শিথিতে পারি। ভগবানের রূপ এই বিশ্ব। কে জানে বিশ্বরূপী ভগবান্ কোন মূর্তিতে কি শিক্ষা দিয়া যান।

(১৮) 'অবগাই সিঁধি হইবে' এই বৃক্ষ লইয়া টিট্টিভপক্ষীর সমুদ্রশোষণের মত উৎসাহ লইয়া সাধন করা উচিত, তাহা হইলে সিঁধি হইবেই। আর যদি ভাবা যায় সিঁধিলাভ দৃষ্টির, তবে উহা দৃষ্টিরই হইয়া উঠিবে। ভগবান্ কম্পতরু—যে বেরূপ সংকল্পের দৃঢ়তা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দেন। এ বিষয়ে একটী গল্প আছে—একদা এক পখিক পরিগ্রাস্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে বিগ্রাম লইতেছিল। ঐ বৃক্ষটী কম্পতরু, (অর্থাৎ যে যাহা কামনা করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করে) তাহা সে জানিত না। সে ক্ষুধাক্ত হইয়াছিল, সুতরাং ভাবিতে লাগিল 'এখন কিছু খদ্য পাইলে ভাল হয়'। যেমনই সংকল্প তেমনই সিঁধি, অর্মানি খাদ্য উপস্থিত হইল। তখন সে ভাবিল, 'এখন বিছানা পাইলে শুইয়া একটু আরাম করি', ওর্মানি বিছানা আসিল। আবার সে ভাবিল, 'এখন একজন শ্রীলোক আসিয়া যদি পদসেবা করে ত ভাল হয়'। অর্মানি একজন

স্ট্রীলোক আসিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল। পথিক অতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার কি? যাহাই ইচ্ছা করিতেছি, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে'। তাহার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইল, সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক-কাণ্ড নয় ত? সে ভাবিতে লাগিল 'না, নিশ্চয়ই ইহা ভৌতিককাণ্ড; এই স্ট্রীলোকটী অবশ্যই ভূত, এ অবশ্যই আমাকে বিনাশ করিবে'। এই প্রকার সংকল্প যেমন সে করিয়াছে, অমনই স্ট্রীলোকটী ভূতরূপে তাহাকে ধ্বংস করিল। সুতরাং 'আমি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করিব' এই প্রকার দৃঢ় সংকল্প রাখিতে হইবে।

(১৯) মান্দ্র যতই পাপ করিয়া থাক্ না কেন, তথাপি তাহার উঠিবার উপায় আছে। এখন হইতে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া শূভকর্ম করা কর্তব্য। পুনঃ পুনঃ ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। প্রার্থনা বড় পুরুষকার।

(২০) 'বাহিরের লোক আমার সাধন-ভজনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে,' ইহা ভাবিয়া তাহাদের উপর ক্রোধ বা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। আমার সাধনার বিষয় আমি নিজে যত করি, অপরে তত করিতে পারে না। স্ট্রী, পুত্র, অর্থ কখনও আমাকে বলে না, 'আমাদিগকে আমার আমার ভাব'। আমি নিজেই ঐ প্রকার ভাবিয়া বশনে পড়ি ও কষ্ট পাই। ভাবিতে হইবে যে বিশ্বরূপী ভগবান আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মাতা, পিতা, স্ট্রী, পুত্র, মিত্র, শত্রু প্রভৃতিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। এই বুদ্ধিতে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিলে উহারা সাধনার বাধা উৎপাদন করিবে না বরং সহায়ক হইবে।

(২১) তাৎকালিক ব্যবহার দেখিয়া কাহাকেও পাপী বা পুণ্যাত্মা বলিয়া ঠিক করা উচিত নয়। কর্ম অনন্ত—মনে করুন কাহারও একলক্ষ কর্ম-সংস্কার আছে, উহার মধ্যে এক সহস্র সংস্কার অশুভ কর্মের, বাকী সংস্কার শুভ কর্মের। যখন অশুভ কর্মের সংস্কার ফল দিতেছে, তখন শুভ কর্মের সংস্কার অবিভূত আছে। অশুভ সংস্কার ফল দিতে থাকিলে কোন ব্যক্তিকে

তখন পাপী মনে হয়। আবার অশুভ সংস্কার ভোগদ্বারা ক্ষয় হইয়া শুভ সংস্কার কর্মফল দিতে থাকিলে পূর্বোক্ত ব্যক্তিকেই অতিশয় পুণ্যাত্মা মনে হয়। রত্নাকর, বিশ্বমঙ্গল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

(২২) ভোগোদগমে আচ্ছন্ন হইয়া অথবা কায়ক্লেশ ভয়ে 'সব ঈশ্বর-ইচ্ছা' বলিয়া আলস্যাবশতঃ শূভকর্ম হইতে বিরত হওয়া উচিত নয়। জীব চেতন, শূভও করিতে পারে অশুভও করিতে পারে। এবিষয়ে জীবের ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতা আছে। অশুভ সংকল্প বা কর্ম ত্যাগ করিয়া শূভ সংকল্প ও কর্ম করাই পুরুষকার। সংকল্প জড়, উহা চেতন আমার অধীন, উহা আমাকে পরাভূত করিবে কিরূপে? যদি কেহ সাধনার উচ্চ কোঠায় উঠিয়া সম্যক্ অহংকার ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবেই তাহার 'সব ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলা সাজিবে, নতুবা নহে। যে শূভ ইচ্ছা কার্যো পরিণত হয়, উহা বন্দ্যা ইচ্ছা, যাহা কার্যো পরিণত হয় না, উহা বন্দ্যা ইচ্ছা।

(২৩) প্রতিদিন ৩ বার, অন্ততঃ সকালসন্ধ্যা দুইবার, আসনে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া প্রণব, ইষ্টমন্ত্রাদি কিছুক্ষণ জপ করা কর্তব্য। এইরূপ অভ্যাসে চিত্ত স্থির হয়, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

(২৪) গুরুপদেশমত শাস্ত্রান্ত উপায়ে গুণ্ঠিভ্যান, বিশুদ্ধভ্যান, গুরুপাদদুকাভ্যান প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়। একবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যস্ত হইলে অন্য বিষয়েও চিত্তকে একাগ্র করা যায় যেমন অস্তের দ্বার দেওয়া হইলে উহাদ্বারা সব কাটা যায়। একাগ্রচিত্ত যাহার উপর পড়ে, তাহার তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ হয়। অনেকে বলেন, ধ্যানকালে যত বিষয়চিত্তার উদয় হয়। ইহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। অন্যকালেও শতসহস্র বিষয়চিত্তা মনে উঠে। কিন্তু জীব তৎকালে চিত্তের সহিত বদ্ধভাবে মিলিয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ ঐ চিত্তাগর্ভাল লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু ধ্যানকালে যাতা জীব চিত্তস্থিত ঐ চিত্তাগর্ভালকে বাধাকারী শত্রুর মত মনে করে, তাই উহাদিগকে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারে। ইহা চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। মলিন দর্পণে সম্মুখস্থ বস্তুর ছাপ ফোটে না,

দর্পণ যতই পরিষ্কার হয়, ততই সম্মুখের বস্তুগুলি উহাতে ফুটিয়া উঠে। চিত্তস্থ চিন্তাগুলিকে দেখিতে পাইলে উহাদের নাশ করা সম্ভব হয়। দেখিতে না পাইলে তাহা হয় না। সুতরাং উহাতে হতাশ না হইয়া গুরুদ্বাকো দৃঢ় শ্রম্য রাখিয়া পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে ধ্যান করা কর্তব্য। ইহাতে ক্রমশঃ চিত্তকে জয় করা যায়।

(২১) মনের উপর লক্ষ্য করিতে অভ্যাস করা কর্তব্য। মন স্থির করিবার ইহার মত উত্তম ও সহজ সাধনা আর নাই। স্বয়ং দৃষ্টাভাবে থাকিয়া মন কি করে, দেখিয়া যাইতে হয়। মনের নৃত্যে যোগ না দিয়া কেবল দেখিয়া যাওয়া কর্তব্য। চোর যেমন ঘুমন্ত গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করে, মনও তেমনই বেহুঁস জীবের আত্মরত্ন চুরি করে। মন বড় যাদুকর—কেহ মনের উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন, কোন সময় অকস্মাৎ অলক্ষ্যে মন তাঁহাকে বেহুঁস করিয়া দিবে, তখন তিনি মনের তালে নাচিতে থাকিবেন। সুতরাং পুনঃ পুনঃ সাবধান হইয়া আগতুক মনকে লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। মন যখন দেখিবে গৃহস্থ জীব জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে স্বয়ংই পলাইবে।

(২২) প্রত্যহ আত্মবিচার কর্তব্য। জড় দেহানি বা অন্য বিষয়সকল মিথ্যা ও আত্মার উপর কল্পিত জানিয়া উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আত্মসংস্থ হইতে চেষ্টা করা উচিত। ভাবিতে হইবে, আমি তিন দেহের সাক্ষী আকাশবৎ নির্লিপ্ত শূন্যচেতনা। যেমন জলের উপর তরঙ্গ খেলা করে, এইরূপ চেতনা আমার উপর স্বভাবতঃ মনের একটী বৃত্তিরূপ তরঙ্গ উঠিয়া খেলা করিতেছে ও পুনরায় আমাতেই লয় পাইতেছে, আমার কখনও লয় হয় না। যেমন জল ছাড়া তরঙ্গের পৃথক্ সত্তা নাই, এইরূপ আমি ভিন্ন জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। তরঙ্গ মিথ্যা, যেহেতু উহা উদয়-অস্তশীল, জলই সত্য, এইরূপ মন মিথ্যা চৈতন্যরূপ আমিই সত্য। জলই তরঙ্গাকারে দৃষ্ট হয়, এইরূপ চৈত্ বা জ্ঞানস্বরূপ আমিই মাত্রাপ্রভাবে জগদ্রূপে দৃষ্ট হই। আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না কিন্তু জগতের উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। জগৎ বাদ পড়িলেও আমি থাকি। আমি

স্বভাবতঃ শূদ্র, বৃদ্ধ, মূক ও চেতন-স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম। এই ভাব দূত করিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষৎ, শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী, অষ্টাবক্রসংহিতা, অবশুত গীতা প্রভৃতি পাঠ করা বস্তু বা। বিচার দ্বারা যত যত মনোরূপ সপক্ষে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, ততই উহার দংশনজ্বালাও আর অনুভূত হয় না; ক্রমশঃ আত্মসাক্ষাৎকারে মন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, আর উহাকে দেখা যায় না বা দেখা গেলেও উহাকে মৃতসৈনিক জানিয়া উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তি হয় না। বিচারই আচার্য্য শঙ্করের মতে রাজযোগ। শূদ্রচিত্ত পুরুষ রাজযোগের অধিকারী। সাক্ষী শূদ্র চেতন্য চিত্তের যে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ, উহাই নির্দিষ্টাঙ্গন, উহাই যোগ এবং উহাই প্রকৃত ভক্তি। গীতায় “মামেব য়ে প্রপদ্যন্তে” বাক্যে এই প্রকার সাক্ষিপরাঙ্গন হইতে বলা হইয়াছে। এই যোগ অভ্যাসকালে সাধক ‘আমি পাপী, তাপী, দুঃখী’ ইত্যাদি মনে করিবেন না, কারণ ভাবানুরূপ সিদ্ধি হয়। তাপ, দুঃখ প্রভৃতি মনের হুম্ম। মন প্রকৃতিজাত। ‘আমি পাপী, তাপী’ প্রভৃতি ভাবিলে মন বা প্রকৃতির প্রপন্ন হওয়া হইল। মায়ার প্রপন্ন হইলে ময়া ছাড়িবে কেন? আমি শূদ্র, বৃদ্ধ, নিত্যমূক চেতন্য এই প্রকার ভাবনাদ্বারা খণ্ড আমি বা ‘ক’টা আমিকে শূদ্র চেতন্য লয় করাই ভগবানের প্রপন্ন হওয়া। এই প্রকার প্রপন্ন ভবই ঈশ্বর-কৃপায় প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া মায়ার হাত হইতে পরিচোণ পান। এই রাজযোগ শূচি অশূচি যে কোন অবস্থায় ও যে কোন স্থানে করা যাইতে পারে। ইহা সদ্যোন্মোক্ষপ্রদ এবং পরম পবিত্র। ইহা করা সহজ, কিন্তু ইহার ফল অব্যয়। অধিকারী, শূদ্র-চিত্ত ও মৃদুস্বভাব সাধকের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

— — —

যোগ

“সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সৰ্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেশ্বিন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বন্দ্বধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥”

গীতা ৬:২৪।২৫ ।

অর্থাৎ ‘সংকল্পপ্রভাব কামনাসকলকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সব দিক্ হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিম্বারা ধীরে ধীরে চিত্তকে উপরত করিবে। মনকে আত্মসংস্থা করিয়া আর কিছ্ চিন্তা করিবে না।’

প্রথমে বাক্যকে সংযত করিয়া মনে আনয়ন কর। নানাপ্রকার বাক্য আর বলিও না কিন্তু বাহিরের বাক্য বশ করিলেও মন ভিতরে ভিতরে কথা বলিবে, বহু কল্পনা-জল্পনা তুলিবে। সুতরাং বাক্যবৃদ্ধির নিরোধ হইলেও মনোবৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকিবে। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, অতএব ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে গুটাইয়া আন। সমস্ত বিষয়-চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ের মূলে মন আছে, মনকে বাদ দিয়া উহারা থাকিতে পারে না। অতএব মন উহাদের কারণ। কার্য্য বাদ দিয়া কারণে আইস। আবার মনের মূলে ‘আমি বা অহং’ আছে। আমি নাই অথচ মন আছে, ইহা সম্ভব নয়। সর্বপ্রকার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া এই ‘অহংতত্ত্বে’ আইস। যখন ‘অহং’ এর মূখ্য বিষয়ের দিকে, উহা তখন স্পষ্টাকার ইহাই বিশেষ অহংকার। কিন্তু ‘ঐ বিশেষ অহংকারকে’ (স্পষ্ট আমি ভাবকে) সন্দর্ভিত কর সময় অনুভব করা যায় না, সুতরাং উহা উদয়-অস্তশীল, সুতরাং মিথ্যা।

উহাকে ত্যাগ করিয়া যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা ঐ খণ্ড অহংকারের উদয়, অস্ত ও স্থিতি জানিতে পারা যায়, উহার দিকে বুদ্ধির মূখ ফিরাও। বুদ্ধি যেমন যেমন বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া চৈতন্যে সমাহিত হইতে থাকিবে, তেমনি তেমনি ঐ খণ্ড ‘আমি’ ভাবটী অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হইয়া পড়িবে। এ অবস্থায় ‘কে আমি, কোথায় আমি’ প্রভৃতি বিশেষভাব থাকে না। কেবল ‘আছি’ মাত্র এতাবৎ অনুভূতি হয়। এই সর্বত্র অনুদ্রুত অহংকারকে সামান্য অহংকার, সমষ্টি-অহংকার মহান্ বা হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। বিশেষ অহংকারকে উহার কারণ সামান্য অহংকারে নিরোধ কর। অতঃপর সামান্য অহংকারকে নিরূপাবিক, সর্বান্তর, চৈদেকরস, শাস্ত আত্মায় নিরুদ্ভ করিয়া ‘আত্মাই সব, আত্মা-বতীত কিছই নাই’, এইরূপে মনকে আত্মসংস্থ করিয়া আর অন্য কিছ চিন্তা করিও না অর্থাৎ আত্মা, অনাত্মাকে, বৈত, অবৈত, সত্য মিথ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞান প্রভৃতিকে আর বস্তির বিষয়ীভূত করিও না। ইহাই গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ২৪-২৫ শ্লোকে বর্ণিত আত্মসংস্থযোগঃ। ইহাই নিরোধ বা নির্বিকল্প সমাধি। বারদ্রুদ্যাহানে প্রদীপ যেমন কম্পিত না হইয়া নিশ্চলভাবে ধারণ করে, এতদবস্থায়ও চৈত ঐরূপ নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয় এবং আত্মাতেই স্থিতিলাভ করে। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, মহন্তত্ব-ক্ষেত্রে বিচার চলে না। জীবের বুদ্ধি পুনরায় অহংতত্ত্বে নামিয়া আসিলে মহন্তের অনিত্যতা বিচার করিতে হয়। আত্মাতে মহৎ বা অণু, ব্যাপ্য বা ব্যাপক ইত্যাদি ভাব নাই। উহারা প্রকৃতক্ষেত্রে বর্তমান থাকে, সূত্রাং মিথ্যা। পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা ‘মহন্তত্বক্ষেত্র মিথ্যা’ এইরূপ দৃঢ়সংস্কার লাভ করিলে সমাধিকালে অবুদ্ধি-পূর্বক (বিচার ব্যতীতই) ঐ ক্ষেত্র ভেদ হইয়া নির্বিকল্প চৈতন্যে স্থিতি লাভ হয়। ষাঁহারা সাতিশ বৈরাগ্যবান্ ও গুরুচিহ্ন তঁাহাদের বিচারদ্বারা দৃঢ়রূপে জ্ঞাতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, সূত্রাং চিন্তা স্বতঃই ভগৎ হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে নিরুদ্ভ হইয়া যায়। আর ষাঁহাদের তাদৃশ বৈরাগ্য নাই ও চিন্তাশুদ্ধি হয় নাই, তঁাহারা যোগ ও বৈরাগ্যের অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ চিন্তাশুদ্ধি

লাভ করিলে 'বিবেকখ্যাতি'র অর্থাৎ প্রকৃতি পদ্রুপের প্রকৃত বিবেকের উদয় হয় এবং পদ্রুপতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ইহার পর তিনগুণে বিতৃষ্ণা আসায় চিত্ত স্বতঃই নিরুদ্ভব হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে :—“যচ্ছৈদ্বাৎমনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছৈজ্ঞ জ্ঞান আত্মনি।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছৈত্তদ্যচ্ছৈচ্ছাস্ত আত্মনি” ১।৩।১০

অর্থাৎ 'প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রথমে বাক্যকে মনে, পরে মনকে জ্ঞানাত্মায় বা বৃদ্ধিতত্ত্বে বা অহংতত্ত্বে, পরে অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে এবং শেষে মহত্তত্ত্বকে শাস্ত আত্মায় নিরুদ্ভব করিবেন।'

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্ত নিরোধের সাধনসকল সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উহা প্রদর্শিত হইল :—

মহর্ষি প্রথমেই বলিলেন—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।” ১।২। অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধকেই যোগ কহে। এখন চিত্তবৃত্তি কহাকে বলে, তাহা বলিতেছি। যেমন কোন পদার্থকারণীর জল নালা দিয়া বাহিরে গিয়া চতুষ্কোণ বা গোল প্রভৃতি যেরূপ ক্ষেত্রে পড়ে সেই আকারই ধারণ করে, এইরূপ আমাদের অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয় প্রণালীদ্বারা বাহিরে গিয়া ঘটাদি বিষয়ের উপর পড়ে এবং ঐ বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। বিষয়-আকারে আকারিত ঐ চিত্তই ঘটাদি বিষয়ক চিত্তবৃত্তি। কিন্তু চিত্তবৃত্তি আকারমাত্র ও জড়। যেমন অগ্নি গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারের লৌহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে প্রকাশ করে, এরূপ জীবচৈতন্য বা চিদাভাস (যিনি স্বরূপ-চৈতন্যের আলোকে আলোকিত ও প্রকাশস্বভাব) বৃদ্ধির ঐ আকারের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ চিত্তবৃত্তিকে জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রকাশ করেন, ইহাই ঘটাবিসয়ক বৃত্তিজ্ঞান। (এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে)। এইপ্রকার আমাদের অসংখ্য বস্তুর জ্ঞান হইতেছে, ঐ খণ্ড খণ্ড বস্তু বিষয়ক এক একটি জ্ঞান এক একটি চিত্তবৃত্তি। ঘটজ্ঞান হইবার পর ঐ জ্ঞানের সংস্কার বীজভাবে আমাদের চিত্তে লুকুইয়া বাস করে, উহাই বাসনা। যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান ধরা

থাকে, পিন্ লাগিলেই বাজিয়া ওঠে, এইরূপ আমাদের চিত্তে অনন্ত বাসনা-বীজ রহিয়াছে, এক একটী অনকুল কারণের সাহায্য পাইয়া উহারা ফুটিয়া উঠে। ঘট সামনে না থাকিলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ ঘটাকার্যবৃত্তির উদয় হয়। সমুদ্রে যেমন অসংখ্য ঢেউ উঠে ও লয় পায়, এইরূপ অসংখ্য বৃত্তি আমাদের চিত্তে উঠিতেছে আবার লয় পাইয়া চিত্তে বাসনারূপে বীজভাবে অবস্থান করিতেছে। লোকে যেমন বৃত্তিদ্বারা জীবিত থাকে, চিত্তও এইরূপ বৃত্তিদ্বারাই জীবিত থাকে। বৃত্তিশূন্য হইলে চিত্ত নানাপ্রাপ্ত হয় এবং চিত্তই অবশিষ্ট থাকেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ।

এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফল কি? তাহার উত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন :

“তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্”। ১১৩

অর্থাৎ ‘তখন দ্রষ্টা নির্বিকল্পস্বরূপে অবস্থান করেন’। বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে কি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—“বৃত্তিনারূপ্যমিতরত্”। ১১৪। অর্থাৎ ‘অন্য সমস্ত (যেমন স্ফটিকের নিকট জ্বা পুষ্প ধরিলে স্ফটিক প্রকৃতপক্ষে লোহিত না হইয়াও লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়) শব্দশ্রুতেন দ্রষ্টা বৃত্তির সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিজের শব্দ, অঙ্গ স্বরূপটি ভুলিয়া গিয়া বৃত্তিশূন্য শব্দদুঃখাদি দ্বারা যেন নিজেও সুখী দুঃখী হইয়া পড়েন’।

বৃত্তিসকলকে * মহর্ষি দুইটি প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) ক্রিষ্টবৃত্তি (২) অক্রিষ্টবৃত্তি যে সকল বৃত্তি আত্মা ও অনাত্মার অব্যবহিক আনিয়া

বৃত্তি পঞ্চবিধ :—(১) প্রমাণ (২) বিপর্যয় (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা (৫) স্মৃতি। প্রমাণ চিহ্ন (সাধ্যমতে) :—

(ক) প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়দ্বারা ঘটাদি পদার্থের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ঘটিলে, যে বৃত্তি জ্ঞান ও ব্যক্তির মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ নিশ্চারণ করে, উহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে।

(খ) অনুমান প্রমাণে বস্তুটী দৃষ্ট না হইলেও উহার লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখিয়া বস্তুর সত্তা নিরূপণ করা হয়। যেমন ‘পশ্চাতে বাহি আছে, যেহেতু সেখানে ধূম দেখা যাইতেছে’। এখানে বাহি দেখা যায় নাই। উহার লিঙ্গ বা চিহ্ন ধূম দেখিয়া উহার অনুমান করা হইতেছে। এইরূপ অনুমানে ‘যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে অগ্নিও

জীবকে সংসার-বন্ধনের দিকে লইয়া যায়, উহারা ক্রিষ্ট বৃত্তি এবং যে সকল বৃত্তি আত্মা ও অনাত্মার বিবেক উৎপাদন করিয়া জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যায়, উহারা অক্রিষ্ট বৃত্তি।

ক্লেশ পাঁচটী—(১) অবিদ্যা (২) অস্মিতা (৩) রাগ (৪) দ্বেষ (৫) অভিভাবিকা ।

অবিদ্যা—আত্মস্বরূপকে না জানা । অবিদ্যার জন্য অনিত্য ও অশুদ্ধি দেহাদি বস্তুকে নিত্য ও শুদ্ধি বালিয়া ভ্রম হয় ।

অস্মিতা—আত্মস্বরূপ না জানার জন্য অর্থাৎ অবিদ্যার জন্য দ্রুটা পুরুষ, প্রকৃতির বিকার বৃন্দ্রস্বরূপ সহিত যেন একাকার-ভাব প্রাপ্ত হন । দ্রুটা ও দৃশ্যের এই যে অব্যবহিক বশতঃ একাত্মতা, ইহাই ‘অস্মিতা’ ।

রাগ—অস্মিতার কার্য্য রাগ । বৃন্দ্রস্বরূপ যে বৃত্তি সত্বকে স্মরণ করিয়া উহা পাইবার লোভ করে উহা ‘রাগ’ । রাগ = অনুকূল বিষয়ে আসক্তি ।

দ্বেষ—পুঙ্খ দ্রুখে স্মরণ করিয়া উহার প্রতি যে প্রতিকূল ভাব উহাই ‘দ্বেষ’ ।

থাকে, এইরূপ জ্ঞান আবশ্যক : উহার নাম ব্যাপ্তি-জ্ঞান । অনুমান-প্রমাণে জ্ঞাতির জ্ঞান হয়, ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না । “পৰ্ব্বতো বহিমান্” এস্থলে পর্বত পক্ষ, বহি সাধ্য ।

(গ) আগমপ্রমাণ—বেদ, শাস্ত্র বা অদ্রাস্ত ব্যাপ্তির বাক্য ।

(২) বিপর্য্যয়-বৃত্তি—যে বস্তুর স্বরূপ যে-রূপ সেইরূপ জ্ঞান না হইয়া অন্যরূপ যে মিথ্যা জ্ঞান, উহা বিপর্য্যয়-বৃত্তি । যেমন রত্নরূপে সপ-জ্ঞান ।

(৩) বিকল্প-বৃত্তি—শব্দমাগ্নকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, বাহার অবলম্বনস্বরূপ কোন বস্তু নাই, উহা বিকল্প বৃত্তি । যেমন :—বন্দ্যাপুত্র, অশ্বভিষেক ইত্যাদি ।

(৪) নিদ্রাবৃত্তি—যে বৃত্তি অভাব-প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া স্থিত থাকে ।

(৫) স্মৃতিবৃত্তি—পূর্বাভিভূত বিষয়ের যে অত্যাগ বা অনুভবজনিত অনুসন্ধান, উহাই স্মৃতিবৃত্তি ।

অভিনিবেশ—পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারের জন্য যে মৃত্যুভয়, উহাই 'অভিনিবেশ'। যেমন রস কোন ভূমিকে আগ্রা রাখে এবং আগ্রা ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, এইরূপ ক্রেশ হইতেছে চিত্তভূমির রসস্বরূপ; ক্রেশযুক্ত চিত্তভূমিতে কস্মীবীজ উপস্থিত হইলে সুখদুঃখাদিপ্রদ জন্মের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। যেমন কোন বাগের মূল পূর্ব হইতে অন্যান্য পর্বের উৎপত্তি হয়, এইরূপ অবিদ্যারূপ মূল পূর্ব হইতে অশ্মিতাদি ক্রেশের উৎপত্তি হয়। অবিদ্যার নাশ হইলে সমস্ত ক্রেশের নাশ হয়। বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ দৃষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্যজগৎ অত্যন্ত ভিন্ন, এই প্রকার বিবেকের দ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎ হইলে অবিদ্যার নাশ হয়।

বৃত্তিসকলের কিরূপে নিরোধ হয়? মহর্ষি বলিলেন :—

“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তস্মিন্নিরাধঃ।” ১।১২

অর্থাৎ ‘অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা উহাদের নিরোধ করা যায়’। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন ‘অভ্যাসেন তু কোত্তর ! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।’ ৬৩৫। অর্থাৎ ‘হে কোত্তর ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চঞ্চল মনের নিগ্রহ করা যায়।’ অভ্যাস কি? তদন্তরে মহর্ষি বলিলেন “তন্মহিতৈ যজ্ঞোহভ্যাসঃ” ১।১৩ অর্থাৎ ‘যোগে দ্বিহিতলাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন বা চেষ্টাকে অভ্যাস বলে।’ পরে বলিলেন “স তু দীর্ঘকাল-নিরন্তর্য-সংকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ” ১।১৪। অর্থাৎ ‘সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত অনুরূপ হইলে তবে উহা দৃঢ়ভূমি হয় বা স্থিরতা লাভ করে।’

বৈরাগ্য কি? মহর্ষি বলিলেন, “দৃষ্টান্দ্রাবিকবিষয়বিতৃষ্ণা বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।” ১।১৫ অর্থাৎ ‘দৃষ্ট এবং শাস্ত্রে শ্রুত বিষয় সকলের ভোগের প্রতি যে বিতৃষ্ণা উহাই ‘বশীকার’ নামক বৈরাগ্য। বিষয় সকল দুই প্রকার (১) দৃষ্ট (২) আনন্দশ্রবিক।

(১) দৃষ্ট—যে বিষয় দেখা যায় যেমন :—ক্ষেত্র, বিত্ত, পশু, স্ত্রী, পুত্র, অন্নপানাদি। (২) আনুশ্রবিক—যে বিষয় চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র শুনিয়ে সাহাদের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যেমন বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে পুণ্যফলে স্বর্গে গিয়া অমৃতপান, অমরত্বাদির সহিত ক্রীড়া প্রভৃতি নানাবিধ ভোগের কথা উল্লিখ আছে। ভোগসকল ক্ষণস্থায়ী পরিণামে দুঃখপ্রদ, ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই। পৃথিবীর সমস্ত ভোগও একজনের ভোগের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, ভোগে আকাংক্ষা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতির কারণ, ইত্যাদি প্রকার বিচারদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দোষদর্শন করিতে করিতে সমস্ত ভোগের উপর বিতৃষ্ণা বা উপেক্ষা-বুদ্ধি আসিয়া থাকে। যখন দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক ভোগে সন্তোষ থাকে না, তখন বৈরাগ্য বশ হইয়াছে বলা যায় ; ইহা হইল ‘অপরবৈরাগ্য’। ইহাতে পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু বিবেক-খ্যাতির পর ‘পরবৈরাগ্যের’ উদয় হয়।

অষ্টাঙ্গ-যোগ।

এক্সে অভ্যাস সম্বন্ধে মহর্ষি কি বলিলেন দেখা যাউক। মহর্ষি বলিয়াছেন :—‘যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঃস্টাবঙ্গানি’ । ২। ২৯ অর্থাৎ ‘সম্প্রজ্ঞাত যোগের ৮টী অঙ্গ। যথা :—(১) যম (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি। যম—“অহিংসাত্যাগেতঃস্বস্ত্যচর্যাঃপরিগ্রহা যমাঃ” । ২।৩০। অর্থাৎ (১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অস্তেয় (৪) ব্রহ্মচর্যা (৫) অপরিগ্রহ, এই পাঁচটির নাম ‘যম’।

অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যদ্বারা পরপীড়াবজ্ঞানই ‘অহিংসা’। হিংসা, কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিবিধ হইতে পারে। কোন হিংসা নিজে করিলে উহা কৃত হিংসা। হিংসা নিজে না করিয়া অপরের দ্বারা করাইলে উহা কারিত হিংসা। হিংসা কৃত বা কারিত না হইলেও যদি উহার

অনুমোদন করা হয়, তবে উহা অনুমোদিত হিংসা। অহিংসা পালনে এই ত্রিবিধ হিংসাই বর্জনীয়। অহিংসা যদি কোন জাতি, দেশ বা কালে নিবন্ধ না হয়, তবে ঐ অহিংসা সার্বভৌম মহাব্রত হইল। (ব্রাহ্মণ জাতিকে হিংসা করিব না, অন্য জাতিকে হিংসা করিব, এই প্রকার অহিংসা জাতিতে নিবন্ধ। বারানসী আদি পূণ্যদেশে হিংসা করিব না, অন্যস্থানে করিব, এই প্রকার অহিংসা দেশে নিবন্ধ। পূণ্যকালে হিংসা করিব না, এই প্রকার অহিংসা কালে নিবন্ধ। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই অহিংসক যোগীর নিকট পরস্পর বৈরভাবাপন্ন জীবগণ উহাদের বৈরভাব ত্যাগ করে।

স্মরণ রাখা উচিত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মবৃদ্ধ যজ্ঞে শাস্তানুমোদিত পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নহে। আবার প্রারম্ভবেগে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি কোন হিংসা বা অহিংসার কার্য করেন, তবে উহাতে তাঁহার পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না। বাহ্য লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানিগণকে কর্মের কর্তা মনে হইলেও জ্ঞানীর স্বীয় পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি সর্বদা অকর্তা।

সত্য—যেমনটী, দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমোদিত হইয়াছে ঠিক তাহাই না বাড়াইয়া বা না কমাইয়া ষথার্থ ভাষণের নাম সত্য। মন পুরুষ, বাক্ জায়া সত্যী স্ত্রী যেমন স্বামীর অনঙ্গমন করে, এইরূপ বাক্যেরও মনের অনঙ্গমন করা উচিত। অর্থাৎ মনে এক, আর মুখে এক হইলে চলিবে না। নতুবা অসত্যী স্ত্রী যেমন জারজ সন্তান প্রসব করে, মনের অননঙ্গামী বাক্ও সেই প্রকার মন্দফল প্রসব করে। কিন্তু ষথার্থ ভাষণ হইলে যে বাক্য অপরের প্রাণনাশক, অথবা বহুলোকের ক্ষতি করে, উহার, ফল মিথ্যা-ভাষণের তুল্য। সত্য ভাষণের ফল বাক্‌সিদ্ধি।

অস্তর—কলপূর্বক বা গোপনে অপরের ধন অপহরণ না করাকে ‘অস্তর’ বা অসৌন্দর্য বলে। অস্তর প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সকল রত্ন উপস্থিত হয়। যেহেতু যোগী তখন সকলের বিশ্বাসপাত্র হন। লোকে

দেখে যে, ইহার নিকট ধনরত্নের অপবাবহার হইবে না, সেইজন্য তাহাকে দান করিয়া কৃতার্থ হয় ।

ব্রহ্মচর্য্য—উপস্থসংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য । শৃঙ্গ উপস্থ-সংযম নহে, ব্রহ্মচর্য্যসাধনে অস্ত্রোঙ্গ মৈথুনও পরিত্যাজ্য । অষ্টাঙ্গ মৈথুনঃ—

“স্মরণং কীর্ত্তনং কৌলঃ প্রেক্ষণং গৃহ্যভাষণম্ ।

সংকল্পপাহাধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ॥”

অর্থাৎ ‘স্ট্রীলোকদিগের স্মরণ, কীর্ত্তন, উহাদের সহিত বিহার, লোভ-পূর্ব্বক উহাদিগকে দেখা, উহাদের সহিত গৃহ্যভাষণ, উহাদের বিষয় সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি’ মৈথুন এই আট প্রকার । মিতাহার, সংসঙ্গ স্ট্রীলোকদিগকে জগদম্বার মূর্ত্তি জানিয়া উহাদিগকে মাতৃভাবে দর্শন, ভোগের অনিত্যতা চিন্তন, আপনার মৃত্যুচিন্তা, আসনে বসিয়া জপ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য সাধনের সহায়ক । বৃদ্ধির সম্বন্ধে ব্রহ্ম বিচরণ, উচ্চস্তরের ব্রহ্মচর্য্য । ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর বীৰ্য্য লাভ হয় ।

অপরিগ্রহ—দেহযাত্রা নির্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুর গ্রহণ না করাকে ‘অপরিগ্রহ’ বলে । অপরিগ্রহ শৈথর্য্যলাভ করিলে যোগী পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন, ভবিষ্যতে কি হইবেন, এই শরীর কিরূপে আসিল ইত্যাদি জানিতে পারেন । অপরিগ্রহ অভ্যাসদ্বারা যোগীর দেহ ও দেহ-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিনিবেশ কমিয়া যায় । দেহে অভিনিবেশবশতঃ জীব দেহ লইয়া বা দেহসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে । সুতরাং অন্যান্য জন্মের সংস্কার তখন অভিভূত থাকে । দেহে অভিনিবেশ কমিলে পূর্ব্বজন্মের বা ভবিষ্যৎ জন্মের কথা স্মরণ হইতে পারে ।

(২) **নিয়ম**—‘শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রণিধানানি নিয়মাঃ’ ২।৩২ ।

অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম ।

শৌচ—মৃত্তিকা জল প্রভৃতিদ্বারা এবং পবিত্র আহার দ্বারা শরীরের শুচিতা রক্ষা করিতে হয়—ইহা বাহ্যশৌচ। মৈত্রী, করুণা, মৃদিতা প্রভৃতি-দ্বারা চিত্তের মলকালন, আভ্যন্তর শৌচ। (সুখী প্রাণীর প্রতি মৈত্রী বা মিত্রতা, দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মৃদিতা বা হর্ষ এবং অপুণ্যবানের প্রতি উপেক্ষা-বর্ষি আনিলে চিত্ত নিঃশ্রম হয়)। উক্ত উভয়বিধ শৌচেই ‘শৌচ’ শব্দের অর্থ। শৌচ পালন করিতে করিতে দেখা যায়, শরীরের যতই শুচিতা করা যাউক না কেন, উহা আবার অশুচি হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা স্বভাবতঃ অশুচি। উহার শুদ্ধি অসম্ভব। সাধকের তখন শরীরের উপর ঘৃণা জন্মে এবং অপরের শরীরের সহিত সংগ করিতে ইচ্ছা হয় না।

সন্তোষ—সম্ব্যবসায় মনের তৃপ্তিই সন্তোষ। যাহার সন্তোষ লাভ-হইয়াছে, তিনি নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।

তপঃ—কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি পালন এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি ষণ্ড-সহনকে তপঃ বলে। তপঃ সিদ্ধি হইলে অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধিসকল (যেমন অগ্নিাদি কার্যসিদ্ধি এবং দূরত্বশ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি) লাভ হয়।

স্বাধ্যায়—বেদপাঠ, প্রণব বা ইষ্টমন্ত্রজপ স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎলাভ হয়।

ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমগুরু, পরমেশ্বরে সম্ব্যকস্মের অর্পণ হইলে ‘ঈশ্বরপ্রণিধান’। ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা ঈশ্বরকৃপায় সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) **আসন**—“শিরশ্চুখমাসনম্”। ২৪৬ শির ও শ্রুখাবহ অবস্থিতির নাম ‘আসন’। যাহার উপর উপবেশন করা যায়, যেমন মৃগচর্ম, কম্বল প্রভৃতি, উহা আসন। আবার সাধনের সুবিধার জন্য যাহাতে নিদ্রা আলস্যাদি না আসে, শরীরের এইপ্রকার অবস্থানও আসন। শেষোক্ত আসনের

বহুপ্রকার ভেদ যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । মাত্র কয়েকটী নিম্নে দেওয়া হইল ।

- (ক) **পদ্মাসন**—বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ স্থাপিত করিয়া মেরুদণ্ড সরল করিয়া উপবেশন করা পদ্মাসন ।
- (খ) **বীরাসন**—একচরণ এক উরুর উপর স্থাপন করত অন্য চরণ উরুর নীচে রাখিলেই উহা বীরাসন হইল ।
- (গ) **স্বস্তিকাসন**—জানুয়ুগল ও উরুয়ুগলের মধ্যে পদতলদ্বয় বিন্যাস করত ত্রিকোণাকার আসন বন্ধন-পূর্বক সরলভাবে উপবিষ্ট হইলেই উহা স্বস্তিকাসন হইল ।
- (ঘ) **সিদ্ধাসন**—গুল্ফ দিয়া যোনিদেশ সংপীড়িত করিয়া গুল্ফান্তর উপস্থের উপরিভাগে রাখিবে এবং হৃদয়োপরি চিবুক সংস্থাপিত করিবে । পরে নিশ্চল ও সরল-দৃষ্টি হইয়া লুঙ্গের মধ্যভাগ দর্শন করিবে, ইহাই ‘সিদ্ধাসন’ । উপযুক্ত প্রত্যেক আসনেই মেরুদণ্ড সরল থাকিবে এবং মূখ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে হইবে ।
- (ঙ) **শবাসন**—চিৎ হইয়া ভূমিতে শবৎ অবস্থানই শবাসন । ইহা শ্রমনাশক । ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস লইতে হইবে ।
- (চ) **প্রাণায়াম**—“তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্যতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ” ২।৪৯। অর্থাৎ আসন হিঁর লইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে । প্রাণায়াম ত্রিবিধ :—(১) বাহ্যবৃত্তি (২) আভ্যন্তরবৃত্তি ও (৩) স্তম্ভবৃত্তি ।
- (১) **বাহ্যবৃত্তিপ্ৰাণায়াম**—শরীরস্থ বায়ুকে প্রশ্বাসের দ্বারা বাহির করিয়া দিয়া উহাকে বাহিরে ধারণ করার নাম বাহ্যবৃত্তি-প্রাণায়াম ।
- (২) **আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম**—বাহ্যবায়ুকে শ্বাসদ্বারা টানিয়া উহাকে ভিতরে ধারণ করার নাম আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম ।
- (৩) **স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম**—যখন শ্বাস বা প্রশ্বাসের প্রযত্ন নাই, কেবল বিধারণ প্রযত্নের সাহায্যে প্রাণের গতিবিচ্ছেদ হয়, উহা স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম । যেমন

তপ্ত প্রস্তরে জল নিষ্কিপ্ত হইলে তাহা সৰ্বদিকে সঞ্চারপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ
স্তম্ভবৃত্তিতে অপর দুইটী বৃত্তির যুগপৎ অভাব হয়।

আহার সংযম, ব্রহ্মচর্যা-পালন ও নাড়ীশুদ্ধি করিয়া সদংগুরের উপদেশমত
নিশ্জ'নে ধীরে ধীরে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কৰ্ত্তব্য। কদাচ যের প্রয়োগ
করিতে নাই : পুস্তক পাঠ করিয়া নিজে নিজে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে
যাওয়া ঠিক নহে, উহাতে কঠিন রোগাদি হইতে পারে। ভক্তির সাধনায়,
কিংবা ধ্যান ও বিচারদ্বারা সহজেই (আপনা হইতেই) প্রাণ-বায়ুর বোধ
হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে বলিয়াছেন—
মিথ্যাভজ্ঞানে প্রপণ্ডের নিষেধই রোচক। সৰ্বত্র ব্রহ্মমাত্রই আছেন, এই বৃত্তি
পূরক। আর ঐ বৃত্তি যখন বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না,
নিশ্চলভাবে ধারণ করে, তখন উহা কুন্তক। যাহা হউক প্রাণায়ামের ফল
মহর্ষি বলিয়াছেন যে উহাদ্বারা বুদ্ধিসত্ত্বের আবরণ ক্ষীণ হয় এবং বিবিধ
ধারণা-বিষয়ে মনের যোগ্যতা লাভ হয়।

(৫) প্রত্যাহার—“স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিন্তয়া স্বরূপানুকার ইবোঁদ্রয়ানাং
প্রত্যাহারঃ” ২।৫৫

অর্থাৎ ‘ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে বিরত হইয়া যখন চিন্তাস্বরূপের অনু-
করণের মত করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার কহে। প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের
বিপরীতদিকে ইন্দ্রিয়গণের আহার প্রত্যাহার। প্রত্যাহার যোগের দ্বারস্বরূপ।
প্রত্যাহারদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ পরম বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।

এ পর্য্যন্ত যোগের যে পাঁচটী অঙ্গ উক্ত হইল, উহারা সম্প্রজ্ঞাতসমাদির
বহিঃসঙ্গ সাধন। এক্ষণে সম্প্রজ্ঞাতসমাদির অন্তঃসঙ্গসাধন ধারণা, ধ্যান ও
সমাদির বিষয় উক্ত হইবে। ধারণা, ধ্যান ও সমাদি এই তিনটী একত্র সংযম
নামে অভিহিত হয়।

(৬) ধারণা—“দেহকর্ষাচ্চিন্তয়া ধারণা” ৩। অর্থাৎ বাহ্য কিংবা আভ্যন্তর
প্রদেশে চিন্তকে ধরিয়া রাখার নাম ধারণা। প্রাণায়ামদ্বারা বায়ুকে বশ

করিয়া এবং প্রত্যাহারদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিয়া অনন্তর চিত্তকে কোন শব্দে অবলম্বনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। নাভীচক্র, হৃদয়-পুণ্ডরীক, আজ্ঞাচক্র (ভ্রূবয়ের মধ্যে স্থিত) ; সহস্রার প্রভৃতি আভ্যন্তর-প্রদেশ চিত্ত-ধারণার স্থান। বাহ্যপ্রদেশে মূর্তি প্রভৃতিতে চিত্তধারণা করিতে হয়। শাস্ত্রে বহু প্রকার ধারণার উপদেশ করা হইয়াছে। আমরা এখানে নাদানুসন্ধানের মাত্র উল্লেখ করিলাম।

নাদানুসন্ধান—দুই কণ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা রুদ্ধ করিয়া এবং মূখ ও চোখ বন্ধ করিলে ভিতরে চিত্তাজ্বলনবৎ হৃদয় শব্দ শোনা যায়। ঐ শব্দে মনোনিবেশ করিলে ও মন একটু অন্তর্মুখ হইলে ঝাঁ ঝাঁ পোকাকার শব্দের ন্যায় শব্দ শোনা যায়। ঐ শব্দে একাগ্র হইলে মন যেমন যেমন অন্তর্মুখ ও সূক্ষ্ম হয়, তেমনই তেমনই, দীঘঘণ্টানিনাদবৎ, বংশীনাদবৎ, ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ শব্দের বিশেষ বিশেষ বদনি অর্থাৎ হইয়া শব্দ-সামান্য নাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ নাদ ক্রমশঃ বিস্মৃতে লয় প্রাপ্ত হয়। বিস্মৃ মনের উৎপত্তিস্থান (শব্দশক্তি ও সৃষ্টি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বিস্মৃতে চিত্ত ধারণ করিলে মনের লয় হয় এবং পরমপদে স্থিতিলাভ হয়।

(৭) **ধ্যান**—‘তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্’ ৩২ অর্থাৎ ধারণ-বিষয়ে প্রত্যয়ের বা জ্ঞান-বস্তুর যে একতান প্রবাহ উহা ধ্যান। ধারণা গভীর হইলে উহা ধ্যান, ধ্যান গভীর হইলে উহা সমাধি। কোন বস্তুর ধারণাকালে ঐ বস্তুটী চিত্তে এক একবার ভাসিয়া উঠে, আবার বিজাতীয় প্রত্যয় আসিয়া ঐ ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু ধ্যানকালে চিত্ত বিনা প্রযত্নেই বিজাতীয় প্রত্যয়শূন্য হইয়া এক বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে। নিম্নে মূর্তি-ধ্যান সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

ধ্যানের জন্য একটী পৃথক ঘর থাকা চাই, নতুবা ভাল ধ্যান হইবে না। ঐ ঘরে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ, গঙ্গাজল, ধূপ, চন্দননাদি প্রভৃতি

রাখিবে ঐ ঘরে পূজা, শ্রব, কীর্তনাদি ব্যতীত কোন বিষয়কথা বা বিষয়চিন্তা করিও না, তবে ঐ ঘরে শব্দিসংগ্ৰহ হইবে এবং বাহির হইতে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেই তোমার মনে পবিত্রতা আসিবে। তোমার ইষ্টমূর্তির সন্মুখ হইবে ঐ ঘরে রাখিবে। ঐ ছবির সামনে মৃগচর্ম, কব্জাদি আসন পাতিয়া তাহার উপর মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সোজা রাখিয়া পদ্মাসন, স্থিতিকাসন প্রভৃতি (যে আসনে সূবিধা) উপবেশন করিবে। পরে চক্ষু খুলিয়াই ঐ মূর্তির পাদদেশ হইতে ক্রমশঃ ধ্যান করিতে থাকিবে। প্রথমে পাদদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত, পরে কটিদেশ হইতে মধ্য দেহের এবং পরে বন্দনমণ্ডলের ধ্যান করিবে। এইরূপ নীচে হইতে উপর এবং উপর হইতে নীচে ধ্যান করিতে অভ্যাস করিবে। ধ্যান করিবার সময় এবং অন্য সময়ও মূর্তিকে জীবন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি ভাবিবে। তিনি যেন তোমার সব দেখিতেছেন, সব জানিতেছেন মনে করিবে। কাতরভাবে তোমার সকল অভাব, দুঃখ তাহাকে জানাইবে। তাহার চরণে তোমার অহংকারকে নিবেদন করিবে। তোমার সমস্ত অভাব ও দুঃখ তিনিই দূর করিবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে এবং দেখিতেও পাইবে তিনি তোমার অভাব, দুঃখাদি দূর করিতেছেন। এইরূপে কিছুকাল অভ্যাস করিয়া অভ্যাস একটু থাকিলে অর্ধনির্মালিতনেত্রে ঐ মূর্তির ধ্যান করিবে। একবারে চক্ষু মূর্ছিত করিলে নিদ্রা আসিতে পারে। মূর্তিচিন্তা জ্যোতির মধ্যে করাই কর্তব্য। গায়ত্রীদেবীর চিন্তা সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে করিতে হয়। সূর্য্য অস্তমিত হইলে ভীষের নিদ্রা আসে অর্থাৎ তমোগুণ আক্রমণ করে, আবার সূর্য্য উঠিলে নিদ্রা ভাঙ্গে অর্থাৎ তমোগুণ কাটিয়া যায়। এইজন্য জ্যোতির মধ্যে মূর্তি চিন্তা করিলে তমোগুণ কাটিয়া যায়। ধ্যানের সঙ্গের শব্দে প্রস্বাসে মন্ত্রজপ করাও কর্তব্য, উহা ধ্যানের সাহায্য করে, তবে ধ্যান গভীর হইলে জপ আপনিই থাকিয়া যায়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এইরূপ অভ্যাস করিলে ইষ্টমূর্তির

সাক্ষাৎলাভ হয় এবং তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ অজ্ঞান দূর হইয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ হয় ।

মূর্ত্তি-ধ্যানের ন্যায় ভ্রূমণ্যে প্রণবাদি মন্ত্রের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তির ধ্যানদ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা ও অশেষ কল্যাণ লাভ হয় ।

(৮) সমাধি—‘তদেবাথমাঠনিভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ।’ ৩৩ অর্থাৎ ‘যখন সেই ধ্যেয় বস্তুমাত্রই প্রকাশিত থাকে, ধ্যাতা ও ধ্যান ধ্যেয় বস্তুতে যেন ভূবিয়া গিয়া স্বরূপশূন্যের ন্যায় হয়, তখন উহাকে সমাধি (সম্প্রজ্ঞাত) বলে । এই সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপদটি থাকিলেও ধ্যেয়-বস্তুর প্রাধান্য থাকে । অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপদটি প্রতিভাত হয় না ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার :—(১) বিতর্ক (২) বিচার (৩) আনন্দ (৪) অস্মিতা ।

(১) শূন্য মূর্ত্তিসকলে যে সমাধি, উহা বিতর্ক সমাধি ।

(২) শূন্যমূর্ত্তির কারণ, সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল (অবতার-দেহের কারণ উহার নহে) : ধ্যানের দ্বারা উহাদের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, বিচার সমাধি ।

(৩) সূক্ষ্ম তন্মাত্রের কারণ ‘অহংতত্ত্ব’ । সাধনার দ্বারা এই ‘অহংতত্ত্বের সাক্ষাৎকার আনন্দ-সমাধি ।

পদার্থে ক্ত চারিপ্রকার সমাধিই প্রকৃতির বিকারকে অবলম্বন করিয়া হয়, সেইজন্য উহার সর্বত্র-সমাধি অর্থাৎ ঐ সকল সমাধিতে বিবেকখ্যাতি না থাকায়, বন্ধনের বীজ অবিদ্যা থাকিয়া যায় । সাধক প্রকৃতি বা উহার বিকারে সমাধি করিয়া প্রকৃতি বা উহার বিকারে লীন হন এবং বহুদিন উহাদের মধ্যে লীন থাকিয়া বিদেহবৎ অবস্থান করেন । পরে কর্মক্ষয়ে জাগিয়া উঠেন এবং পুনরায় সংসারদশা প্রাপ্ত হন । আরও এক কথা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে সাধক বিভূতি

সকল লাভ করেন। যদি তিনি ঐ বিভূতিসকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, তাহার উত্থানের পথ রুদ্ধ হইয়া যার অর্থাৎ তাহার অনাপ্রস্ফুট বা নির্বিকল্প সমাধি লাভ ও মূর্ত্তি হয় না।

মহর্ষি বলিয়াছেন, যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিঞ্চয়ৈ জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ' ২।২৮। অর্থাৎ 'যোগাঙ্গানুষ্ঠানদ্বারা অশুদ্ধিঞ্চয় হইতে থাকিলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জ্ঞানের দীপ্তি বাড়িতে থাকে।' যখন মোক্ষকামী সাধক পূর্বোক্ত বৈরাগ্য ও অভ্যাসদ্বারা সাত্ত্বিয় শুদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তখন তাহার সত্যবস্তু ধারণা করিবার প্রজ্ঞা হয় এবং তিনি প্রকৃতি ও পদ্রুশের প্রকৃত বিবেক করিতে সমর্থ হন। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পদ্রুশ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন, ইহাই 'বিবেকখ্যাতি'। পদ্রুশতত্ত্বের সাক্ষাৎ হওয়াতে তখন স্বভাবতঃই তিন গুণের উপর বৈরাগ্য আসে—ইহাই পরবৈরাগ্য। তখন বুদ্ধি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই বিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল্যাভিমুখী হয় এবং সুরূপধ্যানে নিমগ্ন হইতে থাকে এবং নিরোধ-সংস্কারের অর্থাৎ টিপুর্টীশূন্যতাব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব হয়। ক্রমশঃ নিরোধসংস্কারের প্রাবল্য হওয়া দোষবীজের (অজ্ঞানের) ক্ষয় হয় এবং যোগী কেবল্য বা মোক্ষ লাভ করেন। পাতঞ্জলদর্শনোক্ত এই যোগ অদ্বৈতবেদান্তিগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু ইহা প্রতিবন্ধ নাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মূখ্য অধিকারীর মহাবাক্যবিচার শ্রবণমাত্রই জ্ঞানলাভ হয়। এ বিষয়ে শান্তিগীতা বলেন,—'প্রতিবন্ধকশূন্যস্য জ্ঞানং স্যাৎ প্রতিমাত্রতঃ। ন চৈব মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ। প্রতিবন্ধক্যৈ জ্ঞানং সুরূপেবোপজায়তে।' ৩।২০, ২৪ অর্থাৎ 'প্রতিবন্ধকশূন্য মূখ্য অধিকারীর শ্রবণমাত্রই জ্ঞান হয়। নতুবা মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা প্রতিবন্ধক্য হইলে জ্ঞান সুরূপই হইয়া থাকে।' মহাবাক্য-বিচার শ্রবণই জ্ঞানের মূখ্য কারণ, মনন নিদিধ্যাসন প্রতিবন্ধক্যের কারণ। কিন্তু

বেদান্তের ঐ প্রকার মূখ্য অধিকারী অতি বিরল। এখনকার দিনে পাওয়াই দূরকর। এখন অধিকাংশ সাধকই বেদান্তের গৌণ ও মন্দ অধিকারী। শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যগণ, বেদান্তের অধিকার লাভ করিতে হইলে, যে সকল কষ্টকর সাধনের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, তাহা এখন কেহ বড় করিতে চান না। অথচ অধিকারলাভের পূর্বেই অনেকে বেদান্তের চর্চা করেন। উহার ফলে উহারা মোটামুটি একটা জ্ঞান বা জ্ঞানাভাস লাভ করেন। তখন ইংহারা লোকসমাজে নিজেদিগকে জ্ঞানী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। ইংহাদের বিষয়ভূষা, ক্ষেত্র, বিদ্য এবং পদ্যাদিতে আগ্রহ পূর্ব্ববৎ থাকে। ইংহাদের জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যাদি দেখা যায় না। কাম, ক্রোধ, লোভাদি প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে। ইংহারা বেদান্তশাস্ত্রের কতকগুলি বুলি শিখিয়া, 'ভোগ আসক্তি, ভয় প্রভৃতি জীবের হইতেছে, উহাতে আমার ক্ষতি কি? ইন্দ্রিয় কাৰ্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে আমার কি? জ্ঞানীকে চিনিবার উপায় নাই, সব প্রারম্ভ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিজেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ও ভেগেচ্ছার সমর্থন করেন। যোগবাণিশ্ঠে ঐ প্রকার ব্যক্তিগণকে 'জ্ঞানবশু' এবং গীতায় 'মিথ্যাচার' বলা হইয়াছে। অনেক জন্মের পুণ্যপুণ্যের পরিপাকে জ্ঞানলাভে অধিকার হয়। পূর্বে শূভকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করায় জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী জীবের অমানিত্ব, অদাম্ভত্ব, অহিংসা, সত্য, সৰ্ব্বজীবে দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদগুণ অলঙ্কাররূপে উহার শোভাবর্ধন করে। জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবেই ঐ গুণগুলি দেখা যায়। প্রকৃত জ্ঞানীর ভয়, আসক্তি, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থাকে না, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, ইহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রুতপ্রস্তার লক্ষণে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্ত্য লক্ষণে, ষষ্ঠাধ্যায়ের যোগারূঢ়ের লক্ষণে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণে দেখান হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানী সর্বদা আনন্দী 'যস্যানন্দো নিত্যতরঃ' (বিবেক-চূড়ামণি), তাহার দৃষ্টিতে প্রারম্ভ নাই। ইংহার আচরণ শূভ হইয়া থাকে। ইংহার শূভ আচরণের অনুসরণ করিয়া অজ্ঞব্যক্তিগণ জ্ঞানলাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বিচারদৃষ্টিতে আভাসবাদে দেখান হয়, আভাসচেতন্য জীবের সুখ, দঃখাদি-ভোগ সাক্ষিচেতন্য আত্মাকে স্পর্শ করে

না, যেমন জলে পতিত সূর্যের আভাস, জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও আকাশস্থ সূর্য কম্পিত হয় না। বেদান্তের অন্যান্য বাদের ন্যায় আভাসবাদেরও উদ্দেশ্য বুদ্ধিকে নির্বিকার চৈতন্যের দিকে অভিমুখী করান। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ হইলে, থাকে এক অখণ্ড সমরসত্ত্ব। তখন জীব ও উহার উপাধি বাধিত হয়, স্মরণীয়, দৃশ্যাদি থাকিবে কোথায়? যদি ব্যাখ্যান অবস্থায় স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদির স্মৃতির ন্যায় জ্ঞানীর জীব ও ভ্রগতের স্মৃতির উদয় হয়, তথাপি উহাতে দৃঢ়নিখ্যাত বোধ থাকায় ঐ স্মৃতি জ্ঞানীর চিতে কোন বিকার উৎপাদন না করিয়া স্রুতঃই স্বরূপানন্দে লীন হইয়া যায়। জ্ঞানের লক্ষণ স্রুতঃবেদ্য বটে অর্থাৎ পরিসঙ্গকারিণী রমণীই পরিসঙ্গের সূত্র জানেন, অপরে জানে না। তথাপি শাস্ত্রে জ্ঞানীর আচার প্রভৃতি বাহ্য লক্ষণের কথা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে ঐরূপ বর্ণনার অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে, যাহাতে অজ্ঞব্যক্তিগণও জ্ঞানীকে মোটামুটি চিনিতে পারে। ঐরূপ না হইলে অজ্ঞব্যক্তিগণ ব্যাস, বিশিষ্ট প্রভৃতিতে কিরূপে জ্ঞানী স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইবে? জ্ঞানীর প্রারম্ভের বিষয় বিবেকচূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে, “তিষ্ঠত্যরং কথং দেহ ইতি শংকাবতো জড়ান্। সমাধাতুং বাহাদৃষ্টা প্রারম্ভং বদতি শ্রুতিঃ” ৪৭১। অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী জীবের দেহ কি প্রকারে অবস্থিত থাকে, এই প্রকার শংকাকারী জড়বুদ্ধি অজ্ঞানীগণকে বুদ্ধাইবার জন্য শ্রুতি বাহাদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানীর প্রারম্ভের কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানীর ‘আমার প্রারম্ভ আছে’ এই প্রকার বুদ্ধি হয় না। এ বিষয়ে বিবেকচূড়ামণি ৪৬০-৪৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

রাজা জনক প্রভৃতির দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত ভোগে ও বিষয়চিন্তায় ব্যাপৃত থাকি আত্মপ্রত্যর্গামাত্র। সেইজন্য যাহাতে ঐরূপ আত্মপ্রবণতা না আসে, আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে পুনঃ পুনঃ হুঁসিয়ার করিয়া দিয়াছেন। অপরোক্ষানুভূতিতেও বলা হইয়াছে :—

কুশলা ব্রহ্মবাস্তুসিদ্ধিঃ ব্রহ্মহীনঃ সূর্য্যগিণঃ ।

তেহপাজ্ঞানতয়া নুনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ” ১৩০

অর্থাৎ ‘যে সকল ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, ব্রহ্মবান্ধব কুশল কিন্তু ব্রহ্মবৃদ্ধিহীন তাহারাও অজ্ঞতাবশতঃ নিশ্চয়ই সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে’।

বিদ্যা পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ; উহার মধ্যে পরা বিদ্যাই অজ্ঞানের নাশক। অপরা বিদ্যাদ্বারা অনেক শাস্ত্রবাক্য আওড়াইতে পারা যায়, কিন্তু অনুভব না থাকায় উহাদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় না। ছান্দোগ্যে দেখা যায়, শ্বেতকেতু গুরুগৃহ হইতে অপরাবিদ্যা লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। তাহার পিতা জ্ঞানী উদ্দালক পুত্রকে অহঙ্কারী ও অনন্যভাব দেখিয়া বদ্বিলেন, তাহার পুত্র প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে নাই। তখন তিনি উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার অজ্ঞান নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে পনের দিন অন্ন না খাইয়া কেবল জল খাইয়া থাকিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু ঐরূপ করিলে পিতা তাহাকে অধীত বিদ্যার আবৃষ্টি করিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু বলিলেন—“উহা আমার প্রতিভাত হইতেছে না।” তখন পিতা তাহাকে পুনরায় খাইতে ও আরও পনের দিন পরে আসিতে বলিলেন। তখন তাহার অধীত বিদ্যা পুনরায় স্মৃতিপথে আসিল। তবেই দেখা যাইতেছে, শ্বেতকেতুর ঐ বিদ্যা আহার না পাইয়া ক্ষীণ হইল, আবার আহার দ্বারা পূর্ন হইল। ঐ বিদ্যা অন্তের সূক্ষ্ম পরিণতি মনোমধ্যে অবস্থিত—উহা অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যার অপরাবিদ্যার ন্যায় স্থাসবৃদ্ধি নাই।

জ্ঞানীর লোক-ব্যবহার সাধারণতঃ শুভ হইলেও কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার বাতিক্রমও দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে ত্রিগুণাতীত প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য বলা হইবে। যাহা হউক জ্ঞানের দোহাই দিয়া পূর্বোক্ত মিথ্যাচার সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ।

শ্রদ্ধা ও সদগুণ-সম্পন্ন গৌণ অধিকারীরও গুরুমুখ হইতে বেদান্তবিচার শ্রবণ করিয়া ‘আমি ব্রহ্ম’ এইপ্রকার অপরোক্ষজ্ঞান হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম সেই জ্ঞান দৃঢ় ও প্রতিবন্ধশূন্য হয় না। ঐ প্রকার জ্ঞানীর দেহাদি বিষয়ে ও জগতের উপঃ পুনঃ পুনঃ সত্যত্ববৃদ্ধি আসিয়া পড়ে। ঐ বিক্ষেপ নিবৃত্তির জন্য তাহার পুনঃ পুনঃ বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাস করা

কর্তব্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে সম্যক, চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতার অভ্যাস না করিয়া থাকিলেও ঐ প্রকার ব্রহ্মাভ্যাসের দ্বারা উহা সিদ্ধ হইয়া দূঢ় প্রতিবন্ধশূন্য অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইবে।

নির্বিবাক্ষপ সমাধি ও উহার অভ্যাস

এই প্রকার অদৃঢ় জ্ঞানী আন্তর ও বাহ্য দৃশ্যানুবিম্ব ও শব্দানুবিম্ব সবিবাক্ষপ সমাধির অভ্যাস করিবেন। ঐরূপ করিতে করিতে সূতঃই নির্বিবাক্ষপ সমাধির আবির্ভাব হইবে। ঐ প্রকার জ্ঞাননিষ্ঠ যতি ভাবিবেন, কামাদি চিত্তবৃত্তিসকল দৃশ্য, পরিণামী ও উদয়-অস্তশীল। আমি উহাদের সাক্ষী নির্বিবাক্ষ চৈতন্য। আমি দেহ নহি, মন নহি, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ নহি ইত্যাদি, আমি অসঙ্গ দ্রষ্টাস্বরূপ। আমি হইতে দৃশ্য পৃথক্। এই প্রকার দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিবেকদ্বারা দ্রষ্টাতে যে সমাধি, যাহাতে দ্রষ্টাভাবের প্রাধান্য থাকে, দৃশ্যভাব যেন ভূবিয়া যায়, ইহাই দৃশ্যানুবিম্ব সবিবাক্ষপ সমাধি। কারণ এই সমাধিতে দ্রষ্টাভাবের মধ্যে দৃশ্যভাব অনুবিম্ব থাকে। যখন বৃদ্ধি দৃশ্যভাব ত্যাগ করিয়া শব্দশ্চৈতন্যের আরও অভিমুখী হয়, তখন জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকের নিকট দ্রষ্টাদৃশ্য ভাব আর প্রকট থাকে না, তখন সাধকের অনুভূতি হয় ‘আমি, শব্দ, বৃদ্ধ, মূর্ত্ত’, প্রভৃতি। ইহাই শব্দানুবিম্ব সবিবাক্ষপ সমাধি। যেহেতু ‘আমি অসঙ্গ, শব্দ, মূর্ত্ত’ ইত্যাদি জ্ঞানের মধ্যে অপর কেহ সঙ্গবান্, অশব্দ, বৃদ্ধ ইত্যাদি আছে, এই ভাব লুকাইয়া থাকে। যেখানে দৃশ্য ও শব্দের গতি নাই, যাহা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন কিংবা জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এইপ্রকার ত্রিপদটী-বর্জিত অবস্থা হাই নির্বিবাক্ষপ সমাধি। পূর্বেও দৃশ্যানুবিম্ব ও শব্দানুবিম্ব ভাব পর্যান্তই প্রযুক্ত চলে। এই দুই সমাধির অভ্যাসের পরিপাকে সূতঃই নির্বিবাক্ষপ সমাধির আবির্ভাব হয়। কিন্তু প্রথম-প্রথম ঐপ্রকার নির্বিবাক্ষপ সমাধির মধ্যে অজ্ঞাতসারে ত্রিপদটী থাকিয়া যায়, তাই পুনরায় ব্যাখ্যান ঘটে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা ঐ নির্বিবাক্ষপভাবে স্থিত হইতে চেষ্টা করিলে চিত্তের অতি সূক্ষ্ম পাপসকল (পুণ্য ও পাপ উভয়েই মদমদ্রুর নিকট পাপরূপে গণ্য) সমূলে নষ্ট হয়। ভিতরের ন্যায় বাহিরেও

এ প্রকার তিনটী সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে । যখন মন বাহিরে আসিবে, তখন বিচারদ্বারা বস্তুসকলের নাম ও রূপ হইতে সং, চিৎ ও আনন্দকে পৃথক্ করাই বাহ্য দৃশ্যানুবিম্ব সমাধি । ইহার পর 'আমি অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ বস্তু' এইপ্রকার অবিচ্ছিন্ন চিন্তাই বাহ্য-শব্দানুবিম্ব সমাধি । ইহার ফলে নির্বিকল্প সমাধির আবির্ভাব হয় । এই ছয়টী সমাধি সর্বদা অভ্যাস করিতে করিতে দেহাভিমান গলিত হয় এবং পরমাত্মার ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান লাভ হয় । তখন ভিতর কিংবা বাহির যেখানেই মন ষাউক না কেন সেইখানেই সমাধি হইয়া থাকে । আচার্য্য গোড়পাদ নির্বিকল্প সমাধিকে অপর্শ্যযোগ বলিয়াছেন ; যেহেতু নির্বিকল্প আত্মায়, শব্দ, রূপ, রসাদির গতি নাই । সেইজন্য আকারনিষ্ঠ যোগিগণ এই অপর্শ্যযোগ সাধনে ভয় পাইয়া থাকেন । শূন্য, সূক্ষ্ম ও কারণ সর্বপ্রকার উপাধিশূন্য নির্বিকল্প আত্মাই অভয় পদ । সাকারনিষ্ঠ যোগিগণ বৈরাগ্যের দৃঢ়তা না থাকায় সেই অভয় পদেই ভয় দর্শন করেন । আচার্য্যপাদ আরও বলিয়াছেন নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্ন চারিটী :—(১) লয় (২) বিক্ষেপ (৩) কষায় (৪) রসাস্বাদ । উহাদের প্রতিকারের পন্থাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । যথা :—

“লয়ে সম্বোধয়েৎ চিন্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ ।

সকষায়ং বিজ্ঞানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥

নাস্বাদয়েৎ স্মৃথং তত্ নিঃসঙ্গং প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ।

নিঃচলং নিঃশরং চিন্তমেকীকুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥

যদা ন লীয়তে চিন্তং ন চ বিক্ষিপাতে পুনঃ ।

অনিঙ্গনমনাভাসং নিঃপন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা ” ॥

(মাণ্ডুক্য-কারিকা—অদ্বৈত-প্রকরণ) । ৪৪-৪৬

অর্থাৎ 'চিন্তা সূক্ষ্মদৃপ্তিতে লীন হইতে চাহিলে চেতন আত্মার (যিনি সদা জাগ্রত এবং স্বাহার লয় নাই) বিষয় স্মরণ করাইয়া জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা উহাকে জাগরিত করিয়া তুলিবে । চিন্তা বিক্ষিপ্ত হইলে অর্থাৎ আত্মভাবনা ত্যাগ করিয়া বিষয়ে গমন করিতে থাকিলে উহাকে বৈরাগ্য-ভাবনা ও অভ্যাসদ্বারা একাগ্র করিয়া শাস্ত

করিবে। পূর্বেও অভ্যাসদ্বারা চিত্ত বাহ্যতঃ লয় ও বিক্ষেপশূন্য হইলেও সমতা-প্রাপ্ত না হইয়া সংস্কারবশতঃ অনুরাগযুক্ত হইয়া মধ্য-অবস্থায় স্থিত হয়। ইহা কষারূপে বিদ্য। উহাতে 'আমার মন সরাগ এবং প্রবৃত্তির বীজভূত অনুরাগযুক্ত' এইরূপ জ্ঞানিয়া যত্নপূর্ব্বক সেই অবস্থা হইতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা মনের সমতা সম্পাদন করিবে। চিত্ত একবার সমতা লাভ করিলে উহাকে আর বিচলিত করিবে না। সমাধি করিতে করিতে যোগীর যে সর্বিকল্প সূখ উৎপন্ন হয়, উহা রসাস্বাদ বিদ্য। যোগী উহাকে আস্বাদ করিবেন না। যেহেতু সূক্ষ্মভাবে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই ত্রিপটীদ্বারা ঐ আস্বাদ গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং উহা নির্বিকল্প ভাবলাভের পক্ষে বিরূপরূপ। যোগী বিবেকদ্বারা ঐ সূখ হইতে নিঃসঙ্গ হইবেন এবং চিত্তকে নিশ্চল ও প্রসারশূন্য করিয়া যত্নপূর্ব্বক উহাকে চৈতন্যের সহিত এক করিবেন। চিত্ত যখন লীন কিংবা বিক্ষিপ্ত কিছুই হয় না, যখন উহা নিষ্কল্প হয় ও বিষয়াকারে প্রকাশিত না হয়, তখন সেই চিত্ত ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। তখন কি দ্বৈত, কি অদ্বৈত, কি বশ, কি মদন্তি, কি অস্তর, কি বাহির, কি পূণ্য, কি পাপ, কি স্মরণ, কি বিরূপ, কি শূন্য, কি অশূন্য, কি ব্রহ্ম, কি জগৎ, কি জ্ঞান, কি অজ্ঞান, কি সত্য, কি মিথ্যা ইত্যাদি বিকল্প থাকিয়া যায়। এই অবস্থা বর্ণনার ও চিত্তের অতীত, উহা সদৃশ, * চৈতন্য ও আনন্দচৈতন্য ব্রহ্মরূপ।

সাধক যেরূপে নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাসদ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবেন, তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রস্নাত্তরদ্বারা কুটম্ব ও আভাস-চৈতন্যের পার্থক্য, বিষয়জ্ঞান চাস্তিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতির স্বরূপ বঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

প্রঃ—কুটম্বচৈতন্য ও আভাসচৈতন্যের পার্থক্য কি ?

* অনেকে বলেন ছল যেমন জ্বলিয়া বৎস হয়, এইরূপ চৈতন্য ঘন হইয়া অত্যন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাহা দেখা উচিত আকাশকেই যখন ঘন করা যায় না, তখন আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম চৈতন্যকে কিরূপে ঘন করা যাইবে? সুতরাং চৈতন্য কথার অর্থ চৈতন্য এমন কোন ছিন্ন বা অবকাশ নাই যেখানে অন্য কিছু প্রবেশ করিতে পারে। সদৃশ ও আনন্দচৈতন্য শব্দদ্বয়েরও ঐ প্রকার অর্থ।

উঃ—এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে, আবার বিশেষভাবে বলিতেছি। কূটশব্দের অর্থ কাম্বারের নেহাই। নেহাইএর উপর হাতা, বেড়ি প্রভৃতি কত বিভিন্ন প্রকারের লৌহনির্মিত বস্তু প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু নেহাই সর্বদা একভাবে অবস্থিত। এইরূপ যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধিাদি, উহাদের পরিবর্তন বা অভাব প্রবাল পাইতেছে, যিনি সর্বদা একরূপ, পরিবর্তন সকলের নির্বিকার সাক্ষী তিনিই কূটশ্চৈতন্য। কিন্তু দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে অভিমানী যে চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্য অব্যবহৃতঃ দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে অথবা উহাদের বিকারসকলকে আপনার বলিয়া মানিয়া লন এবং তজ্জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তিনি আভাসচৈতন্য জীব। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য আকাশহ সূর্য্যের আভাস। জলহ সূর্য্যও আকাশহ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। জলহ সূর্য্যের যে দীপ্তি, উহা আকাশহ সূর্য্যেরই দীপ্তি; যেহেতু আকাশহ সূর্য্যকে বাদ দিয়া ঐ দীপ্তি দেখান যায় না। এইরূপ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট আভাস-চৈতন্যের যে প্রকাশ, উহা কূটচৈতন্যেরই প্রকাশ। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে কূটশ্চৈতন্য চিদাভাস জীবরূপে প্রতিভাত হন। এই আভাসও উপাধিগত ও মিথ্যা, কূটশ্চৈতন্যই জীবের স্বরূপ। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ, সর্বদা অভিন্ন, এইরূপ কূটশ্চৈতন্যের সহিত জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের সর্বদা অভিন্ন রহিয়াছে। ‘তত্ত্বমস্যাংদি’ মহাবাক্যে কূটশ্চৈতন্যের ব্রহ্মের সহিত এই যে স্বাভাবিক একত্ব রহিয়াছে, উহাই দেখান হয়। জল কম্পিত হইলে বা স্থির হইলে যেমন জলহ সূর্য্যকে কম্পিত বা স্থির দেখায়, এইরূপ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির কম্পনে বা স্থিরত্বে অন্তঃকরণ-প্রতিফলিত আভাস-চৈতন্য আপনাকে চঞ্চল বা স্থির বলিয়া অনুভব করেন। যেমন জলের কম্পনে আকাশহ সূর্য্য কম্পিত হয় না, জলের শব্দ বা অশব্দ আকাশহ সূর্য্যকে স্পর্শ করে না, এইরূপ অন্তঃকরণের চঞ্চলতা, স্থিরত্ব, শব্দ বা অশব্দ কূটশ্চৈতন্যকে স্পর্শ করে না। আরও বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জলহ আভাসসূর্য্যও কম্পিত হয় না, কিন্তু জলের কম্পন জলহ সূর্য্য

আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপ অস্তকরণের কম্পনে আভাস বা জীবচৈতন্য চৈতন্যাংশে কম্পিত হন না। অস্তকরণের কম্পন আভাসচৈতন্যে আরোপিত হয় মাত্র। কুটস্থেই আভাস; আভাসই কম্পিত বা মিথ্যা। আভাসের কুটস্থেই পর্যাবসান। অব্যবহৃতঃ আভাসচৈতন্য অস্তকরণের স্বর্ষ্য সূর্য্য দৃশ্যাদির, আপনাতে আরোপ করিয়া সূর্য্যী দৃশ্যী হইয়া পড়েন। চিৎ ও জড়ের, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিবেক না থাকাই উহার কারণ উহাই সদয়গ্রাস্তি। বিবেকদ্বারা গ্রাস্তি ভেদ হইলে জীব আপনাকে সর্ব্ব বিকারের নির্বিকার সাক্ষীরূপে অনুভব করেন।

কুটস্থচৈতন্যের প্রকাশ সামান্য অর্থাৎ সর্বত্র সমানভাবে স্থিত, ব্যাপক ও অপটু। কিন্তু আভাসচৈতন্যের প্রকাশ খণ্ড, বিশিষ্ট ও স্পষ্ট। মনে করুন কোন ঘরের দেওয়ালে সূর্য্যালোক সমানভাবে পড়িয়া রহিয়াছে এবং সমগ্র দেওয়ালকে প্রকাশিত করিতেছে। এখন কতকগুলি দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্যালোক, ঐ সামান্যভাবে প্রকাশিত দেওয়ালের উপর ফেলা হইল। সুতরাং দেওয়ালে কতকগুলি মণ্ডলাকার অধিক আলোকিত স্থান দেখা যাইবে, যেহেতু মণ্ডলাকার স্থানগুলিতে দ্বিগুণ প্রকাশ রহিয়াছে। প্রথমতঃ সূর্য্যালোকের সামান্যপ্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ দর্পণ প্রতিফলিত সূর্য্যের বিশেষ-প্রকাশ। এইরূপ কুটস্থচৈতন্য দ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত প্রত্যেক বস্তুই, বুদ্ধি-প্রতিফলিত আভাসচৈতন্যের আলোকে বট, পটাদিরূপে বিশিষ্ট, খণ্ড ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিশিষ্টজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত। অজ্ঞানের কন্যা বুদ্ধি জ্ঞানে আকারভাগ আনিয়া দিয়া কালী, তারাদি দশমহাবিদ্যারূপে জ্ঞানস্বরূপ শিবকে যেন মোহিত করিতেছেন। যেমন দেওয়ালে সামান্য প্রকাশকে ঘরিতে হইলে যেখানে দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্য নাই, সেই স্থানে দেখিতে হয়, অথবা যেমন দুইটী দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের সন্নিবস্থলে দেখিতে হয়, এইরূপ কুটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ অবধারণ করিতে হইলে যেখানে অস্তকরণবস্তির অভাব অথবা যেখানে দুইটী অস্তকরণবস্তির সন্নিবস্থল, ঐ স্থানেই অবধারণ করা সম্ভব হয়। প্রথমে কুটস্থচৈতন্যের অনুভব করিয়া উহাকেই

জগদাংশ্ঠান রূপে অনুভব করাই রূপজ্ঞান । জ্ঞান হইলে আর 'ইহা আভাস-চৈতন্য', 'ইহা কূটস্থচৈতন্য' এই ভেদ থাকে না । জ্ঞানী দেখেন, 'আমি শূন্যচৈতন্য । মায়াবশতঃ আমি অন্তঃকরণের সাক্ষী কূটস্থচৈতন্যরূপে এবং অন্তঃকরণে অভিমানী আভাসচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হই । পরমার্থতঃ আমাতে কোন প্রকার ভেদ নাই' ।

প্রঃ—অধ্যাস কাকে বলে ? কেনই বা অধ্যাস হয় ?

উঃ—যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহাতে সেই বস্তুর অবভাসকে ভ্রম বা অধ্যাস বলে । দৃষ্টান্ত—যেমন রজ্জুসর্প, শূন্যরজ্জুতে প্রভৃতি । রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষিতকালে দৃষ্ট সর্প রজ্জুতে বাস্তবিক নাই, তথাপি রজ্জুতে উহার অবভাস বা প্রতীতি হয়, ইহাই রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস । শূন্যরজ্জুতাদি স্থলেও ঐ প্রকার বৃত্তিতে হইবে । রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পরূপ বিষয়টী (১) অর্থাধ্যাস এবং সর্পজ্ঞানটী (২) জ্ঞানাধ্যাস । রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের ন্যায় ব্রহ্মেও জগৎ অধ্যস্ত হইয়াছে । সকল প্রকার অধ্যাসেরই অজ্ঞান বা অবিদ্যা সাধারণ উপাদান-কারণ । উপাদান-কারণ পরিণামী হয় । নির্বিকারচৈতন্যের পরিণাম সম্ভব নয় । সেইজন্য চৈতন্য অধ্যাসের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু বিবর্তকারণ । অবিদ্যা অনাদি বলিয়া অধ্যাসও অনাদি । সেইজন্য জীবের দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয়িতরূপ অনাদি সংস্কারদ্বারা চলিয়া আসিতেছে ।

বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্যস্বরূপ বিষয়ী যে আত্মা এবং জড় যে বিষয়, ইহাদের স্বরূপ এবং ধর্ম আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত । সুতরাং ইহাদের স্বরূপের বা ধর্মের পরস্পর বিনিময় হয় না । সুতরাং স্বরূপতঃ এই অধ্যাস মিথ্যা । তথাপি অজ্ঞানবশতঃ সত্য (আত্মা) ও মিথ্যাকে (অনাত্মা) মিশাইয়া এক করিয়া 'ইহা আমি' 'আমার ইহা' এই প্রকার নৈসর্গিক (স্বাভাবিক, অনাদি) লোক-ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে । যদি প্রশ্ন কর, জ্ঞানের অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে, বিষয় ও উহার ধর্মের অধ্যাস কিরূপে হইবে ? সকলে ত সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই অন্য বিষয়ের অধ্যাস করে । তদন্তরে বলি, যে প্রত্যগাত্মা একবারে জ্ঞানের

অবিষয় নহেন। ইনি 'আমি' এই প্রত্যয়ের বিষয় হন এবং অপরোক্ষ; সেইজন্য প্রত্যগাত্মা প্রসিদ্ধ বস্তু। এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, যে সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই মাত্র অন্যবিষয়ের অধ্যাস হইবে। অপ্রত্যক্ষ আকাশে বালকগণ তল-মলিনতাদির (আকাশ কড়াই এর তলদেশের ন্যায় এবং নীলবর্ণ এই প্রকার) অধ্যাস করিয়া থাকে। এই প্রকার প্রত্যগাত্মাতেও অনাত্মার অধ্যাস অবিরুদ্ধ। (অধ্যাসভাষা—শঙ্করাচার্য)।

অবিদ্যাকে দোষ বলা হয়। দোষ অধ্যাসের কারণ। বুদ্ধে যে জগৎ অধ্যস্ত হয়, একমাত্র অবিদ্যাদোষই উহার কারণ। সাক্ষিচৈতন্যে যে স্বপ্নজগৎ অধ্যস্ত হয়, উহাতে অবিদ্যাদোষের সহিত নিদ্রাদোষও সহকারী কারণ হয়। বজ্র আদিতে যে সর্প আদি ভ্রান্তি হয়, উহাতেও অবিদ্যাদোষের সহিত প্রমাতৃগত, প্রমাণগত প্রভৃতি দোষসকল সহকারী কারণ হয়। সেই সকল দোষ নানাপ্রকার। (১) প্রমাতৃগতদোষ—বজ্রসর্প, শক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রান্তিহলে প্রমাতার (জীবের) ভয়, লোভ, চিন্ত্যাশ্রয় প্রভৃতি দোষজন্য ভ্রান্তি হয়। (২) প্রমাণগত দোষ (প্রকৃষ্ট জ্ঞান যাহা দ্বারা হয়, তাহাই প্রমাণ। বিষয় প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সকলই প্রমাণ) সেই ইন্দ্রিয়সকলের দোষও ভ্রমপ্রত্যক্ষের বা অধ্যাসের কারণ। যেমন চক্ষুর কামলাদোষ থাকিলে স্বেত শব্দকেও পীতবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। দৃষ্টিশক্তির মন্দতাবশতঃ নানাপ্রকার ভ্রান্তিদর্শন হয়। (৩) প্রমেয়গতদোষ—প্রমেয় বস্তু বজ্র প্রভৃতির সহিত সর্পাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকা। (৪) যে বস্তুর অধ্যাস হইবে, তাহার পূর্বসংস্কার থাকা। যেমন বজ্রতে সর্প অধ্যাস-স্থলে সর্পের পূর্বসংস্কার থাকা চাই। (৫) অধিষ্ঠানের বিশেষ-জ্ঞানের অভাব। যেমন—বজ্র-সর্প ভ্রান্তিহলে বজ্রের বিশেষরূপের অনবধারণ। (৬) কালগতদোষ—যেমন সন্ধ্যাদিকালের মন্দ অন্ধকারবশতঃ ভ্রান্তি হয়। (৭) দেশগতদোষ—অতিদ্রব বা অতি সামীপ্যবশতঃও ভ্রান্তি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দোষরূপ প্রতিবন্ধক থাকা হেতু বস্তু-স্বরূপের যথার্থজ্ঞান হয় না। দোষমুক্ত প্রমাণই যথার্থ-জ্ঞানের হইয়া থাকে।

পূর্বে আমরা (১) অর্থাধ্যাস ও (২) জ্ঞানাধ্যাসের কথা বলিয়াছি। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাসের কয়েকটি প্রকার ভেদ আছে। অধ্যাসের অন্যপ্রকার বিভাগও আছে। ঐ সকল প্রকরণগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দেহাদির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসের (একাকার ভাবের) ফলে আত্মা, দেহাদির নাশে মনে করেন, ‘আমি নাশ প্রাপ্ত হইলাম’, মনের স্বেচ্ছা দ্বারা অনভব করেন, ‘আমি সুখী বা দুঃখী’ ইত্যাদি; আবার পুত্র-কলত্রাদিতে বাস্তবিক আত্মা না থাকিলেও আত্মাসম্বন্ধ অধ্যাস (সংসর্গাধ্যাস) করিয়া উহাদের স্বেচ্ছা দ্বারা আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করেন। এই অধ্যাসের নিবৃত্তি সহজ নয়। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলেও অনাদি বাসনাবশতঃ দেহাদিতে অধ্যাস আসিয়া থাকে। সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর এই অধ্যাসকে নাশ করিবার জন্য বিবেকচূড়ামণিতে পুনঃ পুনঃ নির্দিধ্যাসন করিতে বলিয়াছেন। যতক্ষণ অযুক্ততঃ স্বরূপরিপূর্ণতা না হয়, এবং জীব ও জগতের প্রতীতি ঠিক স্বপ্নবৎ না হয়, ততক্ষণ নির্দিধ্যাসন করা কষ্টব্য। নির্দিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় হইয়া থাকে। দৃঢ়জ্ঞানই মোক্ষ।

অন্যদোষসহিত কেবল অবিদ্যা হইতে জাত অধ্যস্তবস্তুর সত্তাকে ব্যবহারিক-সত্তা বলে এবং অন্য দোষসহিত অবিদ্যা হইতে জাত অধ্যস্তবস্তুর সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে। ব্যবহারিক বস্তুর জ্ঞান অন্তঃকরণের পরিণামপূর্বক হয়। কিন্তু প্রাতিভাসিক বস্তুর জ্ঞান অন্তঃকরণের পরিণামপূর্বক হয় না, অবিদ্যার পরিণামপূর্বক হইয়া থাকে। কারণ প্রাতিভাসিক বস্তুর সহিত ব্যবহারিক ইন্দ্রিয় বা মনের সংযোগ সম্ভব নয়। আত্মা অবিদ্যাশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বপ্নে বা রংজদুসপাদি ভ্রমস্থলে বাহ্যসামগ্রী (পণ্ডিত, উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি) ব্যতীতই স্বাশ্রিত জগৎ, রংজদুসপাদি এবং উহাদের জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন করেন।

প্রঃ—অধ্যাস বা ভ্রান্তির আশ্রয় অন্তঃকরণ না আত্মা ?

উঃ—ভ্রান্তির আশ্রয় আত্মা। আত্মারই ভ্রান্তি, আত্মারই সম্যগ্‌দর্শন এবং আত্মারই অধ্যাসনিবৃত্তি; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। ভ্রান্তি আত্মাপ্রভা

অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় । অন্তঃকরণ নিজেই অধ্যাত্ম বস্তু বলিয়া অধ্যাত্মের আশ্রয় হইতে পারে না ।

প্রঃ—কি প্রকারে আমাদের ঘটপটাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় ?

উঃ—এবিষয়ে ‘বেদান্তপরিভাষা’ গ্রন্থের মত এইরূপ । চৈতন্য ত্রিবিধ :—
 (১) বিষয়চৈতন্য (২) প্রমাণচৈতন্য (৩) প্রমাতৃচৈতন্য । (১) ঘটাদি বিষয়-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য (অর্থাৎ ঘটাদি যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া আছে, ততটুকু স্থানের চৈতন্য—যে চৈতন্যে ঘট কম্পিত) = বিষয়চৈতন্য । (২) অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য = প্রমাণচৈতন্য । (৩) অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য = প্রমাতৃচৈতন্য । যেমন কোন পুংকরিনীর জল ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া নালা দিয়া গিয়া চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সেই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে এইরূপে তৈজস অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্গত হইয়া, ঘটাদি বিষয়দেশে গমনপূর্বক ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় । অন্তঃকরণের সেই পরিণামকে বৃত্তি বলে । ‘ইহা ঘট’ ইত্যাদি প্রকার প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাদি বিষয় এবং অন্তঃকরণবৃত্তি একদেশে সহাবস্থান করায় বিষয়-চৈতন্য এবং বৃত্তি-চৈতন্য মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় । (যেমন দুইটী ভিন্নদেশস্থ প্রদীপ একদেশস্থ হইলে উহাদের প্রভা মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়) । মঠাভ্যুত্থান ঘটাকাশের সহিত মঠাকাশের ভেদ থাকে না । বৃত্তিচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য এই প্রকার এক হইয়া যাওয়ায় ঘটের প্রত্যক্ষ হয় । বিষয়চৈতন্যের প্রমাতৃচৈতন্য-অতিরিক্ত সত্তা নাই । ঘটাদি বস্তু ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যাত্ম বলিয়া বিষয়চৈতন্য-সত্তাই ঘটাদি-সত্তা । যেহেতু আরোপিত বিষয়ের অধিষ্ঠান-নস্তু অতিরিক্ত সত্তা থাকিতে পারে না । এক চৈতন্যই বিষয় ও অন্তঃকরণ উভয়ের অধিষ্ঠান । বিষয়চৈতন্যও পূর্বোক্তপ্রকারে প্রমাতৃচৈতন্যই । প্রমাতৃচৈতন্যই ঘটাদির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রমাতৃসত্তাই, ঘটাদি সত্তা, অন্য কিছু নহে । পূর্বোক্তপ্রকারে ঘটাদি বস্তুর অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় । চৈতন্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ । কেহই আত্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষতাব্যতীত বাহ্য ও

অন্তর বস্তুর প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। আত্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষতা, অধ্যস্ত বস্তু-সকলে দৃষ্ট হওয়াই, উহাদের প্রত্যক্ষতা।

পঞ্চদশী বলেন :—

‘বৃদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।

তজ্ঞানং বিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্মুরেৎ ॥

তৃপ্তিদীপ—৯১ শ্লোক।

অর্থাৎ ‘ঘটকে জানিতে গিয়া বৃদ্ধি ও তাহাতে স্থিত চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপ্ত করে। উহাদের মধ্যে বৃদ্ধিবৃদ্ধি দ্বারা ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হয় এবং আভাসচৈতন্য দ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়।’

যখন আমাদের অন্তঃকরণ অন্যবিষয়াকারা বৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঘটাকারাবৃদ্ধি ধারণ করে, তখন অন্ধকারস্থিত ঘটকে যেমন প্রদীপালোক ব্যাপ্ত করিয়া ঘটনিষ্ঠ অন্ধকারের নাশ করে, এইরূপ ঘটাকারাবৃদ্ধিও অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করিয়া ঘটনিষ্ঠ অজ্ঞান-আবরণের নাশ করে। ইহাকে বৃদ্ধিব্যাপ্তি দ্বারা অজ্ঞাত ঘটের আবরণভঙ্গ বলে। কিন্তু বৃদ্ধি জড় বলিয়া ঘটকে প্রকাশ করিতে পারে না। বৃদ্ধিবৃদ্ধিতে স্থিত যে চিদাভাস, উহারই সাহায্যে ‘ইহা ঘট’ এই প্রকার জ্ঞান হয়। তদনন্তর ‘ঘট জ্ঞাত হইল’ এই প্রকার কথন ব্রহ্মের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে। চিদাভাস (জীব) এই প্রকারে ঘটকে আপনা হইতে পৃথক ভাবে যে জানেন, উহাকে ফলব্যাপ্তি বলা হয়। ঘটজ্ঞান চিদাভাসে প্রতি-ফলিত হওয়াই ফলব্যাপ্তি। যেমন দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্য্য সমগ্র দেওয়ালকে প্রকাশিত না করিয়া উহার অঙ্গ অংশকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে, এইরূপ অন্তঃকরণ-প্রতিফলিত চিদাভাস মূল অজ্ঞানের নাশ না করিয়া, বিশিষ্টভাবে ঘটকে প্রকাশ করে। সেইজন্য ঘটের এই বিশেষজ্ঞানে ঘটের মূল কি, তাহা জানা যায় না—বিশেষজ্ঞান, অজ্ঞানপ্রসূত।

ঘটাদি বিষয়-জ্ঞানের তত্ত্ব এ প্রক্রিয়াটী সহজ করিয়া বলিতে গেলে বলা যায়—আমি স্বরূপতঃ সর্বব্যাপক চেতন আত্মা; ভিতর ও বাহির ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত এবং প্রমাতা, প্রমাণ ও বিষয়ের প্রকাশক। আমিই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও

তমোগুণে প্রতিফলিত হইয়া প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হই। যখন আমি অজ্ঞানবশতঃ আমার সর্বব্যাপক স্বরূপটী ভুলিয়া যাই, তখন আমি প্রমাতৃভাবে (জীবভাবে) অভিনিবিষ্ট ও খণ্ড হইয়া পড়ি এবং প্রমেয় পদার্থকে আমা হইতে ভিন্ন ও বাহিরের বস্তু মনে করি। তখন আমি বাহ্যবস্তু জানিতে যাই এবং উহাকে অন্তঃকরণদ্বারা ব্যাপ্ত করি। তখন সর্বিচ্ছিন্ন সমাধিকালে যেমন ধ্যান ও ধ্যান ভ্রূবিয়া গিয়া ঘোষাকারে প্রতিভাত হয়, এইরূপ আমার প্রমাতৃত্বের অভিনিবেশ ক্ষণকালের জন্য ভ্রূবিয়া গিয়া আমি যেন প্রমেয় ঘট হইয়া পাই এবং আমারই (চৈতন্যেরই) উপর অধ্যস্ত ঘটকে আমি দেখি। প্রমেয় ঘটাদি বস্তু মূল অজ্ঞানদ্বারা বন্ধে অধ্যস্ত। আবার সেই ঘটের উপর জীবের বুদ্ধি পতিত না হইয়া তদাকার ধারণ না করায় জীবের নিকট ঐ ঘটাদি অজ্ঞাত থাকে। যখন জীব অন্য বিষয়াকারাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ঘটাকারী বৃত্তি করেন, তখন ঘটনিষ্ঠ খণ্ড অজ্ঞানের নাশ হয়, কিন্তু মূল অজ্ঞানের নাশ হয় না অর্থাৎ ঐ জ্ঞানদ্বারা ঘটের মূল কি তাহা জানা যায় না। সর্বকর্তাই বন্ধে অধ্যস্ত, বন্ধই সকলের মূল।

মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় সূক্ষ্মভাবে প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই ত্রিপটী থাকিয়া যায়। সুতরাং ঘটাদির সহিত একাকারভাবে প্রাপ্ত হইবার পরক্ষণেই আবার আমার প্রমাতৃত্বের অভিনিবেশ ও ত্রিপটী (প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়) স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন আমি বলি, “আমি ঘট জানিলাম।” এই প্রকারে আমরা বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করি এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে আমার উপর অধ্যস্ত ঘটকে যখন আমি প্রত্যক্ষ করি, তখন উহা ‘অহং ঘটঃ’ এইরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া ‘অনং ঘটঃ’ এইরূপে প্রত্যক্ষ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, ঘটাদি প্রত্যক্ষহলে মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ার ভিতর, বাহির এই সংস্কারের নাশ হয় না। সুতরাং পূর্বে পূর্বে আহিত-সংস্কারানুযায়ী ‘অনং ঘটঃ’ (ঘট আমার বাহিরে স্থিত আমি উহা জানিলাম) এইরূপেই ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয়। যদি মূল অজ্ঞানের নাশ হইত, তবে ‘অহং ঘটঃ’ এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান

হইতে পারিত। যে হেতু যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, উহা মায়াকৃতিদ্বারা জ্ঞান-স্বরূপ আমারই (আত্মারই) বিস্তার। আমিই মায়াকৃতি-প্রভাবে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ঘট, বৃক্ষ, পৰ্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, অহং, ইদং ইত্যাদি সব সাজিয়াছি। তত্ত্বতঃ আমাতে মায়াজ্ঞান নাই, সৰ্ব্ব ও অসৰ্ব্বও নাই। আমি এক অখণ্ড, অদ্বিতীয় সমরস-তত্ত্ব।

প্রঃ—কিরূপে রজ্জুসর্পাদি ভ্রান্তি হয় ?

উঃ—বিষয়জ্ঞানে যেমন অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা দিয়া গিয়া বাহিরে বিষয়ের উপর পতিত হয়, এ স্থলেও সেইরূপ অন্তঃকরণ চক্ষুদ্বারা দিয়া বহির্গত হইয়া রজ্জুর উপর পতিত হয় এবং রজ্জুর যাহা সামান্যরূপ, যেমন—‘ইহা একটা (লম্বা অঁকা বাঁকা) কিছু’ উহার সহিত সমানাকার ধারণ করে। রজ্জুর এই সামান্য রূপটীকে ভ্রান্তির আধার বলা হয়। এই সামান্য রূপটী ভ্রান্তিদৃষ্ট সৰ্পেও থাকে অর্থাৎ ঐ সর্পও ‘লম্বা, অঁকা বাঁকা একটা কিছু’। ভ্রান্তিকালে সামান্য-জ্ঞানটী আবৃত হয় না। এই পর্যন্ত যে জ্ঞান উহা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত হেতু প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। কারণ এস্থলে রজ্জুর সামান্যংশদ্বারা অবাচ্ছিন্ন বিষয়চেতন্য ও বৃত্তিচেতন্য একদেশেই হইয়া ঐ জ্ঞান হয়। কিন্তু রজ্জুর বিশেষরূপ হইতেছে—পাট, শণরূপ ঠিথলয়াকার রজ্জু-বস্ত্র-বিশিষ্ট রজ্জু। রজ্জুর এই বিশেষরূপটীকে অধিষ্ঠান বলা হয়। রজ্জু সর্প-ভ্রান্তিকালে রজ্জুর বিশেষরূপটী (অধিষ্ঠান জ্ঞানটী) আবৃত থাকে। অধিষ্ঠানজ্ঞান হইলে আর ভ্রান্তি থাকে না। সুতরাং রজ্জুর সামান্যরূপের জ্ঞান ও বিশেষরূপের অজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির কারণ। এক্ষণে অন্তঃকরণ-বৃত্তি রজ্জুর উপর পড়িয়াও যখন রজ্জুচেতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার আবরণ সম্যক্ নাশ করিতে পারে না, অথচ জ্ঞাতা জীবচেতন্যের বিশেষরূপটী জানিবার ইচ্ছা থাকে, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় মায়ার ক্ষোভের ন্যায়, রজ্জুচেতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। সেই অবিদ্যার অনন্তবস্তুর অনাদি-সংস্কার নিহিত থাকে। রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্যজ্ঞান,

সেই অনন্ত সংস্কারের মধ্যো সর্পসংস্কারের উদ্বোধক হয়। তখন রজ্জুচৈতন্যানিষ্ঠ তমোগুণপ্রধান অবিদ্যা সর্পাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। যে সময় রজ্জুচৈতন্যানিষ্ঠ অবিদ্যার পরিণাম হয়, সেই সময়েই সাক্ষিচৈতন্যানিষ্ঠ অবিদ্যার সত্ত্বগুণও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সর্পজ্ঞান উৎপন্ন করে। সাক্ষিচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং যে নিমিস্তবশতঃ রজ্জুচৈতন্যানিষ্ঠ অবিদ্যার ক্ষোভ হয়, সেই নিমিস্তবশতঃই সাক্ষিচৈতন্যানিষ্ঠ অবিদ্যারও ক্ষোভ হয়। এই সর্পরূপ বিষয় এবং উহার জ্ঞান উভয়ই অবিদ্যার পরিণাম কিন্তু চৈতন্যের বিবর্ত*। চৈতন্য নির্বিকার বলিয়া চৈতন্যের পরিণাম সম্ভব নয়। এই সর্প ও সর্পজ্ঞান চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক। কারণ বাহিরে সর্প না থাকায়, ঘটজ্ঞানের ন্যায় এখানে অন্তঃকরণ বাহিরে গিয়া সর্পাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না।

রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, উহার স্বরূপ কি প্রকার ?

উক্তরে বলা যায়, উহাকে ‘সং’ বলা যায় না; কারণ রজ্জুজ্ঞান হইলে আর উহা থাকে না। সতের কখনও অভাব হয় না। আবার উহাকে ‘অসং’ও বলা যায় না—অসদ্বন্তু যেমন ‘বন্দ্যাপুত্র’ কাহারও জ্ঞানের বিষয় হয় না। যদি বলা যায় বন্দ্য ও পুত্র উভয়ই যখন দৃষ্ট হয় বা জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন উভয়কে মিশাইয়া ‘সোনার পাহাড়ের’ জ্ঞানের ন্যায় কেন বন্দ্যাপুত্রের জ্ঞান হইবে না? তদন্তরে বলা যায়, বন্দ্যজ্ঞানের সহিত পুত্রের ঐ প্রকার মিলন সম্ভব নয়। কারণ বন্দ্য শব্দের অর্থ ই যাহার পুত্র নাই। ঐ প্রকার মিলন ব্যাঘাত-দোষদৃষ্ট। ত্রিভুদৃষ্ট সর্পটী কিন্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, সুতরাং উহাকে অসংও বলা যায় না। তবেই হইল উহার স্বরূপ সং ও অসং হইতে অতিরিক্ত কিছু; উহাই অনির্বচনীয় মায়া। স্বপ্নভ্রম অথবা রজ্জুসর্পাদি যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর

• উপাদানের সমসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যাপত্তির পরিণাম নাম। যেমন পুত্রের পরিণাম দাঁষ। এখানে বৃন্দ ও দাঁষ উভয়ের সত্তা ব্যবহারিক বলিয়া উহার সমসত্তাবিশিষ্ট। উপাদানের বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যাপত্তির নাম বিবর্ত, যেমন—রজ্জুসর্প। এখানে রজ্জুর সত্তা ব্যবহারিক ও সর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক বলিয়া উহার বিষম সত্তাবিশিষ্ট।

স্মৃতি নহে, ইহা আত্মানাত্মবিচার প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের অনিবচনীয় খ্যাতি। (লৌকিক ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, বিচারদৃষ্টিতে অনিবচনীয় এবং শ্রোতদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ বা নাই।) ভ্রম-বিষয়ে অন্যান্য বাদিগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে উভয়-পক্ষের বহু বাদবিবাদ আছে। এখানে উহাদের উল্লেখ সম্ভব নয়। অধিকন্তু সাধারণ পাঠক উহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। জটিল বিষয়-সমূহ যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া যাহাতে পাঠক সহজে তত্ত্বাবধারণ করতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক লিখিত। যাহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক তাহারা বেদান্ত-পরিভাষা, বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ, বৃত্তিপ্রভাকর প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

আত্মা বা ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তিহলে ‘সৎ’ রূপটী ব্রহ্মের সামান্যরূপ বা জগদ্ভ্রান্তির আধার। ভ্রান্তিকালেও উহা আবৃত হয় না। কিন্তু আত্মার চৈদ্রূপতা, আনন্দতা, কুটূহতা, অসঙ্গতা প্রভৃতি যে বিশেষরূপ (অধিষ্ঠান) আবৃত হওয়ার ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি হয়। অধিষ্ঠান-জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে সর্ব-উপাধিশূন্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকট হন। “স্বয়ং চ তত্ত্বং স্বয়মেব বদধম্”—অবতৃণীতা। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সামান্য ও বিশেষ রূপদ্বয় নাই। বিচারের সুবিধার জন্য বিচারকালে উহাদিগকে স্বীকার করা হয় মাত্র।

প্রঃ—প্রমাতৃভাস্য ও সাক্ষিভাস্য কথার অর্থ কি ?

উঃ—সাক্ষিচৈতন্যেই দেশ, কাল, কার্য, কারণ, ভিতর, বাহির সমস্ত ভাব যুগপৎ কল্পিত। ইহা যিনি ঠিক ঠিক অনুভব করিয়াছেন, তাহার নিকট জগতের ব্যাবহারিক সত্তা নাই, সব প্রতিভাসিক ও সাক্ষিভাস্য। তাহার নিকট প্রমাতৃভাস্য বা অন্তঃকরণভাস্য কথার সার্থকতা নাই। কিন্তু যিনি অজ্ঞানবশতঃ জগতের সত্য স্বীকার করেন, তাহার মনে হয় বাহ্যবিষয় দেখিয়াই আমাদের বিষয়ের জ্ঞান হয়, জগতের ব্যাবহারিক সত্তাবাদী তাহারই নিকট অন্তঃকরণভাস্য বা প্রমাতৃভাস্য কথার সার্থকতা। ইন্দ্রিয়সাহায্যে অন্তঃকরণ বাহিরে গিয়া

যে সব বস্তুর উপর পতিত হইলে উহাদের জ্ঞান আমাদের হয়, উহাদিগকে প্রমাতৃ-ভাস্য বা অন্তঃকরণভাস্য বলা হয়। বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক ব্যতীত আমাদের যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, উহারা সাক্ষিভাস্য।

বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক ব্যতীতও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। যেমন সুখ-দুঃখাদি বা অহমাদির প্রত্যক্ষস্থলে বাহ্যবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্পর্কের অপেক্ষা নাই। এই সকল স্থলে অন্তঃকরণ দেহাভ্যন্তরে সুখ-দুঃখাদি বা অহমাদির আকার ধারণ করে। সাক্ষিচেতন্য সেই সুখ-দুঃখাদি আকার বা অহমাদি-আকারা অন্তঃকরণ-বৃত্তিদ্বারা উহাদিগকে প্রকাশ করেন। সুতরাং সুখ-দুঃখাদি সাক্ষিভাস্য। স্বপ্নজগৎ এবং রজ্জু-সর্পাদি যাহারা অনির্বচনীয়-ভাবে উৎপন্ন হয়। যাহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী, উহারাও সাক্ষিভাস্য। এই সব ক্ষেত্রে সাক্ষী অবিন্যাসবৃত্তিদ্বারা উহাদিগকে প্রকাশ করেন। স্মৃতিজ্ঞান, সংশয়জ্ঞান, প্রভৃতিও সাক্ষিভাস্য।

আত্মাকে জানিতে গেলে আমাদের অন্তঃকরণ দেহাভ্যন্তরে থাকিয়াই আত্মাকার ধারণ করে এবং আত্মাতে আশ্রিত যে অবিন্যাস উহার আবরণ ভঙ্গ করে। তখন আত্মা নিজ প্রকাশদ্বারা সেই বৃত্তিতে প্রকাশিত হন। এইজন্য আত্মাকে বৃত্তির বিষয় বলা হয়। কিন্তু সিদাভাস স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইজন্য আত্মাজ্ঞানে বৃত্তিব্যাপ্তি হইলেও ফলব্যাপ্তি নাই। গম্য হইতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। যেমন 'তন্মিই দশম' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া। মূর্ছিতচক্ৰ অবস্থায়ও। দশমপদার্থ-সম্বন্ধে অপরোক্ষ-জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ উপযুক্ত গুরুর নিকটে 'তদ্বদমস্যাং' মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত গিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

প্রঃ—ব্রহ্মজ্ঞান কাহার হয় এবং কিরূপে হয় ?

উঃ—যে চেতন্য অজ্ঞানে পড়িয়াছেন তাহারই অজ্ঞান নাশের চেষ্টা হয় এবং তিনিই অজ্ঞানরূপ বাধা সরাইয়া আত্মজ্ঞানলাভ করেন। এই অজ্ঞান অনাদি ও অনির্বচনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না।

আচার্য্য গোড়পাদ বলিয়াছেন :—

“কল্পয়ত্যাআনমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া ।

স এব বদ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥

(মাণ্ডুক্য-কারিকা, বৈতথ্য-প্রকরণ ১২ শ্লোক) ।

অর্থাৎ ‘স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয়মায়াপ্রভাবে আপনি আপনাকে বিভিন্ন পদার্থাকারে কল্পিত করেন এবং তিনিই আবার সেই পদার্থসকলকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করেন, ইহাই বেদান্তের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত’ । আচার্য্য পুনরায় বলিয়াছেন :—

‘প্রাণাদিভিরনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈবিকল্পিতঃ ।

মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥” ১৯ ।

অর্থাৎ ‘প্রাণাদি অনন্তভাবের দ্বারা আত্মা বিকল্পের বিষয় হইতেছেন । ইহা সেই স্বপ্রকাশ আত্মার মায়্যা, যাহার দ্বারা তিনি নিজেই যেন মোহিত হইয়াছেন ।’ । বাস্তবিক রস্কে জগৎ নাই, তথাপি যখন মায়্যাকল্পপ্রভাবে উহাকে দেখা যায়, তখন রস্কে অধিষ্ঠান করিয়াই উহা ভাসে । সেইজন্য রস্কে জগতের বিবর্ত-কারণ বলা হয় এবং রস্কে সর্ষশক্তিমত্ত, সর্ষকর্তৃত্ব প্রভৃতি ভাবের আরোপ করা হয় ।

এক্ষণে রস্কে বৃত্তিব্যাপ্তির দ্বারা কিরূপে অজ্ঞান নাশ হয় দেখা যাউক :—

জীবের মধ্যে দুইটী ভাগ আছে একটী চেতন ভাগ, অপরটী জড় ভাগ । অব্যবহৃতঃ এই চৈতন্য ও জড়কে মিশাইয়া ফেলাই জীবন্ত বা হৃদয়গ্রন্থি । বিবেক-ব্যতীত এই হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয় না । সাধারণ জীবের মধ্যে জড়ভাবের আধিপত্য থাকে । কিন্তু সাধনদ্বারা জীবের বুদ্ধি যেমন যেমন নিশ্চল হয়, তেমনি তেমনি জীবের চেতনভাগটী পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং জড়ভাগ দূর্ধ্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন জীবের তত্ত্বাবধারণের ক্ষমতা জন্মে । তখন সেই জীব নামধারী চৈতন্য বা রস্কে মূল অজ্ঞাননাশের জন্য সমস্ত বিষয়াদিত্য ত্যাগ করিয়া সদৃগুরুদূর নিকট বেদান্তবিচার শ্রবণ করেন । ইহার ফল তাহার ‘আমি অসঙ্গ, কুটস্থ, শূদ্র, বুদ্ধ ও মুক্ত রস্কে’ এইরূপ অখণ্ডাকারা বিদ্যাবৃত্তির বা রস্কাকারাবৃত্তির উদয় হয় । শূদ্রবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ঐ চৈতন্যই সর্ষ একত্বদর্শনকারী বিদ্যাবৃত্তির

দ্বারা বহুদর্শনকারী অবিদ্যাবৃত্তির বা অজ্ঞানের নাশ করেন। বিদ্যাবৃত্তি; অবিদ্যাবৃত্তির বিপরীত বলিয়া উহার নাশক। সামান্য চৈতন্য বা নিগূর্ণব্রহ্ম অজ্ঞানের নাশক নহেন বরং উহার কৃপাতেই অজ্ঞান ভাসে। সেইজন্য অজ্ঞান নাশজন্য ‘আমি শূন্য, বৃক্ষ’ প্রভৃতি এইরূপ সর্বিশেষ বিদ্যাবৃত্তির প্রয়োজন। নিগূর্ণব্রহ্ম বিদ্যার বিষয় হন না তাই আচার্য্য শঙ্কর সর্ববেদান্তসারে বলিয়াছেন :—

“তদবিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানসুখাত্মকম্।

শান্তং তদতীতং পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥” ৯৯৬ ॥

অর্থাৎ ‘সত্য, জ্ঞান ও সুখাত্মক ব্রহ্মই বিদ্যার বিষয় হন, পরব্রহ্ম শান্ত ও বিদ্যাবৃত্তির অতীত বলিয়া কথিত হন।’

চিন্তাভাস-সম্মিশ্রিত ঐ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি যেমনই মূল অজ্ঞানের নাশ করে, অমনই জীবের স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকট হয়। অজ্ঞানের বাধ (সমূল নাশ) হওয়ায়, অজ্ঞানবশতঃ যে জীবিত খাড়া ছিল, উহারও বাধ হয়। যেমন দপ্‌গৃহ সূর্য্য আকাশস্থ সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে গেলে উহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া উহার মধ্যে লীন হইয়া যায়, এইরূপ জীবিতেরও ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি ঘটায় জীব ঘটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। সুতরাং বলা হয়, অজ্ঞাননাশজন্য ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা থাকিলেও ফলব্যাপ্তির অপেক্ষা নাই। যেখানে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, “মনসৈবেদমাপ্তবাম্” অর্থাৎ ‘মনের দ্বারা ইহাকে পাওয়া যায়’, সেখানে বুদ্ধিতে হইবে ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। আবার যেখানে বলা হইয়াছে :—

“যশ্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্বি নেনং যদিদমুপাসতে ॥” কেনোপনিষৎ ১৫।

অর্থাৎ ‘যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, যিনি থাকায় মন মনন করিতে পারে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তুমি ‘ইদং’ রূপে যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্ম নহে’। এই স্থলে ‘যাঁহাকে মনন করা যায় না’ বলায় নিগূর্ণব্রহ্মে ফলব্যাপ্তির নিষেধ করা হইল।

আচার্য্য শংকর বলিয়াছেন :—“অরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বং সংতমসে হৃতে ।

তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়ংমেবাংশুমানিব” ।

(আত্মবোধ—৪৩ শ্লোক)

অর্থাৎ ‘সূর্য্যোদয়ের প্রথম অবস্থায় অরুণ যেমন অন্ধকার দূর করিয়া দিলে পরে প্রকাশময় সূর্য্যের আপনিই আবির্ভাব হয়, এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর হইলে প্রকাশস্বরূপ আত্মা স্বয়ংই আবির্ভূত হন ।

আচার্য্য গোড়পাদ আত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমরা এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি ।

“মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যং কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।

মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥

আত্মসত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা ।

অমনস্তাং তদা য়াতি গ্রাহ্যভাবে তদগ্রহম্ ॥

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে ।

ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবদ্যতে ॥

(মাণ্ডুক্য-কারিকা—অদ্বৈত-প্রকরণ) । ৩১-৩৩

অর্থাৎ ‘এই সচরাচর জগৎ যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, ইহা মনের দৃশ্য ! মনের অমনীভাব অর্থাৎ নিরোধ হইলে দ্বৈত উপলব্ধ হয় না । ‘আত্মাই সত্য, তদ্ব্যতীত সবই মিথ্যা,’ এইজ্ঞানে যখন মন সংকল্প ত্যাগ করে, তখন ইশ্বনশূন্য অগ্নির ন্যায়, গ্রাহ্যবস্তুর অভাবে মন গ্রহণচিন্তারহিত হইয়া অমনস্তা (বিকল্পরাহিত্য) লাভ করে । সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত অজ জ্ঞানকে ব্রহ্মবিদগণ জ্ঞেয় পরমার্থসত্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলেন । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “বিস্তারিত জ্ঞানের লোপ হয় না”, “ব্রহ্ম, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ” ইত্যাদি । ব্রহ্ম যাহার জ্ঞেয়, স্বরূপস্থ সেই এই জ্ঞান অগ্নির উষ্ণতাবৎ জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । সেই অজ জ্ঞেয়স্বরূপ আত্মাতত্ত্ব স্বয়ংই আপনাকে স্ব-স্বরূপ অজ জ্ঞানদ্বারা অবগত হন । নিত্যপ্রকাশ সূর্য্য যেমন নিজ প্রকাশের জন্য অপর প্রকাশের অপেক্ষা করেন না, এইরূপ নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া আত্মা স্বীয় প্রকাশের জন্য প্রকাশাত্তরের অপেক্ষা করেন না ।’

বিভূতি যোগ

“যদ্ব্যধিভূতমং সত্ত্বং শ্রীমদীশ্বরতমেব বা ।

ভক্তদেবারগচ্ছ তদং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ গীতা ১০।৪১

অর্থাৎ ‘হে পার্থ’ ! যে যে বস্তু বিভূতি, শ্রী ও শক্তিস্বকৃত, উহাদিগকে আমার তেজঃ-অংশ-সম্ভূত জানিবে’ ।

গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায় কর্মসংন্যাসাধ্য সাধনপ্রধান, দ্বিতীয় ছয়টি অধ্যায় বিশ্বরূপ ভগবানের উপাসনা বা ভক্তিপ্রধান এবং শেষের ছয়টি অধ্যায় বিচারপ্রধান । গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ । ভক্তি সগুণ বা নিগুণ রস্কে হইতে পারে । যাহারা সগুণ বিশ্বরূপের উপাসক, তাহারা ক্রমশঃ যুক্ততম অবস্থা লাভ করেন এবং পরে ঈশ্বরকৃপায় ইহাদের বিচারের উদয় হয়, ভগবান্ উহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন । তখন তাহারা সেই বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যুক্ত হন । কিন্তু যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্যযোগী, তাহাদের ঐ জ্ঞাননিষ্ঠাই নিগুণে ভক্তি । তাহারা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন । দ্বৈতবুদ্ধি লইয়া যাহারা সগুণরস্কে উপাসনা করেন, তাহারাই যুক্ত অথবা যুক্ততম অবস্থা লাভ করিতে পারেন । কিন্তু যিনি বিচারদ্বারা জীবরস্কের একত্ব অবগত হইয়া সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে নিষ্ঠা, এইপ্রকার নিগুণ উপাসককে যুক্ত, যুক্ততম প্রভূতি বলা যায় না । কারণ সেই অভেদ-দর্শনকারী জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক কাহার সহিত যুক্ত হইবেন ? মায়িক প্রপঞ্চকে মিথ্যাজ্ঞানে ভাগই ইহার যোগ । কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ ও মদমদ্বন্দ্ব সাধকের নিকটেই জ্ঞাননিষ্ঠার উপযোগিতা । দেহে অভিমান দৃঢ় থাকিলে জ্ঞাননিষ্ঠা বা নিগুণ-উপাসনা ক্রেশরই কারণ হয় । সুতরাং দেহাভিমানী সাধকের পক্ষে অগ্রে সগুণ-উপাসনাদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার লাভ করা কর্তব্য । ভগবানের বিভূতির ধ্যানদ্বারা ভগবানে স্থায়ী ভক্তি লাভ হয় । বিভূতিসকল ভগবানের বিশেষ বিশেষ-রূপ অভিযুক্ত মূর্তি । গীতার দশম অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে

ভগবান্ বলিয়াছেন, “আমার বিভূতির অস্ত্র নাই” অর্থাৎ জগতের যাহা কিছু আমরা জানি বা না জানি, সমস্তই ভগবানের বিভূতি। ৪১ শ্লোকে ভগবান্ প্রত্যেক শ্রী, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাক্ত বস্তুতে তাহার ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং দশম অধ্যায়ে ঐরূপ কতকগুলি বস্তুর নামও করিয়াছেন। শ্রুতির উপদেশ : ‘ঈশাবাস্যমিদং সৰ্ব্বম’। অর্থাৎ ‘এই জগৎকে ঈশ্বরভাবনাদ্বারা বাসিত বা আচ্ছাদিত করা উচিত’। যদি এরূপ শঙ্কা কর যে, যদি সৰ্ব্বত্র ভগবান্কে ভাবনা করা শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য হয়, তবে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া ধ্যান করার উদ্দেশ্য কি? সবই ত ভগবানের বিভূতি। ইহার উত্তর শ্রবণ কর, সত্য বটে, সবই ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক ধারণা করা সোজা নয়। মানুষ ইহা জানিলেও ব্যবহারকালে ইহার স্মরণ রাখিতে পারে না। ঠিক ঠিক উহার ধারণা করিবার জন্যই প্রথমে ঐশ্বর্য্যাদিয়ুক্ত বস্তুসকলে চিত্ত ধারণ করিতে এবং উহাদের ধ্যান করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। দেখ আদিত্য সৰ্ব্ববস্তুতে পড়িলেও দর্পণাদি স্বচ্ছ বস্তুতে আদিত্যকে ধরিবার যত সুবিধা হয়, প্রস্তরাদি অস্বচ্ছ বস্তুতে সেরূপ হয় না। এইরূপ ভগবান্ সৰ্ব্বত্র থাকিলেও ঐশ্বর্য্যাদি-সমন্বিত সাত্ত্বিক বস্তুতে ভগবান্কে ধরার যত সুবিধা হয়, অন্যবস্তুতে তদ্রূপ হয় না। ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও মাধুর্য্যাক্ত বস্তুতে আমাদের চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে চিত্তধারণা করা বা ঐ সকল বস্তুর ধ্যান করা সহজ হইয়া থাকে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, উহা হইতে জানা যায়, যে ভগবানের ঐ বিশ্বরূপদেহ আদ্য, তেজোময় ও ব্যাপক। শূন্যদেহে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি ঐ ব্যাপকরূপ দর্শন করিতে পারে না। তাই ভগবান্ ভক্ত অঞ্জলীকে বিশ্বরূপ দেখিবার উপযুক্ত দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন। ঐ চক্ষু-দ্বারা অঞ্জলী ভগবানের দেহে একইকালে একত্র অবস্থিত সৰ্ব্ববস্তু দেখিতে পাইলেন। কিন্তু পরে তাহার ব্যষ্টি খণ্ডদেহের অভিমান ফুটিয়া উঠিল। তখন তাহার ঐ ব্যাপক রূপ দেখিতে ভয় হইল এবং তিনি ভগবানের ব্যষ্টি চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে চাহিলেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দেহাভিমানী

সাধকের পক্ষে ভগবানের সগুণ ব্যাপক রূপ দর্শন করাই সহজ নহে, আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদিবিহীন তাহার নিগূঢ়রূপ দর্শন করা যে আরও কঠিন তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা নামরূপবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড বস্তু দেখিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য নামরূপবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড বস্তুর ধ্যান করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়, আর উহারা বিভূতি-যুক্ত হইলে ধ্যানের আরও সুবিধা হয়। যদিও ভগবান্ সর্বত্রই আছেন, তথাপি আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, পশ্চত, সমুদ্র, মন্দির প্রভৃতি দর্শনে আমাদের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য স্থির ও ভগবৎমুখী হয়; ঘট, পটাদি বস্তুদর্শনে তাহা হয় না। বিভূতিযুক্ত বস্তুসকলের আমাদের চিত্তকে একটু স্থির ও ভগবৎমুখী করাইয়া দিবার শক্তি আছে। চন্দ্র, সূর্য্যাদি বস্তু ঈশ্বরপ্রেরিত দূত, ইহারা আমারে নিকট ঈশ্বরের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই নামরূপের সাজে নিজেকে সজ্জিত করিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন, আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য। আমি অবিদ্যাপ্রভাবে যেমন যেমন খণ্ড হইয়া পড়িয়াছি, তেমনই তেমনই আমার অখণ্ড বস্তু ধারণা করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। তখন পরমদয়ালু ভগবান্ও আমাকে ঐ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বরূপে অখণ্ড থাকিয়াও আত্মমায়ার দ্বারা খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তিসকল ধারণ করিয়াছেন।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—“ঈশ্বরদ্বৈত জ্ঞানের বিরোধী নহে, পরস্তু সহায়ক। বেদ, গুরু প্রভৃতি ঈশ্বরদ্বৈতদ্বারাই অদ্বৈতের জ্ঞান সম্ভব হয়। ভগবানের বিভূতিসকলের ধ্যান করিলে আমাদের মনে ঈশ্বরবিষয়ক জিজ্ঞাসার উদয় হয়। প্রত্যেক বস্তুর মূলেই ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমরা উহাদিগকে তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং রজোগুণদ্বারা ঘূর্ণিতদৃষ্টি হইয়া দেখি, তাই উহারা আমাদের নিকট ঈশ্বরমূর্ত্তিরূপে দৃষ্ট না হইয়া ভেদযুক্ত জগদ্রূপে দৃষ্ট হয়। যদি কোন বস্তুতে মনকে ধরিতে পারি, তবে ঐ বস্তুর মূলে যে ভগবান্ আছেন, তাহারও দর্শন করিতে পারি। কাহারও স্থানতে (শব্দক মড়া গাছ) পদুমবৃক্ষ হইল, এমতাবস্থায় সে যদি ঘুমাইয়া

পড়ে বা তাহার চিত্ত অন্য বিষয়ে গমন করে, তবে তাহার ঐ ভাবি কাটিবে না । কিন্তু সে ব্যক্তি যদি হৃদসিয়ার হইয়া ভাল করিয়া ঐ স্থানকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে, তবে সে দেখিতে পাইবে যে, উহা অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থিরভাবে একরূপেই আছে । মনুষ্য হইলে কিছু নড়িত । তখন তাহার সংশয় আসিবে, ইহা স্থান কি পদার্থ ? সংশয়ের মধ্যে সত্যের কিছুটা দর্শন হয়, বিশেষরূপ নিঃসারণ হয় না ; সংশয় উভয়কোটিক । সংশয় আসিলেই বিচার আরম্ভ হইবে এবং ঐ বিচারদ্বারা স্থানভূতে পদার্থবুদ্ধি কাটিয়া গিয়া উহাকে স্থান বলিয়াই নিশ্চয় হইবে । এইরূপ প্রত্যেক বস্তুকে যদি আমরা বিচারপূর্ব্বক সাবধানে ও একাগ্রচিত্তে দেখি, তবে নামরূপের আবরণ ভেদ করিয়া উহার মধ্য হইতে সং, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ভগবান্ ফুটিয়া উঠেন । একটী বস্তুতে ভগবৎ স্পর্শলাভ করিলে সকলবস্তুতেই ঐ স্পর্শলাভ করা যায় । যেমন যে কোন স্থানে গঙ্গাকে স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্পর্শের ফললাভ হয়, হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হয় না, এইরূপ একটী বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হইলে সকলবস্তুর তত্ত্বদর্শন হয়, কারণ মূল তত্ত্ব যে ভগবান্, তিনি এক । নিজের গৃহে পার্শ্বস্থিত জল দেখিয়া জলের পরিচয় হইলে, অন্যত্র অবস্থিত জলকে চিনিতে বেগ পাইতে হয় না । এইজন্য ভগবান্ গীতায় বিভূতি-বর্ণনার প্রথমেই বলিলেন—“হে গুড়াকেশ । আমি সর্ব্বভূতে আত্মরূপে স্থিত” । অর্থাৎ নিজের মধ্যে ভগবান্কে আত্মরূপে ধরিতে পারিলে, সর্ব্ববস্তুতেও তাহাকে ধরা সহজ হইবে । কিন্তু বহির্মুখতাজন্য যদি ভগবান্কে আত্মরূপে ধরিতে না পারা যায়, তবে বাহিরের যে যে বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ বেশী, ঐ সকলের মধ্যে তাহাকে ধরিতে হইবে । বাহিরের বিভূতির ধ্যানও আমাদেরকে ক্রমশঃ ভগবৎ-স্বরূপের পরিচয় করাইয়া দেয় ।

সূর্য্য ভগবানের একটী বিভূতি । সূর্য্যের বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করিলে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা করিতে ও সদগুণ লাভ করিতে পারি এবং ভগবানের সমীপবর্তী হইতে পারি । সূর্য্য সমস্ত শক্তির আধার, সূর্য্য না থাকিলে আমাদের চলিবার উপায় নাই । সূর্য্য কত মহৎ ! উহার মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিলে

আমাদের চিন্তাও মহৎ ও উদার হইয়া উঠে। সূর্য্য আলস্যবিহীন ও ভগবানের নিয়মানুবর্তী হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া যাইতেছেন। উহা হইতে আমরা আলস্যবিসর্জন, নিষ্কামভাব ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করিতে পারি। সূর্য্য ধনী, দরিদ্র, পুণ্যাশ্রা, পাপী ইত্যাদিবিচার না করিয়া সকলকে সমানভাবে আলোক প্রদান করিতেছেন। উহা হইতে আমরা সমদর্শিতা ও পক্ষপাতশূন্য ভাব শিক্ষা করিতে পারি। আবার সূর্য্য সকলবস্তুরূপে পতিত হইয়াও উহাদের গুণদোষে লিপ্ত হন না, সুতরাং আমরা উহার নিকট হইতে অসঙ্গভাবও শিক্ষা করিতে পারি। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সূর্য্যের নিকট হইতে আমাদের এইরূপ অনেক বিষয় শিখিবার আছে। এইরূপ অন্যান্য বিভূতিসকলের বিষয় চিন্তা করিলেও অনেক-কিছু শিক্ষালাভ করা যায়। বস্তুতঃ দেখিতে জানিলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর নিকট আমরা কিছু না কিছু শিখিতে পারি। বেদ বলিতে কতকগুলি পুস্তকমাত্রই বৃথায় না। জগৎও বেদ, পরমেশ্বরের বিকাশ। বিভূতিসকলের ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের চিন্তা ঐ বিভূতিসকলের নিয়ামক পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হইবে এবং পরিশেষে আমরা তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইব।

ভগবান্ নামরূপের মধ্যে আমাদের কাছে ধরা দিতে চাহিলেও আমরা বহির্মুখতাহেতু তাঁহাকে ধরিতে চাহি না। প্রত্যেক বস্তুর নাম ও রূপ প্রকাশের পূর্বে সাক্ষিদানল ভগবান্ ফুটিয়া উঠেন, নতুবা নামরূপ কাহার উপর দাঁড়াইবে? তরঙ্গ যদি দেখা যায় তবে জল অগ্রেই দৃষ্ট হয়, নতুবা তরঙ্গের ধারণাই হইত না। নামরূপাশ্রয় যে বস্তুই আমরা দেখি, উহাদের সত্তা প্রথমেই স্বীকার্য্য এবং যে জ্ঞানের উপর উহারা ভাসে, উহাও প্রথমেই স্বীকার্য্য। সুতরাং সৎ ও চিৎ বাহ্য ভগবৎস্বরূপ উহা আমরা প্রথমেই দেখি, আনন্দস্বরূপটী আমাদের রাগদ্বেষকলুষিত তামাসিক ও রাজসিক বুদ্ধিতে প্রথমে প্রতিভাত হয় না। যদিও প্রত্যেক বস্তুর প্রকাশের মূলে ভগবান্ সৎ ও চিৎ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেন তথাপি নাম ও রূপে অতিশয় আগ্রহবশতঃ আমরা ভগবানকে অবহেলা করিয়া বিষয়-ভোগের জন্য বহির্মুখে ছুটিতে থাকি। ঘট-সত্তা, পট-সত্তা, আকাশ-সত্তা, তেজ-সত্তা, অহং-

সত্তা, ব্রহ্মার সত্তা, বিষ্ণুর সত্তা, মহেশ্বরের সত্তা ইত্যাদিরূপে যদি ভগবান্ আমাদিগকে ধরা না দিতেন, তবে অখণ্ড সত্তা বা 'সৎ'কে কে ধারণা করিতে পারিত ? যদি ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞানরূপে তিনি প্রকাশিত না হইতেন, তবে অখণ্ড জ্ঞানকে বা 'সৎ'কে কে ধারণা করিতে পারিত ? যদি পদ্রে আনন্দ, বিত্রে আনন্দ, স্থীতে আনন্দ ইত্যাদি রূপে খণ্ড খণ্ড আনন্দের অভিব্যক্তি না হইত, তবে অখণ্ড আনন্দের ধারণা কিরূপে হইত ? সুতরাং ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনাকে হনন করেন নাই, পরন্তু স্বমহিমায় প্রকাশিতই রহিয়াছেন। সূর্য্যালোক ভগৎকে প্রকাশ করে—প্রত্যেক বস্তুকে সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াও যে মূর্খব্যক্তি সূর্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না, সে কৃপার পাত্র। এইরূপ ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, দেহজ্ঞান, আমি জ্ঞান ইত্যাদিরূপে ঘট, পট, দেহ, অহং প্রভৃতিকে জ্ঞানালোকদ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াও যে জ্ঞানরূপ ভগবানকে অস্বীকার করিতে চায়, সে কৃপার পাত্র। পণ্ডদশীকার বলিয়াছেন—যদি কোন ব্যক্তি বলে 'আমার জিহ্বা নাই' তবে, উহা তাহার পক্ষে বড় লজ্জার কথা, সে লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হয়। কারণ সে জিহ্বার-দ্বারাই বলে 'আমার জিহ্বা নাই'। এইরূপ যে ব্যক্তি বলে 'ঈশ্বর নাই' ইহা তাহার পক্ষে লজ্জার কথা এবং যে উপহাসের পাত্র, কারণ, তাহার ও ঈশ্বরের মূলে যে সত্তা ও জ্ঞান উহা একই এবং সেই সত্তা ও জ্ঞানের সাহায্যেই সে বলিতে পারে 'ঈশ্বর নাই'। যে জ্ঞানদ্বারা তুমি বলিবে 'ঈশ্বর নাই' ঐ জ্ঞানই চিদ্রূপ ভগবান্। ঐ জ্ঞান তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, উহা সর্বব্যাপক। তোমার আমিত্ব বা অহংকার ঐ জ্ঞানদ্বারাই প্রকাশিত হয়। "অসম্ভব স ভবতি অসদৃশশ্চেতি বেদ চেৎ"। তৈত্তিরীয়। ২।৫। অর্থাৎ 'যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজেই অসৎ হন'।

জীব যদি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখে, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়া পারে না। এই যে চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতভাবে উদিত হইতেছেন, অস্ত যাইতেছেন, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ছয় ঋতু ঠিক পর পর আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে,

শুক্রশোণিত মনুষ্যরূপে, বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে, মৃত্যু প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে, ইত্যাদি দেখিয়া লোকের মনে প্রশ্ন জাগে কে এই নিয়ম করিল ? কাহার শাসনে চন্দ্র, সূর্য্য এবং গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে বিচরণ ও কার্য্য করিতেছে ? ইহাদের নিয়ন্তা বা রাজা কে ? যদি বল স্বভাবতঃই ইহা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্বভাব কাহার ? ঐ স্বভাব বা নিয়তি ষাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই সকলের নিয়ামক ও শাসনকর্ত্তা ।

‘এতস্য বা অক্ষরস্য গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মূহুৰ্ত্তা অহোরাত্রাণ্যৰ্শ্বমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতান্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃ স্যান্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পৰ্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাং যাং চ দিশম্শ্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দবাং পিতরোহস্বায়ত্তাঃ । বৃহদারণ্যক ৩।৮

অর্থ—‘হে গার্গি ! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে ইহারই প্রশাসনে স্বৰ্গ ও পৃথিবী বিধৃত আছে, ইহারই প্রশাসনে নিমেষ, মূহুৰ্ত্ত, অহোরাত্র, অৰ্শ্বমাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ বিধৃত হইয়া আছে । এই অক্ষরের শাসনেই শ্বেতপৰ্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচ্য নদীসমূহ এবং প্রতীচ্য নদীসমূহ ষাহার যেদিকে গতি সেই দিকে প্রবাহিত হইতেছে । হে গার্গি ! এই অক্ষরের প্রশাসনেই মনুষ্যাগণ বদান্যগণকে প্রশংসা করে, দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দৰ্শ্যহোমের অনঙ্গত হন’ ।

জীব ভাবিয়া দেখ তোমার শক্তি কতটুকু ? তোমার জীবন পদ্যপত্রস্থ জলবৎ চঞ্চল, কখন যে চলিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। তোমার চক্ষু কিছুদূর পর্য্যন্ত দেখে, অতি দূরের কত দেখিতে পায় না, আবার অতি নিকটের কতও দেখিতে পায় না । তোমার কণা অতি সূক্ষ্ম শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না, অতি ভীষণ শব্দও সহ্য করিতে পারে না । তোমার ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি সীমাবদ্ধ, তোমার

জ্ঞানও সমীক্ষ। তোমার অহংকার করিবার কি আছে? এক মূহুর্তেই তোমার কন্মশক্তি, চিত্তশক্তি প্রভৃতি রোগাদি দ্বারা বিকল হইয়া যাইতে পারে। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সব পূর্ণ হয় না—তুমি ইচ্ছা কর না যে আমি বৃদ্ধ হই, আমি মরি, অথচ কোন শক্তি বাধা না মানিয়া তোমাকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়, কোন শক্তি বিজ্ঞানের গর্ভে খর্ব করিয়া তোমাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লয়? কোন শক্তি তোমাকে আদিত্যরূপে, বায়ুরূপে, জলরূপে, পৃথিবীরূপে, অন্তরূপে, মাতারূপে, পিতারূপে রক্ষা করিতেছেন? কোন শক্তি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন? ঐ শক্তির মূল উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক যে পদার্থসকল লইয়া গবেষণা করেন, ঐ পদার্থগুলি কে সৃষ্টি করিল?

বিজ্ঞান যে শক্তির আবিষ্কার করেন, ঐ শক্তি কাহার? এই যে বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তির আবিষ্কার করিলেন, উহা এতদিন কোথায় ছিল, অণু কাহার সৃষ্টি? ইহার উত্তর, সমস্তই ভগবৎ-শক্তির অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক সেই শক্তির সামান্যমাত্র ধার লইয়া তাহার কারবার চালান। ইহাতে তাহার অহংকার করিবার কিছু নাই। ভগবানের সামান্য স্রুষ্টিতে বৈজ্ঞানিক তাহার সমস্ত আবিষ্কার-সহ এক মূহুর্তে ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্রের অতলগর্ভে চলিয়া যাইতে পারেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শূভ বৃষ্টির সহিত সংযুক্ত হইলে মানবের কল্যাণ সাধন করে, নতুবা উহা ধ্বংসের কারণ হয়। অনন্ত কাল পড়িয়া রহিয়াছে। সেই কালের সংকুচিত চিত্রপটে কোথায় কি অঙ্কিত আছে, তাহা কে জানে? কাল যে চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতেছেন, উহা দেখিয়াই আমরা মূগ্ধ হইতেছি। ভাবিতেছি না, ঐ চিত্রপটে আরও কত কি বিচিত্র চিত্র গুটান আছে, কালে উহা প্রকাশ পাইবে। জগৎরূপ রঙ্গমঞ্চে ভগবানের কালশক্তি নৃত্য-শিক্ষক। কাল যাহাকে যে সময়েরূপ নাচাইবেন, তাহাকে সেই সময় সেইরূপই নাচিতে হইবে। কাল জগতের নিয়ামক। দেখ আশ্র-বৃক্ষের আমফল প্রদানের শক্তি থাকিলেও তাহাকে কালের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, অর্থাৎ সেই শক্তি গ্রীষ্মকাল ব্যতীত শীতকালে ফলপ্রদান করিতে

পারে না। কালে দেশ সমুদ্রে এবং সমুদ্র দেশে পরিণত হয়। কালে চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত লয় পায়। এই কালও ভগবানের বিভূতি, ভগবানের শক্তি, উহা সর্ব্বনিয়ামক ভগবানের অধীন। ভগবান্ কালেরও কাল। কালের ধ্যান সাতিশয় মঙ্গলপ্রদ।

বিভূতির ভাবনা ও ধ্যানদ্বারা অনন্তশক্তি ভগবানের উপর ভক্তির উদয় হয় ও সাধকের অহংকার ক্ষীণ হইতে থাকে। চক্ষুঃ বিভূতির বাহ্যরূপটী ছাড়িয়া চিত্ত ভগবানের গুণ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য আদি চিন্তায় ডুবিতে থাকে। ভগবান্ এই প্রকার ভক্তকে আত্মস্বরূপ দেখাইয়া দেন। তখন জীব বদ্বিতে পারে :—

“য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ

শরীরং য আদিত্যমন্তরো যমদিত্যে ত আত্মা সন্ত্যমামৃতঃ। বৃহদারণ্যক ৩।৭

অর্থাৎ ‘যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্য যাহাকে জানে না, আদিত্য যাহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্ষামী অমৃত।’

—

গায়ত্রী-উপাসনা ও গায়ত্রী-তত্ত্ব

‘গায়ত্রী ছন্দসামহক্’—গীতা ১০।৩৫।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, ছন্দঃ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী। গায়ত্রী ‘ছন্দসাং মাতঃ’ ছন্দঃসকলের মাতা বা উৎপত্তিস্থল। গায়ত্রীর স্পন্দনে উষ্ণিক, অন্দষ্টপ্ প্রভৃতি ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে। গায়ত্রীছন্দঃ আবার ওঁকারের স্পন্দন। ওঁকারই স্পন্দিত হইয়া সপ্ত ছন্দঃ এবং ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তলোক হইয়াছে। গায়ত্রী জপের পাঁচটী অঙ্গ :—(১) আবাহন (২) অঙ্গন্যাস (৩) ধ্যান (৪) জপ (৫) বিসর্জন।

(১) আবাহন—“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রি ছন্দসাং মাতরক্ষ্যোনি নমোহস্তু তে” ॥

অর্থাৎ—‘হে বরদায়িনি, ত্র্যক্ষরে, ব্রহ্মপ্রকাশিনি, ছন্দঃসকলের মাতা, ব্রহ্মযোনি গায়ত্রি। তুমি আগমন কর।

(২) ন্যাস—“ওঁ হ্রদি। ওঁ ভূঃ শিরসি। ওঁ ভুবঃ শিখায়াম্। ওঁ স্বঃ সম্বর্গাশ্চৈষদ্। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ নেত্রয়োষদ্। ওঁ তৎ সর্বিতদ্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অশ্রায় ফট্।” (৩বার)

অর্থাৎ—ওঁকার শব্দদ্বারা হৃদয়, ভূঃ শব্দদ্বারা মস্তক, ভুবঃ শব্দদ্বারা শিখা, স্বঃ শব্দদ্বারা সম্বর্গাশ্রয় এবং ‘ভূভুবঃ স্বঃ’ শব্দদ্বারা নেত্রয়োষ্মতঃ স্পর্শ করিবে। পরে ‘তৎ সর্বিতদ্বরেণ্যং’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকালে দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম হস্তের তল ও পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ‘ফট্’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করতলে আঘাত করিবে।

(৩) ধ্যান—“ওঁ কুমারীমৃগেন্দযদুতাং স্বক্ষরূপাং বিচিন্তয়েৎ ।

হংসংস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্” ॥

অর্থাৎ—‘প্রাতঃ কালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদযদুতা, স্বক্ষরূপা (সৃষ্টিশক্তি)

হংসংস্থিতা, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে।

“ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাণ্ড তাক্ষ্যাস্থাং পীতবাসসীম্ ।

যদ্বতীণ্ড যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্” ॥

অর্থাৎ ‘মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে বিষ্ণুরূপা, গরুড়াস্থা, পীতবাস্তা, যদ্বতী, যজুর্বেদযদুতা সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে’ ।

“ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাণ্ড বৃষাং বৃষভবাহিনীম্ ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাস্থাং সামবেদসমায়ুতাম্” ॥

অর্থাৎ ‘সায়াহ্নে গায়ত্রীকে শিবরূপা, বৃষা বৃষভবাহিনী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাস্থা এবং সামবেদসমায়ুতাস্থা এইরূপ চিন্তা করিবে’ ।

(৪) জপ—জপের পূর্বে গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা, উহার ছন্দঃ ও দেবতার স্মরণ করিতে হইবে। যথা :—“গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।” অর্থাৎ ‘গায়ত্রীমন্ত্রের বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা জপকালে ইহাদের প্রয়োগ হয়’ । পরে নিম্নলিখিত গায়ত্রীমন্ত্রের ১০, ১৮, ১০৮, ১০০৮, বার যথাশক্তি জপ করিবে ।

জপমন্ত্র—“ওঁ ভূভুৱঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বারৈন্যং ভূর্গোদেবস্য ধীমহি ধियो যো নমঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥”

তিনটী পাদ হিসাবে ভাগ করিলে গায়ত্রীর রূপ নিম্নলিখিত প্রকার হইবে :—

প্রণব	মহাব্যাহ্রতি	প্রথম পাদ	দ্বিতীয় পাদ
ওঁ	ভূভুৱঃ স্বঃ	তৎসবিতুর্বারৈন্যং	ভূর্গোদেবস্য ধীমহি

তৃতীয় পাদ

ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ

গায়ত্রীছন্দের প্রত্যেকপাদে ৮টী কীরিয়া অক্ষর থাকা উচিত। কিন্তু প্রথম-পাদে ৭টী অক্ষর আছে। ছন্দে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরযুক্ত না হইলে উহার গণনা হয় না। সুতরাং ‘তৎ’ শব্দ একটী অক্ষর ঘরিতে হইবে। এইজন্য ছন্দ-পতন নিবারণকল্পে ‘বরেণ্যং’ শব্দটী ‘বরেণিয়ং’ এইপ্রকার উচ্চারণ করা হয়।

গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ :—ওঁকার পরমেশ্বরের বাচক, ইহা সগুণ ও নিগুণ উভয় ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। ভূঃ = পৃথিবী (শব্দের মতে = সৎ)। ভুবঃ = অন্তরীক্ষ (শব্দের মতে = চিত্ত)। স্বঃ = স্বর্গ (শব্দের মতে = আনন্দ)। যঃ = যে জগৎ-প্রসাবিতা ঈশ্বর। নঃ = আমাদের। ধিয়ঃ = কৰ্ম্মসকল এবং ধৰ্ম্মাদিবিষয়ক বুদ্ধি-বৃত্তিসকলকে। প্রচোদয়াৎ = প্রেরণ করেন। তৎ সর্বতদ্দেবস্যা = জগৎ প্রসাবিতা সেই দেবতার। বরেণ্যং = বরণীয়। ভগঃ = জ্ঞানরূপ তেজঃ যাহা অবিদ্যাবীজকে ভঞ্জন করে উহাকে। ধীমহি = ধ্যান করি—‘তিনিই আমি এবং আমিই তিনি’ এইরূপে। অর্থাৎ :—‘যে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর মায়াদ্বারা প্রথমে ওঁকাররূপে, পরে ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিন মহাব্যাহতিরূপে বিবর্তিত হন, যিনি আমাদের কৰ্ম্মসকল এবং ধৰ্ম্মাদিবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে প্রেরণ করেন, জগৎ-প্রসাবিতা সেই দেবতার জ্ঞানরূপ বরণীয় ভগঃ, যাহা অবিদ্যাবীজকে ভঞ্জন করে, উহাকে আমরা (তিনিই আমি এবং আমিই তিনি এইরূপে) ধ্যান করি’।

শিরঃ গায়ত্রী—(ইহা প্রাণায়াম-সহকারে কর্তব্য—সংখ্যামন্ত্র দৃষ্টব্য)।

“ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎ-সবিতুর্ভরেণ্যং ভগো দেবস্যা ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতিরসোহ-মৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্”। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সাতটী ব্যাহতি। গায়ত্রীর রূপ পূর্বে দেখান হইয়াছে। ওঃ আপোজ্যোতীরসোহ-মৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্”। এইটী গায়ত্রী-শিরঃ। আপঃ—ইহা ব্যাপিত্ব বৃদ্ধাইতেছে = সৎ। জ্যোতিঃ ইহা প্রকাশরূপ বৃদ্ধাইতেছে = চিত্ত। রসঃ—ইহা আনন্দরূপ বৃদ্ধাইতেছে = আনন্দ। অমৃতং—ইহা সংসারবিনিমুক্তি বৃদ্ধাইতেছে। অর্থাৎ ‘নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ ওঁকার-লক্ষ্য যে ব্রহ্ম, তাহাই

আমি, গায়ত্রী-শিরস্বারা তাহাই বদ্ধাইতেছে। শির শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ। গায়ত্রীর শিরও গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠ অংশ।

(৫) বিসর্জন—“ওঁ মহেশবদনোৎপন্ন বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথৈচ্ছয়া” ॥

অর্থাৎ ‘হে গায়ত্রীদেবি! তুমি মহেশ্বরের বদন হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর হৃদয়ে প্রকাশ হইয়াছ এবং ব্রহ্মা-কর্তৃক সম্যাক্ প্রকারে পশ্চাৎ গৃহীতা হইয়াছ। হে দেবি! যথা ইচ্ছা গমন কর’।

গায়ত্রীতত্ত্ব—গায়ত্রী ত্রিপদা। পদদ্বারা লোকে যেমন গমন করে, সেইরূপ ত্রিপদদ্বারা ইনি সৃষ্টি-অভিমুখে গমন করিতেছেন আবার লয়ক্রমে সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মাভিমুখে গমন করিতেছেন। গায়ত্রী কখন একপদী, কখন ত্রিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টপদী, কখন নবপদী কখন সহস্রাক্ষরপরিমিতা হইয়া থাকেন এবং কখন অপদীও হইয়া থাকেন। সুতরাং গায়ত্রী সগুণ এবং নিগূঢ় উভয় ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। মন্দের আদিত ও অস্তে ওঁ কারদ্বারা ইহাই সৃষ্টি হইতেছে যে, ওঁকারের স্পন্দনে শব্দরূপা গায়ত্রীর বা সৃষ্টির বিস্তার এবং ওঁকারেই উহাদের লয়। ওঁকার স্পন্দিত হইয়া ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, ও সত্য এই সপ্তবাহ্যতি বা সপ্তলোকের উৎপত্তি। উহাদের মধ্যে ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ এই তিনটীকে মহাবাহ্যতি বলা হয়। ব্যাহরণ মানে উচ্চারণ। ঈশ্বরের অক্ষনাদ্বারা সাতিশয় শব্দসিদ্ধ। সত্যসংকল্প প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার মানসে ব্যাহতিসকল উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভূঃভূবঃ প্রভৃতি শব্দসকলের উচ্চারণ মাত্রই ভূঃ, ভূবঃ প্রভৃতি লোকসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল। সংকল্পদ্বারা প্রজাপতি সৃষ্টিকরিয়াছিলেন, সুতরাং জগৎ ত্রাহারনিকট আমাদের মনঃকল্পিত সংকল্পের ন্যায় আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম উহাতে স্থূল আধিভৌতিক ভাব নাই। সূক্ষ্ম বা স্থূলে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। যাহা সূক্ষ্ম তাহাই আবার দৃঢ় ভাবনার দ্বারা স্থূল মূর্তি পরিগ্রহ করে। বালকের সংকল্পিত ভূত স্থূলমূর্তি ধরিয়া উহার নিকট খাড়া হয়। জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতি

বিশিষ্টদেহে অভিনিবিশ্ট হইয়া যেন খণ্ড জীব হইয়া পড়েন, তখন তৎসৃষ্ট জগৎই তাহার নিকট স্থূল বা আধিভৌতিক। বস্তুতঃ মূর্ত্ত-দৃষ্টিতে যাহা আতিবাহিক, বস্তুদৃষ্টিতে তাহাই আধিভৌতিক। শব্দ, সৃষ্টির সূক্ষ্মাবস্থা— শব্দই সৃষ্টিরূপে অভিযুক্ত হয়। শব্দশ্রুতি প্রজাপতির নিকট সবই আতিবাহিক বা সংকল্পময় বলিয়া তাহার দৃষ্টি সর্বগত। তাহার নিকট শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ (শব্দলক্ষিত বস্তু) প্রকাশিত হয়। অশব্দশ্রুতি আমাদের নিকট শব্দ ও অর্থ দূরে অবস্থিত।

গায়ত্রীর ধ্যানে প্রাতে নাভিতে ব্রাহ্মীশক্তির অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টি শক্তির, মধ্যাহ্নে হৃদয়ে বৈষ্ণবীশক্তির অর্থাৎ ভগবানের স্থিতি বা পালনশক্তির এবং সায়াহ্নে ললাটে রৌদ্রী বা মাহেশ্বরী শক্তির ধ্যান করিতে হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনটীই ভগবানের মূর্ত্তি। ভগবানকে দেখিতে হইলে তিনটীর মধ্যেই দেখা চাই। শ্রীকৃষ্ণের কোন ভক্ত যদি কালীমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পান বা উহাকে বিদ্বেষ করেন, তবে বদ্বিধিতে হইবে যে, তিনি ভগবানের একদেশমাত্র দর্শন করিতেছেন। কালীমূর্ত্তি ধনুস-লীলার দ্যোতক। ঐ কালী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও রহিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণেরও চক্র আছে। সাধুগণের পরিদ্রাণ এবং দুষ্টকর্মকারিগণের বিনাশের জন্য ভগবান্ অবতারমূর্ত্তি গ্রহণ করেন। “পরিদ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্টকৃতাম্”। গীতা ৪।৮। এইরূপ কালীর মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ বলেন,—“যে দ্বিষতি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষতি জনান্দর্শনম্” অর্থাৎ ‘যাহারা বিরূপাক্ষকে ঘৃষ করে, তাহারা জনান্দর্শনকেও ঘৃষ করে’। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাহার শক্তি, তিনিই ভগবান্। শক্তি ধরিয়া শক্তিমানে পেঁছিতে হয়, তাই গায়ত্রীর উপাসনা। তাই শক্তিসাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া নাভিতে বস্তুগ্রন্থি, হৃদয়ে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং ললাটে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া ঐ শক্তিকে সহস্রারে শক্তিমান্ শিবের সহিত মিলিত করেন। সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি যেমন তত্ত্বতঃ অভিন্ন এইরূপ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন।

যাহারা গায়ত্রীমন্ত্রের গান করেন, গায়ত্রী তাহাদিগকে দান করেন,—

“গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ত্রং ব্রাহ্মণে যতঃ।” গায়ত্রী প্রাণরূপী গয়সমূহকে (ইন্দ্রিয়গণকে) ব্রাহ্মণ করেন, সেইজন্যও ইহার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রের জপ ও ধ্যান শ্রেষ্ঠ সাধনা। অর্থভাবনা-পূর্বক গায়ত্রীমন্ত্রের ভূপে বেদপাঠের সমান পুণ্যফল লাভ হয় এবং চিত্তের শৃঙ্খল হইয়া আত্মদর্শন লাভ হয়। আজকাল যজ্ঞাদি করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, ত্রিসংখ্যাও অনেকে করেন না বা করিতে পারেন না; এমতাবস্থায় গায়ত্রীজপ করা যাইতে পারে এবং অর্থভাবনা-পূর্বক ঐ জপ করিলে উহার ফলও বড় কম হয় না।

— — —

ত্রিগুণাতীত

“প্রকাশণ প্রবৃত্তিণ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন ঘোঁটে সম্প্রাবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাণ্ডকীতি” ॥ গীতা ১৪।২২

অর্থাৎ (সত্ত্বগুণের বশ্ম) প্রকাশ, (রজোগুণের বশ্ম) প্রবৃত্তি এবং (তমোগুণের বশ্ম) মোহ উদ্ভিত হইলেও গুণাতীত পুরুষ উহাদিগকে দ্বেষ করেন না, বা নিবৃত্ত গুণসকলের আকাঙ্ক্ষা করেন না’ ।

গুণাতীত পুরুষের এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় থাকে, যে তিন গুণ অথবা উহাদের কার্য্য মিথ্যা এবং আত্মাতে তিন গুণ নাই । ইহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ় ও বলা যাইতে পারে । গীতায় দ্বাদশ-অধ্যায়ের শেষে যে ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে, উহার লক্ষণও গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ় এবং গুণাতীতের লক্ষণের সঙ্গে মিলে । সুতরাং ঐ প্রকার ভক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ় এবং গুণাতীত ইহারা এক অবস্থাপন্ন । যেমন ভ্রান্তিবশে দৃষ্ট মরুভূমির জল মরুভূমিকে আর্দ্র বা কন্দমাক্ত করিতে পারে না, এইরূপ ভ্রান্তিবশে দৃষ্ট তিনগুণ বা উহার কার্য্য জগৎ, ত্রিগুণাতীত পুরুষকে পবিত্র বা কলুষিত করিতে পারে না । সমাধি-অবস্থায় গুণাতীত পুরুষ কিছুই দেখেন না ; প্রারম্ভবেগে যখন ব্যুত্থান হয়, তখন তিনি যাহা দেখেন সমস্তই তাহার নিকট ব্রহ্মমায়েই পর্য্যবসিত হইয়া যায় । সুতরাং তিনি ‘দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না’ ইত্যাদি । তাহার কোন বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণে ইচ্ছা থাকে না, তিনি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি শূন্য । “চেষ্টতে শৃঙ্খপণ’বৎ যেমন শৃঙ্খপণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকিলেও যে দিকে বারু প্রবাহিত হয়, সে দিকেই চলিতে থাকে, এইরূপ গুণাতীত পুরুষেরও কস্মৈ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকিলেও প্রারম্ভ-বেগেই কস্মৈ হইয়া যায় । ইহার নিকট ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, বশ্ম অশ্ম সব সমান । পাপী দেখিয়া ইহার মনে দঃখ হয় না বা পুণ্যাত্মা দেখিয়া

হর্ষ হয় না। যে কোন অবস্থাতেই ইনি নির্বিকার ও সমভাবাপন্ন থাকেন। গুণাতীত পুরুষ জ্ঞানলাভের পূর্বে যে অমানিৎ, অদান্তিহ, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সদগুণ অর্জন করেন, জ্ঞান হইবার পরও ঐসব সদগুণ স্বতঃই তাহার স্বভাবের অন্তর্ভুক্তন করে। ইহাই জীবন্মুক্ত পুরুষগণের ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু শাস্ত্রে কদাচিৎ কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রারম্ভেই বলবান্। কিন্তু গুণাতীত পুরুষের নিকট প্রারম্ভও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। গুণাতীত পুরুষ প্রারম্ভ বদ্যথান, নিরোধ সমস্তই ব্রহ্মমাত্র দেখেন, স্মরণ্য তাহার দৃষ্টিতে প্রারম্ভ বদ্যথান, সমাধি প্রভৃতি তত্বতঃ নাই। অস্ত্র বাস্তিকে বদ্যাইবার জন্য 'ইহা তাহার প্রারম্ভ, ইহা সমাধি' ইত্যাদি বলা হয়। কেবলমাত্র বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া সব সময় গুণাতীত পুরুষকে চেনা যায় না, যেহেতু গুণাতীত পুরুষেরও কদাচিৎ অশুভ আচরণ দেখা যায় এবং অস্ত্রব্যক্তিগণও অনেক সময় শুভ আচরণ করিতে পারে। গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ স্বসংবেদ্য অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষই উহা জানিতে পারেন। যে আম খাইয়াছে, সেই জানে আমার মিস্ত্রী কিরূপ; যে খায় নাই, সে উহা কিরূপে জানিবে? শাস্ত্রে কোন কোন জ্ঞানী পুরুষের বাহ্য আচরণে কাম, ক্রোধাদিও দৃষ্ট হয়, কাহারও রাজবৎ, কাহারও পিশাচবৎ ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। যে সকল জ্ঞানীর বাহ্য আচরণে শুভ, তাহারা অনেক লোকের উপকার করিতে পারেন, কারণ সকল লোক তাহার শুভ আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে সকল জ্ঞানীর অশুভ আচরণও দৃষ্ট হয়, তিনি অতি অল্প লোকেরই উপকার করিতে পারেন, কারণ অতি অল্প লোকই তাহাকে জ্ঞানী বলিয়া ধরিতে পারে। কিন্তু যদি কোন জ্ঞানীর যোগবল বিভূতি প্রভৃতি থাকে, তবে বাহিরে তাহার অশুভ আচরণ দৃষ্ট হইলেও তিনি অনেক লোকের উপকার করিতে পারেন। কারণ লোকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহার সেই অশুভ আচরণ যত্ববোর যথোপায়ে জানে না। অবশ্য জ্ঞানীর লোকের উপকার করিবার বাসনা থাকে না ঐ ইচ্ছা তাহার স্বতঃই উদ্ভূত হয়, বাসনা-পূর্বক নহে। গুণাতীত পুরুষগণের ব্যবহারে

এমন একটা স্বচ্ছন্দভাব ও আলংগাভাব থাকে, যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক সময় তাহাদের ঐ ভাব দেখিয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারেন। গুণাতীত পদ্রুঘের বাহ্য-লক্ষণও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ঐ লক্ষণ ধরিয়া উহাকে চেনা যায়, আবার অনেক সময় ভুলও হইতে পারে। নীচের অবস্থা হইতে গুণাতীত পদ্রুঘকে চেনা বড় কঠিন; জ্ঞানীই জ্ঞানীকে ঠিক চিনিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী না হইয়াই, ‘আমি জ্ঞানী, অতএব আমি পাপ পুণ্য যাহাই করি না কেন, উহা জীব করে, আমার যায় আসে না’ ইত্যাদি প্রকার মূর্থতা ও মিথ্যাচারের নিন্দা আমরা পূর্বে ‘যোগ’ প্রবন্ধে করিয়াছি। মিথ্যাচার সম্বন্ধে বজ্রনীর।

এক্ষণে গুণাতীত পদ্রুঘের বাহ্য-আচারণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাক্। অষ্টাবক্রসংহিতা বলেন—

“উচ্ছ্বলপ্যাকৃতিক্য স্থিতিধীরস্য রাজতে ।
নতদ্ব সম্পৃহচিত্তস্য শান্তিমূর্তস্য কৃত্রিমা ॥
বিলসন্তি মহাভোগৈবিশন্তি গিরিগহ্বরান্ ।
নিরন্তকম্পনা ধীরে অবস্থা মূক্তবন্ধনাঃ ॥
শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থমঙ্গলাং ভূপতিং প্রিয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ধীরস্য ন কাপি হৃদিরজনা ॥
ভূত্যোঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দ্রব্ধৈশ্চাপি গোত্রজৈঃ ।
বিহস্য ধিক্কৃতো যোগী ন য়াতি বিকৃতিং মনাক্ ॥
সন্তদৃষ্টোহপি ন সন্তদৃষ্টঃ খিলোহপি ন চ হিদিতে ।
তস্যাশ্চৰ্য্যদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জানতে ॥”

(শান্তিস্তবক) ।

অর্থাৎ ‘জ্ঞানী পদ্রুঘের স্থিতি উচ্ছ্বল হইলেও তাহা স্বাভাবিকতাহেতু শোভা পায়, কিন্তু মূর্থবাসনায়ুক্ত পদ্রুঘের শান্তি কৃত্রিম বলিয়া শোভা পায় না। জ্ঞানিগণ মহাভোগেই বিলাস করুন অথবা গিরি-গহ্বরেই প্রবেশ করুন, তাহারা কম্পনা-রহিত, ধীর, আবদ্ধ এবং মূক্তবন্ধন। বেদপারগ ব্রাহ্মণ, দেবতা, তীর্থ

অঙ্গনা এবং ভূপতি প্রভৃতিকে দেখিয়া ও তাহাদের পূজা করিয়া যীর জ্ঞানী পদ্রুপের হৃদয় কোন প্রকারে রঞ্জিত বা আসক্ত হয় না। ভূতা, পদ্রু, স্ত্রী, দ্রু, এবং জ্ঞানীগণ উপহাস করিলে এবং বিকার দিলেও জ্ঞানীর মন কিছুমাত্র বিকৃত হয় না। বাহিরে তাহাকে সন্তুষ্ট বা দুঃখিত দেখাইলেও তিনি অন্তরে সন্তুষ্ট বা দুঃখিত হন না। তাহার সেই সেই আশ্রয় দণ্ডা তাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণই জ্ঞানিতে পারেন।

অনেকের ধারণা জ্ঞানী পদ্রু (১) কিছু খাইবেন না (২) তাহার বিভূতি থাকিবে (৩) তিনি সর্বদা সমাধিহ থাকিবেন (৪) তাহার মৃত্যু ভাল হইবে (৫) তিনি দেখিতে সুপদ্রু হইবেন। যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্ত তাহারাই ঐ প্রকার মনে করেন। তাহাদের পূর্বোক্ত ধারণাসকল ভ্রান্তিমূলক।

(১) কিছু না খাওয়াই যদি জ্ঞানের লক্ষণ হয়, তবে সর্পাদি প্রাণী যাহারা দীর্ঘকাল না খাইয়া অবস্থান করে, মানুষের তুলনায় উহাদিগকে জ্ঞানী স্বীকার করা উচিত। জ্ঞানলাভ হইবার পরেও যাবৎ প্রাণশক্তি না হয়, তাবৎ প্রাণশক্তি ভোগী জ্ঞানী জীবের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং উহাদের ধর্ম থাকে। প্রাণশক্তি ভোগহীন হয় না। কিন্তু জ্ঞানী ক্রু তাদিগকে আত্মার মধ্যে দর্শন করেন না, উহাদিগকে ক্ষেত্রের • ধর্ম বলিয়াই জানেন। প্রাণশক্তি ভোগী জীব, উহার ক্রু তাদিগকে সবই মিথ্যা। জ্ঞানীর ঐ সকলে মিথ্যা বোধ থাকায় এবং কর্ম-অকর্ম দর্শন থাকায় উহারা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

“কৃৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথা পূর্বং মরণীতি চেৎ।

মচ্ছন্দব্যাচোহংকারে দৃশ্যভাং নোতি কো বদেৎ” ॥

পঞ্চদশী—চিত্রদীপ। ২৪৯

• অবাচ্য-প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার, পদ্রু, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি ইহারা ক্ষেত্র। যিনি উহাদের সাক্ষী, আত্মা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। একটি ক্ষেত্রের অপেক্ষায় ইনি জীব এবং সকল ক্ষেত্রের অপেক্ষায় ইনিই দ্রু। গীতার চতুর্থোধ্যায়ের নাম, ‘কৃৎক্ষেত্রবিভাগযোগ’। এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পদ্রুের বিচার করা হইয়াছে। আমরা ঐ বিচার নানামানে বিশেষতঃ আত্মানন্দ-বিচার-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

অর্থাৎ “যদি বল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতিতে ত আমাতে পূর্বেই ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে তবে জ্ঞানলাভে অনর্থ-নিবৃত্তি কি হইল ? তাহার উত্তর এই যে, তুমি ‘মৎ’ শব্দ-বাচ্য অহংকারের মধ্যোই ক্ষুধা, তৃষ্ণাদিকে দর্শন কর। আত্মার সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। অহংকারের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই কে বলিল ?

(২) বিভূতি তপস্যা বা যোগের ফল জ্ঞানের ফল নহে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ‘বলে সংযম অভ্যাস করিলে হস্তীর ন্যায় বলশালী হওয়া যায় ; সূর্য্যে সংযম অভ্যাস করিলে ভুবনজ্ঞান হয়, ইত্যাদি। জ্ঞানী না হইয়াও সম্প্রজ্ঞাত বা একাগ্রসমাধির অভ্যাসদ্বারা বিভূতিসকল লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র বিভূতি-লাভদ্বারা মুক্তি হয় না, জ্ঞানদ্বারাই কেবল্য বা মুক্তি লাভ হয়। বিভূতিলাভে অনেক সময় অহংকার বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়া বন্ধন আরও দৃঢ় হয়, সেইজন্য পাতঞ্জলদর্শনে পরে দেখান হইয়াছে, যে বিভূতিসকল নির্বিকল্প সমাধিলাভের পক্ষে বাধাস্বরূপ। “তে সমাধাব্দুপসর্গা বদ্যথানে সিংধয়ঃ”। (বিভূতিপাদ — ৩৭ সূত্র)। প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ মৃদুমৃদু সাধকের একমাত্র মুক্তিই লক্ষ্য তিনি বিভূতিসকল কামনা করেন না, উহাদিগকে উপসর্গ জ্ঞানিয়া উপেক্ষা করেন। সেইজন্য জ্ঞানীর যে বিভূতি থাকিবেই, উহা ঠিক নহে। যদি বল পূর্বে পূর্বে অনেক জ্ঞানিপুরুষেরই ত বিভূতি ছিল, ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ; তাহার উত্তর এই যে, ইহা তাহাদের বিভূতিলাভজন্য তপস্যার ফল, জ্ঞানের ফল নয়। কিন্তু কেবল তত্ত্বজ্ঞান-লাভোদ্দেশ্যে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে যোগ বা তপস্যা অনর্নুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল কেবল তত্ত্বজ্ঞান। উহাদ্বারা বিভূতি লাভ হয় না।

“ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ।

শাপাধিকারণাদন্যৎ তপো জ্ঞানস্য কারণম্ ॥”

(পঞ্চদশী—ধ্যানদীপ)। ১০৯।

অর্থাৎ ‘ব্যাসাদি ঋষির শাপাদি-প্রদানে সে সামর্থ্য, উহা তাহাদের তদ্বিস্ময়ক তপস্যারই ফল। যে তপস্যার উদ্দেশ্য কেবল তত্ত্বজ্ঞান-লাভ (শাপাদি-প্রদানের সামর্থ্য লাভ নহে) উহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানেরই কারণ। জ্ঞানী আপ্তকাম

ও কৃতকৃত্য। তিনি আকাশাদি-গমনরূপ বিভূতি-দর্শনে, অথবা যদি সূর্যোঃ শীতলত্ব এবং চন্দ্রে উষ্ণত্বও সম্ভব হয়, তথাপি তিনি বিস্মিত হন না। কারণ তিনি ঐ সকল মিথ্যা বলিয়াই জানেন। এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব-ব্যতীত তাহার নিকট দ্বিতীয় বলিয়া কিছুই প্রতিভাত হয় না। তবে যদি প্রারম্ভবশতঃ কোন জ্ঞানীর বিভূতিলভের ইচ্ছা হয়, তিনি যোগাভ্যাসদ্বারা ঐ বিভূতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা বৃদ্ধিতেই উহা করিয়া থাকেন, সুতরাং বিভূতি তাহার বশ্যনের কারণ হয় না।

“অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যামহংকৃতিম্।

ইচ্ছংস্তু কোটীবস্তৃনি না বাধো গ্রন্থিভেদতঃ।

(পঞ্চদশী—চিহ্নদীপ)। ২৬২।

অর্থাৎ ‘অহংকার ও চৈতন্য না মিশাইয়া, চৈতন্য হইতে অহংকারকে পৃথক্ জানিয়া যদি কোটীবস্তৃও ইচ্ছা করা যায়, তথাপি সেই ইচ্ছা জ্ঞানের বাধক হয় না। যেহেতু, জ্ঞানদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে।’ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর সমস্ত বিভূতিই আছে; যেহেতু তিনি আত্মারূপে সকলের মূলে অবস্থিত। যেখানে যাহার যাহা বিভূতি আছে সবই তাহার। তিনি সূর্য্যরূপে তাপ প্রদান করেন, বৃক্ষারূপে সৃষ্টি করেন, ঐশ্বর্য্যরূপে পালন করেন এবং রুদ্ধরূপে সংহার করেন। তিনিই একাদশ রূদ্র ও অষ্টবসু হইয়া বিচরণ করেন, ইত্যাদি। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানীর স্বাভাবিকভাবে সত্য-সম্পূর্ণতা, বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি থাকার কথাও উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

(৩) সমাধি বা ব্যবহার বিকারী মনের ধর্ম্ম। জ্ঞানী সমাধি বা ব্যবহারকে কখনও আত্মার ধর্ম্ম মনে করেন না। প্রারম্ভভোগী জীব সমাধিই করুক অথবা ঘোরতর যুদ্ধাদিকার্ষ্যে ব্যাপ্তই থাকুক জ্ঞানীর নিকট উভয় অবস্থাই তুল্য। প্রকৃত জ্ঞানের আত্মার ধর্ম্ম মনে করেন না। প্রারম্ভভোগী জীব সমাধিই করুক অথবা জ্ঞানকে বজায় রাখিতে হয় না। যেমন দিগ্‌লোভি নাশের পরও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় দিগ্‌লোভি আসিয়া পড়ে, তথাপি পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা সেই লোভ

স্বতঃই নিরাস হইতে থাকে, এইরূপ জ্ঞানলাভের পর প্রারম্ভবেগে যদি জগতের উপর সত্যস্বৰূপ আসিয়া পড়ে, তথাপি পূর্বেওপন্ন জ্ঞানদ্বারা সেই আন্তি স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তত্ত্ববিস্মরণমাত্রই অনর্থোৎপত্তি হয় না, যেহেতু জীবমুক্তি কোন বৃত্ত নহে, যে উহার ভঙ্গ হইলে অনর্থ হইবে—ইহা বস্তুর প্রকৃতস্বরূপে স্থিতি মাত্র।

“এবমারম্ভভোগোহপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।

ভোগকালে কদাচিত্ত্ব মর্ত্যোহহমিতি ভাসতে ॥

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।

জীবমুক্তিবৃত্তং নেদং কিস্তু বস্তুস্থিতিঃ থলু” ॥ *

(পঞ্চদশী—তৃপ্তিদীপ)। ২৪৫-২৪৬।

কর্তৃত্ববৃদ্ধি হইতেই সাধক সমাধির অভ্যাস করেন। তাই মহামুনি অষ্টাঙ্ক বলিয়াছেন—

“অযমেব হি তে বশঃ সমাধিমনুষ্ঠাসি।” অর্থাৎ ‘ইহাই তোমার বশন যে, তুমি কর্তৃত্ববৃদ্ধি লইয়া সমাধি করিতেছে।’ জ্ঞানীর সমাধি ঈ বাধপূর্বক, উহা লরপূর্বক নহে। জ্ঞানীর বাধপূর্বক সমাধি ব্যবহারকালেও কাটে না, জ্ঞানীকে উহা করিতে হয় না।

এখানে জ্ঞান ও ধ্যানের পার্থক্য নির্ণয় করা আবশ্যিক। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

* ইহা প্রতিবন্ধবৃত্ত মন্দ-জ্ঞানের কথা। প্রতিবন্ধশূন্য দৃঢ়জ্ঞানে, প্রারম্ভ নাই। যেহেতু, অজ্ঞাতবাদই অশ্বৈতবাদে চরমসিদ্ধান্ত। পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, মিথ্যা, জীব, প্রারম্ভ ইত্যাদি ভেদ লুপ্ত হইয়া অখণ্ড সমরসত্ত্বে স্থিতি হয়। ব্যাখ্যাত-অবস্থার জগতের ভান ছইলেও উহাতে কখনই সত্যস্বৰূপ হয় না, স্বতঃই (বিচারপূর্বক নহে) মিথ্যাবৃদ্ধি হয়। সেজন্য প্রারম্ভাদিতে আগ্রহের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্যস্থিতি লাভ হয়।

† লর পূর্বক সমাধিতে চিত্ত প্রকৃতিক্ষেপের কোন এক অবস্থার লীন থাকে। ঐ অবস্থার জীবের সুখদুঃখ থাকে না। কিস্তু লরপূর্বক সমাধি ভাসিয়া গেলে পুনরায় সুখ দুঃখ হয়। বাধ-পূর্বক সমাধিতে জগতের মিথ্যাঋবোধ দৃঢ় থাকার ব্যবহারকালেও সর্বদাই সমাধি লাগিয়া থাকে—“যত যত মনো যাতি তত তত সমাধয়ঃ”। কিস্তু বাধপূর্বক সমাধির ফলে চিত্ত ক্রমশঃ চিরকালের জন্য লীন হইয়া যায়, উহার উত্থান হয় না। জ্ঞানীরই বাধপূর্বক সমাধি হয়।

‘বস্তুতন্ত্র ভবেৎ বোধঃ কত্ তন্ত্রমুপাসনম্ ।’ পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ, ৭৪ । অর্থাৎ ‘জ্ঞান বস্তুর অধীন কিন্তু উপাসনা বা ধ্যান কর্তার অধীন’ । মনে কর, ঘট নামক একটি বস্তু আছে । আমি ঘট জানি না, এমন সময় ঘাহার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা আছে তিনি আমাকে বলিলেন, ‘এই শ্রীলোদর, কব্জলী বস্তুটি ঘট ।’ যদি আমার ইন্দ্রিয়গণ ও মন অপটু না হয় এবং যদি আমি ঐ বাক্যে অবহিত হই, তবে তৎক্ষণাৎ অংশাই আমার ঘট-জ্ঞান হইবে, ইহাতে কিছু করিতে হইবে না । কিন্তু ঐ বাক্য শ্রবণ ব্যতীত আমি ঘট লইয়া ব্যবহার করিলেও আমার ঘটজ্ঞান হইবে না । একবার ঘটজ্ঞান হইলে, আমার ঘটজ্ঞান না হউক বা ঘটজ্ঞান নষ্ট হউক’ এই প্রকার অনিচ্ছাও উহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না । আবার যদি আমি ঘটের ধ্যান নাও করি, অথবা অন্যবস্তুর চিন্তাও করি, তথাপি ঐ জ্ঞান নষ্ট হইবে না । এইরূপ প্রমাদশূন্য, অপ্রতারক গুরুদ্বার নিকট শ্রদ্ধালু ও সান্তিশয় শূন্যচিত্ত শিষ্য মহাবাক্যবিচার শ্রবণমাত্রই অথবা চিন্তাশূন্যের কিছু ন্যূনতা থাকিলে মনন-নিদিষ্ট্যাসনদ্বারা ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইপ্রকার অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ করেন । শ্রবণই জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ । যদি শ্রুত বস্তুটি দূরে থাকে, তবে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণদ্বারা উহার পরোক্ষজ্ঞান-লাভ হয় । যেমন শ শব্দ হইতে দূরস্থ সুগন্ধি বিষয়ের যে জ্ঞান হয়, উহা পরোক্ষ-জ্ঞান । কিন্তু শ্রুতবস্তুটী যদি সন্নিহিত হয়, তবে শ্রবণদ্বারা অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হয় । যেমন দণমপূরুষের উদাহরণহলে ‘তুমিই দণম’ এই বাক্য শ্রবণমাত্র লম কাটিয়া গিয়া দণমপূরুষ-সম্বন্ধে অপরোক্ষ-জ্ঞান হইল । তবে চিন্তের সম্যক শূন্য না থাকিলে মহাবাক্য-বিচার শ্রবণ করিয়াও প্রথমে পরোক্ষ এবং পরে ক্রমশঃ প্রতিক্ষক্ষণ হইলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় । আর অশূন্যচিত্ত ব্যক্তির মহাবাক্য-বিচার শ্রবণ করিলেও অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হয় না ।

একবার জ্ঞান লাভ করিলে, ‘আমার জ্ঞান না হউক, বা নষ্ট হউক’ এইপ্রকার ইচ্ছাও উহাকে নিবারণ করিতে পারে না । আর একবার জ্ঞান লাভ করিলে ব্যবহারকালেও ঐ জ্ঞান নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই । পটবস্তুর ঘটের অভাব রহিয়াছে, তথাপি যখন একবার ঘটজ্ঞান হইলে পটাদি চিন্তার দ্বারা ঘটজ্ঞানের

নাশ হয় না, তখন সৰ্ব্বত্র বিদ্যমান সকলের প্রকাশক আত্মার জ্ঞান একবার হইলে আর উহা কি প্রকারে নষ্ট হইবে? জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সিম্ভবন্তু, বৃত্তিরূপ জ্ঞান, অজ্ঞান নাশ করিয়া উহা জানাইয়া দেয় মাত্র, উহাকে উৎপন্ন করে না। জ্ঞান পদ্রুপের কর্মদ্বারা উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য ইত্যাদি হইলে উহা অনিত্য হইত। সুতরাং জ্ঞান কর্তার অধীন নহে, বস্তুর অধীন। কিন্তু ধ্যান বা উপাসনা কর্তার ইচ্ছার অধীন অর্থাৎ ধ্যান করা বা না করা কর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

অন্তঃকরণকে ধ্যানদ্বারা বিলীন করাই জ্ঞান নহে। অন্তঃকরণ সূক্ষ্মপ্তিতে বিলীন হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। ‘আত্মাই ব্রহ্ম’ নিরতিশয় সূক্ষ্ম ও শূন্যবৃত্তি দ্বারা এই প্রকার যে প্রতিবন্ধন্য দৃষ্টান্ত, উহাই অবিদ্যানাশক বিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে জ্ঞান, অজ্ঞান এই ভাগ নাই। গুরু, শাস্ত্র, শূন্যবৃত্তি প্রভৃতি ঈশ্বরদৈতের সাহায্যেই জীবের জ্ঞান হয়। সুতরাং ঈশ্বরদৈত জ্ঞানের বিরোধী নহে, পরন্তু সহায়ক। জ্ঞান হইলে জীবদৈত নাশপ্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরদৈত প্রারম্ভকর্মের ফল-পর্যন্ত থাকে, কিন্তু জ্ঞানীপদ্রুপ উহার মিথ্যাছে নিশ্চয়ধান্—এই যে মিথ্যারূপে জগতের প্রতিভাস ইহাই অবিদ্যালেশ (দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী ও অজাতবাদীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরদৈত, প্রারম্ভ প্রভৃতি নাই)। ঈশ্বরের সঙ্কল্পপ্রসূত জগতের উপর অজ্ঞান-প্রভাবে জীবগণ যেসত্যবৃত্তির আরোপ করে, জ্ঞানদ্বারা জগতের উপর সেই সত্য-বৃত্তির বাধ হয়। ধ্যানযোগী সুন্দররূপে লোকব্যবহার সম্পাদন করিতে পারেন না—কারণ ধ্যানকালে চিন্তকে একবিষয়ে তন্ময় রাখিতে হয়। জ্ঞানী স্ফোররূপে লোকব্যবহার করিতে সমর্থ; ইহাতে তাঁহার জ্ঞানের হানি হয় না—কারণ জ্ঞানীর নিকট ভিতর, বাহির সবই ব্রহ্ম। কিন্তু অশূন্যচিন্তে বিচার বা তৎফল জ্ঞানের উদয় হয় না। সেইজন্য মন্দবৃত্তি ও চঞ্চলচিত্ত সাধকের পক্ষে ধ্যানের সাথকতা আছে। সেইজন্য পণ্ডশীকার বলিয়াছেন, ‘অত্যন্তবৃত্তিমাল্যাহেতু বা উপযুক্ত গুরু ও শাস্ত্রাদির অভাবহেতু যিনি বিচার লাভ করিতে না পারেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান করিবেন’। নিগুণ ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থাই নির্বিকল্পসমাধি। এই

সমাধির বিষয় উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

“অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে ।

সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কৰ্মসংগমে ॥

বাক্যমপ্রতিবৎসং সৎ প্রাক্ পরোক্ষাবভাসিতে !

করামলকবৎবোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥” (তত্ত্ববৈবেক ৬১।৬২ শ্লোক) ।

অর্থাৎ ‘এই নির্বাক্সসমাধিধারা বাসনাজাল নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে এবং পুণ্য-পাপাখ্য কৰ্মসকল সমূলে উন্মূলিত হইলে, পূর্বে প্রতিবৎস থাকায় মহাবাক্য-বিচারে যে পরোক্ষজ্ঞানমাত্র হইয়াছিল, এক্ষণে উহা প্রতিবৎসশূন্য হইয়া, করস্থিত আমলকী ফল যেমন অধিগত থাকে, এইরূপ দৃঢ়-অধিগত অপরোক্ষজ্ঞান প্রসব করে’। সমাধিও জ্ঞান নহে, উহা চিত্তের অবস্থা, জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়ক-মাধ্যম । উহা দৃঢ় অপরোক্ষ-জ্ঞানলাভের প্রতিবৎসক কে নাশ করে ।

(৪) জ্ঞানের উদয়ের সময় হইতেই জ্ঞানী মৃত্যু এবং হতশোক । অজ্ঞানরূপ মোহই মৃত্যু । জ্ঞানীর অজ্ঞান না থাকায় মৃত্যু নাই । তাই বৃহদারণ্যক বলেন— “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামান্তু ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” (৪।৪।৬)—অর্থাৎ ‘তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ । অস্ত্রলাকে দেখে জ্ঞানীর মৃত্যু ; জ্ঞানী মৃত্যুকে ব্রহ্ম দেখেন । সেইজন্য জ্ঞানী তীর্থে চণ্ডালগৃহে বা নষ্টস্মৃতি হইয়া দেহত্যাগ করিলেও কৈবল্য প্রাপ্ত হন ।

“তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্দেহম্ ।

জ্ঞানসমকালমূহঃ কৈবল্যং ধাতি হতশোকঃ ॥”

(৫) জ্ঞানী দেখিতে সুন্দর হইবেন তাহার কোন মানে নাই । ভোগী সুন্দর দেহ শরীরের যত্ন ও পারিপাট্য থাকে, জ্ঞানীর উহা থাকে না । মহামুনি অষ্টাবক্র পরমজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাহার দেহ অষ্টস্থানে বক্র ছিল । তিনি সাধারণদৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন না । কিন্তু জ্ঞানীর চিত্ত সর্বদা আনন্দময় এবং তিনি সুচ্ছন্দভাবে অক্ৰিয় ও ব্যবহার করেন । সুতরাং তাহার মুখচোখে সেই আনন্দের ও সুচ্ছন্দতার ছবি ফুটিয়া উঠে । উহাই তাহার সুন্দরতা । মনে রাখা উচিত

দ্বস্তের বিকাশই আনন্দ নয়, হৃদয়ের বিকাশেই প্রকৃত আনন্দলাভ হয়। আনন্দ তরল হইলে উৎকট হয়। প্রকৃত আনন্দ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও উদার। সুস্বাদুদর্শিগণ মাংসপিণ্ডের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সুন্দর মনে করেন না। যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরকে পাইয়াছেন, তিনিই সুন্দর, সুপুরুষ এবং দোখিবার যোগ্য।

বৈরাগ্য ও উপর্য্যতির তারতম্যানুসারে জ্ঞানীর বাহ্যস্থিতির তারতম্য হয়। সেইজন্য এখন আমরা বৈরাগ্য, উপর্য্যতি ও জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বৈরাগ্য, উপর্য্যতি ও জ্ঞান ইহারা মুক্তির কারণ। ইহাদের মধ্যে আবার তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদান করে। বৈরাগ্য ও উপর্য্যতি তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক মাত্র। এই তিনটী প্রায়ই একত্র অবস্থান করে এবং পরস্পরকে সাহায্য করে। কখন কখন ইহাদিগকে বিযুক্ত হইয়া থাকিতেও দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের হেতু, স্বরূপ ও কার্য্যসকল ভিন্ন ভিন্ন। পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দোষদর্শনদ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়। ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত তৃণবৎ তদুচ্ছ জ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা। যোগের অভ্যাস উপর্য্যতির কারণ এবং স্মৃতিপ্রবণ বাহ্যজগতের বিমূর্ত্তি উহার সীমা। বেদান্তের শ্রবণ-মননাদি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ এবং দেহে যেমন অজ্ঞ ব্যক্তির ‘আমি’ বোধ দৃঢ় থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে দৃঢ় আত্মবোধ জ্ঞানের সীমা। যদি কাহারও মধ্যে বৈরাগ্য, উপর্য্যতি ও জ্ঞান এই তিনটীরই অতিশয় পক্কতা দৃষ্ট হয়, তবে উহা মহাতপস্যার ফল। এই প্রকার জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে দৃষ্টদুঃখ বা প্রারম্ভ থাকে না, ইনি সর্ব্বদা ভয়, উদ্বেগ, সুখদুঃখাদিশূন্য এবং সর্ব্বদা আনন্দী। ইনিই গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ।

যদি কাহারও মধ্যে বৈরাগ্য ও উপর্য্যতির অত্যন্ত পক্কতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বোধ বা জ্ঞান প্রতিবন্ধযুক্ত হয়, তবে তাহার তপোবলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, কিন্তু জ্ঞান না হওয়ায় মুক্তি হয় না। আবার যদি কাহারও তত্ত্বজ্ঞানের অতিশয় পক্কতা থাকে, কিন্তু বৈরাগ্য ও উপর্য্যতির ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার মুক্তি অনিবার্য্য, কিন্তু তাহার দৃষ্টদুঃখ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু সেই দৃষ্ট দুঃখে জ্ঞানী অজ্ঞব্যক্তির

ন্যায় বিচলিত হন না । এই প্রকার জ্ঞানী চিত্তের বিশ্রান্তি ও জীবমুক্তি সূত্রলাভের জন্য সংন্যাস লইয়া (বিদ্যে-সংন্যাস) মনোনাশ ও বাসনাশ্রয়ের অভ্যাস করেন । যতক্ষণ না হিতপ্রসূ, গুণাতীত প্রভৃতির লক্ষণ সুসংবেদ্যরূপে আবির্ভূত হয়, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠায় লাগিয়া থাকা উচিত ।

জ্ঞান হওয়ার পরও বৈরাগ্য ও উপরিতর তারতম্যানুসারে জ্ঞানী পদরূষণের বাহ্য হিতের তারতম্য ঘটে । সেইজন্যই কেহ উন্মাদবৎ, কেহ পিণ্ডাচবৎ, কেহ যোগিবৎ, কেহ ভোগীবৎ ইত্যাদি প্রকার ব্যবহার করেন অধিকাংশস্থলেই জ্ঞানী লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রীয় শৃঙ্খলার অনুষ্ঠান করেন । তবে সকল জ্ঞানীরই ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, আমি (জীব) ব্রহ্মই’ এইপ্রকার জ্ঞান থাকে । জগতের উপর মিথ্যাত্ব বোধ থাকায় জ্ঞানীর ভোগ অজ্ঞানীর ন্যায় আসক্তিপূর্ণক হয় না । ইহা প্রকৃত ভোগ নহে, ভোগাভাসমাত্র । যতদিন শরীর থাকে, ততদিন মনোনাশ ও বাসনাশ্রয়ের তারতম্যানুসারে ঐ ভোগাভ্যাসের তারতম্য হয় । সেইজন্য কেবল বাহ্য ব্যবহারমাত্র দেখিয়াই জ্ঞানী পদরূষকে চেনা যায় না । জ্ঞানিগণই জ্ঞানিগণকে চিনিতে পারেন । অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেক অজ্ঞানীকেও জ্ঞানী মনে করে এবং জ্ঞানীকেও অজ্ঞানী মনে করে ।

নিষ্কামকর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি । শৃঙ্খলিত বিচারের উদয় হয়, বিচারের ফল জ্ঞান ; জ্ঞানের ফল অদ্বৈতহিতরূপ মোক্ষ । জ্ঞানীর প্রারম্ভিক কর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে । প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে জগতের উপর দৃঢ় মিথ্যাত্ব বোধ হয়, এবং সর্বত্র সমদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হইতে থাকে । ব্রহ্মের কোন আকার না থাকার বুদ্ধিরও আকারভাগ ভাগ হইয়া ব্রহ্মমাত্রে পৰ্য্যবসান ঘটিতে থাকে । বুদ্ধি যত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, জগৎ দর্শনও তত লোপ পায় এবং সমাধিভাব (ব্যবহার-দৃষ্টিতে) বাড়িতে থাকে এবং জীবও উজ্জ্বলরূপে বেশী আনন্দ পান । ‘আনন্দময়রূপী মাত্মা স্বনাশেন হি হর্ষদা’ (শান্তি গীতা) । অর্থাৎ ‘মাত্মা আনন্দময়রূপী, ইনি নিজের নাশ-দ্বারা হর্ষ প্রদান করেন’ । ইহাই জীবমুক্তি সূত্র । জ্ঞান এইরূপে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় করিয়া জীবকে জ্ঞানফল নির্বাণ-মোক্ষের দিকে লইয়া যায় ।

“বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্ ।

শ্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষেবোপরতেঃ ফলম্ ॥

ষদন্তরোক্তরাভাবঃ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বন্তু নিঃফলম্ ॥”

(বিবেকচূড়ামণি—৪২৬।২৭) ।

অর্থাৎ বৈরাগ্যের ফল বোধ বা জ্ঞান, জ্ঞানের ফল উপরতি (বাহ্য বিষয় হইতে উপরত হইয়া সমাধি এবং জগতের বিস্মৃতি) উপরতির ফল ব্রহ্মানন্দানুভবজনিত শান্তি । উত্তরোক্তরের অভাব হইলে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বটী নিঃফল । অর্থাৎ যে বৈরাগ্য জ্ঞানের কারণ না হয়, সে বৈরাগ্য নিঃফল, যে জ্ঞান উপরতির কারণ নহে উহাও নিঃফল, এবং যে উপরতি ব্রহ্মানন্দানুভব-জনিত শান্তি না আনে, সে উপরতিও নিঃফল । প্রতিবশ্যদ্ব্যুক্ত অদৃঢ় জ্ঞানকে দৃঢ় ও প্রতিবশ্যশূন্য করিবার জন্য বিষয়চিন্তার পরিহারপূর্ব্বক সর্বদা মনন, নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, ইহা আচার্য্য শঙ্কর ‘বিবেক-চূড়ামণি’ গ্রন্থে এবং আচার্য্য শঙ্করানন্দ তাহার গীতা-ভাষ্যে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন । জ্ঞানপূর্ব্বক যে নির্বিকল্পভাব উহাই মোক্ষের স্বরূপ । ইহাতে জ্ঞান, অজ্ঞান, সাক্ষী, সাক্ষ্য, সত্য, মিথ্যা, ব্রহ্ম, জগৎ, বশন, মূর্ত্তি, দ্বৈত, অদ্বৈত ; জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি বিকল্প একবারে লুপ্ত হইয়া যায় । যেমন নিদ্রা হইতে জাগ্রত পুরুষের স্বপ্নদৃষ্টবস্তু-সকলের স্মৃতি হইলেও ঐ সকলে দৃঢ় মিথ্যাত্ব বোধ থাকায় ঐ স্মৃতি বিষয়সকলে কোন আগ্রহ থাকে না এবং স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রাদির স্মৃতি জাগ্রত পুরুষকে ভীত, উদ্ভিন্ন প্রভৃতি করে না এবং ঐ স্মৃতিও ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, এইরূপ অজ্ঞাননিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ পুরুষেরও জগৎস্মৃতি-বিষয়ে কোন আগ্রহ থাকে না এবং ঐ স্মৃতি তাহাকে ভীত বা উদ্ভিন্ন করে না ; মিথ্যাবোধহেতু ঐ স্মৃতিও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান । তাই পঞ্চদশী বলিয়াছেন :—

“দর্শনাদর্শনে হি হ্যা স্বয়ং কেবলরূপতঃ ।

যন্তিস্ঠতি স তদ ব্রহ্মান্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্” ।

(ঐতিবিবেক—৬৯)

অর্থাৎ ‘যিনি দর্শন ও অদর্শন অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়কে ত্যাগ

করিয়া কেবল স্বস্বরূপে অবস্থান করেন (অর্থাৎ যিনি একবারে বিক্ষেপ-শূন্য) হে ব্রহ্মন্ । তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মবিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না ।’

জ্ঞানীর ক্রমশঃ বাহ্যব্যবহারেরও ক্ষয় হয় এবং সমাধির দিক্‌টো বাড়িতে থাকে, ইহা যোগবাশিষ্ঠ-কথিত সপ্তজ্ঞান-ভূমিকার মধ্যে শেষের তিন ভূমিকাতে দেখান হইয়াছে । জ্ঞান হইবার পর যাবৎ জীবের দেহ থাকে, তাবৎ উহার জীবমুদ্র অবস্থা । শ্রুতি বলেন—

“তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষোহথ সম্পৎস্য ।”

অর্থাৎ ‘তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ তিনি দেহবিমুদ্র না হন ; দেহ-পাতের পরই তিনি ব্রহ্মসম্পন্ন হন ।’ (ছান্দোগ্য—৬:১৪:২)

জ্ঞান হওয়ার পরও কোন কোন জ্ঞানী দেহান্তরগ্রহণ করেন, ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যেমন—বশিষ্ঠ, ব্যাস, ভৃগু প্রভৃতি । ইহাদের কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও প্রারম্ভ-কর্মের ক্ষয় না হওয়ায় ইহারা কর্মানীত অধিকারে কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করেন । কর্মক্ষয় হইলে তাঁহারা সেই অধিকার বিমুদ্র হইয়া কেবল হন । ইহারা সকলেই কর্মবলে ঐশ্বর্য্যশালী এবং পরমেশ্বর-কর্তৃক নিমুদ্র হইয়া লোকস্ଥିতিকারক বেদ-প্রবর্তনাদিকার্য্যে অধিকার-সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবমুদ্র-ভাবে অবস্থান করেন, ইহারা আধিকারিক পুরুষ । আধিকারিক পুরুষগণের এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণকালে স্মৃতি অলুপ্ত থাকে, ইহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয় ও প্রকৃতিবশী । সেইহেতু তাঁহারা একসময়ে বা ক্রমা-বশে বহু দেহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধিষ্ঠান করেন । আচার্য্য শঙ্করানন্দ তাঁহার গীতাভাষ্যে ৩১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে—বহুধা কৃতশ্রবণ এবং ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাদি বাসনাবশত আভাসাত্মজ্ঞানী কিংবা আধিকারিক পুরুষগণই গীতাত্ত লোকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন । কিন্তু, সাধারণ আত্মজ্ঞানীর কিংবা মূঢ়ক্ষু যতির পক্ষে আত্মরতি ও আত্মহৃৎ হওয়া বাতীত অন্য করণীয় কিছুই নাই, (অজ্ঞানাবস্থার ও ব্যাবহারিকদৃষ্টিতে সৃষ্টি, ঈশ্বর, আধিকারিক পুরুষ স্বীকৃত দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদীর দৃষ্টিতে জীব, ঈশ্বরাদিভাব, আধিকারিক পুরুষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি

তাহারই বিস্তার এবং উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক বা মিথ্যা। সম্যক্ অজ্ঞানক্ষয়ে ঐ সকল কিছুই নাই। এক অখণ্ড সমরসতত্ত্বই সর্বদা বিরাজমান। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের ফলে অজাতবাদের লক্ষ্য নিগূঢ়-ব্রহ্ম স্থিতি। (সমরস = ভিন্ন ভিন্ন ফুলের রস, মৌচাকে স্থিত হইয়া একই প্রকার রস মধুরূপে পরিণত হয়; সমরস কথার তাৎপর্য্য খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়া)।

সংতজ্ঞানভূমিকা :—(১) শূভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তনুমানসা (৪) সত্ত্বাপত্তি (৫) অসংসক্তি (৬) পদার্থাভাবনী (৭) তদ্ব্যগা।

(১) **শূভেচ্ছা**—‘কেন আমি মৃতের মত থাকি, শাস্ত ও সংজন সংস্কারা আমার স্বরূপ জানিবই, বৈরাগ্যের উদয়ে এই প্রকার শূভ ইচ্ছাকে ‘শূভেচ্ছা’ বলে। (সাধক)।

(২) **বিচারণা**—শূভেচ্ছা-উদয়ের পর ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদর আশ্রয় গ্রহণকরতঃ তাহার নিকট বেদান্ত-মহাবাক্যের বিচার শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে শ্রুতি-অনুকূল নানা যুক্তিসহকারে যে পুনঃ পুনঃ মনন, উহাই ‘বিচারণা।’ (সাধক)।

(৩) **তনুমানসা**—শূভেচ্ছা ও বিচারণাদ্বারা চিত্ত বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মচিন্তায় রত থাকে। বিষয় চিন্তাদ্বারা চিত্ত ম্লল হয় এবং আত্মচিন্তাদ্বারা চিত্ত ক্ষীণ হয়। আত্মচিন্তাদ্বারা চিত্ত যখন সাতিশর ক্ষীণ হয়, তখন চিত্তের সেই অবস্থাকে ‘তনুমানস’ বলে। ইহা নির্দিধ্যাসন-ক্ষেত্র। (সাধক)

(৪) **সত্ত্বাপত্তি**—পূর্বোক্ত ভূমিকাগুলোর অভ্যাসদ্বারা চিত্ত বিষয়-বিরত হইয়া জ্ঞানের উদয়ে শূন্য, সত্য, আত্মাতে যে স্থিতি, উহাই ‘সত্ত্বাপত্তি’ (ব্রহ্মবিৎ, জ্ঞানী)।

(৫) **অসংসক্তি**—পূর্বোক্ত ভূমিকাগুলের অভ্যাসবশতঃ যখন চিত্ত স্বরূপধ্যানে নিমগ্ন হইতে থাকে, দেহ ভুল হইয়া যায়, আত্মচমৎকৃতিরূপা রূঢ়সত্ত্ব এই অবস্থার নাম ‘অসংসক্তি’। এই অবস্থা হইতে যোগী স্মরণই

ব্যবহারে বদ্যুখিত হন । ইহাকে ব্রহ্মবিদ্বর বলা হয় ।

(৬) পদার্থাভাবনী—পূর্বোক্ত পঞ্চ ভূমিকার অভ্যাসবশতঃ যখন আত্মরমণের দৃঢ়তা-হেতু বাহ্য্যভ্যন্তর পদার্থ-সমূহের তুল্য হইয়া যায়, তখন সেই অবস্থাকে ‘পদার্থাভাবনী’ বলে । এই অবস্থায় যোগী স্বয়ং বদ্যুখিত হন না, পার্শ্বস্থ ব্যক্তির দ্বারা বদ্যুখাপিত হন । ইহাকে ব্রহ্মবিদ্ব-বরীয়ান্ বলা হয় ।

(৭) তূর্ষ্যাগা—পূর্বোক্ত ভূমিকা-ষট্‌কের অভ্যাসবশতঃ যখন কোনপ্রকার ভেদ আর উপলব্ধি হয় না, যখন স্বভাবে একনিষ্ঠত্ব-হেতু মন উত্থানরহিত হয়, জাগ্রৎ, সুপ্ত, জ্ঞান-অবস্থার-নিশ্চয় সেই অবস্থাকে ‘তূর্ষ্যাগা’ কহে । এই অবস্থায় যোগী বদ্যুখ নরহিত । ইহাকে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ বলা হয় ।

পূর্বোক্ত সপ্তভূমিকার মধ্যে সত্ত্বাপত্তি ভূমিকাতেই জ্ঞানের উদয় হয় । এই-খানেই সাধনার শেষ । জ্ঞানলাভের পর জগতের উপর মিথ্যাভবোপ-ধাকার জন্য অসংস্কৃত প্রভৃতি প্রবৃত্তি ভূমিকাগুলি আপনিই আবির্ভূত হয় । জ্ঞানী সত্ত্বাপত্তিভূমি অপেক্ষা অসংস্কৃত, পদার্থাভাবনী ও তূর্ষ্যাগা ভূমিতে ক্রমশঃ অধিকতর বিক্ষেপণনা ও আনন্দী হন । সত্ত্বাপত্তিভূমি হইতে জীবন্মুক্তি অবস্থা, দেহপাতে বিদেহমুক্তি । অবস্থাগুলি জীবদেহই হয়, সূতরাং মিথ্যা । আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বদা একরূপ ; সেইজন্য পারমাধিক্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠে, এবং জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে কোন ভেদ নাই, ব্যবহারদৃষ্টিতে ঐ ভেদ কল্পনা করা হয় মাত্র । প্রকৃত কথা :—

“ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্বিশেষো ন চ সাধকঃ ।

ন মৃদুমৃদুর্ন বৈ মৃদু ইতিৈষা পরমাখ্যতা” ॥ মাণ্ডুক্যকারিকা ।

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ‘নিরোধ, উৎপত্তি, বস্তুভাব, সাধক, মৃদুমৃদু ও মৃদু কিছুই নাই, ইহাই পরম ও চরম সত্য’ । একমাত্র নিগূর্ণব্রহ্মই সর্বদা স্ববরূপে বিদ্যমান ।

জীবের গতি নিকূপণ

শ্রমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ-যষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুক্তামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুগন্ধানিবাশরাৎ ॥

গীতা—পঞ্চদশ অধ্যায় ৭:৮

অর্থাৎ ‘এই সংসারে আমার জীবরূপ অংশ, মন যাহাদের ষষ্ঠ সেই ইন্দ্রিয়গণকে মনের সহিত আকর্ষণ করে। দেহস্থামী জীব যখন শরীরকে আশ্রয় করেন, কিংবা যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন বায়ু গন্ধস্থান পুষ্পাদি হইতে যেমন গন্ধকে লইয়া গমন করে সেইরূপ ইহাদিগকে (মন ও ইন্দ্রিয়গণকে) লইয়া গমন করে’ ।

(১) জ্ঞানীর শব্দের বৃহদারণ্যক বলেন, “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সনু ব্রহ্মাপ্যোতি”—৪।৬ ‘তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না ; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মবেই প্রাপ্ত হন’ । জ্ঞানী দেখেন, ‘আমি পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ, দ্বিতীয় যাহা, তাহা অজ্ঞানকল্পিত ও মিথ্যা । পরিপূর্ণস্বরূপ আমার গতাগতি অসম্ভব । তাই তিনি বলেন, “ন জাতো ন মৃতোহসি ত্বং ন তে দেহঃ কদাচন” (অবধূত গীতা) । অর্থাৎ ‘তুমি জন্মাও না বা মরও না, তোমার কোন কালেও দেহ নাই’ ।

“ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মাতা চ ভৃশ্ম ।

ন বন্ধু ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্” ॥

(শঙ্করাচার্য—নির্ব্বাণষট্কে)

অর্থাৎ ‘আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, ভৃশ্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য প্রভৃতি কিছুই নাই, আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব’ ; জ্ঞানী জানেন মোহই মৃত্যু

নতুবা মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র আত্মাই আছেন, দ্বিতীয় নাই। যম বলিয়াও কেহ নাই, জীব আপনার কর্মের সংস্কারের মধ্য দিয়া ভগবানকেই যমরূপে দর্শন করে। যে মৃত্যুর্তে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, সেই মৃত্যুর্তেই হইতেই জ্ঞানী মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—ইহাই সদ্যোমুক্তি। কিন্তু যতক্ষণ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ যজ্ঞ জীব শূল, সন্ধ্য ও কারণদেহে অভিমান ছাড়িতে পারে না, সুতরাং জীব চেতন সর্বব্যাপক আত্মা হইরাও প্রকৃতিজাত দেহাদিতে অভিমানবশতঃ দেহের গমনাগমনে আপনার গমনাগমন অনুভব করে। জীব এই লোকে শূল দেহ ত্যাগ করিয়া সন্ধ্য ও কারণ-দেহ লইয়া অন্যলোকে গমন করে।

(২) যাহারা নিস্কামকর্মী—যাহারা নিস্কামভাবে বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যাাদি কর্ম করেন, যাহারা সগুণব্রহ্মের উপাসক তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। যদি ইহজন্মে তাহাদের জ্ঞানের উদয় না হয়, তবে মৃত্যুর পর তাহাদের দেবযান-পথে উৎসর্গিত হয়। গীতা বলেন :—

“অগ্নিজ্যোতিরহঃ শত্রুঃ যশ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াভাগচ্ছান্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮২৪

অর্থাৎ ‘অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শত্রুপক্ষ এবং উত্তরায়ণ যগ্নসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের যে মাগা, সেই মাগে গমন করিয়া ব্রহ্মউপাসনাপর যোগিগণ ক্রমশঃ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’ এই যোগিগণকে অগ্নি, জ্যোতিঃ প্রভৃতিতে অভিমানী দেবতাগণ মৃত্যুর পর পথ দেখাইয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তথায় ইহারা বহু বৎসর বাস করিয়া ঐশ্বর্যবর্ষা ভোগ করিয়া ব্রহ্মার আয়ুঃশেষে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। ইহা ক্রমমুক্তির পথ

(৩) যাহারা সাকামকর্মী—যাহারা ঐহিক, পার্থক্য সখলাভের আশায় বেদোক্ত যজ্ঞ তপস্যা দানাদি করেন, তাহারা মৃত্যুর পর পিতৃযান-মাগে গমন করেন। ইহাদের গতি সম্বন্ধে গীতা বলেন :—

“দ্যুমোর্যশ্চৈশ্বক্যঃ যশ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিষোদী প্রাপ্য নিবসতি” ॥ ৮২৫

অর্থাৎ 'সকাম যোগিগণ, 'ষ্ম, রাষ্ট্র, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও ষম্মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের যে মাগ', সেই মাগে' গমন করিয়া চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন'। জীবের যখন চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির হেতুভূত পুণ্যের ক্ষয় হয়, তখন তিনি চন্দ্রলোক হইতে ছাড়া হন বা পতিত হন তখন দেবতাগণ সেই গোমূপী জীবকে পঞ্চান্যগ্নিতে (মেবে) হোম করেন। ইহা হইতে বৃষ্টি সমৃদ্ধভূত হয়। জীব বৃষ্টিকে আশ্রয় করেন। পরে দেবতাগণ ঐ বৃষ্টিকে পৃথিব্যাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন, শস্যাদির উৎপত্তি হয়। তখন জীব অন্নকে আশ্রয় করে। পরে দেবতাগণ সেই তরুকে লোকপ্রসিদ্ধ হস্তকাঁদিশালী পুরুষাণিকে হোম করেন। এখানে দেবতা বলিতে পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলের দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। দেহমধ্যে যে দেবতাগণ অধ্যাত্ম বলিয়া পরিগণিত, বাহিরে বিরাট-দেহে তাহারাই অধিদেব বলিয়া খ্যাত। সেই দেবতাগণ পুরুষের মূখে অন্ননিষ্ক্ষেপ (আহুতি প্রদান) করেন, তাহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। জীব তখন রেতঃকে আশ্রয় করে। রেতঃ আবার পূর্বোক্ত দেবতাগণ-কর্তৃক যোষিদিগ্নিতে (স্ত্রীতে) আহুত হয়। ইহা হইতে স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। জীব তখন স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে। সৃষ্টি-ব্যাপার একটী যজ্ঞ, ইহা ঈশ্বরানুযায়ী স্বভাবতঃই চলিতেছে। দ্যুলোক, পঞ্চান্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষি (স্ত্রী) এই পাঁচটী অগ্নি। এই পাঁচটী অগ্নির আহুতি যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ। ইহাই ছান্দোগ্যকথিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। জীব প্রথমে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে অবস্থান করে এবং পূর্ব পূর্ব সংস্কারবশতঃ অতি সূক্ষ্মভাবে 'আমি দেখিব' 'আমি শুনিব' ইত্যাদি সংকল্প পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে। তখন সেই সংকল্পপ্রভাবে ও ঈশ্বরানুগ্রহে ভ্রূণের চক্ষুর্কাণি ইন্দ্রিয়সকল নির্গত হয়। জীবসকলের পূর্ব পূর্ব সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন, সেইজন্য উহাদের সংকল্পেরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং সংকল্পের তারতম্যাহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিরও তারতম্য হয়। এইজন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মানুষ্যের মূখাদি দেখিয়া কর্ম-ফলাফল নির্ণয় করা যায়। জীব এইরূপে জন্মলাভ করিয়া পুনরায়

চন্দ্রাদিলোক লাভের আশায় অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম করে এবং পুনরায় ধূমাদিক্রমে একবার সোণলোক একবার ইহলোক এইরূপে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকে, এইটী গভাগতির পথ ।

(২) বাহারা উত্তর বা দক্ষিণ পথ-প্রাপ্তির জন্য কৰ্ম কিংবা জ্ঞানের কোনরূপ অনুষ্ঠান করে না। তাহারা এই পরিদৃশ্যমান জগতে কীট, পতঙ্গ, ডাণ, মশকাদি শরীর লাভ হয়। অতঃপর সর্বাঙ্গিক উৎসাহের সহিত জীব-প্রাকৃতিক অজ্ঞান-প্রসূত আহার-বিহারাদি কৰ্ম ও মিথ্যাজ্ঞান পরিহারপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম-কিংবা জ্ঞানের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।

এক্ষণে জীব দেহান্তর গ্রহণকালে কিরূপে মনের সহিত পশু ইন্দ্রিয়শক্তি ও কৰ্মসংস্কার লইয়া গমন করে, তাহা উক্ত হইতেছে । জীব যেমন জাগ্রদবস্থা হইলে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপেই ইহলোকে দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন । ঐ দেবতাগণ জীবের কৰ্মপ্রেরিত হইয়া, উহার ইন্দ্রিয়সকলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবদশাপৰ্য্যন্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহ (স্মৃতিাদি ক্রিয়া সম্পাদন) করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ঐ দেবতাগণ চক্ষুরাদির অনুগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হন, এবং স্বীয় আদিভাদিরূপ প্রাপ্ত হন, পুনর্ব্বার দেহগ্রহণকালে ঐ ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করেন । স্বপ্নকালে যেমন জীব শূলদেহসম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম মনোময় দেহে স্বপ্নরূপে বিচরণ করে, এইরূপ মৃত্যুকালে জীব শূলদেহ-সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম মনোময় দেহ লইয়া বিচরণ করে । আবার জন্মকালে জীবের শূলদেহের সহিত পুনরায় সম্পর্ক হয় । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে “মরণকালে পুরুষের বাণিশিখর অগ্নিকে, প্রাণবায়ুসমূহ বায়ুকে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় আদিতাকে প্রাপ্ত হয়” । মৃত্যুকালে ইন্দ্রিঅধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ জীবের লিঙ্গশরীরে বা সূক্ষ্মশরীরে লীন হন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাসে একীভাব প্রাপ্ত হয় । তখন লোকে বলে, ‘এই ব্যক্তি আর দেখিতেছে না, শুনিতেছে না বা বুঝিতেছে না, ইত্যাদি । সেইকালে হৃদয়ের অগ্রভাগ, নাড়ীমূখ বা নিগমনধার, স্বপ্নকালের ন্যায় তেজোহংগ গ্রহণহেতু

নিজ আত্মজ্যোতিঃদ্বারা প্রদ্যোতিত হয় এবং এই প্রদ্যোতমান হৃদয়দ্বারা লিঙ্গশরীরী বিজ্ঞানময় আত্মা, দেহ হইতে নির্গত হন। “তস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি।” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২)। যদি আদিত্য-লোক-প্রাপ্তির অনুকূল জ্ঞান ও কৰ্ম সঞ্চিত থাকে, তবে চক্ষুদ্বারা নির্গত হয়। যদি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অনুকূল জ্ঞান ও কৰ্ম সঞ্চিত থাকে, তবে ব্রহ্মরশ্মি ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। এইরূপে জীবের জ্ঞান ও কৰ্মের সঞ্চয়ানুসারে অন্যান্য শরীরাবয়ব-দ্বারা নিষ্ক্রামণ হইতে পারে। সেই বিজ্ঞানময় আত্মা, যে সময় পরলোক-প্রস্থানের নিমিত্ত উৎক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়, সেই সময় প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে। এই দেহে প্রাণকে আশ্রয়করতঃ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করে। সুতরাং প্রাণের উৎক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ও উৎক্রান্ত হয়। সেই ভয়ানক মৃত্যুসময়ে জীবের প্রভুত্ব থাকে না। জীব যাবৎজীবন যে সমস্ত কৰ্ম করে, তন্মধ্যে যে যে কৰ্মের সাক্ষ্য হয়, আসক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ স্থাপন করে, মৃত্যুকালের বোর মৃত্যুশব্দে অন্যান্য সমস্ত সংস্কার লুপ্ত হইলে পর, কেবল দৃঢ়তর আসক্তিবশে অনর্দীষ্ট কৰ্মের সংস্কার তাহার হৃদয়পটে উদ্ভূত হয়। কৃতকৰ্মের সংস্কার উদ্ভূত হইয়া, যে অতঃকরণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই সমস্ত লোক সেই সময়ে সবিজ্ঞান বা জ্ঞানবান্ হয়। আর জীব সবিজ্ঞান-ভাবেই গত্যস্থানে গমন করে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে বিশেষ বিশেষ বাসনাময়বিজ্ঞান অভিযুক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যে স্থান দেখাইয়া দেয়, সেইস্থানেই গমন করে। জীব পুণ্যকৰ্মদ্বারা * পুণ্যলোক এবং পাপকৰ্মদ্বারা পাপলোক (নরকাদি) প্রাপ্ত

* হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত এবং পুনর্জন্মবাদকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুর বর্ণপ্রমাদ বিভাগ এবং ধর্মকর্ম নিরূপিত। ঋষিগণ নানা শ্রুতি ও বৃত্তি দ্বারা পুনর্জন্মবাদের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের Conservation of energy নিয়ম হইতেও পুনর্জন্মবাদের সমর্থন করা যায়। কারণ উহাতে বলা হয়—“Energy cannot be created, cannot be destroyed but it can be transformed from one form to another” অর্থাৎ “শক্তিকে সৃষ্টি করা যায় না, উহার ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু উহাকে এক আকার হইতে অন্য আকারে পরিণত করা যায়। এখন, জীবের এক একটি বাসনা, এক একটি শক্তি। আমার বাসনা হইল ‘কাশী ঘাইব’। ঐ বাসনাশক্তি আমার শরীরটাকে কাশী লইয়া গেল। এক এক জীবকে আশ্রয় করিয়া

হয়। পূর্ব বিদ্যা, কর্ম ও প্রজ্ঞা জীবকে অনুসরণ করে। জীব যখন শ্বীয় কর্মফল ভোগের জন্য এই দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ পাইতে চেষ্টা করে, তাহার পূর্ব হইতেই কর্মফলভোক্তা সংসারী জীবের শরীরনির্মাতা পৃথিব্যাদি ভূতসকল এবং ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক দেবভাগন, জীবের পূর্বসংস্থিত কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া কর্মফলভোগের সাধন, দেহ, ভক্ষা, ভোজ্য, পেষ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করেন। জলৌকি যেমন একটী তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া অপর একটী তৃণকে আক্রমণ করে ও পরে আপনার পূর্ব অবস্থাসকল শেষ অবস্থাহলে উপসংহত বা সংকুচিত করে, এইপ্রকারে সংসারী আত্মা পূর্বগৃহীত শরীরকে নিদ্রাভিলাষী ব্যক্তির মত অচেতনভাবে ফেলিয়া, জড় করিয়া জলৌকির তৃণান্তর গ্রহণের ন্যায় শ্বীয় প্রসারিত বাসনার সাহায্যে সম্মুখে উপস্থিত শরীরান্তর (সংসার শরীর) গ্রহণ করে ও আত্মার উপসংহার করে। অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া অভিনবদেহে আত্মভাব স্থাপন করে। পরে শূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বিষয় ভোগ করিতে থাকে। (বৃহদারণ্যক ৪:৩)

উহাদের অনন্ত বাসনা রহিয়াছে। শক্তি-নিত্যতার নিয়মানুসারে উহারা ধ্বংস হইতে পারে না, অন্য আকারে থাকিবে। সেই হিসাবে যে সকল বাসনা যে জীবকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, মৃত্যুর পরেও উহাদের সেই জীবকে আশ্রয় করিয়া অন্যাকারে থাকিতে বাধ্য কি? জীবের অনন্ত বাসনার মধ্যে জীবের মৃত্যুকালে যে বাসনাবলি প্রবল হয়, ঐন্দর্যনিরতিবশে জীবের তদনুসারেই জন্ম হয়। জীবের পাপ ও পুণ্যানুসারে উৎস ও অধোগতি উভয়ই হইতে পারে। ‘পাপের জন্য শুদেব অনন্ত নরকভোগ হয়, আর উত্তমের আশা নাই’ অথবা আধুনিক জনোন্নতিবাদ—‘জগৎ ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, পশ্চান্নাবর্তন নাই’ ইত্যাদি অধৌক্তিক মতবাদ হিন্দুশাস্ত্র-সমর্থিত নয়। মনে থাকিতে হইবে আধ্যাত্মিক উন্নতির মৃত্যু ঘটাইয়া, ভোগবিষয়ক উন্নতিই জগতের প্রকৃত উন্নতি নয়।

সাম্যবাদ ও শান্তি

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। গীতা উপনিষৎসকলের সার, সেইজন্য ইহাতেও সাম্যবাদ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদের সমর্থক কতকগুলি শ্লোক গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেখান হইতেছে।

“বিদ্যাভিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শূনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ” ॥ ৫।১৮

অর্থাৎ ‘পণ্ডিতগণ বিদ্যাভিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল প্রভৃতিতে সমদর্শন করিয়া থাকেন’।

“ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেমাং সাম্যো হিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মাণি তে হিতাঃ” ॥ ৫।১৯

অর্থাৎ ‘যাঁহাদের মন সাম্যো হিত হইয়াছে, তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সংসার জন্ম করিয়াছেন, কারণ ব্রহ্ম সর্বত্র সম এবং নির্দোষ, সেই ব্রহ্মেই তাঁহারা অবস্থিত।

“সুহৃন্মিত্রায়ুদাসীনমধ্যাহ্নং দ্বৈষাৎ ক্షুণ্ণং।

সাপুংসপি চ পাপেষু সমবদুশ্চিবিশিষ্যতে” ॥ ৬।৯

অর্থাৎ ‘সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যাহ্ন, দ্বৈষাৎ, ক্షুণ্ণং, সাপুংস এবং পাপিগণে যিনি সম বদুশ্চি তিনি শ্রেষ্ঠ’।

“সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ” ॥ ৬।২৯

অর্থাৎ ‘যোগযুক্তচিত্ত, সর্বত্র সমদর্শী পুরুষ আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন’।

“সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যাৎস্ববিনশ্যাৎ তং যঃ পশ্যতি” ॥ ১৩।৫৭

অর্থাৎ 'সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, নশ্বর পদার্থসকলের মধ্যে অবিনাশী পর-
মেশ্বরকে যিনি দেখেন, তাঁহার দর্শনই যথার্থ দর্শন'।

‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি’।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মনোভিঃ লভতে পরাম্” ॥ ১৮.৫৪

অর্থাৎ ‘ব্রহ্মভাবে অবস্থিত প্রসন্নাত্মা পুরুষ শোক কিংবা আকাঙ্ক্ষা করেন না।
তিনি সর্বভূতে সমদর্শনরূপ আমার পরাভক্তি লাভ করেন’।

উল্লিখিত শ্লোকগুলির তর্ক পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, আত্ম বা ব্রহ্ম
বা ভগবান সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ও অবিনাশী, ভূতসকল বিশাশী। জ্ঞানী
পুরুষ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তির উদয়
হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সমদর্শী বা সাম্যবাদী।

আমরা জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, ঐ দিকেই বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি-
বিশিষ্ট জীব ও বস্তুসকল দেখিতে পাই। এত যে মানুষ দেখি, ইহাদের একটীর
সহিত অপরের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে মিল নাই। আবার মনুষ্যের সহিত
বৃক্ষপত্রাদির, পশুপক্ষী প্রভৃতির ভেদ রহিয়াছে। সর্বত্রই ভেদ লক্ষিত হয়।
সুতরাং সমতা বা সাম্য কোথায়? যতদিন আমরা প্রকৃতির রাজ্যে থাকিব
এবং প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইব, ততদিন আমরা বৈষম্যই দেখিব, সাম্যের
সন্ধান পাইব না। এই নানা ভেদযুক্ত জগতের মূলে প্রকৃতিজাত উপাধিশূন্য
সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ ভগবানই সমান সর্বসাধারণ বস্তু। সাম্য বৈষম্যকে
ধরিত্তা আছে

মানুষ পশু নয়, পশুও মানুষ নয়; রাম, শ্যাম নয় এবং শ্যামও রাম নয়।
কিন্তু মানুষ, পশু, রাম প্রভৃতির মূলে যে সত্তা উহা এক। ‘সত্তা’ এই শব্দটী
শুনিলে রাম, শ্যাম প্রভৃতির কোন বিশেষ সত্তার বোধ চিত্তে উদ্ভূত হয় না।
একটী সামান্য অর্থাৎ সর্বসমান সত্তাজ্ঞানের উদয় হয়, উহাই সৎ। এই সৎ
সর্বত্র অনুগত, যেহেতু সত্তাশূন্য কোন বস্তু দেখান যায় না। এইরূপ, জ্ঞানশূন্যও
কোন কিছু দেখান যায় না, সুতরাং জ্ঞানও সর্বত্রগত। অস্বাধিত সত্তা ও জ্ঞানই

আনন্দ। সেইজন্য আনন্দও সর্বগত। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানই সর্বসম। ভগবানে বা ঈশ্বরে দৃষ্টিই প্রকৃত সাম্যবাদ। জ্ঞানী মহাত্মাগণের কর্মকালেও ভগবানে দৃষ্টি অব্যাহত থাকে। সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত সাম্যবাদী। ভগবানে দৃষ্টি না থাকিলে সাম্যের সম্ভাবনা নাই। অথুনা বাহির হইতে ভারতবর্ষে যে সাম্যবাদের আমদানী করা হইয়াছে, উহার স্বরূপ ভারতীয় ঋষি-গণের সাম্যবাদ হইতে ভিন্ন। ভারতীয় সাম্যবাদের গতি ত্যাগমুখীন, লক্ষ্যবস্তু ঈশ্বর। ভোগ গৌণ, ঈশ্বর মূখ্য। কিন্তু বাহিরাগত এই সাম্যবাদের গতি ভোগমুখীন। লক্ষ্য সমভাবে বণ্টন করিয়া ভোগ। ভোগ মূখ্য; ঈশ্বরকে এই সাম্যবাদ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। ভারতীয় সাম্যবাদে বাহিরে প্রকৃতির ভেদ স্বীকার করিয়া উহার মধ্যে সম ঈশ্বরের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবতঃ অসম প্রকৃতিজাত নাম ও রূপকে সমান করিবার বৃথা চেষ্টা করা হয় নাই। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক সাম্যবাদ। কিন্তু বাহিরের এই সাম্যবাদে ভেদসঙ্কুল প্রকৃতি-জগতে জোর প্রয়োগ করিয়া সাম্য আনিবার চেষ্টা চলিতেছে— এই সাম্যবাদ অস্বাভাবিক। কারণ লোকের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার এবং ভিন্ন ভিন্ন ভোগ-প্রবৃত্তি মারিরা ধরিয়া সমান করিয়া দেওয়া যায় না। এই সাম্যবাদ অহংকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, এখনও কালপরীক্ষিত হয় নাই। সুতরাং ইহারই মধ্যে উহার গুণ গাহিবার সময় আসে নাই। আমাদের দেশের একদল লোক এই সাম্যবাদের প্রশংসায় পণ্ডমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যদি সাম্যবাদের নামে নরহত্যা, ধ্বংসমূলক কার্য এবং স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তবে উহা আধ্যাত্মিক হিন্দু জাতির আত্মবিস্মৃতির ফল ও দুর্গতির পরিচায়ক। বাহিরাগত এই সাম্যবাদের ইতিমধ্যেই ওলট পালট হইয়া গিয়াছে এবং আরও হইবে—যেহেতু ইহা চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া অগ্নি জলসেচন যেমন বৃথা, ঈশ্বরকে দৃষ্টিপথে না রাখিয়া সাম্যবাদের কল্পনাও সেইরূপ বৃথা। ইহা অন্ধকারের সাম্যবাদ। অমাবস্যার রাতিতে পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইলে সব সমান বোধ হয়, কিন্তু হাটিতে

গেলে ধাক্কা খাইয়া পড়িতে হয়, তখন দেখা যায় সব সমান হয় নাই, আধুনিক সাম্যবাদেরও স্বরূপ এবং গতি ঐ প্রকার। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া অহংকারবশে যে কর্মই (উহা আপাততঃ মনোরম মনে হইলেও) করা যাউক না কেন উহার পরিণাম অবশ্যই মন্দ। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—“যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্দনঃ” ৩৯। অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রীতি-ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম বন্দনের কারণ হয়। অহংকার বৈষম্যের বীজ—অহংকার হইতে বৈষম্য ছুটিয়া উঠে। ঈশ্বর-শরণাপত্তি ও আত্মজ্ঞানব্যতীত অহংকারের নিবৃত্তি নাই; সত্তরাং সমদর্শনেরও আশা নাই। অজ্ঞানদ্বারা আবৃতচক্ষু মানব অহংকারবশে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া যে জগতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়, উহার ভাবী ফল ক্যাণজনক হইতে পারে না, কালে উহা ধরা পড়িবে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ভাগ করিয়া নিশ্চিন্তে ভোগ করিব, এ বৃষ্টি ভাল নয়। ভোগেচ্ছা প্রবল হইলে অশান্তি আসিয়াই পড়িবে। তাই গীতা বলেন—“ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।” ১২ ১২। অর্থাৎ ত্যাগ হইতে অনন্তর শান্তি লাভ হয়। হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রও ইহাই বলেন।

জগতের সকল লোক যে সত্য শান্তি চায়, ইহাতে সন্দেহ নাই, তাই সকলেই ‘শান্তি’ ‘শান্তি’ করিয়া চীৎকার করিতেছে। শান্তি আনন্দ সকলের স্বভাব বলিয়া সকলেই উহার কামনা করে। কিন্তু বাহিরের কতকগুলি ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করিলেই শান্তি আসিবে না। শান্তি পাইবে ত মন—সেই মন যদি নানাবিধ ভোগের চিন্তায় উহার আহার্যে এবং রক্ষণে সর্বদা চঞ্চল থাকে, তবে সে কেমন করিয়া শান্তি পাইবে? যে কত স্বয়ং অস্থির, তাহার আশ্রয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি পাইতে গেলে চিরশান্ত কতকে আশ্রয় করিতে হয়। যাহারা বাহিরের সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট তাহাদিগকে আমরা অগ্রে নিজের ঘরের ধনরাজ্য ভাল করিয়া খোঁজ লইতে অনুরোধ করি। শান্তি আছে—‘স্বগেহে পায়সং তাক্ত্বা ভিক্ষামর্জিত দুর্মতিঃ’। অর্থাৎ “দুর্দৃষ্টি মানব নিজের গৃহের পায়স ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হয়”।

আবার অনেকে মনে করেন, হিন্দুজাতির বর্ণাশ্রম-বিভাগ তুলিয়া দিলে ও একত্র আহার-বিহারাদি করিলে আমাদের মধ্যে একতা ও সাম্য আঁগবে। ইহাও একপ্রকার অজ্ঞতা। ইহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যে সকল জাতির মধ্যে বাহ্যতঃ এই বর্ণবিভাগ নাই, যাহারা একত্র আহারাদি করেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না কেন। হিন্দুশাস্ত্রের সর্বত্রই (ঋগ্বেদের পদ্যসংস্কৃত, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতিতে) বর্ণবিভাগের কথা পাওয়া যায় এবং এই বর্ণবিভাগকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুর ধর্ম-কর্মাদি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিভাগকে বাদ দিতে হইলে অগ্রে হিন্দুর বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক।

আজকাল আমাদের অধিকাংশই আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থসকলের সহিত পরিচিত নহি। ইহার সুযোগ লইয়া বাহিরের জগতের নিকট প্রশংসা পাইবার এবং নাম কিনিবার আশায় এক দল লোক ‘জাতিভেদ হিন্দুশাস্ত্রে নাই, উহা মনুষ্যসৃষ্ট, উহা বংশগত নহে’ ইত্যাদি মিথ্যা বাক্যদ্বারা জনসাধারণকে প্রতারিত করেন। কিন্তু বাহিমুখতা ত্যাগ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থলি পৰ্যালোচনা করিলে বর্ণাশ্রম-বিভাগ যে পুনর্জন্মবাদী হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য উহা মনুষ্যকৃত নহে, জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের গুণ-কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং উহা বংশগত, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।*

বর্ণাশ্রম বাদ দিলে হিন্দুধর্ম কাঁঠালের আমসতেলের ন্যায় অলীক বস্তু হইবে। এখন কথা হইতেছে যে, যে হিন্দু-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সর্বত্র সমদর্শন উহার মধ্যে আবার ভেদদৃষ্টিযুক্ত বর্ণাশ্রম বিভাগের কথা কেন? উত্তরে বলি, অনাদি সংস্কার-

* জন্মযারাই যে হিন্দুজাতির বর্ণবিভাগ নিয়ন্ত্রিত হইত, ইহা আজীবন শাস্ত্র-সেবী, নানা শাস্ত্র সুপণ্ডিত গভীর চিন্তাশীল পুজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্ক-তীর্থ মহাশয় রাক্ষস-সভার অভিভাষণে নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার দেহি অভিভাষণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

বশতঃ ভেদদৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক—ইহা অনাদি তজ্ঞান-প্রসূত, সুতরাং অত
সূত্রে ভেদদৃষ্টি উচ্ছেদসাধন করা যায় না। জ্ঞানদ্বারা মূল তজ্ঞানের নাশ না
হইলে ভেদদর্শন কিহুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। “অভেদদর্শনং জ্ঞানম্”—‘অভেদ-
দর্শনই জ্ঞান’। আজকাল কোন নেতাই অকপটভাবে জোর করিয়া বলিতে পারেন
না যে, তিনি সত্যের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। আর ব্যস্ত, কামনা-
যুক্ত ও কম'চঞ্চল জীবনে সত্যোপলব্ধির অবকাশ কোথায়? ঋষিগণ কিন্তু
ঋষি-বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কর্মে সমাহিত হইয়া সত্যের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি
করিয়া উদাস্তস্বরে বলিতে পারিয়াছিলেন—‘বেদাহমতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-
বর্ণং তমসঃ পরম্ভাং’ (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)। অর্থাৎ ‘আমি অজ্ঞানের
অতীত সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে জানি।’ যাহারা সত্যের স্বরূপ সম্যক্
উপলব্ধি করেন নাই, তাহাদের অহংকার থাকিবে এবং তাহাদের বিধানেও
ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে। এরূপক্ষেত্রে তাহারা যদি বহুকালহায়ী সম্যগ্দর্শী
ঋষিগণ-প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় ব্যবহার সংস্কার করিতে যান, তবে হিন্দুধর্মের
সংস্কারের নামে উহারা শীঘ্র উহার সংহারের ব্যবস্থা করিবেন।

জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক। সেই জ্ঞান আবার শাস্ত্রোক্ত ধারার অনুসরণেই
হইয়া থাকে, স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা হয় না। বর্ণাশ্রমমত্ত ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া
কর্তব্যবোধে আপন আপন স্বধর্মপালনই ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের শাস্ত্রোক্ত ধারা
ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম। হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রও ইহাই প্রতিপাদন করে। এই
বর্ণাশ্রমধর্ম ভগবদ্দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কোন সঙ্কীর্ণদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত
নহে। দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া কোনকালেই সন্দর্শন
লাভ সম্ভব হইবে না। আবার একবারে অভেদ যে ব্রহ্মবস্তু, তাহাতেও সৃষ্টি
নাই। সুতরাং যতদিন আমরা নানাপ্রকার নামরূপবিশিষ্ট এই সংসারে থাকিব,
ততদিন আমরাগকে জ্ঞানদৃষ্টির আশ্রয়করত ভেদের মধ্যে ষাহাতে অভেদদৃষ্টি
মলিন না হইয়া পড়ে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভেদের মধ্যে
অভেদ বস্তুটাই ভগবান্। ভগবানে দৃষ্টি না রাখিলে বর্ণাশ্রম-ধর্মপালনের

সার্থকতা থাকে না। বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিলে—উহার কর্মাংশদ্বারা জগতের অভ্যুদয়ের এবং ঈশ্বরাংশ দ্বারা মনুষ্যের পথ প্রশস্ত হয়। অলস্য তমোগুণ, উহা মৃত্যুপ্বরূপ। উহাকে কর্মদ্বারা বা রজোগুণদ্বারা জয় করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া যে কর্ম করা হয়, উহার মধ্যে জগতের ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। উহাদ্বারা জগতের তাত্কালিক বাহ্য উন্নতি হইলেও ঐ উন্নতি স্থায়ী হয় না। ঈশ্বরদৃষ্টি বাদ পড়িলে ভোগদৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করে। উহাই জগতের ধ্বংসের কারণ হয়। একানে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জোর করিয়া আইনের বলের সাম্য আনা যায় না। এমন শিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত যাহাতে মানুষ বাল্যকাল হইতেই ক্রমশঃ ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে স্বভাবতঃই সাম্য আসিবে। মূল সূত্র বর্ণিখিয়া যেমন সঙ্গীতের নানা মাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করা যায়, এইরূপ মূল সূত্র ভগবানকে দৃষ্টিপথে রাখিয়া নানাপ্রকার জাগতিক উন্নতিও করা যাইতে পারে। জীবন-সঙ্গীতকে মধুময় করিবার ইহাই পথ, অন্য পথ নাই,—“নানাঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।” (শ্বেতাশ্বতর—৩।৮)। এখানে ইহাও স্মরণ রাখা কষ্টব্য যে ভগবান্ বিশ্বব্যাপক। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর উহা গ্রহণ করিতে আমরা দ্বিধা করিব না। কিন্তু তাহাদের আসন্ন ঈশ্বর-বিমুখ ভাব আমরা কোন মতেই গ্রহণ করিব না।

সৃষ্টি মানেই ভেদ; ভেদ ভিন্ন সৃষ্টি থাকে না, ব্যবহারও চলিতে পারে না। একতাল স্বর্ণ আছে। উহার মাকড়ি, বালা, হার প্রভৃতি যে নামরূপের ভেদ করা হইল, উহাই স্বর্ণ হইতে সৃষ্টি। মাকড়ি, বালা হার প্রভৃতির ব্যবহারিক ভেদ আছে। মাকড়িকে কাণে, বালাকে হাতে এবং হারকে গলায় পড়িতে হইবে, ব্যবহারে ইহার অন্যথা করা চলিবে না। কিন্তু স্বর্ণ হিসাবে মাকড়ি, বালা, হার প্রভৃতি কেহ কম নয়। এইরূপ আত্মা-হিসাবে সব সমান হইলেও মনুষ্যগণের মধ্যেও ব্যবহারিক ভেদ আছে। বালা, হার প্রভৃতির আপন আপন মর্যাদা আছে, উহারা শরীরের যথাযোগ্য অঙ্গে স্থাপিত হইয়া উহার শোভাবর্ধন করে। এইরূপ ভগবানের সমাজরূপ দেহে চারিটি বর্ণ যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হইয়া উহার

শোভাবর্ণন করে। অন্যথা করিলে সমাজে বিপর্যয় আসিয়া পড়ে। বাহ্য ভেদের জন্য ক্ষতি হয় না, অভেদদৃষ্টি মলিন হইলেই ক্ষতি হয়। স্ত্রীলোকেরা গহনার গড়নের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া স্বর্ণে সাবধান দৃষ্টি রাখে না। স্বর্ণকার কিন্তু স্বর্ণেই সাবধান দৃষ্টি রাখে। এইরূপ আত্মাদিগকেও ভেদের মধ্যে অভেদ ঈশ্বরে সাবধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঠিক্ ঠিক্ স্বধর্ম পালন করিলে অভেদ-দৃষ্টি (ঈশ্বরে দৃষ্টি) উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। ব্যাবহারিক জগতে ভেদ মূছিয়া ফেলা যাইবে না, আবশ্যকও নাই। যেহেতু মিথ্যা ভেদ, সত্যবস্তুর হানি করিতে পারে না।

শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান্‌ই সৃষ্টিকার্য্য-নির্বাহ করিবার জন্য মায়াশক্তি দ্বারা নিজেকে চারিটী বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভগবানের সমাজদেহে এই চারিটী বর্ণ চারিটী অঙ্গ-স্বরূপ। সমাজে এই চারিটী বর্ণের প্রয়োজনও আছে, কাহারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। ইহারা যদি পরস্পর হিংসা, ঘৃণা ও বিবাদ করে, তবে সমাজদেহের ধ্বংস হয়। মনুষ্য সমাজকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য ভাগী, চিত্তাশীল ব্রাহ্মণের, ক্ষত বা অনর্থ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য শূদ্র কৃষ্ণের, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য বৈশ্যের এবং সেবার জন্য শূদ্রের প্রয়োজন আছে। পুনর্জন্মবাদী হিন্দুশাস্ত্রমতে এই বিভাগ বংশগত হওয়ায় পূর্বে প্রত্যেক বর্ণই অন্যদিকে চিত্তকে বিকল্প না করিয়া আপন আপন বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিত এবং নিষ্কামভাবে আপন আপন স্বধর্ম পালন করিয়া শেষে সকল বর্ণই মূর্তির অধিকারী হইত। ইহা ভগবান গীতায় “স্বৈ স্বে কৰ্মণ্যভিহতঃ সংসিদ্ধিঃ লভতে নরঃ” (১৮।৪৬) অর্থাৎ ‘মানুষ স্ব স্ব ধর্ম ধর্ম পালন করিয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে’ ইত্যাদি বাক্যে দেখাইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগণেরই মূর্তি একচেটিয়া ছিল না। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে বৃত্তি-সাম্প্রদায়িক প্রভাৱ দেওয়া হইত না। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ” (গীতা, ৩।৩৫) অর্থাৎ ‘স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়ের কারণ।’ “শ্রোতান্‌ স্বধর্মো বিদগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ” (১৮।৪৭) অর্থাৎ

‘পরধর্মের সুন্দরভাবে আচরণ অপেক্ষা স্বধর্মের অঙ্গহীন আচরণও শ্রেয়ঃ।’
‘স্বধর্ম’ কথার বর্ণপ্রতিমভিন্ন অন্যরূপ অর্থ করিতে গেলে, গীতার কথার মধ্যেই
সামঞ্জস্য রাখা যাইবে না !

পূর্বের প্রত্যেক বর্ণই ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশ্যে আপন আপন কর্তব্য করিয়া
যাইত। কে বড়, কে ছোট, কে উচ্চ, কে নীচে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইত না,
কারণ কল্পিত বড়, ছোট, উচ্চ, নীচ স্বীকার না করিলে ব্যবহারই সম্ভব হয় না।
সকলের দৃষ্টি প্রধানভাবে সত্যস্বরূপ ভগবানে নিবদ্ধ থাকায় অহংকার, ভেদ-দৃষ্টি,
ভোগস্পৃহা প্রভৃতি প্রবল হইতে পারিত না। কিন্তু কালপ্রভাবে যতই ঈশ্বর-বিষয়ক
দৃষ্টি আবৃত হইতে লাগিল, ততই অহংকার, লোভ, স্বার্থবৃত্তি পরস্পরের উপর
ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি দোষ সমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দু-জাতির
পতনের জন্য সকল বর্ণই দায়ী। মূল সূত্র হারাইয়া সমাজে এই যে সবদোষ আঁসি-
য়াছে ঐ গুলিই পরিত্যাজ্য। শাস্ত্রোক্ত বর্ণপ্রতিমাবিবান পরিত্যাজ্য নহে। এই প্রসঙ্গে
বলিয়া রাখি বৌদ্ধধর্মে যে অহিংসার বাণী প্রচারিত হইয়াছে, উহা হিন্দু-শাস্ত্রেরই
কথা। কিন্তু অহিংসা সমদর্শনলাভের একটী সাধনমাত্র। উহার উপর বৌদ্ধ
দিয়া বৌদ্ধধর্মে সমদর্শন কাটিয়া গিয়াছে এবং দেশের ক্ষাত্রশক্তি দুর্বল হইয়া
পড়ায় ভারতের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু বৈদিকধর্মে ‘হিংসা ও অহিংসার মধ্যে
সমভাবে অবস্থিত ভগবানে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সমদর্শন—ইহার
মধ্যে ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। সেইজন্য হিন্দুর দেবতার হস্তে যেমন শংখ ও
পদ্ম আছে তেমনই গদা ও চক্র আছে—‘পরিচাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ
দুঃকৃতাম্।’ গীতা, ৪।৮।

এই যে অধুনা এত উদারদৃষ্টি, সাম্য, একতা ও শান্তির বাণী প্রচারিত
হইতেছে তথাপি দিন দিন নূতন নূতন দল, উপদল গজাইতেছে কেন? জগতে
কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না কেন? পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ
কেন? কেন সহস্র সহস্র নিরপরাধ লোকের উপর বোমাবর্ষণ করিয়া উহাদিগকে
ধ্বংস করা হয়? মূল ব্যাধি কোথায়? মূল ব্যাধি না ধরিয়া হাতুড়ে চিকিৎসার

স্বারা উহার প্রতিকার হইবে না। আমরা বর্ণি, ধর্মহীন শিক্ষা ও ঈশ্বরদৃষ্টি-
বর্জিত ভাবই এই সকল অশান্তির কারণ। অন্যদিকে হিন্দুজাতি ক্ষয় পাইতেছে
ভাবিয়া হিন্দুদের গঙ্গাযাত্রা করাইয়া দল বাড়াইলেও কোন ফল হইবে না।
শাস্ত্রের দৃষ্টি-পাণ্ডরে প্রকৃত ধার্মিক বলিয়া প্রমাণিত অতি অল্প হিন্দু বাঁচিয়া
থাকিলেও আবার আধ্যাত্মিক হিন্দুজাতি রাহুমুগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ দীপ্তিতে
প্রকাশিত হইয়া জগতে শান্তিধারা বিকীরণ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আর এই যে বলা হয়, কালগতির তালে পা ফেলিতে না পারিলে আমরা
ধ্বংস হইব, তদন্তর বলি, মূল সুর ও মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া এই যে বেতাল-নৃত্য
চলিয়াছে (কেহ যখন এক সুরে গান আরম্ভ করিয়াছে, তখন অপরে অন্য সুর
জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ যখন একদিকের পা উঠাইতেছেন, তখন অপরে সেই পা
ফেলিতেছে—কেহ গগতন্তরী, কেহ সমাজতন্তরী, কেহ কম্বানিষ্ট আরও কত কি)
ইহার কোন সুরে সুর মিলাইব বা কোন তালে পা ফেলিব, আমরা ইহা ঠিক
করিতে পারি না। তাই দক্ষযজ্ঞের এই বেতালনৃত্যে আমরা শান্ত, অদ্বৈত
শিবের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়ঃ মনে করি এবং তাহার আশ্রয়েই আমরা মৃত্যুকে
অতিক্রম করিব, এই দৃঢ় বিশ্বাসও আমাদের আছে। মূল সুরে দৃষ্টি না থাকিলে
কিরূপে এক্যতান্বাদন সম্ভব হইবে?

প্রঃ—আচ্ছা নিজেকে হিন্দু ভাবা ত সম্পর্কিত, উহা অপেক্ষা নিজেকে
মানুষ ভাবাই ত উদারতা। ঠিক কথা, আবার নিজেকে মানুষ না ভাবিয়া জীব
জবা আরও উদারতা আর নিজেকে ব্রহ্মভাবনা করা সর্বাপেক্ষা উদারতা।
সেই উদার দৃষ্টি আসুক ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত
স্বাই শক্ত। উদারতা ক্রমশঃ সাধনাদ্বারা লাভ হয়, উহা গাছের ফল নয়, যে
ফুড়িয়া পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে সেই উদারতা যাহাতে লাভ হয়, সেই
উপায় দেখান হইয়াছে। আত্ম ব্রহ্ম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে মানুষ ভাবাও
সম্পর্কিত। কেন্‌টীই বা আমার দেশ, কোন্‌টীই বা আমার দেশ, “স্বদেশো
ভবন্তরয়ম্”—অমপূর্ণাভ্যুত (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) কিন্তু ইচ্ছা-উদারতা ভাল নয়।

যখন দেখি কোন ব্যক্তি বাড়ীতে তার মা বাপের সেবাযত্ন করে না, অথচ দেশ-সেবার বড় কাজে লাগিয়া যায়, তখন তাহার উদারতায় সন্দেহ হয় যে, এই ব্যক্তির উদারতার অন্তরালে সস্তায় নিজের নাম কিনিবার ও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আছে। এইরূপ তাহার হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া হিন্দুত্বের সম্মান না দিয়া মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে যান, তাহাদের এই উদারতা আমাদের সন্দেহ ও ভয়ের উদ্রেক করে।

প্রঃ—আমাদের দেশে এত দুনীতি, চুরি, প্রতারণা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বাড়িল কেন?

উঃ—আধুনিক ভোগমুখীন ধর্মবিশিষ্ট শিক্ষাই উহার মূল কারণ। আরও কারণ দেশের দারিদ্র্য, অন্নবস্ত্রের সংস্থান না করিতে পারা, উপায়ের পথ না পাইয়া যুবকগণের বেতার অলস জীবনযাপন, নীতিশিক্ষাহীন ছাত্রাচরণের দর্শন বাজেনভেল পাঠ ইত্যাদি। আজ যে সকল নেতা দুনীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির নিন্দা করিতেছেন, উহাদের অনেকেই দেশে এই-ভাবসূচীর জন্য দায়ী। কারণ তাহাদের ধারণা ‘ধর্ম’ ‘ধর্ম’ করিয়াই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে, আমরা জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছি না। সেইজন্য তাহারা দেশে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করেন নাই। অপরপক্ষে শাস্ত্রবিশ্বাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অহংকারবশে গোড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। অবজ্ঞাতরে পণ্ডিতগণের কথা শোনা হয় নাই বা তাহাদের বক্তব্য বলিতে দেওয়া হয় নাই। যুক্তি-বিচারের আশ্রয় না লইয়া জোর করিয়া তাহাদের সভাসমিতি ভাঙ্গিয়া দিতে ছেলদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে অদূরদর্শী নেতা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য ছেলদিগকে মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজনদের বাক্যও অমান্য করিতে শিখাইয়াছেন। তাহাদের অদূরদর্শি তার ফলে দেশে যে কুফল ফলিতেছে এখন উহার নিন্দা করিলে চলিবে কেন? তাহারা কি নিঃস্বফলের বীজ বপন করিয়া উহা হইতে ন্যাংড়া আমের আশ্বাদের আশা করেন? আবার দেশে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করুন, নিজেরা আচরণ করিয়া ছেলদিগকে বাল্যকাল হইতে

ধর্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করুন—আম্রফলের বীজ বপন করুন, কিছুদিন পরে উহার ফলের মধুর আম্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহা দ্বারা দেশে দুর্নীতি, চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি স্বতঃই কমিয়া যাইবে। আর লোকে যাহাতে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল দেশের অনেক সুধী ব্যক্তি দেশে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। বিলম্ব হইলেও ইহা দেশের পক্ষে মূলক্ষণ।

প্রঃ—অনেকে বলেন, স্বার্থপর স্বাক্ষগগণ হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহাতে নিভেদের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে কি বলেন?

উঃ—এই প্রকার উক্তি মূর্খতাপ্রসূত। হিন্দুর মূল শাস্ত্র বেদ, উহাকে হিন্দুগণ অপৌরুষেয় মনে করেন অর্থাৎ উহা মনুষ্যসৃষ্ট নহে। মনু আদি সম্যগ-দর্শী ঋষিগণ বেদোক্ত দ্বারা হইতে বিচ্যুত না হইয়া মানব সমাজের কল্যাণের জন্য বিবিধনিষেধমূলক, স্মৃতি-শাস্ত্রসকল প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন দেশের রাজশক্তি, অশ্বশক্তি, ধনসম্পদ স্বাক্ষগদের হাতে ছিল না, উহা অন্য বর্ণের হস্তে ছিল। ইহা সত্ত্বেও অন্য বর্ণ স্বার্থপর স্বাক্ষগগণদ্বারা প্রণীত শাস্ত্রবিধানমানিয়া লইলেন কেন? কোন্ শক্তির নিকট তাঁহারা হস্তক অবনত করিলেন? যদি বলা যায়, তাঁহাদের নির্দোষতাই উহার কারণ উহা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। যেহেতু আগেকার ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বর্ণের মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহারা সুসংস্কৃতভাবে রাজ্যপালন করতেন, যুদ্ধ, ব্যবসাবাণিজ্যাদি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিবৃদ্ধি ভাবাই নির্দোষতা পুণ্যে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে অনেকে অন্তরে ত্র্যগকে বড় রাখিয়া বাহিরে ভোগ করিয়া যাইতেন। অন্যবর্ণের মধ্যেও এই ভাব ছিল সেই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ ত্যাগী স্বাক্ষগগণকে বা তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রসকলের বিধানকে মর্ধ্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঐ সকল শাস্ত্রবিধানে যে মনুষ্যসমাজের কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, উহা স্বার্থদুষ্ট নয়, ইহা ঋষিগণের মত বৃদ্ধি তাঁহাদের ছিল। তাঁহারা জানিতেন, সম্যগদর্শন ও স্বার্থপরতা পাশাপাশি বাস করে না। স্বার্থপরতাদুষ্ট বৃদ্ধিদ্বারা ঋষিগণকে বিচার করা

যায় না ; যদি কালগতির জন্য সমাজ ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আবশ্যিক হয়, তবে উহার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ধার্মিক পণ্ডিতগণের সহিতও পরামর্শ করা কর্তব্য :

এখনকার দিনে বর্ণপ্রতিষ্ঠার কথা অনেকের নিকট শ্রুতিকটু শুনাইবে। এখন হিন্দুধর্ম বা শাস্ত্রের নাম করাও যেন সাম্প্রদায়িকতা। তাই আমরা বৈদিকধর্ম ও ঋষিগণকে আড়াল করিয়া এখন বৌদ্ধধর্মের মহিমা-প্রচারে ব্যস্ত। রামরাজ্যের কথা ক্রমশঃ চাপা পড়িতেছে। কারণ রামরাজ্য মানিতে গেলে আবার বর্ণপ্রতিষ্ঠার কথা আসিয়া পড়ে। রামায়ণে দেখা যায়, রামরাজ্যে বর্ণপ্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই উহা আদর্শ রাজ্য ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় আমাদের নানাপ্রকার বিপর্যয়বৃদ্ধি আসিয়াছে এবং আমরা অজ্ঞতাবশতঃ উদার হিন্দুধর্মকে জগতের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিতেছি। মনে রাখা উচিত বাহ্য জগতের স্তম্ভীগণ হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হইতেই হিন্দুর স্বরূপ বুদ্ধিবার চেষ্টা করিবে, আধুনিক ভাবাপন্ন কোন নেতার বক্তৃতা হইতে উহা করিবে না। সুতরাং হিন্দুর বর্ণপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত তাৎপর্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যতক্ষণ সমাগ-দর্শন না হয়, ততক্ষণ যে প্রকার কর্মই আমরা করি না কেন, উহা অহংকারযুক্ত ও বাসনাদোষদুষ্ট হইবেই। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বিবেক বা যুক্তি মোহশূন্য হয় না। ঈশ্বরে অযুক্ত ব্যক্তির যুক্তি ঠিক হয় না। সেই জন্য যাহা আমাদের অহংকার ও বাসনার অন্তর্কূল হয়, উহাকেই আমরা যুক্তিযুক্তি মনে করি এবং উহাদের প্রতিকূল হইলে উহা গ্রহণ করিতে চাই না।

কোন স্থানে কতকগুলি লোক প্রত্যহ গঙ্গাপার হইয়া অপর পারে নেশা করিতে যাইত। একদিন সন্ধ্যায় উহারা গঙ্গা-তীরে আসিয়া দেখিল, কোন নৌকা নাই। তখন ‘শীঘ্র নৌকা আসিবে’ এই আশায় উহারা তীরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—‘ভাই! সম্বাপেক্ষা বীর কে?’ কেহ বলিল অজ্ঞান, কেহ বলিল ভীষ্ম, কেহ বলিল রাবণ, ইত্যাদি এবং আপন আপন উক্তি যুক্তির দ্বারা সমর্থনও করিল, কিন্তু অন্য

সকলের উহা মনঃপূত হইল না। অবশেষে একজন বলিল,—‘হনুমান্ সৰ্ব্বাপেক্ষা বীর’। সকলে ভিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন’? সে বলিল ‘দেখ ভাই! রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ লক্ষণ মারা পড়িল। হনুমান ছুটিল গঙ্গামাদন পৰ্ব্বতের দিকে বিশল্যাকরণী আনিতে। সেখানে গাছ চিনিতে না পারিয়া সমস্ত পাহাড়টাকেই মাথায় করিয়া লইয়া আসিল। কাজ শেষ হইলে আবার মাথায় করিয়া সেখানকার পাহাড় সেখানেই রাখিয়া আসিল। আর বাটা ভগ্নীতথ! তাই পূৰ্ব্বপরগণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে আনিল। কাজ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন যেখানকার গঙ্গা সেখানে রাখিয়া আয়।’ তখন সকলের অনুকূল হওয়ায় সকলে উহার যুক্তি মানিয়া লইল এবং হনুমান্কেই শ্রেষ্ঠ বীর স্বীকার করিল। এইরূপ শাস্ত্রসকল বিধিনিষেধের দ্বারা আমাদের অহংকার ও কামনার বাধা উৎপাদন করে বলিয়া আমরা উহাদিগকে ঋষিগণের নিকট ফিরাইয়া দিতে চাই। অথচ হিন্দুও থাকিতে চাই—ইহাই কলিকৌতুক।

যাহা হউক আমরা এই বর্ণাশ্রমধর্মমধ্যে হিন্দুজাতির বাঁচবার উপায় দেখিতে পাই। এবং আধ্যাত্মিক হিন্দুজাতি বাঁচিলে উহার মধ্যে ভগবতের কল্যাণেরও পথ দেখিতে পাই। বর্ণাশ্রমধর্মকে আমরা পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া উহাকে সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক মনে করি না, বরং উহার মধ্যে সৰ্ব্বব্যাপক উদার ভগবান্কে দেখিতে পাই বলিয়া উহাকে ভগবদ্মুক্তিবোধে গ্রহণ করি। সেইজন্য সংক্ষেপে এখানে উহার বিষয় বলা হইল। বর্ধমান পাঠক উহা হইতেই হিন্দু-ধর্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন।

‘ব্রহ্ম বহুং ভাজৌ ক্ষত্রং কণ্ঠসমুদরং বিশঃ।

পাদৌ যস্যাপ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাশ্রমে নমঃ’।

ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ—মহাভারত।

অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণ বাঁহার মূখ, ক্ষত্রিয় বাহুদ্বয়, বৈশ্য উরুদ্বয় এবং উদর এবং শূদ্র বাঁহার পাদাশ্রিত সেই কাশ্মী ভগবান্কে নমস্কার’।

“য একোহবর্ণে বহুধা শক্তিযোগাদ্, বর্ণানেকান্ নিহিতার্থে দধতি ।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বাদৌ স দেবঃ, স নো বধ্যা শ্ভয়া সংযদনকু” ।

(শ্বেতাস্বতর ৪।১)

অর্থাৎ ‘সৃষ্টির পূর্বে’ যিনি এক অবর্ণ (ব্রাহ্মণাদি ভেদরহিত) ছিলেন, সৃষ্টিকালে যিনি মায়াশক্তিযোগে অনেক বর্ণের বিধান করেন, প্রলয়ে যিনি জগৎ জয় করেন, সেই দেবতা (দ্যুত্ৰিশীল পরমাত্মা) আমাদেরকে শ্ভবদ্বন্দ্বি যুক্ত করুন ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ । হরিঃ ওঁ তৎসৎ ।

— — —

দেবাসুরতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্ব

‘দৈব সম্পদ’ বিমোক্ষায় নিবন্ধ্যাসুরী মতা । গীতা ১৬ ৫

ভগবান্ বলিলেন, ‘দৈবী সম্পদ’ মূক্তির কারণ এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ ।

প্রাণিগণের যে দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী এই তিন প্রকার প্রকৃতি আছে, ইহা গীতার নবম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে এবং ষেড়শ অধ্যায়ে উহাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিই সংসারমোক্ষের কারণ এবং আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বন্ধনের কারণ । অভয়, সন্তুষ্টি, জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ত্যাগ পরনিন্দার বর্জন, ক্রোধশূন্যতা, দয়া, নিলোভিতা, মৃদুতা, কৃকর্ষ্ম, লজ্জা, তেজ ক্রমা, ধৈর্য্য, অহংকারশূন্যতা, প্রভৃতি দৈবী সম্পৎ । আর দন্ত (বশ্মবর্জিত), দর্প, (গর্ব) অভিমান ক্রোধ প্রভৃতি যাহারা দৈবী সম্পদের বিপরীত উহারা আসুরী সম্পৎ । আসুরী সম্পদের ভেদ অনন্ত । ইহাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভই প্রধান । অন্য আসুর সম্পদগুলি ঐ তিনটির অন্তর্গত । সুতরাং ঐ তিনটী আসুররাজকে জয় করিতে পারিলে উহাদের সৈন্যগণকে সহজেই জয় করা যায় ।

মানবপ্রকৃতি শাস্ত্রার্থ আলোচনার্জনিত জ্ঞানদ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মদ্বারা দীপ্যমান হইলে তাহাকে দৈবীসম্পৎ বলে । লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্ম-জর্নিত যে বিষয়বাসনা, যে বাসনা বিষয়শক্তি প্রবল করে এবং প্রবৃত্তিমার্গে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের পথে লইয়া যায়, তাহার নাম আসুরী সম্পৎ ।

বৃহদারণ্যক বলেন—“দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাচ্চাসুরাশ্চ । ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাশ্চ এষ লোকেষ্ অস্পর্শত তে হ দেবা উচুহঁতাসুরান্যশ্চ উগীষেনাতায়ামেতি” । ১।৩ । অর্থাৎ প্রজাপতির পুত্রগণ দুইপ্রকার—দেবতাগণ

ও অসূরগণ উহাদের মধ্যে অসূরগণ কনিষ্ঠ ও দেবগণ জ্যেষ্ঠ। উহারা এই লোকসমূহে ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্য পরস্পর স্পর্ধা বা বিবাদ করিয়াছিল। দেবতারা বলিয়াছিলেন ‘আমরা যজ্ঞে উৎগীথ (বেদগান) দ্বারা অসূরগণকে পরাস্ত করিব’। দেবতাগণ দৈবীসম্পদ-বিশিষ্ট এবং অসূরগণ আসুরী সম্পদ-বিশিষ্ট। অসূরগণ নিজ নিজ ‘অসু’ বা প্রাণে রমণ করে বা ভোগে আসক্ত হয় এবং দেবভাবের বিপরীত ধর্মাবলম্বী হয়। অগ্রেই লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্মনিষ্ঠানের উদয় হয় বলিয়া অসূরগণ জ্যেষ্ঠ। আর শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রমত কর্ম বহু ঝিলস্বে জন্মে বলিয়া দেবগণ কনিষ্ঠ। আসুর প্রকৃতিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল ও উন্মুক্তদ্বার, দেবপ্রকৃতি উহার বিপরীত। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকাধীন নিরোধের বিরোধবশতঃ ইহলোক এবং পরলোক লক্ষ্য করিয়া স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান-বিষয়ে প্রজাপতির শরীরস্থিত দেবাসূরগণের পরস্পর স্পর্ধা বা বিবাদ হইয়াছিল। এ স্থলে স্পর্ধা শব্দের অর্থ দেবপ্রকৃতি এবং আসুর-প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একের বৃত্তির উদ্ভব অন্যবৃত্তির অভিভব। কখন শাস্ত্রাভ্যাস জন্য জ্ঞান ও কর্মের ভাবরূপিণী ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন সেই বৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সময় প্রতাক্ষ ও অনুমানজন্য কর্ম ও জ্ঞানের ভাবনারূপিণী স্বাভাবিকী আসুরী বৃত্তি অভিভূতা হয়। এই অকস্মাত দেবতার জয় ও অসুরের পরাজয় হয়। আবার যখন আসুরী-বৃত্তির প্রভাবে দৈবী-বৃত্তি অভিভূতা হয়, তৎকালে অসুরের জয় ও দেবতার পরাজয় হয়। ইন্দ্রিয়-দেবতার জয় হইলে ধর্মের আধিক্য-নিবন্ধন, প্রজাপতি-পদপ্রাপ্তি-পর্যন্ত জীবের উৎকর্ষ লাভ ঘটে ও অসুরের জয় হইলে অধর্মের প্রাবল্যে শ্রাবরযোনিলাভ পর্যন্ত অপকর্ষ ঘটে। ধর্মধর্মের সমতান্ধলে মনুষ্যযোনি লাভ হয়।

দেবতাগণ সম্বন্ধে প্রধান, উহাদের মধ্যে রজঃ তমোগুণও আছে, তবে উহারা অপ্রধান। এইরূপ অসূরগণও রজঃ ও তমঃ প্রধান, সত্ত্বগুণও আছে, তবে উহা অপ্রধান। প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট বস্তুমাতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকিবেই, যেহেতু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মকা। দেবতাগণ মিশ্রসত্ত্ব সেইজন্য রজঃতমোরূপ অসূর-

স্বারা আক্রান্ত হন । বিবেকচূড়ামণিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন :—

“মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ, অমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদাঃ ।

শ্রদ্ধা চ ভক্তিঞ্চ মৃদুক্ষুভা চ, দৈবী চ সম্পত্তিসম্ভিবর্জকঃ” ॥ ১২২ ।

অর্থাৎ ‘অমানিতাদি গুণ, নিয়ম, যমাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মৃদুক্ষুভা, দৈবীসম্পত্তি অসংকর্মে নিবৃত্তি এইগুলি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম’ : দেবতাগণ মিশ্রসত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের, ‘আমি ইন্দ্র’ ‘আমি অগ্নি’ ইত্যাদি প্রকার বিশেষ বিশেষ শক্তির উপর অভিমান আসিয়া পড়ে । তথাপি সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ উঁহারা বৃত্তিতে পারেন যে, ঐ অহংকাররূপ অস্বরভাব বন্ধন ও দুঃখের কারণ এবং ঐ অস্বরভাব জয়ের জন্য তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন । চণ্ডীতে আছে যে দেবী চণ্ডী দেবগণের শক্তির সমষ্টিবিশূদ্ধা : ইহার অর্থ এই যে দেবগণ অস্বরনাশের জন্য নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের অভিমান বিসর্জন দিয়া এক হইয়াছিলেন । তখন দেবগণের সত্ত্বশক্তির সমষ্টিভূতা শুদ্ধসত্ত্বরূপা ভেদদর্শনকারিণী বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইনিই চণ্ডীদেবী । ঐ শক্তি অসংখ্য ভেদদর্শনরূপ অস্বরসৈন্যকে বিনাশ করিয়াছিল । পরেরজঃ ও তমোরূপ শুদ্ধতত্ত্বনিশ্চয়কে বধ করিয়া জগৎকে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ঈশ্বরদ্বৈতে স্থাপিত করিয়াছিল, ইহাই জগতের স্বাচ্ছন্দ্যলাভ । যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় না, বাহা নির্লিপ্তস্বভাব ইহাই শুদ্ধসত্ত্ব । ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা স্বেচ্ছন্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন । অস্বররাজগণের দুইটী দুইটী নাম দেখা যায়, যেমন শুদ্ধ নিশ্চয়, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুভকর্ণ — ইহারা ই রজঃ ও তমঃ । রাবণ রজঃ, কুভকর্ণ তমঃ । অস্বরগণ বিপদে পড়িলেও রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যবশতঃ শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ অহংকারের উপর নির্ভর করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

যজ্ঞদ্বারা অস্বরভাবকে অতিক্রম করিতে হয় । দেবতারা অস্বরগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘আমরা যজ্ঞে উৎসীধদ্বারা অস্বরগণকে পরাস্ত করিব’ । তখন তাঁহারা বাগ্‌মন্ত্রের দেবতাকে বলিয়াছিলেন, ‘তুমি আমাদের জন্য উৎসান কর’ । বাগ্‌দেবতা বাক্যদ্বারা যে ভোগলাভ হয়, উহা সর্ধ দেবতা

ভোগ করুক এবং যাহা কল্যাণরূপ শব্দবাক্য তাহার নিজের জন্য থাকুক, এইভাবে উৎসান করিয়াছিলেন। ‘দেবতাগণ উৎসানদ্বারা আমাদিগকে পরাস্ত করিবে’ অসুরগণ ইহা জানিতে পারিয়া দ্রুত গমন করিয়া বাক্‌দেবতাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেইজন্যই বাক্‌দেবতার উক্তপ্রকার স্বার্থবর্ধি আঁসিয়াছিল। সুতরাং দেবতাগণ বাক্‌দেবতার সেই উৎসানদ্বারা অসুরভাব হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হন নাই। অনন্তর চক্ষু ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ ও মনের দেবতা যথাক্রমে উৎসানে প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণ উর্হাদিগকেও পাপদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিল, উহারাও সমস্ত দেবতাকে অসুরভাব হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষে মূখ্যপ্রাণ উৎসানে প্রবৃত্ত হইলে অসুরগণ তাহাকেও আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাকে পাপদ্বারা বিনষ্ট না করিতে পারিয়া নিজেরাই বিনষ্ট হইল। এই দেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ স্কাযভাবে রূপাদি দর্শন করে, সেইজন্য উহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে ও মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত হয়। সেইজন্য সুষুপ্তির ক্ষোড়ে উহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। প্রাণ কিন্তু নিষ্কামকর্মী—উহা স্বাসাদিগ্রহণ বা ত্যাগ কোন কামনা-পূর্বক করে না, সুতরাং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে না এবং সুষুপ্তির ক্ষোড়ে উহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য দেবতা প্রাণদেবতার অধীন। প্রাণ উৎসান্ত হইলে অন্যান্য দেবতা দেহে অবস্থান করিতে পারেন না। ইনি আগ্নিরস, অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গের রস এবং বৃহস্পতি অর্থাৎ বাক্যসকলের পতি, যেহেতু বাক্য-সকল প্রাণসাহায্যেই উচ্চারিত হয়। (বৃহদারণ্যক)। প্রাণের এইসকল মহিমা থাকায় উপনিষদে প্রথমে প্রাণের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। প্রাণের উপাসনাদ্বারা শব্দর্শচিস্ত পদার্থই ‘প্রাণেরও প্রাণ’ পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারেন।

মূখ্যপ্রাণই হিরণ্যগর্ভ—ইনি দেবতাগণের পতি, ইনিই সকল দেবতা ও আসুৰশক্তির উৎপত্তির কারণ। প্রাণদেবতার সাহায্যে যখন অন্যান্য দেবতাগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন বাক্‌দেবতা বিরাটদেহিগ্ৰীত অগ্নিরূপে, চক্ষুর দেবতা আদিত্যরূপে মনের দেবতা চন্দ্রমারূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

অন্যান্য দেবতাগণও তাঁহাদের স্বকীয় রূপ ফিরিয়া পাইলেন । (বৃহদারণ্যক) ।
 ঈশ্বরের খিরাটদেহে যে দেবতাগণ অধিদেব, উহারাই আমাদের ব্যাণ্টদেহে
 আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হন । আমাদের দেহে অহংকাররূপ অসুর-
 ভাবদ্বারা আক্রান্ত হইয়া উঁহারা ক্ষুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । ঐ দেবতাগণ আমাদের
 দেহে অহংকাররূপ রাবণের কবলে পড়িয়াছেন, তাই তাঁহাদের স্বীয় দেবস্বভাব
 সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে । যজ্ঞ বা ঈশ্বরের ষড়নদ্বারাই উঁহারা নিজের স্বরূপে
 পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন । ঈশ্বরেষ্টে কোন বশন নাই—ঈশ্বরেষ্টে
 স্বভাবতঃই যজ্ঞ চলিতেছে । যজ্ঞদ্বারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—সৃষ্টি, স্থিতি
 লয় করেন । যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয় । জগৎময় এই আহুতিপ্রদান কার্য
 চলিতেছে ও যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে । যাহা কিছু আহুত হয়, উহা অন্ন বা সোম ।
 যাহাতে অন্ন আহুত হয়, উহা অগ্নি বা অন্নাদ বা অন্নের ভক্ষক । বিশ্ব অগ্নী-
 সোমাক্ষক । রূপাদি বিষয় অন্ন, ইন্দ্রিয়গণ অগ্নি, যেহেতু রূপাদি বিষয়সকল
 ইন্দ্রিয়ে আহুত হইতেছে । রূপসকল চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আহুত হইয়া উহার সহিত একতা
 প্রাপ্ত হয়—“সর্থেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবম্” ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক) : ২৪।

রূপসকল শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি বহু প্রকারের । কিন্তু চক্ষু একরূপে খাবিয়া
 সকল রূপ প্রকাশ করে, উহার জন্য শ্বেত বা লোহিত হইয়া যার না । যাহা
 সকল রূপকেই স্থান দিতে পারে, উহাই রূপসামান্য বা শূন্য রূপতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব-
 প্রকাশক দেবশক্তি বা রূপতন্মাত্র । ঈশ্বরেষ্টে স্থিত ঐ দেবতা ‘আমি’ ‘আমার’
 রূপ অস্বরভাবদ্বারা আক্রান্ত হইয়া রূপে আসক্তি বা শ্বেষ করিয়া থাকেন । পূর্বে
 প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দেবতাগণও স্বভাবতঃ শূন্য হইলেও অস্বরভাবদ্বারা
 আক্রান্ত হইয়া ক্ষুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইন্দ্রিয়ের দেবতাগণ মনদেবতায় আহুত
 হইয়া উহার সহিত একতা প্রাপ্ত হন । মন, মহামনে আহুত হইয়া উহার সহিত
 একতা প্রাপ্ত হয় । সূতরাং বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ের অন্ন, ইন্দ্রিয়গণ অন্নাদ । আবার
 মনের তুলনায় ইন্দ্রিয়গণ অন্ন, মন অন্নাদ । মহামনের তুলনায় মন অন্ন, মহামন
 অন্নাদ । পরমাত্মার তুলনায় সকলই অন্ন, পরমাত্মা অন্নাদ । পরমাত্মাই মূল অগ্নি

যাহাতে জগতের সকল বস্তু আহুত হইতেছে । যজ্ঞের জন্য কাণ্ঠে কাণ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয় । আতরযজ্ঞে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন :—

“স্বদেহমরুণিং কৃশ্বা প্রণবণ্ডোক্তরুণিম্ ।

ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ, দেবং পণোমিগুড়বৎ” । ১।১৪ ।

‘যোগিপদ্রুশ নিজের দেহকে নিম্ন অরুণি (যজ্ঞকাণ্ঠ) এবং প্রণবকে উপরের অরুণি কম্পনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মথনের সাহায্যে সুপ্রকাশ পরমাত্মাকে (কাণ্ঠস্থিত নিগুঢ় অগ্নির ন্যায়) দর্শন করিবেন ।’ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইলে আহুতি দিবেন কোথায় ? গীতা বলেন :—

“সর্বাণীন্দ্রিয়-কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে” ॥ ৪ ২৭ ।

অর্থাৎ ‘অপর জ্ঞানযোগীগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণের কর্মসকলকে জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন’ ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পণ্ডাগ্নিবিদ্যায় দেখান হইয়াছে যে বেদোক্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যাগণ কিরূপে দেবতাগণকর্তৃক আহুত হইয়া ক্রমশঃ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন এবং কিরূপে পুনঃক্ষয়ে দেবতাগণ-কর্তৃক পুনর্জন্ম, পৃথিবী, পদ্রুশ, যোষিৎ প্রভৃতি অগ্নিতে আহুত হইয়া সংসাবে প্রত্যাবর্তন করেন । গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ হইতে ১৫ শ্লোক পর্য্যন্ত যজ্ঞদ্বারা কিরূপে জগজ্জরু চলিতেছে, উহা দেখান হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বাদশ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে । আমাদের ব্যষ্টিদেহেও যজ্ঞ চলিতেছে । নাভিতে বৈশ্বানর অগ্নি রহিয়াছেন । আমরা যাহা কিছুর আহার বা পান করি, তাহা ঐ অগ্নিতে আহুত হয় । ঐ বৈশ্বানর অগ্নি চন্দ্রাদি দেবতার যজ্ঞভাগ যথাস্থানে পেঁছাইয়া দিতেছেন, উহাদ্বারা উহাদের তৃপ্তিসাধন ও পুষ্টি হইতেছে । তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—‘আহার করি মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে’ । গীতার ভগবান্ও বলিলেন :—

“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচামানং চতুর্দ্বিধম্” ॥ ১৫/১৪

অর্থঃ—‘আমি ভূত্বাশ্রিত হইয়া প্রাণিসকলের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপানে সংযুক্ত হইয়া চতুর্দ্বিধ (চক্ষু, চোষা, লেহ্য ও পেয়) অন্ন পাক করি ।’

যদিও এই প্রকারে আহারও একটী যজ্ঞ তথাপি ‘আমি আহার করিতেছি’ এই ভাবিয়া এবং লোভবশতঃ আমরা যজ্ঞ নষ্ট করি । উহা দ্বারা আমাদের অজীর্ণাদি রোগ হয় । কাষ্যকারণে লয় হইতে চায় । সূর্য্য হইতে নিঃসৃত রশ্মি যেমন স্বভাবতঃই সূর্য্যে ফিরিয়া যাইতে চায়, এইরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এই জগতের স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরমুখী গতি আছে । ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । কুস্তকার যেমন ঘটের নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরও এইরূপ চৈতন্যপ্রধান অংশে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান-কারণ, ঈশ্বরও এইরূপ জড় প্রধান অংশে জগতের উপাদান কারণ । যদিও জগতের স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বরমুখী গতি আছে, তথাপি আসুৰভাবদ্বারা ঐ গতি বাধা প্রাপ্ত হয় । আসুৰভাবের পরিহারকরতঃ যিনি বর্জিতে পারিয়াছেন যে ঈশ্বরদ্বৈতে স্বাভাবিকভাবে যজ্ঞ চলিতেছে, তাহার বাহিরে যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন নাই । তিনি দেখেন জগৎ একটী বিরাট যজ্ঞাগার । এখানে সততই যজ্ঞ চলিতেছে । চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি দেবতাগণ এই যজ্ঞে কখন হোতা, কখন আহুতি । সেই জ্ঞানী মহাত্মা দর্শন, শ্রবণ আত্মাদি যাহাই কিছু করুন না কেন, সবই তাহার নিকট যজ্ঞ । কিন্তু এই প্রকার উদার দৃষ্টি সকলে লাভ করিতে পারে না ; তাই তাহাদের অন্তরে ও বাহিরে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করা হয় । অগ্নি দেবতাগণের মূখ । অগ্নিতে শ্রাদ্ধসহকারে আহুত দ্রব্য অগ্নিদ্বারা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হয় এবং অগ্নি পৃথক্ পৃথক্ দেবতার যজ্ঞভাগ উহাদের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান । দেবতাগণ নৃশ্চত্বাক্ । মনুষ্যদ্বারা শ্রাদ্ধসহকারে নিবেদিত অন্নের সূক্ষ্মাংশ ভোজন করিয়া উহাদের তৃপ্তি ও পূর্ণি হয় । দেবতাগণও প্রতিদানরূপ মনুষ্যাগণকে বৃষ্টি, অন্ন, বিস্ত্র, পশু স্ত্রী প্রভৃতি প্রদান করিয়া

থাকেন। দেবভাগনের অনুগ্রহ-ব্যতীত মনুষ্যাগনের বাঁচবার উপায় নাই এবং দর্শন, শ্রবণ, মননাদি কৰ্ম করিবারও শক্তি থাকে না। দেবভাগনের নিকট হইতে মানুষ অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য মনুষ্যাগণ দেবভাগনের নিকট ঋণী। ঐ ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত মনুষ্যাগনের যজ্ঞ করা প্রয়োজন। তাই। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

“দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্যথ ॥” ৩:১১

অর্থাৎ ‘এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবভাগনকে ভাবনা করিবে সেই দেবভাগন তোমাদের পোষণ করিবেন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করিলে পরম কল্যাণ লাভ করিবে।’

কার্য্যকে কারণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই যজ্ঞ। কার্য্য অপেক্ষা কারণটী সূক্ষ্ম ও শূন্য। কার্য্যকে কারণে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই উহার শোধন। এইজন্য আমরা ক্ষিত্তিতত্ত্ব-প্রধান শরীরের অশুদ্ধি হইলে উহাকে ক্ষিত্তির কারণ জলদ্বারা শূন্য করি। জল অশুদ্ধ হইলে উহাকে উহার-কারণ অগ্নিদ্বারা শূন্য করি। পরমেশ্বর সকলের মূল কারণ বলিয়া উহাতে সব তত্ত্ব ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সকলের শোধন। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানে ক্ষিত্তিতত্ত্বকে জলে, জল তত্ত্বকে তেজে বা অগ্নিতে, তেজতত্ত্বকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে, আকাশকে অহংতত্ত্বকে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বকে পরমেশ্বরে ক্রমশঃ আহুতি প্রদান করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এক্ষণে অসুন্দরগণ কিরূপে যজ্ঞ নষ্ট করে, তাহা দেখুন। মনে করুন, একটী সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি রহিয়াছে, উহা ঈশ্বরসৃষ্ট। প্রথম দর্শনে উহার যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল, তাহা ঈশ্বরের বিভূতি। ঈশ্বরের বিভূতি চিত্তকে আকর্ষণ করে, ঈশ্বরকে ধরাইয়া দিবার জন্য। যদি ঐ স্ত্রী মূর্তিটী দেখিয়া এইপ্রকার চিন্তার উদয় হয়—‘আহা! এই সুন্দর স্ত্রী মূর্তিটীকে যিনি সৃষ্ট করিয়াছেন তিনি কত সুন্দর! স্ত্রী মূর্তিটী ভগবানের মহিমা প্রচার করিতে আসিয়াছে, আবার

তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইবে, উহাতে আমার অধিকার কি ?' 'এই যে সুন্দর ফুলটী হাসিতেছে, উহা সুন্দর ভগবানেরই মহিমা প্রচার করিতে আসিয়াছে, উহা ভগবানের চরণে অর্পিত হইতে চায়, আমি উহাতে লোভ করি কেন ?' তাহা হইলে যজ্ঞই চলিতে লাগিল । কিন্তু ঐরূপ চিন্তার উদয় না হইয়া যদি ঐ স্ত্রীমূর্তিটী বা ফুলটী ভোগের জন্য মন লালায়িত হয়, তবে অহংকাররূপ অসুর ও উহার চরণগণ দ্বারা যজ্ঞ নষ্ট হইল । প্রত্যেক কৰ্ম্মই ভাবনার গুণে যজ্ঞরূপে পরিণত হয় এবং ভাবনার দোষে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায় । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসৰ্য্য প্রভৃতি অসুরগণদ্বারা পদে পদে যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে । কেবলমাত্র ঈশ্বর শরণাপত্তি ও প্রবল পুরুষকারদ্বারা অসুরগণকে জয় করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । তাই বিবাহিত যজ্ঞসম্পাদন জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইয়াছিলেন ।

আমরা যে পূজা করি উহা ও যজ্ঞ । পূজা ঈশ্বরমুখীন । ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বব্যাপক । পূজায় খণ্ডভাব বিসর্জনপূর্বক অখণ্ড চৈতন্য ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হয় । সেইজন্য প্রথমেই আচমনমণ্ডে বিষ্ণুস্মরণ (সৰ্ব্বব্যাপক পরমাত্মার স্মরণ) করিতে হয় : 'আচমনে প্রক্ষালয়েৎ ভূতাবশেষম্' ইতি আচমনম্—অর্থাৎ ভূতাবশেষ মূখ হইতে প্রক্ষালন করার নাম আচমন । চক্ষুঃ, কণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ভোগের সংস্কাররূপ যে উচ্ছ্রষ্ট লাগিয়া আছে, আচমনদ্বারা ঐহাদগকে শৌথ করিতে হয় । চক্ষুঃ আনন্তি-পূর্বক রূপ দর্শন করিল এবং জীব অহংকার-পূর্বক রূপভোগ করিল অহংকাররূপ অসুরের আনন্তি বা লোভদ্বারারূপে যে শূন্যরূপ তাহা উচ্ছ্রষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট হইয়াগেল । উহার ফলে চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারে পুনরায় রূপ দর্শনার আগ্রহ থাকিয়া গেল । ঐ আনন্তিরূপ সংস্কারই চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারে সংলগ্ন উচ্ছ্রষ্ট । পূর্ণাঙ্গি-প্রকারে অন্য ন্য ইন্দ্রিয়দ্বারেও এইরূপ সংস্কাররূপ উচ্ছ্রষ্ট সংলগ্ন থাকে । ঐ সংস্কাররূপ উচ্ছ্রষ্ট শৌথ করিতে হইলে ব্যক্তিগত, ভোগ-স্পৃহাযুক্ত অসুরভাবের বিপরীত সৰ্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর বা পরমাত্মার ভাবনা করিতে হয় । পূজাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে চৈতন্যেরই

পূজা করা হয় ; জড়ের পূজা করা হয় না । জড়ের পূজা করিলে জড়ত্বই বাড়িয়া চলিবে, কারণ পূজক পূজ্যের গুণ লাভ করেন । সেইজন্য শাস্ত্র বলেনঃ...“অবিষ্কৃৎ পূজয়েদ বিষ্কৃৎ ন পূজা-ফলভাগ্ ভবেৎ ।” অর্থাৎ ‘অবিষ্কৃৎ হইয়া বিষ্কৃৎ পূজা করিলে পূজার ফল হয় না ।’ যিনি পূজক, তিনিও চেতন । জীব স্বরূপতঃ শিবই ; অবিদ্যাপ্রভাবে অখণ্ড ঈশ্বরচেতন্য যেন খণ্ড জীবচেতন্য হইয়া পড়িয়াছেন । স্বরূপতঃ জীব মুক্ত শিবই আছেন ; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে ক্ষুদ্র, বশ ইত্যাদি মনে করিতেছেন । জীব যদি জড় হইতেন তবে তাহার দ্বারা চেতনের পূজা সম্ভব হইত না । যেহেতু জড় ও চেতন, বিপরীত বস্তু । অশকার কি আলোকের পূজা করিতে পারে ? তবেই হইল, পূজার উদ্দেশ্য অখণ্ড স্বরূপ-চেতন্যের অবধারণ ও তৎফলে আনন্দ ও শান্তিলাভ । উপাধিদ্বারা চেতন্য খণ্ডরূপে প্রতিভাত হন । স্বীয় অখণ্ড স্বরূপে স্থিত হইবার জন্য পূজায় উপাধি ত্যাগ করিয়া অগ্নসর হইতে হয় । উপাধিসকল আগন্তুক ও কল্পিত বলিয়া উহাদের ত্যাগ সম্ভব হয় । যত যত উপাধির আহুতি বা ত্যাগ হয়, ততই জীবের স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ চেতন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠে । আবার যেমন যেমন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠে, উপাধিও সেইরূপ ত্যাগ হইতে থাকে ।

পূজারূপ যজ্ঞের অধিপতি হইলেন বিষ্কৃৎ (সর্বব্যাপক পরমাত্মা) । তাই মন্ত্রে বলা হয়...“এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্কবে নমঃ ।” বিষ্কৃৎ যজ্ঞের অধিপতি বলিয়া মূল যজ্ঞভাগ উহারই প্রাপ্তব্য । অবশ্য অন্যান্য দেবতাগণকে বিষ্কৃৎ মূর্ত্তি এবং বিষ্কৃৎ হইতে অভিন্ন জানিয়া পূজা করিলেও ঐ পূজা বিষ্কৃৎ নিকটে পৌঁছায় । গুরুগণ, ইন্দ্রাদি দর্শাদিকৃপাল, গণেশাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতি মনুষ্যাগণকে কৃপা করিবার জন্য বিষ্কৃৎই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি । যে, যে ভাবে ভগবানের উপাসনা করে, সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাহাকে সেইভাবে অনুগ্রহীত করেন । “যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ গীতা ৪:১১

যিনি মোক্ষকামী, তিনি ভগবানের সর্বব্যাপক বিষ্কৃৎরূপের উপাসক । কিন্তু যিনি ধন চান, তিনি ভগবানের সর্বব্যাপক ভাব লইয়া কি করিবেন ? তাই

ভগবান্ তঁহার নিকট লক্ষী ; যিনি পুত্রকামী তঁহার নিকট প্রজাপতি ইত্যাদি ।
 বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে গুরুগণের, পিতৃগণের ও দেবতাগণের
 অনুগ্রহ লাভ করিতে হয় । তঁহাদের অনুগ্রহে সাধকের বৃন্দ্রির প্রকাশশক্তি
 বাড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ তিনি নিষ্কামকামী ও ভক্ত হইয়া বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত
 হন । তখন তিনি বৃন্দ্রিতে পারেন,—“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ় ” (শ্বেতাশ্বতর)
 ৬।১১। অর্থাৎ, ‘একই দেবতা সর্বভূতে লুক্কায়িত আছেন ।’ ইনিই বিষ্ণু ।

অহন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি পূজার অঙ্গ । ন্যাস = ত্যাগ বা স্থাপন ।
 জড় অঙ্গসমূহে ‘আমি ও আমার’ বোধ আছে ন্যাসে ঐ ‘আমি আমার’ বৃন্দ্রি
 ত্যাগ করিয়া ‘আং’ ‘ঈং’ প্রভৃতি মাতৃকা স্থাপিত হইল । এইরূপে সাধকের
 স্থূল দেহ ত্যাগ হইয়া দেহ মাতৃকায় হইল । জড় অন্তর্য্যাক্ষ কাটিয়া গেল ।
 পরে সাধক চক্রে চক্রে মাতৃকাসকলকে ক্রমশঃ ন্যাস করিয়া শব্দমানান্য নাদতত্ত্বে
 উপস্থিত হইলেন । তখন জীবের চেতনভাবটী আরও ফুটিয়া উঠিল । পরে
 নাদতত্ত্ব হইতে সাধক বিস্মৃততত্ত্বে উপস্থিত হইলেন । এই অবস্থায় জড় ভাব
 সান্তিশয় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল এবং চেতন্যভাব অতিশয় পরিস্ফুট হইল । নাদ ও
 বিস্মৃত যথাক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষ । এই অবস্থায় প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইয়া
 গেল । পরে সাধক বিস্মৃত ভেদ করিয়া সহস্রারে পরমশিব অদ্বৈত পরমগুরুর সহিত
 মিলিত হইলেন । এই গুরু কিরূপ, তাহাই গুরুশ্লোকে বলা হইয়াছে :—

ব্রহ্মানন্দং (ইনি সর্বব্যাপক ব্রহ্ম ও আনন্দরূপ) পরমসুখদং (ইনি অক্ষয়
 সুখ দান করেন) কেবলং (একমাত্র ইনিই আছেন, দ্বিতীয় নাই) জ্ঞানমুর্তিং
 (জ্ঞানই ইহার মুর্তি) স্বাভাতীতং (ইনি সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্বপ্নের
 অতীত) গগনসদৃশং (আকাশ যেমন সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়াও অসঙ্গ, ইনিও
 সেইরূপ) তত্ত্বমস্যাঙ্গিলক্ষ্যম্ (তত্ত্বমস্যাঙ্গি মহাবাক্য ইহাকেই লক্ষ্য করে) একং
 (ইনি এক) নিত্যং (সর্বকালে স্থিত) বিমলমচলং (সত্ত্বাদি গুণরূপ মল-রহিত ও
 কুটস্থ) সর্বধীসাক্ষিত্বং (সকল বুদ্ধিবৃদ্ধির সাক্ষী) ভাবাতীতং (ভাবনার বা চিন্তার
 অতীত বস্তু) চিৎগুণরহিতং (তিনগুণহীন) সদংগুরং তং (এইরূপ সদংগুরুকে

বা সংস্বরূপ গদ্রূপে) নমামি (নমস্কার করি) । এই গদ্রূপে নিগদ্য গ
ধাকিয়া ও মায়া-প্রভাবে সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও
লয় করিতেছেন ।

পূজার আর্মাণগকে ‘নমোনমঃ’ বলিয়া অগ্ৰসর হইতে হয় যেমন :—“এতে
গম্পদ্যে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” “এতং পাদ্যম্ ওঁ গণেশায় নমঃ” “এতো
ম্পদীপো ওঁ সূর্য্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ” ইত্যাদি । ‘নমঃ’ অর্থাৎ ‘ন মম’ অর্থাৎ
‘আমার নয়’ এই বুদ্ধিতে অহংকারকে নত করিয়া ক্ষীণ, অপ্, তেজঃ, বায়ু,
আকাশ প্রভৃতি তত্ত্বসকলকে দেবতার নিকট সমর্পণ করিতে হয় । পূজাতে
ক্ষীণ (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (প্রদীপাদি), বায়ু (চামর-বাঞ্জন), আকাশ
(শত্ৰুধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি) প্রভৃতি পূজার উপকরণস্বরূপে থাকে । ক্ষীণ, অপ্
প্রভৃতি জীব সৃষ্টি করে নাই, সুতরাং ঐ সকলে ‘আমার’ বোধ করিবার জীবের
অধিকার কোথায় ? সুতরাং জীব পূজাকালে ঐ সকলের উপর মমত্ব-বোধ
ত্যাগ করিয়া উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে এবং মূলদেবতা বিষ্ণুকে উহাদের
ক্ষিরাইয়া দিবেন । পূজা-সাম্প্রদায়িক যখন লোক-ব্যবহারে আসিবেন, তখন
তঁহার ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, উহা
পশুভূতাত্মক । পশুভূতকে উহাদের দেবতার আহুতিদান করা হইয়াছে, সুতরাং
পুনরায় ‘আমার’ বোধে উহাদিগকে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে ; তবে দেবতার
প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । প্রথমে যে সকল বস্তুর উপর ‘আমার’
বোধ আছে উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পরে ‘আমি’ ভাবে বা অহংকারকে ত্যাগ
করিতে হইবে । অহংকারই মূল অস্দর । অহংকার বা ‘আমি’ ভাব হইতেই
‘আমার’ ভাবের উৎপত্তি । ঐ অহংকারকে চির্দাগ্নিতে (জ্ঞানাগ্নিতে) পূর্ণাহুতি
দিতে হইবে । উহার মন্ত্র :—

“ওঁ ব্রহ্মার্চনং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥” গীতা ৪।২৪ ।

অর্থাৎ—‘অর্পণ ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যে আহুতিদান

তাহাও ব্রহ্ম । ব্রহ্মকর্মে সমাহিত সেই জ্ঞানিদ্বারা ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য ।’

অহংকার ভেদদৃষ্টির বীজ, ইহাকে চিদাগ্নিতে বা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াই সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, পূজা সাক্ষ হইল । পূজার ফলে অসুরকুল নাশ পাইল, জগতে শান্তি ফিরিয়া আসিল । তাই পূজার শেষে শান্তি মন্ত্র ।

“ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমদ্যাতে

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবীশ্বাতে ।”

অর্থ্য—ঐ নিগূঢ় ব্রহ্ম পূর্ণ, এই কার্য্যব্রহ্ম, অর্থ্য্য নাম-রূপাত্মক জগৎও পূর্ণ । পূর্ণ নিগূঢ়-ব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম (মাসাসাহায্যে) উদ্ভূত হন । কার্য্যব্রহ্মের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া (কারণ নিগূঢ়-ব্রহ্মের সহিত একরসত্ব সম্পাদন করিলে) কেবল পূর্ণই (নিগূঢ় ব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন ।

“ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।”

“ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু কক্কতি সিন্ধবা

মাবদীনঃ সন্তোষধীঃ ।

মধু নক্তমতোষসো মধুমং পার্থিবং ব্রজঃ ।

মধু দোহন্তঃ নঃ পিতা ।

মধুমাসো বনস্পতির্মধুমং অস্তঃ সূর্য্যঃ ।

মাবদীগাভো ভবন্তঃ নঃ ।

অর্থ্য্য—‘বাসু, মধুকেই (আনন্দকেই) বহন করে, নদীসমূহ মধুই কক্কণ করে, ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় (আনন্দপ্রদ) হউক । রাতি এক উষাসকল মধু । পৃথিবী-লোক মধু, পিতৃস্থানীয় আমাদের নিকট মধুময় হউক । বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউন, গো সকলও আমাদের নিকট মধুময় হউক’ ।

“ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ।”

— — —

পরিশিষ্ট

ত্রিবিধ সত্তা—সত্তা তিন প্রকার :—(১) পারমাণ্বিক (২) প্রাতিভাসিক (৩) ব্যবহারিক ।

[১] **পারমাণ্বিক সত্তা**—যে সত্তার তিন কালে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে বাধ (কারণ-সহিত নাশ) হয় না, উহা পারমাণ্বিক সত্তা । শূন্যচৈতন্য বা নিগূঢ়ব্রহ্মের সত্তাই পারমাণ্বিক সত্তা, যেহেতু উহার কোন কালে বাধ হয় না ।

[২] **প্রাতিভাসিক সত্তা**—যে বস্তুর প্রকৃত সত্তা না থাকিলেও দেখা যায় এবং দেখা যায় বলিয়াই যাহার সত্তা স্বীকার করা হয়, উহাই সেই বস্তুর প্রাতিভাসিক সত্তা । যেমন রজ্জুসর্প—ভ্রান্তিকালে রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, উহা বাস্তবিক নাই, অথচ প্রতীত হয় । প্রতীত হয় বলিয়াই প্রতীতিকাল-পর্যন্ত উহার সত্তা স্বীকার করিতে হয়, উহা প্রাতিভাসিক সত্তা ।

[৩] **ব্যবহারিক সত্তা**—ব্রহ্মজ্ঞান-ব্যতীত যে সত্তার বাধ হয় না, যেমন ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের সত্তা (জ্ঞানিগণের নিকট জগতের সত্তা প্রাতিভাসিক) উহা ব্যবহারিক সত্তা । রজ্জুসর্প প্রভৃতি ভ্রমস্থলে আলোক আনিলে সহজেই রজ্জুর জ্ঞান হয় ও সর্পভ্রান্তি কাটিয়া যায় । কিন্তু জগদভ্রান্তি অত সহজে দূর হয় না । অধিষ্ঠান ব্রহ্মের প্রকৃত জ্ঞানব্যতীত উহা নাশ হইবার নহে । এই প্রভেদের জন্য জগতের সত্তাকে ব্যবহারিক এবং রজ্জুসর্পাদির সত্তাকে প্রাতিভাসিক বলা হয় । প্রাতিভাসিকের সত্তা অল্প, ব্যবহারিকের সত্তা অধিক । উভয়েই অধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্য ।

বেদান্তসারের ‘শালবোধিনী’ নামক টীকায় মীমাংসকপ্রবর আপোদেব বলিয়াছেন অজ্ঞানের ত্রিবিধ শক্তি আছে :—

১) পারমার্থিক-সত্ত্বসম্পাদন-পটীয়সী শক্তি — অজ্ঞানের এই শক্তির প্রভাবে পড়িয়া লোকে জগৎকে পারমার্থিক সত্য মনে করে। গদ্য ও শাস্ত্রবাক্যাদির শ্রবণ ও মনন করিলে অজ্ঞানের ঐ শক্তির নাশ হয়। তখন জগৎ আর পারমার্থিক সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না ; কিন্তু ব্যবহারিক সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞানের (২) ব্যবহারিক-সত্ত্ব-সম্পাদন-পটীয়সী শক্তি তখনও থাকিয়া যায়। কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞানের ঐ শক্তির নাশ হয়, তখন জগৎ (৩) প্রাতিভাসিকরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ জগৎ দেখা গেলেও উহা বাস্তবিক নাই অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং তখনও অজ্ঞানের প্রাতিভাসিক-সত্ত্বসম্পাদন-পটীয়সী শক্তির প্রভাব চলিতে থাকে। জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী জীবের বৃত্তিতে ‘আমিই ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা’ এইপ্রকার যে বৃত্তির অনবৃত্তি চলিতে থাকে, তাহাকে বারিতানবৃত্তি বলে। নিঃসংশয় যেমন জলকে পরিষ্কার করিয়া স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়, এইপ্রকার ঐ বৃত্তিও ক্রমশঃ স্বতঃই নাশ প্রাপ্ত হয়। তখন প্রপঞ্চ আর প্রতিভাত হয় না — ইহাই নিঃসংশয়মোক্ষ।

বিবিধ লক্ষণের পরিচয়

পদের (ঘট, পট ইত্যাদি উচ্চারিত শব্দই পদ) সহিত অর্থের (ঘট পদের অর্থ—স্থলোদর, কব্ধগ্রীব ইত্যাদি বস্তুবিগ্ণিতে কোন বস্তু) সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি দুই প্রকার :—(১) শক্তি (২) লক্ষণ।

(১) কোন নির্দিষ্ট পদের যে নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য আছে, ঐ সামর্থ্যই ঐ পদের শক্তি। ঐ শক্তি যে অর্থটিকে বুঝাইয়া দেয়, উহা ঐ পদের লক্ষ্যার্থ বা বাচ্যার্থ। যেমন ‘ঘট’ এই পদটির শক্তি একটি স্থলোদর, কব্ধগ্রীব ইত্যাদি বস্তুবিগ্ণিতে একটি অর্থকে বা বস্তুকে বুঝাইতেছে ; ঐ অর্থটী ‘ঘট’ এই পদের লক্ষ্যার্থ বা বাচ্যার্থ। ন্যায়মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পদের শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ‘এই পদ শব্দনিবার মাত্র লোকের এই প্রকার অর্থ-প্রতীতি হউক’।

(২) যে স্থলে পদের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের তাৎপর্য পাওয়া যায় না, সেইস্থলে শব্দার্থের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া বাক্যের অর্থ বদ্বীকিতে হয় ; সেই সম্বন্ধের নাম লক্ষণা। যে অর্থের জ্ঞান পদের শক্তিদ্বারা হয় না, কিন্তু লক্ষণাদ্বারা হয়, সেই অর্থ সেই পদের লক্ষ্যার্থ। যেমন ‘গঙ্গায় ঘোষ বাস করে’ এই বাক্যে ‘গঙ্গা’ শব্দের বাচ্যার্থ ধরিলে ভাগিরথীর জলপ্রবাহকে বুঝায়। কিন্তু জলপ্রবাহে ঘোষের বাস সম্ভব নয়, সুতরাং ‘গঙ্গা’ পদে উহার বাচ্যার্থ জল-প্রবাহকে না বুঝাইয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তীরকে বুঝাইতেছে। এ স্থলে গঙ্গাতীর, গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ।

লক্ষণা তিন প্রকার :—(১) জহতী (২) অজহতী (৩) জহতী-অজহতী বা ভাগত্যাগলক্ষণা।

(১) যে লক্ষণাবারা বাচ্যার্থের সম্যক্ ত্যাগপূর্বক বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, উহার নাম জহতী-লক্ষণা। ‘জহতী’ শব্দের অর্থ যে ত্যাগ করে। পূর্বে বক্ত ‘গঙ্গায় ঘোষ বাস করে’, এই বাক্যে ‘গঙ্গা’ পদের যে বাচ্যার্থ ভাগিরথী-জল-প্রবাহ, উহা ত্যাগ করিয়া ‘জহতী-লক্ষণা’ দ্বারা ঐ জল-প্রবাহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে অর্থ গঙ্গাতীর, উহাকে বুঝাইতেছে।

(২) কিন্তু যে লক্ষণাবারা বাচ্যার্থের সহিত বাচ্যার্থ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুরও জ্ঞান হয়, সেই লক্ষণাকে ‘অজহতী লক্ষণা’ বলে। যেমন ‘লাল দৌড়াইতেছে’ এই বাক্যে ‘লাল’ পদের বাচ্যার্থ লাল রং। লাল রংএর দৌড়ান অসম্ভব। সুতরাং বদ্বীকিতে হয় যে লালরং-বিশিষ্ট ঘোড়া দৌড়িতেছে। এখানে লাল রংকে ত্যাগ করা হইল না। উহাকে লইয়াই উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে অব্যবস্ত তাহার জ্ঞান হইল। এই লক্ষণার নাম অজহতী, যে হেতু ইহাতে জহতীলক্ষণার ন্যায় বাচ্যার্থের ত্যাগ হইল না। এইরূপ ‘কাক হইতে দাঁষ রক্ষা কর।’ এই বাক্যে কাকের সহিত অন্যান্য প্রাণী হইতেও দাঁষ রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই বুঝায়। কাকের ত্যাগ না হওয়ায় ইহাও ‘অজহতী’ লক্ষণার উদাহরণ।

(৩) জহতী-অজহতী বা ভাগত্যাগলক্ষণা—যে লক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ এবং সমান অংশের গ্রহণ হইয়া থাকে উহাই ত্যাগ ও অত্যাগরূপা জহতী-অজহতী বা ভাগত্যাগ লক্ষণা। যেমন—“সোহয়ং দেবদত্তঃ” এই বাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা পূর্বকালদৃষ্ট এবং অধুনাদৃষ্ট দেবদত্তবাস্তুর একত্ব বঝাইতেছে। এ স্থলে ‘সেই’ পদ দ্বারা অতীতকালস্থ ও অন্যদেশস্থ দেবদত্তকে বঝাইতেছে এবং ‘এই’ পদ দ্বারা সম্মুখদেশস্থ, এবং বর্তমানকালস্থ দেবদত্তকে বঝাইতেছে। দেবদত্তের আকার-প্রকারেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এই বিরোধী অংশগুলির দ্বারা বিশেষিত করিয়া উভয়ক্ষেত্রে দেবদত্তের একত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু ভাগত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধ বিশেষণ অংশের ত্যাগপূর্বক উভয়ক্ষেত্রে সমান বিশেষ্য অংশ যে দেবদত্ত ব্যক্তি মাত্র উহার গ্রহণ দ্বারা এই একত্ববোধ হইয়া থাকে।

মুখ্যসামান্যধিকরণ্য ও বাহ্যসামান্যধিকরণ্য

(১) যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর সম্বন্ধাভেদ থাকে, সেই বস্তুর সহিত তাহার মুখ্যসামান্যধিকরণ্য। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের সম্বন্ধাভেদ থাকে, সেইজন্য মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের মুখ্যসামান্যধিকরণ্য। সামান্যধিকরণ্যের অর্থ এক অধিকরণ্যে থাকা। বস্তুর সহিত কূটস্থ-চৈতন্যের মুখ্যসামান্যধিকরণ্য অর্থাৎ সর্বদা অভেদ রহিয়াছে।

(২) যে বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইয়া (বাধ হইয়া) অপর যে বস্তুর সহিত অভেদ হয়, সেই বস্তুর সহিত পুণ্যোক্ত বস্তুটির বাহ্যসামান্যধিকরণ্য হইয়া থাকে। যেমন ‘আমি’ ‘আমি’ রূপে যে আভাসচৈতন্যের ভান হয়, তাহার নিজ স্বরূপের (আত্মত্বের) বাধ করিয়া বস্তুর সহিত অভেদ সিদ্ধ হয়।

অবৈতন্যতে চারিটী বাধ

- (১) প্রতিবিশ্ববাদ (২) আভাসবাদ (৩) অবচ্ছেদবাদ
(৪) দ্বৈতস্বীকৃতিবাদ।

প্রতিবিস্ববাদ

এই মত পদ্যুপাদাচার্য্য ও বিবরণাচার্য্য-সম্মত। প্রতিবিস্ববাদী বলেন, দর্পণের সহিত মূখের যে রূপ সম্বন্ধ শব্দশ্চেতন্যের সহিত জীব ও জগতের ঐ রূপ সম্বন্ধ। দর্পণে যে মূখ দেখা যায়, উহা কণ্ঠোপরিস্থিত প্রকৃত মূখের প্রতিবিস্ব; মূখ বিস্ব। দর্পণে যে মূখ দেখা যায় উহা মূখের ছায়া নহে, কারণ তাহা হইলে উহা মূখ যে দিকে থাকে ঐ দিকেই থাকিত; কিন্তু উহাকে বিপরীত দিকে স্থিত বলিয়াই বোধ হয় অর্থাৎ পূর্বাভিমুখী মূখকে দর্পণে পশ্চিমাভিমুখী বলিয়াই বোধ হয়। আবার পূর্বাভিমুখী মূখ যদি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমাভিমুখী হইত, তবে দক্ষিণ কর্ণের বামদিকে এবং বামকর্ণের দক্ষিণদিকে আসা উচিত। কিন্তু দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণদিকে এবং বামকর্ণ বামদিকেই থাকে। স্মরণ্য বলা হয়, দর্পণে যে মূখ দেখা হয়, উহা প্রকৃতপক্ষে মূখের প্রতিবিস্ব নহে, দর্পণে স্থিতও নহে। মূখ দেখিবার সময় নেত্রশিখি দর্পণে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠোপরিস্থিত প্রকৃত মূখকেই দর্শন করে। কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তির বেগবশতঃ মূখকে দর্পণস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। দর্পণরূপ উপাধিজন্যই বিস্বপ্রতিবিস্বের কম্পনা। দর্পণরূপ উপাধির যে ভাঙ্গা ফাটা প্রভৃতি দোষ থাকে, উহা প্রতিবিস্বের সংক্রামিত হয়, কিন্তু বিস্বরূপ মূখে সংক্রামিত হয় না। বিচারদ্বারা এই বিস্ব-প্রতিবিস্বভ্রান্তি কাটিয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ দর্পণরূপ উপাধির সান্নিধ্য থাকে ততক্ষণ বিস্বপ্রতিবিস্ব-ভাব মিথ্যা বোধ হইলেও উহার ভান হইবে। কিন্তু দর্পণ অপসৃত হইলে বিস্বপ্রতিবিস্বভাবের নিবৃত্তি হইবে।

এইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির সম্পর্কে শব্দশ্চেতন্যকেই জীব বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে। এ স্থলে শব্দশ্চেতন্য বিস্ব, অজ্ঞান দর্পণের ন্যায় এবং জীব প্রতিবিস্ব। এইমতে শব্দশ্চেতন্যই ঈশ্বর। উপাধির দোষ-গুণ প্রতিবিস্বরূপে প্রতিভাত জীবেরই সংক্রামিত হয়, বিস্বরূপ ঈশ্বরে সংক্রামিত হয় না। এইমতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে ন্যায় একটী জীবই স্বীকৃত হয়। স্বপ্নকালে যেমন একই জীব বহু জীবরূপে প্রতীত হয়, বহুজীবগুলি জীবাত্মস মাত্র, এইরূপ মূলতঃ একই জীব অজ্ঞানবশতঃ

বহু জীবরূপে প্রতীত হইতেছে, বহুজীবগুণি জীবাভাসমাট। অজ্ঞানরূপ উপাধির জনাই জীবের অল্পজ্ঞতা। আর জীবের সেই অল্পজ্ঞতাকে অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের সম্বন্ধতা। শব্দে ব্রহ্মে বিশ্বতা, ঈশ্বরত্ব, সম্বন্ধত্ব প্রভৃতি জীবদ্বারা আরোপিত। প্রতিবিশ্বরূপ জীব মিথ্যা নহে, সত্য। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব কোন ভেদ নাই, উহাদের কোন স্বর্মেও সম্ভব নয়। অজ্ঞান উপাধিজনাই শব্দচৈতন্য বা ঈশ্বরকে প্রতিবিশ্ব জীবরূপে মাস্তি হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে বিশ্বপ্রতিবিশ্বভাব কাটিয়া যায়। কিন্তু যতদিন প্রারম্ভ থাকে, ততদিন জীব ভগৎ ও ঈশ্বরের মিথ্যারূপ ভান হয়। সমাক্ প্রারম্ভক্কে ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। এইমতে বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বের প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদস্বীকার না করায় জীব ও ব্রহ্মের একতাবিশেষে মধ্যসামান্যবিশেষণা স্বীকার করা হয়। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে এই মতে 'গঙ্গায় ঘোষ বাসের' ন্যায় জহলক্ষণা স্বীকার্য।

আভাসবাদ

ইহা বিশ্বায়ণ্যবামী, ভারতীতীর্থ প্রভৃতির অনুমোদিত। আভাসবাদে—
প্রতিবিশ্বটীকে আভাস বা ছায়া অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। এই মতে—

ঈশ্বর = অবিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য + মায়া + মায়াতে ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস।

জীব = অবিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্য + বুদ্ধি বা অবিদ্যা + বুদ্ধি বা অবিদ্যাতে কূটস্থচৈতন্যের আভাস।

যে চৈতন্য সর্বব্যাপক ও নিগূঢ় উহা ব্রহ্মচৈতন্য। ঐ ব্রহ্মচৈতন্যই বুদ্ধিরূপ উপাধি ভাঙিলে ঐ বুদ্ধি এবং উহার বৃত্তিসকলের নির্বিকার সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। কূটের অর্থাৎ মায়া-প্রপঞ্চের মধ্যে নির্বিকারভাবে অবস্থিত এই চৈতন্যকে বুদ্ধির অপেক্ষায় কূটস্থ চৈতন্য বলা হয়। আর বুদ্ধিতে কূটস্থের যে আভাস, উহা আভাসচৈতন্য। যেমন জলে আভাস-স্বর্ষকে জলের কম্পনে কম্পিত, জলের আলিন্যে মলিন ইত্যাদি দেখা যায়, এইরূপ আভাসচৈতন্যকেও বুদ্ধির কম্পন ও আলিন্যাদিবশতঃ চঞ্চল, মলিন ইত্যাদি দেখায়।

আভাস-চৈতন্য কৰ্তা, ভোক্তা, সূখী, দুঃখী ইত্যাদি। কূটস্থ-চৈতন্য আকাশস্থ সূর্যের ন্যায় আভাসচৈতন্যের কৰ্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সূখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতিকে প্রকাশ করিয়াও সর্বদা নির্বিকার-ভাবে অবস্থিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে :—

“হা সূপর্ণা সমুজ্জা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাস্ত্যন্যনন্যোহভিচাক্ষরীতি ॥ ৪।৬

অর্থাৎ ‘সর্বদা সংযুক্ত সখা (সমানস্বভাব) দুইটী-পক্ষী একই বৃক্ষকে (দেহকে) আলিঙ্গন করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটী শ্বাদু পিপ্ললফল (পরিপক্ক ভোগযোগ্য কর্মফল সূখ-দুঃখাদি) ভক্ষণ করে, অপরটী ভোগ না করিয়া কেবল দেখিয়া যায়’। এই শ্লোকে আভাসচৈতন্য ও কূটস্থসাক্ষি চৈতন্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শব্দশাস্ত্র-প্রধান এক মাত্রাতে যে ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস, তিনি এক নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু অবিদ্যা মলিন-সত্ত্বপ্রধান, উহা বহু। উহাতে যে কূটস্থচৈতন্যের আভাস, উহারা বহুজীবরূপে প্রতীত হয়। জীবগণ অস্পষ্ট, বংশ ও অস্পষ্টশক্তিমান। কিন্তু জীবের স্বরূপ কূটস্থ-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের একতা স্বতঃই সিদ্ধ আছে। তথাপি অজ্ঞান-প্রভাবে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ আভাসচৈতন্যদ্বারা যেন আবৃত হইয়া যায়। বিচারদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে জীব বুদ্ধিতে পারে, কূটস্থচৈতন্যই তাহার স্বরূপ এবং উহা ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত অভিন্ন। বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত (অর্থাৎ বুদ্ধিতে অভিমানী) আভাস মিথ্যা। কিন্তু ঐ প্রকার জ্ঞান হইলেও প্রারম্ভবশতঃ বুদ্ধিতে আভাস ও জগতের প্রতীতি চলিতে থাকে, কিন্তু উহাতে মিথ্যা বোধ থাকে। বুদ্ধিতে এই প্রকার অনবৃদ্ধির নাম বারিতানুবৃদ্ধি। প্রারম্ভকালে বিদেহমুদ্রিত। প্রতিবিশ্ববাদের ন্যায় আভাসবাদে এক জীব স্বীকার করা হয় না, ইহাতে বহু জীব স্বীকৃত হয়, সুতরাং একের মুদ্রিতে সকলের মুদ্রিত স্বীকৃত নহে। যাহার অজ্ঞান নাশ হয়, সেই কেবল্যালাভ করে, অপরে বংশ থাকে। এই মতে আভাসের বাধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের একতা কল্পনা করা

হয় বলিয়া ইহাতে বাধসামান্যধিকরণ্য স্বীকৃত। আরও এই মতে “সৌহৃদ্যং দেবদত্ত” বাক্যের ন্যায় মহাবাক্যবিচারে ভাগত্যাগলক্ষণা স্বীকার করা হয়।

অবৈতান্যবাদ

এই মত বাচ্যপ্ৰতিমিশ্রসম্মত। অবৈতান্যবাদে প্রতিবিশ্ব বা আভাস ইহার কোনটাই স্বীকৃত হয় না। এই মতে মায়া-বিশিষ্ট শব্দ-চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং অবিদ্যা বা অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলা হয় এবং মায়া-উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর-সাক্ষী এবং অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্যকে জীবসাক্ষী বলা হয়। মায়া বা অবিদ্যা যখন চৈতন্যের বিশেষণ হয়, তখন সেই চৈতন্যকে মায়া বা অবিদ্যাবিশিষ্ট বলা হয়; কিন্তু মায়া বা অবিদ্যা উপাধি হইলে চৈতন্যকে উপহিত বলা হয়। বিশেষণ ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য এই যে কোন বস্তুর স্বরূপমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা ঐ বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে বিশিষ্ট করে, বা পৃথক্ করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহা বিশেষণ। যেমন ‘লাল ফুল’ বলিলে ‘লাল’ এই বিশেষণ ফুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে নীল, পীতাদি ফুল হইতে পৃথকরূপে জানাইয়া দিতেছে। কিন্তু উপাধি বস্তুর স্বরূপে প্রবেশ করে না। যেমন ‘ঘটাকাশ’ বলিলে একটী ছলপূর্ণ ঘট, যে পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, ঐ পরিমিত স্থানের আকাশকে বুদ্ধায়। এখানে ঘট, উপাধি। যেহেতু উহা আকাশের স্বরূপমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়াই ঘটাকাশকে ব্যাপক মহাকাশ হইতে পৃথক করিয়া জানাইয়া দিল।

ঘট ঘটিদ্বারা নির্মিত। আকাশতত্ত্ব, ক্রিতি, জল প্রভৃতি তত্ত্বের উপাদান কারণ। উপাদান কারণ কার্যদ্বারা খণ্ডিত হয় না, কার্যের সম্বন্ধ অনঙ্গত থাকে। সুতরাং ঘটদ্বারা আকাশ খণ্ডিত হয় না; ‘ঘটাকাশ’ কেবল কল্পনামাত্র। ঘটাবচ্ছিন্ন যে আকাশ উহা সম্বন্ধাই মহাকাশের সহিত এক ও অভিন্ন। এইরূপ অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন জীবের সহিত শব্দ চৈতন্য সম্বন্ধা অভিন্ন। অজ্ঞানকণ্ঠঃ জীব মনে করেন যে, তিনি অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত একাকারভাবপ্রাপ্ত। কিন্তু বিচারদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে তিনি বুদ্ধিতে

পারেন, যে জীবভাব কম্পিত, ব্রহ্মত্বই তাহার স্বাভাবিক রূপ। অবচ্ছেদবাদে জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধজন্য জীবের বাধ করিতে হয় না, সেই জন্য এই মতে মধ্যসামান্যধরণ্য স্বীকৃত। এই মতে বলা হয় অবিদ্যা ও জীব নানা; অজ্ঞান জীবকে আশ্রয় করিয়া ভাসে। যে জীবের অজ্ঞান নাশ হয়, তাহারই মৃত্যু হয়। যুক্তিদৃষ্টিতে অবচ্ছেদবাদ অপেক্ষা আভাসবাদ শ্রেষ্ঠ। এইমতে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ চৈতন্যের আভাস গ্রহণ করিয়া চিন্মাত্র জীবরূপে প্রতিভাত হয়। আভাস স্বীকার না করিয়া চৈতন্যের কেবল মাত্র (অন্তঃকরণদ্বারা) অবচ্ছিন্নতাই যদি জীবত্বের কারণ হয়, তাহা হইলে ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও জীবত্ব হওয়া উচিত। ঘট কিন্তু জীব নয়। যুক্তির দিক্ দিয়া আভাসবাদ শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্তর্ভূতির দিক্ দিয়া অবচ্ছেদবাদ শ্রেষ্ঠ। যে হেতু এই মতে ঘটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টান্তদ্বারা সাক্ষাৎভাবে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বদ্বাইয়া দেয়, মাঝখানে আর আভাসের কল্পনা করিতে হয় না।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ বেদান্তের উত্তম অধিকারীর জন্য, ইহা একজীববাদ। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিই এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ। (সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ নিম্ন অধিকারীর জন্য, উহাতে ঈশ্বর দ্বৈত স্বীকৃত হয়, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে ঈশ্বরদ্বৈত স্বীকৃত নহে)। এই মতে বলা হয় এক আত্মাই জীব জগৎ ও ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই জগৎ মনোমাত্র, মন আবার জ্ঞানমাত্র। জীব, জগৎ প্রভৃতির সত্তা বাস্তবিক না থাকিলেও প্রতিভাত হয় বলিয়া উহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক। জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা এই মতে আদৌ স্বীকৃত নহে। (পূর্বেও মতগূঢ়িতে অজ্ঞানাবস্থায় জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়, কিন্তু জ্ঞানলাভের পর উহাদের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকৃত)। জীব স্বপ্ন স্বপ্ন দেখে তখন একই আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বপ্নদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন। এইরূপ জাগ্রৎকালেও একই আত্মা দ্রষ্টা এবং দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হইতেছেন।

স্বপ্নের জীব জগৎ ও ঈশ্বরভাব এককালে ক্রম-ব্যতীত (যুগপৎ) উৎপন্ন হয়, উহারা সাক্ষিভাস্য। এইরূপ জাগ্রৎকালের জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাব প্রভৃতিও শূন্য চৈতন্যকে অধিষ্ঠান করিয়া অবিদ্যাদ্বারা যুগপৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহারাও স্বপ্নজগতের ন্যায় সাক্ষিভাস্য (অর্থাৎ সাক্ষিদ্বারা অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত)।

স্বপ্নের সময় মনে হয়, ‘অমুক ব্যক্তি আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র’—ইহা কার্য্য কারণভাব। আরও মনে হয়, ‘পিতা অনেক পুর্বে জন্মিয়াছেন, আমি পরে জন্মিয়াছি’, ‘কিংবা ‘এই যে আমি সম্মুখে পাহাড় দেখিতেছি আমার জন্মের বহু পুর্বে হইতেই এই পাহাড় বিদ্যমান এবং আমার মৃত্যুর পরও উহা বিদ্যমান থাকিবে’ ইত্যাদি—কিন্তু স্বপ্নের সেই কার্য্য কারণভাব পিতা, পুত্র, পাহাড়াদি একই কালে উৎপন্ন। অবিদ্যাপ্রভাবেই আত্মাকে, কার্য্য, কারণ, পূর্ব, পর, দেশ, কাল ইত্যাদিরূপে দেখা যায়। জাগ্রৎকালের জগৎও স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন। ইহাতে দেশ কাল ভাব, সময়ের দৃশ্যতা দীর্ঘতা, প্রমাণ, প্রমের, প্রমাতা প্রভৃতি দ্বিপুটী সব এক আত্মারই বিস্তার। অবিদ্যাই দেশ, কাল, কার্য্য কারণ-ক্রম প্রভৃতি স্রষ্টি উৎপাদন করিয়া যেন জীবকে মোহিত করিতেছেন। এই মতে বিষয়ের অজ্ঞাতসত্তা নাই। হিমালয় পর্বতে একটি পিপীলিকা রহিয়াছে, উহা আমার অজ্ঞাত। এমুলে এই মতে হিমালয় পর্বত, উহার দ্রুত, পিপীলিকা, পিপীলিকা দর্শনের অন্তরায়, পিপীলিকা-দ্বিধারে অজ্ঞতা সমস্তই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা উপর একই কালে যুগপৎ উৎপন্ন এবং আত্মার দ্বারা প্রকাশিত, উহাদের সকলের সত্তাই প্রতিভাসিক, দৃষ্টিই সৃষ্টির প্রতি হেতু, নতুবা সৃষ্টি নাই। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী জ্ঞানী—জীব, জগৎ, ঈশ্বরভাব বাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ চারিবেদ, কার্য্য-কারণ-ভাব, দেশ, কাল প্রভৃতি সব নিজেরই যুগপৎ (অক্রমপূর্ব্বক) বিস্তার বলিয়া অনুভব করেন। এই দৃষ্টি শাস্ত্র-কথিত ঈশ্বরদৃষ্টির তুল্য। এই দৃষ্টি-লাভেই জ্ঞানের পরম সার্থকতা। ইহার পরিপক্বাবস্থায় অজ্ঞাতবাদের (বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত) সিদ্ধান্তে স্থিতিলাভ হয়। অজ্ঞাতবাদের সিদ্ধান্তে জগৎ আদৌ উৎপন্ন

নহে। জীব, জগৎ, মায়ী, ঈশ্বর প্রভৃতি বন্ধ্যাপদ্রবৎ অসৎ অর্থাৎ কোনও কালেই নাই, দেখাও যায় না। একমাত্র নিগদুর্গ ব্রহ্মই বিদ্যমান। অজ্ঞাতবাদের সিংহাস্তে অবস্থিত জীব ব্রহ্মই হইয়া যান, তিনি জগৎ দেখেন না। তাঁহার অবস্থা বাক্য-মনের অগোচর। যোগবিশিষ্ট-রামায়ণ শ্রীর-চিত্তে অনুধাবন করিয়া পড়িলে দৃষ্টিসূচিবাদ ও অজ্ঞাতবাদের মর্ম অবগত হওয়া যায়।

পূর্বোক্ত চারিটী বাদে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও প্রত্যেক বাদেরই লক্ষ্য 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম' ইহা প্রতিপাদনে।

“শান্তং শিবমদ্বৈতম্”।

— — —

ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তার বিবিধ ভাবধারা (সংক্ষিপ্ত)

অদ্বৈতমত

অদ্বৈতমত বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। ব্যাস, বশিষ্ঠ, শঙ্করদেব, অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিগণ অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য ভারতে এই অদ্বৈতবাদের বিশেষভাবে প্রচার করেন। অদ্বৈতমতে তত্ত্ব একটী স্বীকার করা হয়, উহা ব্রহ্ম। দ্বিতীয় যাহা দৃষ্ট হয়, উহা অনাদি অজ্ঞান-বশতঃ ব্রহ্মে অধ্যাসমাত্র। অদ্বৈতবাদের সার কথা, 'ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম।' শঙ্করের মতে জ্ঞান এক অখণ্ড, নিরপেক্ষ, নির্বিকল্প ও বস্তুতন্ত্র। ব্রহ্মাত্মক্য জ্ঞানই মুক্তির কারণ। কর্ম মুক্তির কারণ নয় এবং জ্ঞান ও কর্ম উভয়ে মিলিত হইয়া মুক্তি প্রদান করে, এইরূপ মতবাদও ঠিক নহে। জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদান করে, উহাতে কর্মের অপেক্ষা নাই। তবে চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্য নিকামকর্মের প্রয়োজন। সুতরাং নিকামকর্ম পরম্পরা-

রূপেমুক্তির কারণ বটে। অজ্ঞান অনাদি ও অনির্ঘটনীয়, কিন্তু ইহা অনন্ত নহে, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়। আত্মা (জীবচেতন্য) ও ব্রহ্ম (জগতের অধিষ্ঠান-চেতন্য) এক এবং উভয়েই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আত্মা চেতন, শব্দ ও নিত্যমুক্ত। তথাপি অনাদি অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা যেন বদ্ধ জীব-রূপে প্রতিভাত হন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত-উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। শঙ্কর পরিণামবাদ স্বীকার করেন না অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎরূপে সত্য সত্যই পরিণত হইয়াছেন, ইহা শঙ্করের স্বীকৃত মত নহে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের এক অংশে পরিণাম বা বিকার স্বীকার করিলে অন্যংশ নির্বিকার থাকিতে পারে না এবং ব্রহ্ম নির্বিকার হইতে পারেন না। শঙ্করমতে বিকার বা পরিণাম যাহা দৃষ্ট হয়, উহা মিথ্যা। ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মস্বরূপে থাকিয়াও সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে থাকিয়াও অজ্ঞানবশতঃ জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ইহাই বিবর্ত-বাদ। শক্তিবিংশটোদ্বৈত-বাদিগণ যে বলেন, ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অচিৎ শক্তিদ্বারা জগদ্রূপে পরিণত হন, সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েই নিত্য শঙ্করের মতের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। শঙ্কর শক্তির নিত্যতা স্বীকার করেন না। কার্য্য দেখিয়া শক্তির অনুমান করা হয়। কার্য্য নিরন্তর পরিবর্তন-শীল, সুতরাং মিথ্যা। সেই জন্য কার্য্যের জননী যে, শক্তি, তাহাও তদ্রূপ হইতে বাধ্য, নচেৎ কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। সেই মিথ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবস্ত, উহাই সত্য। শক্তির নিত্যতা স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদ ও বিংশটোদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

শঙ্করমতে ঈশ্বর শব্দসমুদ্রপ্রধান ও নিত্যমুক্ত। তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়া তাহার মায়া-শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, মায়াশক্তিদ্বারাই তিনি অবতারমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবগণের উদ্ধার করেন। শঙ্করের মতে অজ্ঞান-বন্দ্য কৰ্ম উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ ঐ সকলদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তের শুদ্ধি না হইলে এবং তীর বৈরাগ্য না থাকিলে কখনই অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। শঙ্করের মতে কৰ্ম ও ভক্তি

ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্তসার

(পণ্ডিত পীতাম্বরকৃত পুস্তক হইতে বঙ্গানুবাদ)

বিষয়	পূর্বমীমাংসা	উত্তরমীমাংসা	ন্যায়	বৈশেষিক	সাংখ্য	যোগ
অধিকারী	কর্মফলাসক্ত	মলবিক্ষেপদোষ- রহিত সাধন- চতুষ্টয়সম্পন্ন	দুঃখজিহাস্ত তর্কাগ্রহী	দুঃখজিহাস্ত তর্কাগ্রহী	সম্পদ বিরক্ত	বিক্ষিপ্ত চিন্তাবান
প্রধান কাণ্ড	কর্মকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড	উপাসনাকাণ্ড
বাদ	আরম্ভবাদ	বিবর্তবাদ	আরম্ভবাদ	আরম্ভবাদ	পরিণামবাদ	পরিণামবাদ
আত্ম-পরিমাণ সংখ্যা	বিভূ, নানা	বিভূ, এক	বিভূ, নানা	বিভূ, নানা	বিভূ, নানা	বিভূ, নানা
প্রমাণ	ছয় (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি)	ছয় (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি)	চার (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ)	দুই (প্রত্যক্ষ, ও অনুমান)	তিন (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ)	তিন (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ)
খ্যাতি	অখ্যাতি	অনির্বচনীয় খ্যাতি	অন্যথা খ্যাতি	অন্যথাখ্যাতি	অখ্যাতি	অখ্যাতি
সত্তা	জীব, জগতের পরমার্থসত্তা	পরমার্থরূপ আত্ম সত্তা—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎসত্তা	জীব ও জগতের পরমার্থসত্তা	জীব ও জগতের পরমার্থসত্তা	জীব ও জগতের পরমার্থসত্তা	জীব ও জগতের পরমার্থসত্তা
উপযোগ	চিকিৎসা	তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক মোক্ষ	মনন	মনন	‘ত্বং’ পদার্থশোধন	চিন্তাকাণ্ড

ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্তসার

(পাঁচতম পাঁচাশতাব্দ প্ৰ স্বতক হইতে বৰ্ত্তমান যাম)

[illegible]

জ্ঞানের সহায়ক, জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ । নির্বাণ-মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি । সালোক্য সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি আপেক্ষিক ও ক্ষয়শীল । শঙ্করমতে বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত । বেদ প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদপ্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । বেদবিরুদ্ধ যুক্তি-প্রমাণ গ্রাহ্য নহে ।

তান্দ্রিকমত

[‘কৌলমাগ’রহস্য’ (৩সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) হইতে অধিকাংশ সংগৃহীত ।]

মোক্ষমাগীয় তন্ত্রমত অদ্বৈতবাদের অনুরূপ । কতকগুলি তন্ত্র শক্তিবিশিষ্টাষ্ট্রৈতরবাদী ; ইহারা শক্তির মিথ্যা স্বীকার করেন না । কিন্তু মহাকাল-সংহিতা-মহাকালীতোষে “যথারঙ্গরজ্জ্বলদৃষ্টিবকমাং নৃণাং রৌপ্যদর্বা করাম্বুজমঃস্যাৎ ।” ইত্যাদি শ্লোকে জগতের মিথ্যা স্বীকৃত হইয়াছে । মহানির্বাণতন্ত্র মতের সহিতও অদ্বৈত-মতের পার্থক্য দেখা যায় না । অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে স্থিত হইবার সাধনসকল তন্ত্রে দেখান হইয়াছে । যাহারা অধিকতর শূন্যচিন্তা ও বৈরাগ্যবান্ তাহারা বেদান্তবিচারদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্থিত হন । কিন্তু যাহাদের তাদৃশ চিন্তাশক্তি ও বৈরাগ্য নাই, তাহাদের পক্ষে তান্দ্রিক সাধনা উপযোগী । এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রকৃত সন্ন্যাস ও সদগুরুদের আশ্রয় ব্যতীত তান্দ্রিক সাধনা অনেক সময় ব্যভিচারে পরিণত হয় । বাংলাদেশে তন্ত্রমতের যথেষ্ট প্রচলন । আমাদের পূজা, সম্প্রদায় প্রভৃতির মন্ত্র এবং বীজমন্ত্রসকল অধিকাংশই তন্ত্র হইতে গৃহীত ।

তন্ত্রমতে ভাব তিনটি :—১) পশুভাব ২) বীরভাব ৩) দিব্যভাব ।

আচার ৭টি :—(১) বেদাচার (২) বৈষ্ণবাচার (৩) শৈবাচার (৪) দক্ষিণাচার (৫) বামাচার (৬) সিদ্ধান্তাচার (৭) কৌলাচার ।

উহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত । বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত । ভাব মানসিক অবস্থা । আচার বাহ্য আচরণ ।

ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্তসার

(পণ্ডিত পীতাম্বরকৃত পুস্তক হইতে বঙ্গানুবাদ)

বিষয়	পূর্বমীমাংসা	উত্তরমীমাংসা	ন্যায়	বৈশেষিক	সাংখ্য	যোগ
প্রকটনকর্তা	জৈমিনি	বেদব্যাস	গৌতম	কণাদ	কপিল	পতঞ্জলি
আচার্য্য						
জগৎ	স্বরূপতঃ অনাদি অনন্তপ্রবাহরূপ সংযোগবিয়োগ- বান্	নামরূপ ক্রিয়াত্মক মায়ার পরিণাম, চেতনের বিবর্ত	পরমাণুদ্বারা আরম্ভ সংযোগ- বিয়োগজন্য আকৃতিবিশেষ	পরমাণু-আরম্ভ সংযোগবিয়োগ- জন্য আকৃতিবিশেষ	প্রকৃতির পরিণাম দ্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক	প্রকৃতির পরিণাম দ্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক
জগৎকারণ	জীব-অদৃষ্ট এবং পরমাণু	অভিন্ননিমিত্তো- পাদন ঈশ্বরাদি	পরমাণু, ঈশ্বর, জীব, আকাশ, দিক্, কাল, মন প্রভৃতি।	পরমাণু ঈশ্বরাদি নব	ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি	কর্মানুসার প্রকৃতি এবং তন্নিয়ামক ঈশ্বর
ঈশ্বর	০	মায়্যাবিশিষ্ট চেতন	নিত্য ইচ্ছা জ্ঞানাদি গুণবান্ বিভিন্ন কর্তাবিশেষ	নিত্য ইচ্ছা জ্ঞানাদি গুণবান্ বিভিন্দ কর্তাবিশেষ	০	ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক আশয় দ্বারা অসং- শ্লিষ্ট পদ্রুদ্যবিশেষ
জীব	জড়-চেতনাত্মক বিভিন্ন, নানা, কর্তা, ভোক্তা	অবিদ্যাবিশিষ্ট চেতন	জ্ঞানাদি চতুর্দশ গুণবান্, কর্তা, ভোক্তা, জড়, বিভিন্ন, নানা	জ্ঞানাদি চতুর্দশ গুণবান্, কর্তা, ভোক্তা, জড়, বিভিন্ন, নানা	অসঙ্গচেতন, বিভিন্দ, নানা, ভোক্তা	অসঙ্গচেতন বিভিন্দ, নানা কর্তা, ভোক্তা
বন্ধহেতু	নিবিশ্ব কর্ম	অবিদ্যা	অজ্ঞান	অজ্ঞান	অবिवেক	অবिवেক
বন্ধ	নরকাদি দুঃখ- সম্বন্ধ	অবিদ্যা ও তৎকার্য্য	একবিংশ দুঃখ	একবিংশ দুঃখ	অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ দুঃখ	প্রকৃতি পদ্রুদ্য সংযোগ- জন্য অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ
মোক্ষ	স্বর্গপ্রাপ্তি	অবিদ্যা ও তৎ- কার্য্যনিবৃত্তিপূর্বক পরমানন্দ ব্রহ্ম- প্রাপ্তি	একবিংশতি দুঃখবৎস	একবিংশতি দুঃখবৎস	ত্রিবিধ দুঃখবৎস	প্রকৃতি পদ্রুদ্য সংযোগা- ভাবপূর্বক অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশনিবৃত্তি
মোক্ষসাধন	বেদবিহিত কর্ম	ব্রহ্মাত্মজ্ঞান	ইতরভিন্নজ্ঞান	ইতরভিন্নজ্ঞান	প্রকৃতি-পদ্রুদ্যবিবেক	নির্বিকল্প সমাধি- পূর্বক বিবেক

রূপেমুক্তির কারণ বটে। অজ্ঞান অনাদি ও অনিৰ্ব্বচনীয়, কিন্তু ইহা অনন্ত নহে, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়। আত্মা (জীবচেতন্য) ও ব্রহ্ম (জগতের অবিস্তান-চেতন্য) এক এবং উভয়েই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আত্মা চেতন, শব্দ ও নিত্যমুক্ত। তথাপি অনাদি অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা যেন বদ্ধ জীব-রূপে প্রতিভাত হন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত-উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। শঙ্কর পরিণামবাদ স্বীকার করেন না অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎরূপে সত্য সত্যই পরিণত হইয়াছেন, ইহা শঙ্করের স্বীকৃত মত নহে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের এক অংশে পরিণাম বা বিকার স্বীকার করিলে অন্যংশে নিবিঁকার থাকিতে পারে না এবং ব্রহ্ম নিবিঁকার হইতে পারেন না। শঙ্করমতে বিকার বা পরিণাম যাহা দৃষ্ট হয়, উহা মিথ্যা। ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মস্বরূপে থাকিয়াও সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে থাকিয়াও অজ্ঞানবশতঃ জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, ইহাই বিবর্ত-বাদ। শক্তিবিংশটোদ্বৈত-বাদিগণ যে বলেন, ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা জগৎরূপে পরিণত হন, সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েই নিত্য শঙ্করের মতের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। শঙ্কর শক্তির নিত্যতা স্বীকার করেন না। কার্য দেখিয়া শক্তির অনুমান করা হয়। কার্য নিম্নত পরিবর্তন-শীল, সুতরাং মিথ্যা। সেই জন্য কার্যের জননী যে, শক্তি, তাহাও তদ্রূপ হইতে বাধ্য, নচেৎ কার্যই সম্ভবপর হয় না। সেই মিথ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবস্ত, উহাই সত্য। শক্তির নিত্যতা স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদ ও বিংশটোদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

শঙ্করমতে ঈশ্বর শব্দসম্বন্ধপ্রধান ও নিত্যমুক্ত। তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়া তাহার মায়া-শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, মায়াশক্তিদ্বারাই তিনি অবতারমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবগণের উদ্ধার করেন। শঙ্করের মতে অজ্ঞানাবস্থায় কর্ম উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ ঐ সকলদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তের শুদ্ধি না হইলে এবং তীর বৈরাগ্য না থাকিলে কখনই অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। শঙ্করের মতে কর্ম ও ভক্তি

জ্ঞানের সহায়ক, জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ। নির্বাণ-মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। সালোক্য সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি আপেক্ষিক ও ক্ষয়শীল। শঙ্করমতে বেদ অপৌরুষেয় ও অল্লাভ। বেদ প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদপ্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদবিরুদ্ধ যুক্তি-প্রমাণ গ্রাহ্য নহে।

তান্দ্রিকমত

[‘কৌলমাগ’রহস্য’ (৩সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) হইতে অধিকাংশ সংগৃহীত।]

মোক্ষমাগীর তন্ত্রমত অদ্বৈতবাদের অনুরূপ। কতকগুলি তন্ত্র শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদী; ইহারা শক্তির মিথ্যা স্বীকার করেন না। কিন্তু মহাকাল-সংহিতা-মহাকালীশ্রেত্রে “যথারঙ্গরাজদ্বন্দ্বিষ্টৈশ্বকমাং নৃণাং রৌপ্যদবাকিরাম্বলমঃস্যাৎ।” ইত্যাদি শ্লোকে জগতের মিথ্যা স্বীকৃত হইয়াছে। মহানির্বাণতন্ত্র মতের সহিতও অদ্বৈত-মতের পার্থক্য দেখা যায় না। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে স্থিত হইবার সাধনসকল তন্ত্রে দেখান হইয়াছে। যাহারা অধিকতর শুদ্ধচিন্তা ও বৈরাগ্যবান, তাহারা বেদান্তবিচারদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্থিত হন। কিন্তু যাহাদের তাদৃশ চিন্তাশুদ্ধি ও বৈরাগ্য নাই, তাহাদের পক্ষে তান্দ্রিক সাধনা উপযোগী। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, প্রকৃত সরথক ও সদগুরুদের আশ্রয় ব্যতীত তান্দ্রিক সাধনা অনেক সময় ব্যভিচারে পরিণত হয়। বাংলাদেশে তন্ত্রমতের যথেষ্ট প্রচলন। আমাদের পূজা, সম্বন্ধ প্রভৃতির মন্ত্র এবং বীজমন্ত্রসকল অধিকাংশই তন্ত্র হইতে গৃহীত।

তন্ত্রমতে ভাব তিনটি :—১) পশুভাব ২) বীরভাব (৩) দিব্যভাব।

আচার ৭টি :—(১) বেদাচার (২) বৈষ্ণবাচার (৩) শৈবাচার (৪) দক্ষিণাচার (৫) বামাচার (৬) সিদ্ধান্তাচার (৭) কৌলাচার।

উহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত। ভাব মানসিক অবস্থা। আচার বাহ্য আচরণ।

পশুভাব—যাহার অবিদ্যার আবরণ কিঞ্চিৎমাত্রও অপসারিত হয় নাই, যে দ্বৈতভাবে পূর্ণ, ‘আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমার পুত্র, আমার ধন’ এই প্রকার অহংকারে আত্মহারা—এই প্রকার জীব পশুসংজ্ঞায় অভিহিত। রজ্জু যেমন পশুকে বঁধিয়া রাখে, এই প্রকার জীবও অবিদ্যারূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ, সুতরাং পশু।

বীরভাব—যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহৃদয়ের কণিকামাত্র আশ্বাদন পাইয়া বীরের মত অবিদ্যারজ্জুছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহৃদয়ের সম্মানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর। বীর সাধকের মানসিক অবস্থার নাম বীরভাব। এই অবস্থায় দ্বৈতভাবে কিঞ্চিৎ অপসারিত হয়, অদ্বৈতভাব ভাসা ভাসারূপে দেখা দেয়, কিন্তু স্থায়ীভাবে পরিণত হয় না। সাধক তখন জাগতিক সমস্ত পরার্থে শিব-শক্তির মিথুনীকৃত বিভূতিক্ষমে ধারণা করিবার অধিকার লাভ করেন।

দিব্যভাব—সাধক বীরভাবের সাধনদ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া উপাস্য দেবতার সন্তায় নিজের সত্তা ডুবাইয়া দিয়া নিম্নলিখিত আনন্দ অনুভব করেন ; এইজন্য এই সাধকের নাম দিব্য এবং এই অবস্থার নাম দিব্যভাব।

বেদাচার—সাধক বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদিতে উক্ত, আচার অবলম্বন করিয়া কামনাপূর্বক উপাস্য দেবতার উপাসনা করিবে। ইহার নাম বেদাচার বা পঞ্চাচার। বেদাচারপরায়ণ সাধক পঞ্চায়ে দেবতাপূজা করিবে, পরম্পরী গমন করিবে না, ঋতুকালভিন্ন স্বস্তীতে উপগত হইবে না, পণ্ডপত্র মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না, পণ্ডতত্ত্ব গ্রহণ করিবে না, তাহার নিন্দাও করিবে না। বেদ ও স্মৃতির বিধানিষেধ পালন করিবে।

বৈক্যাচার—সাধক এই আচারে বেদাচারোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে। মাংসভোজন অষ্টাঙ্গ-মৈথুন একেবারে পরিত্যাগ করিবে। রাগিতে জপ ও পূজা করিবে না। হিংসা, পরনিন্দা ও কৌটীলা বর্জন করিবে। সম্বন্ধ কামনারহিত হইয়া ইস্টদেবতার আরাধনা করিবে।

শৈবাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে শিব ও শক্তির আরাধনা করিবে। বৈশ্ব পশুধিংসা করিবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন-পূর্বক ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে।

দক্ষিণাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে উপাসনা করিবে। বিশেষ এই যে রাত্রিতে বিজয়া (দিশি, ভাঙু) পান করিয়া একাগ্রমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। এই আচারে স্ব স্ব বর্ণশ্রমধর্ম পালনকরতঃ “দেবীভূত্বা দেবীং যজ্ঞে।” আত্মাকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া দেবীর পূজা করিবে। দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের সংযোজক অর্থাৎ দক্ষিণাচার পর্য্যন্তই পশুভাবের সাধনার শেষ ; ইহার পর বীরভাবের সাধনা।

বামাচার—দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দেবীর আরাধনা করিবে। রাত্রিতে ভোজন করিয়া পণ্ড ‘ম’কারদ্বারা দেবীর পূজা করিবে। বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। তন্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবে। বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করিবে না ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না। আত্মাকে বামা অর্থাৎ শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এইজন্য এই আচারের নাম বামাচার।

সিদ্ধান্তাচার—সাধক এই আচারে বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবেন, পরন্তু অস্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হইবে। প্রধানরূপে অস্তর্যাগ ও তাহার অঙ্গরূপে বহির্যোগ করিবে। আত্মাকে সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র মনে করিতে হইবে। শোধনের দ্বারা সকল দ্রব্যই শুদ্ধ হয়, কোন দ্রব্যই অশুদ্ধ থাকে না, এইরূপ সংস্কার মনে বশমূল করিতে হইবে।

কৌলিচার—সাধক কৌলজ্ঞান লাভ করিলে জগতের বিধাতা ও সংহর্তা হইয়া সদাশিবত্ব লাভ হইতে পারেন। এই আচারের উপাসনায় দিক্, কাল, আসন প্রভৃতির নিয়ম নাই। কৌল সাধকগণ কোন সময়ে শিষ্ট, কোন সময়ে নষ্ট অর্থাৎ উন্মত্তবৎ, কোন সময় ভূত পিণ্ডাচার মত মানা বেশ ধারণ

করিয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন । তিনি কন্দমে ও চন্দনে, পদ্মে ও শতদ্রুতে
‘মশানে ও ভবনে, স্বর্গে ও তৃণে অভেদজ্ঞান করেন ।

‘‘কুলং মাত্ৰমানমেয়ম্ । মাতা জীবঃ, মানং প্রমাণং জ্ঞানমিতি যাবৎ, মেয়ম্,
ঘটপটাদিরূপং বিবর্ম্মিতি যাবৎ ।’’ ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম হইতে
অর্পি ত্রিক্ত নহে’—ইত্যাকার অদ্বৈতজ্ঞানই কৌলজ্ঞান । পূর্বোক্ত প্রমাতা বা জীব,
সমস্ত বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান এক অদ্বৈত ব্রহ্ম ।’ কৌলজ্ঞানের সাধকগণও
‘কৌল’ নামে আখ্যাত হন ।

‘‘অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ।

কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥’’

সহস্রারে পরমশিব, হৃৎশব্দে জীবাত্মা এবং মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তি অবস্থিত ।
জীবাত্মা পঃশিব হইতে চেতন্য ও কুণ্ডলিনী হইতে শক্তি লাভ করেন ।

পঞ্চ ম কার :—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মদ্রা মৈথুন । মহানির্বাণতন্ম্রে পঞ্চমকারের
আবার্য্যক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । উচ্চতরের সাধকের মদ্য, মাংসাদি ব্যবহারের
প্রয়োজন হয় না । ব্রাহ্মদের ভোগস্পৃহা আছে, তাহাদিগকে ভোগের মদ্য দিয়া
ক্রমশঃ ত্যাগে এবং জ্ঞানে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য । পরিমিত
মদ্যপান চিত্ত একাগ্রতায় সাহায্য করে । তান্ত্রিক চক্রে বসিলে দুর্বল সাধকও
চিত্ত একাগ্র করিতে পারেন ও চিত্তে বল পান । উপযুক্ত সাধক ব্যতীত চক্রানুষ্ঠান
অনেকসময় ভাড়াখানায় পরিণত হয় । বিশেষতঃ চক্রাধীশ উপযুক্ত হওয়া চাই ।
তান্ত্রিক সাধনা জ্ঞানী সদগুরুদর আশ্রয়ে গোপনে অনুষ্ঠেয় ।

সাংখ্যমত (দ্বৈতবাদ)

মহামুনি কপিল সাংখ্যমতের প্রবর্ত্তক । সাংখ্যমতে দুইটী প্রধান তত্ত্ব ধরা
হয় :—(১) পদ্রুশ (২) প্রকৃতি : প্রকৃতির, মহত্তত্ত্ব, অহংকার প্রভৃতি বিকার
হইয়া থাকে । পদ্রুশ নিবিংকার । প্রকৃতির বিকার-সমেত সাংখ্যমতে তত্ত্ব ২৫টি ।
সাংখ্যমতে পদ্রুশ চেতন, বহু, সর্বদা নিবিংকার ও নিষ্ক্রিয় এবং সৃষ্টিকার্য্যে উদাসীন।

দ্বিগুণাখ্যিক জড়া প্রকৃতিই (প্রধানই) চেতন পদ্রুশের সান্নিধ্যে (চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহের ন্যায়) বিচলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। অতরাং জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতিই কঠী; প্রকৃতি পদ্রুশের ভোগ ও অপবর্গসিদ্ধির জন্য পরিণাম প্রাপ্ত হন। সাংখ্যমতে প্রকৃতিপদ্রুশ বাতীত সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করা হয় না। প্রকৃতি সমস্ত কর্ম করিলেও অব্যবহৃতঃ প্রকৃতির ঐ কতৃৎ পদ্রুশে আরোপিত হয় মাত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতির সত্যত্ব; জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে উহার কঠীত্ব এবং পদ্রুশের বহুত্ব স্বীকৃত হয়। অদ্বৈতমতে চেতন পদ্রুশ-বাতীত জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় উহাকে মিথ্যা বলা হয়, চেতন ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করা হয় এবং পদ্রুশের বহুত্ব স্বীকার করা হয় না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পদ্রুশের বিবেকদ্বারা যখন উহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন মুক্তি। যদিও স্বরূপতঃ পদ্রুশের ভোগ ও মোক্ষ সম্ভব নয়, তথাপি যখন পদ্রুশ (আত্মা) অব্যবহৃতঃ প্রকৃতির বিকারসমূহের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলেন, তখন আত্মা যেন ভোক্তা হইয়া পড়েন, তখনই আত্মাতে বশমোক্ষ আরোপিত হয়। সাংখ্যমতকে সংকার্যবাদ বলা হয়। অর্থাৎ এইমতে বলা হয়, কার্য কারণে অব্যক্ত-ভাবে থাকে, পরে উহাই ব্যক্ত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান হয়, তিলে তৈল আছে বলিয়াই তিলকে পেষণ করিলে তৈল বাহির হয়, না থাকিলে উহা হইত না। বালু পেষণ করিয়া তৈল নিগত হয় না। অসৎ অর্থাৎ ষাহা একেবারে নাই, তাহা হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় উহাকে সেশ্বর-সাংখ্য বলা হয়। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতের পার্থক্য এই যে, সাংখ্যমতে যোগনিরপেক্ষ প্রকৃতি পদ্রুশের বিবেকদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ইহাই বলা হয়। আর পাতঞ্জল-সিদ্ধান্তে যোগদ্বারা চিন্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তবেই দ্রষ্টা পদ্রুশের স্ব-স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয়, ইহা বলা হয়। পদ্রুশের বহুত্ব, প্রকৃতির জগৎ-কঠীত্ব এবং উহার সত্যতা এসকল বিষয়ে সাংখ্যমতের সহিত অদ্বৈতমতের পার্থক্য বিদ্যমান। অদ্বৈতমতে পদ্রুশের একত্ব, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব এবং জগতের

মিথ্যাভূত স্বীকার করা হয়। অন্যবিষয়ে উভয় মতের সাদৃশ্য বিদ্যমান। সাংখ্যমতে ২৫টী তত্ত্ব :—(১) পুরুষ (২) প্রকৃতি (৩) মহত্ত্ব (৪) অহংতত্ত্ব (৫) মন (৬) স্কান্দেন্দ্রিয় ৫টী (৭) কর্মেন্দ্রিয় ৫টী (৮) ভস্মাত ৫টী (৯) আকাশাদি মহাভূত ৫টী।

ন্যায়মত (দ্বৈতবাদ)

মহর্ষি গৌতম ন্যায়মতের প্রবর্তন করেন। মহর্ষি কণাদকে বৈশেষিক মতের প্রবর্তক বলা হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক মত প্রায় একই প্রকার। এই দুই মতের অসংকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ বলা হয়। এই মতে 'কার্য' কারণের মধ্যে থাকে না ' ইহাই বলা হয়। যাহা সং বা বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উৎপত্তি কি? কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি বা আরম্ভ হয়। কারণ হইতে উৎপন্ন যে কার্যবস্তু উহা কারণ হইতে ভিন্ন। সূত্র হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, উহা সূত্র হইতে ভিন্ন বস্তু, উহা সূত্রমধ্যে ছিল না।

ন্যায় মতে ঈশ্বর, জীব, আকাশ, কাল, দিক, মন, পার্থিব, জননীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুসকল,— এইগুলি নিত্যবস্তু অর্থাৎ ইহারা সর্বকালেই বিদ্যমান। পৃথিব্যাদি চারিটি ভূতের যাহা সর্বাংশে সূক্ষ্ম অংশ, যাহাকে আর ভাগ দ্বারা যায় না, উহাই পরমাণু। পরমাণু নিরবয়ব ও অদৃশ্য বস্তু। দুইটি পরমাণুতে একটি বস্তুকের উৎপত্তি। উহাও অতিসূক্ষ্ম এবং অল্পপরিমাণ। তিনটী দ্ব্যণু অথবা ছয়টী পরমাণুতে একটি বস্তুকের উৎপত্তি হয়। উহা প্রত্যক্ষযোগ্য হয়।

এই মতে আত্মজ্ঞান দ্বারা মূর্তিলাভ হয়, বলা হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মার সহিত সাদর্ম্য ও বৈষম্য নিরূপণ করিয়া আত্মভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক বলা হয়। আত্মভিন্ন পদার্থ ১৬টী উহাদের নাম :—(১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) বিতণ্ডা (১২) জল্প (১৩) হেতুভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি ও (১৬) নিগূহস্থান।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত বস্তু পারমাণবরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টিকর্তা নিত্যমুক্ত সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবগণের কর্মফল প্রদানজন্য পরমাণু-পুঞ্জকে পুনরায় মিলিত করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর স্বাধীন ও সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ। কিন্তু সৃষ্টাদি বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষ নিমিত্তকারণ নহেন, অর্থাৎ তাহাকেও জীবের কর্মসংস্কারসমূহের অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি করিতে হয়, নতুবা তাহাতে বৈষম্য নৈবদ্য প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। পরমাণুসকল জন্য দ্রব্যের উপাদানকারণ। “অদ্বৈতবাদে আত্মা এক, কিন্তু আরম্ভবাদে আত্মা বহু। অদ্বৈতবাদে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু আরম্ভবাদে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহেন, (কিন্তু চৈতন্য বা জ্ঞান তাহার গুণ, আত্মার সাহিত মনের সংযোগে তাহাতে চৈতন্যরূপ গুণ জন্মিয়া থাকে)। পরমাণুর চৈতন্য নিত্য, জীবাণুর চৈতন্য অনিত্য, সুতরাং সময়বিশেষে আত্মা (জীবাণু) জড়। অদ্বৈতবাদে জীবাণু বস্তুতঃ নিগূঢ়—জ্ঞান, ইচ্ছা, সূক্ষ্ম, দৃঃখাদি অন্তঃকরণের স্বর্গ। কিন্তু আরম্ভবাদে জীবাণু সগুণ জ্ঞান, ইচ্ছা, সূক্ষ্ম, দৃঃখাদি জীবাণুরই বাস্তব গুণ। আরম্ভবাদে জগৎ সত্য; অদ্বৈতবাদে জগৎ মায়ামূলক মিথ্যা অর্থাৎ জগতের পারমাণবিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে” (ন্যায়পরিচয় মহামহোপাধ্যায় ৩ফণিভূষণ তর্কবাগীশ)। ন্যায় মতে সর্ববিধ দৃঃখের অভাবই মোক্ষ। শ্রবণ, মনন, নির্দিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ন্যায় মনন-শাস্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা হইতে চৈতন্য, সূক্ষ্ম, দৃঃখাদি সমস্ত বিশেষগুণের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে আকাশের ন্যায় জড়বৎ স্থিতিই মোক্ষ। মোক্ষে আনন্দের অনুভূতি হয় না। মোক্ষকালে আত্মা পরমাণু হইতে ভিন্ন থাকিয়া দৃঃখরহিত হইয়া জড়ভাবে অবস্থান করেন।

শূন্যবাদী বৌদ্ধমত (অসংখ্যাতিবাদ)

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে শূন্যই চরমতত্ত্ব। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, উহাদের সকলেরই স্বরূপ শূন্য। রঞ্জিতে যে সর্প দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রেও রঞ্জিত এবং সর্প উভয়েই স্বরূপ শূন্য, অর্থাৎ উহারা নাই। তথাপি যে জগৎ

দেখা যায়, ইহা অনাদি ভ্রমধারামাত্র। অদ্বৈতবাদিগণ এই আপত্তি করেন যে, নিরবস্থান স্থানিত হইতে পারে না। রজ্জুতে সপ'স্থানিতকালে সপের অবস্থান একটি রজ্জুরূপ সত্যবস্তু থাকা চাই, নতুবা কিরূপে স্থানিত হইবে? এইরূপ জগদ'স্থানিতর অবস্থান একটি সদ'বস্তু আছে, উহাই ব্রহ্ম। উহা শূন্য নহে। শূন্য-বাদ প্রমাণ করিবার জন্য শূন্যবাদীর নিজের সত্তা থাকা চাই। নিজের সত্তা নাই, ইহা অনদ্ভববিরূদ্ধ কথা। আবার নিজের সত্তা নাই, ইহা জানিবার জন্য পুনরায় নিজের সত্তা স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। অতএব শূন্যবাদ পরম তত্ত্ব নয়।

কণিক-বিজ্ঞানবাদী বোধধর্মত (আত্ম-খ্যাতিবাদ)

কণিকবিজ্ঞানবাদ বোধধর্মের মতে কণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই আত্ম। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই ভ্রমবশতঃ আন্তর-বাহ্য পদার্থ'রূপে প্রতিভাত হইতেছে, নতুবা বাহ্যাত্মকতর কোন পদার্থ নাই। যখন বিষয়াকারা বিজ্ঞানধারা বহিত হইয়া নিরাকার বিজ্ঞানধারা বহিতে থাকিবে, তখন এইমতে মুক্তি বা নির্বাণ। এই মতে দুইটী বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হইতেছে, একটী 'আলয় বিজ্ঞান' অপরটী 'প্রবৃত্তিবিজ্ঞান'। আলয়বিজ্ঞানধারা 'অহং', 'অহং', রূপে প্রবাহিত হইতেছে, আর প্রবৃত্তিবিজ্ঞান 'ইদং' 'ইদং' রূপে বা জগদ'রূপে প্রবাহিত হইতেছে। অনাদিকাল হইতেই এই ভ্রমধারা চলিয়া আসিতেছে। উভয় বিজ্ঞানধারাই কণিক অর্থাৎ প্রত্যেক বিজ্ঞান একক্কে উৎপন্ন হইয়া পরক্কেই নাশ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু নাশ হইবার পূর্বে একটী সদ'শ বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া যাইতেছে। ঘট, পটাদিকে যে আমরা একটি স্থির বস্তু বলিয়া ব'ঝি, উহারা ঘটাকারী পটাকারী বিজ্ঞান-ধারা-প্রবাহ-ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন একটী জলাধারা যখন প্রবাহিত হয়, তখন একক্কে একস্থানে স্থিত জল পরক্কে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতেছে এবং সদ'শ অন্য জল অ'সিয়া সেই স্থান অধিকার করিতেছে; এইরূপ ক্রমাগত চলিয়াছে ঐ ধারাই একটী নদীরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন পর পর স্পন্দনের ফটো দ্বারা ব্যারোস্কোপের ছবি দেখান হয়, এইরূপ পর পর বিজ্ঞানধারাই স্থির ঘট, পটাদিরূপে

প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপেই আলয়-বিজ্ঞানধারা চলিতে থাকায় 'আমি' বলিয়া একটী স্থির প্রতীতি জন্মিতেছে। যদি এই সিদ্ধান্ত মানা যায়, তবে যে আমি একক্ষণে একটী ঘট দেখিলাম, সে আমি আর পরক্ষণে নাই। পরক্ষণে একটী সদৃশ নূতন আমি। এই নূতন আমি কিরূপে স্মরণ করিবে, 'ইহা সেই পূর্বদৃষ্ট ঘট', যাহা এই নূতন আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করে নাই? সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে আমি এক। সুতরাং এই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মত অনুভববিরুদ্ধ কথা। জগৎ পরিবর্তনশীল বটে, কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনকে জানিবার জন্য একটী স্থির বস্তু চাই। আরও নিরাকার বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে।

বিশিষ্টাঐতবাদ

ইহা রামানুজাচার্যের প্রচারিত মত। রামানুজের স্থিতি-কাল ১০১৭—১১৩৭ সাল।

এই মতে তত্ত্ব তিনটী (১) চৈতন্য (জীব), (২) অচৈতন্য (জড়জগৎ), (৩) পদ্রুশো-ভূম। রামানুজ বলেন 'ব্রহ্ম অঐতই বটেন, তবে সেই অঐত্রে কিছু বিশেষ আছে। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ। এইরূপ জীব ও জগদ্বিশিষ্ট অঐত ব্রহ্মই (সগুণ) জগতের কারণ। সুতরাং এই মতকে বিশিষ্টাঐতবাদ বলা হয়। রামানুজের মতে ব্রহ্মে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। মনুষ্যে মনুষ্যে যে ভেদ উহা স্বজাতীয় ভেদ, মনুষ্য পশুতে যে ভেদ উহা বিজাতীয় ভেদ। একটি বৃক্ষের সহিত উহার পত্র পল্লব, পুষ্প, ফল প্রভৃতির যে ভেদ, উহা স্বগতভেদ। এই স্বগতভেদগুলি এক বৃক্ষেরই অন্তর্গত, তাই ঐ সমস্ত ভেদ লইয়াই একবৃক্ষরূপে ব্যবহার করা হয়। এইরূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ এবং ঐ ভেদগুলি লইয়া এক অঐতব্রহ্ম। ব্রহ্মের জগদংশ বিকারী, অন্য চেতন-অংশ নির্বিকার। এই বিকারী এবং নির্বিকার উভয় অংশ লইয়া এক অঐত ব্রহ্ম। অঐতবাদিগণ বলেন, যেমন 'একটী কুর্কটের এক অংশ পাক করা হইতেছে ও অপর অংশ জীবিত আছে' এইরূপ হওয়া অসম্ভব, এইরূপ যদি

ব্রহ্মের এক অংশে বিকার স্বীকার করা হয়, তবে অন্য অংশে নির্বিকার থাকিতে পারে না। রামানুজের অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তি ছিল। তিনি বেদান্তসূত্রের গ্রীভাষা এবং অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বপক্ষস্থাপনে এবং অষ্টেতবাদ-খণ্ডনে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। নিম্নে শঙ্কর ও রামানুজ মতের কতিপয় পার্থক্য দেখান হইল।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নির্বিকার, স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-শূন্য। রামানুজের মতে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, এক অংশে বিকারী, অপর অংশে নির্বিকার। ব্রহ্মে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষে ও নিগূঢ়; রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্বিশেষ ও সগূঢ়। তাঁহার মতে শাস্ত্রে যে ব্রহ্মকে নিগূঢ় বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য, ব্রহ্মে যেই গুণের নিষেধ করা। ব্রহ্ম দয়া, আনন্দ, জ্ঞান প্রভৃতি অশেষ কল্যাণ-গুণের আকর। শঙ্কর বিবর্তবাদী, রামানুজ পরিণামবাদী। শঙ্কর বলেন, 'জীবের অজ্ঞান নাশ হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়। 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের বিচারদ্বারা জ্ঞান হয়। মহাবাক্যসকল জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক। রামানুজ বলেন 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের অর্থ 'তস্য ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তুমি তঁহার দাস।' আর 'অহংব্রহ্মাশ্মি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যগুলি সাধকের উৎসাহবাক্য স্বত্বাত্মক। জীব ভগবানের নিত্য-দাস, মূর্ত্তি দশায়ও জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইবে না মূর্ত্তিদশায় জীব প্রাকৃত দেহত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃতদেহে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ তখন তাহাকে নিজ অঙ্কে ধারণ করিবেন এবং দাসরূপে গ্রহণ করিবেন। এই ভগবদ্দাসত্বই মূর্ত্তি। মূর্ত্ত জীব অপ্রাকৃত-দেহে নারায়ণের সমান ভোগ লাভ করিয়া থাকেন এবং ভগবানের চিরদাস। লাভ করিয়া সেবকরূপে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। রামানুজের মতে জীব অণুচেতন্য, ভগবান্ বিজ্ঞচেতন্য, অণু কখনও বিজ্ঞ হইতে পারে না। অষ্টেতবাদিগণ বলেন, 'চেতন্য সৎস্বাদ্য একরূপ; তাঁহার অণুত্ব, বিভূত্ব সম্ভব নয়। অণুত্ব, বিভূত্ব প্রভৃতি প্রকৃতি রাজ্যের কথা। জীব অজ্ঞানকণ্ঠে অণুতে অভিমান করিয়াই

অণু হইয়া পড়েন। অজ্ঞান কাটিয়া গেলে অণুত্ব, বিভ্রম-শূন্য আপন শূন্যস্বরূপে বিরাজ করেন।' শঙ্কর বলেন জ্ঞান নির্বিকল্প ও নিরপেক্ষ; রামানুজ বলেন জ্ঞান সর্বদা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দ্বিপদটিযুক্ত, সুতরাং জ্ঞান নির্বিকল্প হইতে পারে না। (অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিপদটিযুক্ত জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলেন, স্বরূপজ্ঞান দ্বিপদটির প্রকাশক ও নির্বিকল্প)। রামানুজ 'তত্ত্বমসি' 'মহৎব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বেদের মহাবাক্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সরল স্বাভাবিক অর্থ ত্যাগ করিয়া তাহাকে কষ্টকল্পনা করিতে হইয়াছে। শঙ্কর বেশীর ভাগ প্রতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, রামানুজকে অনেকটা পুরাণপ্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ইহা আচার্য নিম্বাকের প্রচারিত মত। এই আচার্যের মতে ব্রহ্ম, জীব (চেতন) ও জগৎ (অচেতন) হইতে অভ্যন্ত পৃথক্ও বটেন, অপৃথক্ও বটেন। এই যে পৃথক্ এবং অপৃথক্, ভেদ ও অভেদ—উভয় ভাবই সত্য। মাটির সহিত ঘটের সম্বন্ধ পৃথক্ কি অপৃথক্? যদি বলা যায় পৃথক্ তবে মাটি বাদ দিয়া ঘট দেখান যায় না। সুতরাং পৃথক্ স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি বলা যায় অপৃথক্, তবে মাটির দ্বারা জল আনা যায় না, ঘট দ্বারা জলানয়ন সম্ভব হয়, সুতরাং অপৃথক্ও সম্ভব নয়। সুতরাং মাটির সহিত ঘটের সম্বন্ধ পৃথক্ও বটে অপৃথক্ও বটে। (অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, একই বস্তু একই কালে দুইটি বিরুদ্ধ সম্বন্ধবিধিগণিত হইতে পারে না। ভেদাভেদ সম্বন্ধের মধ্যে ভেদটি মিথ্যা, অভেদটি সত্য। নিম্বাকমতে ভেদ অভেদ উভয়ই সত্য। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। ব্রহ্ম জগতের অতীতও বটেন সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্ম ভেদও আছে। জগৎ গুণাত্মক, ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণকে পৃথক্ দেখান যায় না। আবার গুণী ব্যক্তিই

গুণ নহে, সুতরাং উভয়ের ভেদাভেদ সম্ভব। এইরূপ গুণ ও ব্রহ্মকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখিলে ব্রহ্ম নিগুণ, ভেদ-দৃষ্টিতে দেখিলে তিনিই সগুণ। এই উভয়ই ব্রহ্মের ভাব সুতরাং উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্, স্বীয় অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তির বলেই তিনি নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করেন। কিন্তু আপনাকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও তিনি অবিকৃতরূপে অবস্থান করেন, ইহাই তাহার সর্বশক্তিমত্তা। নিম্বাক্রমে জীব ব্রহ্মের অংশ ও নিত্য। মুক্তিতেও জীব অংশই থাকে। জীব পূর্ণব্রহ্ম হইতে পারে না। এই আচার্য্যের মতে ভক্তিই মুক্তির সাধন। উপাসনার ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। আপনাকে ও সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ভক্তির অঙ্গীভূত। ভক্ত জগদতীত ভগবান্কেও চিন্তা করেন। মুক্ত অবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত আপনার ও জগতের অভেদ দর্শন করে। এইমতে মুক্তি দণায় জীবের অগুণ বজায় রাখিয়া কিরূপে ভূমি ব্রহ্মের সহিত জীব একত্ব অনুভব করিতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। আচার্য্য নিম্বাক্র 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহাতে সংক্ষেপে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্বাকাচার্য্যের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী।

স্বতন্ত্র্যতন্ত্রবাদ

ইহা মধ্বাচার্য্যপ্রচারিত দ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্য্য প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও নানা শাস্ত্র সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত-খণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস করেন। তাহার স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী। মধ্বাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উহার নাম 'পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য'। মধ্বাচার্য্যমতে ব্রহ্ম সগুণ ও সর্বিশেষ। জীব অগুণ পরিমাণ ভগবানের দাস। জগৎ সত্য। এইমতে পদার্থ দ্বিবিধ :— (১) স্বতন্ত্র (২) অস্বতন্ত্র। অশেষগুণমুক্ত ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। মধ্বাচার্য্যের মতে জীব ভগবানের দাস। দাস

হইয়াও যদি জীব ভগবানের সহিত নিজেকে সমান জ্ঞান করে, তবে ভগবান্ তাহাকে অধঃপাতিত করেন। ভগবানের সেবা-ব্যতীত জীবের অন্য কর্তব্য নাই। মধ্বাচার্য্যও রামানুজের ন্যায় নির্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন না। এই আচার্য্যের মতে অশেষ-গুণসম্পন্ন বিষ্ণুই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। জীব ও জগৎ বিষ্ণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। বিষ্ণুই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা, তিনি অশেষ কল্যাণগুণের আকর—শাস্ত্র তাহাকে এই অর্থেই নিগদ্য বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে মধ্বাচার্য্য রামানুজের সহিত একমত। এই বিষ্ণু সগুণ ও সবিশেষ, নিগদ্য ও নির্বিশেষ নহেন। জীব ও জগৎ ভগবানের অধীন, জীব চেতন, জগৎ অচেতন। রামানুজের মতে ঈশ্বর জগদাকারে পরিণত, সূতরাং জগৎ পরিব্যাপ্ত। মধ্বমতে জগতে ও ভগবানে পৃথক্ নিত্য ভগবান্ নিয়ন্তা, জগৎ নিয়ম্য। মধ্বমতে ভক্তিই মুক্তির সাধন। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে ভগবান্ প্রীত হইলে তাহার কুপায় মুক্তি লাভ হয়। রামানুজমতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, মধ্বমতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে এবং ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। আচার্য্য মধ্বের মতে বিষ্ণুই স্বতন্ত্র—ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি তাহার অধীন। রামানুজের ন্যায় মধ্বাচার্য্যও জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন না। এই মতে বিষ্ণুর সালোকা ও সারূপ্য প্রাপ্তিই মুক্তি। ঈশ্বর, জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এই জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইলে, ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষের উপলব্ধি হইলে, জাগতিক পদার্থ সমূহের যথার্থ স্বরূপ বোধ হইলে, তবেই ভগবৎপ্রসাদে মুক্তি লাভ হয়। ধ্যান ও উপাসনাদ্বারা মুক্তি লভ্য বস্তু। মুক্তিতেও জীব ঈশ্বরের সেবকই থাকে। এই আচার্য্যমতে বিষ্ণুদ্রোহী, বৈষ্ণবদ্রোহী, বেদদ্রোহী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পাপের ফলে অনন্তকাল নরক ভোগ করে। কিন্তু শংকর প্রভৃতির মতে ভোগ ক্ষয় হইলে জীবের পুনরভ্যুদয় ঘটে।

মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ

ইহা বল্লাভাচার্য্যের প্রচারিত বৈষ্ণবমত। বল্লাভাচার্য্যের স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। বল্লাভাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের চতুরথ্যায়ের

ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহার নাম 'অণুভাষ্য'। বল্লভাচার্য্যের মতে জীব অণু ও সেবক জগৎ সত্য। ব্রহ্ম নিগূঢ় ও নির্বিশেষ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রহ্ম। তিনি জীবের সেবা। জীবাত্মা ও পরমাাত্মা উভয়ই শূন্য। এই জন্য বল্লভের মত শূন্যত্ব নামে পরিচিত। বল্লভের মতে গোলোকস্থ পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে নিভররসাবেশে পতিভাবে ভগবানের সেবা করাই মোক্ষ। বল্লভের মতে জ্ঞান ও ভক্তিমাগ অবেক্ষা প্রীতি-মাগই উৎকৃষ্ট। ইহার মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই (মধ্বমতে উপবাসের প্রাচুর্য্য আছে)। উত্তম বসন ভূষণ পরিয়া ও সুখাদ্য অন্ন পানাদি সমস্ত বিষয় সম্ভোগ-পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিতে হইবে। বল্লভের এই মতের ফলে তৎসম্প্রদায়ের গোপ্বামীরা অতিশয় বিলাসপ্রিয় এবং ভগবানকে পতিরূপে দেহদ্বারা সেবা করার নামে তৎসম্প্রদায়ে ব্যভিচার প্রশয় পাইয়াছে। বল্লভের মতে ব্রহ্ম শব্দাতীত নহেন, তিনি শব্দের বিষয় এবং শাস্ত্রেকগম্য। ব্রহ্ম সাকার, সর্বগতিমান, সর্বজ্ঞ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রাকৃতিক তিনগুণ নাই, সুতরাং তিনি নিগূঢ়। ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য। সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মের ও বাক্যের সমাবেশ তাহাতে হইতে পারে। এই বিরুদ্ধধর্মপ্রসূত ব্রহ্মের ভূষণ। ব্রহ্মই কর্তা এবং ভোক্তা। সৃষ্টিকর্তা হইয়াও ব্রহ্ম নির্বিকার, উপাদান কারণ হইলেও তাহাতে সংসার ধর্ম নাই, তাহার শক্তি অলৌকিক। স্বর্ণ কুণ্ডলাকার হইলেও যেমন স্বর্ণের বিকার হয় না, এইরূপ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম বিকৃত হন না। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য্য। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। সেইজন্য ব্রহ্ম সং বলিয়া জগৎ ও সং। ব্রহ্ম চরীড়ার জন্য স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হন, আবার তাহার ইচ্ছায় জগতের তিরোধান ঘটে। জগৎ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কিংবা মারিক নয়। জগৎ সত্য হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবশীল। জীব ব্রহ্মের অংশ এবং অণু তিনি হৃদয়ে অবস্থিত; চৈতন্য জীবের গুণ। যেমন একস্থানস্থিত চন্দনের গন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, এইরূপ অণু চৈতন্যের গুণ সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত হয় এবং মণির কান্তি যেমন দূরদেশে ব্যাপ্ত হয়,

সেইরূপ চৈতন্যও প্রসারণশীল। বল্লভের মতে গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যই মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা ও সর্বাঙ্গভাবই মুক্তি। সর্বাঙ্গভাব লাভ হইলে শুদ্ধজীব জগৎ কক্ষময় দেখেন এবং কৃষ্ণের প্রেমে তাঁহাকে স্বামিরূপে সেবা করিয়া পরমানন্দরসে বিভোর থাকেন। পদ্রুমোক্ত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত জীব সকল ভোগ প্রাপ্ত হন। ভগবানের প্রসাদেই পদ্রুমিমাগীর ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধি হয়, ইহাতে যত্নের আবশ্যকতা নাই। ভগবানে সম্যক্ আত্মনিবেদনপূর্বক স্বামিভাবে তাঁহার সহিত নিত্যরসাবেশে থাকাই পদ্রুমিমাগীর সাধন। পদ্রুমিমাগীর ভগবান জীবকে স্বয়ং বরণ করেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

অচিন্ত্য-ভেদাভেদকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত বলা হয়। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মতাবলম্বী। শ্রীচৈতন্যদেবের লিখিত কোন পুস্তক পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য রূপ ও সনাতন এবং তাঁহাদের দ্বাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর গ্রন্থ হইতে চৈতন্যদেবের মত জানিতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী দার্শনিক ভিত্তিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। চৈতন্যদেব ৪৮ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন (১৪৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত)। এই সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া মান্য করেন, সেইজন্য এই সম্প্রদায়ে প্রথমে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ছিল না, পরে বলদেব বিদ্যাভূষণ একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উহার নাম ‘গোবিন্দ ভাষ্য’।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদের অর্থ ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ ভেদ এবং অভেদ। কিন্তু একই কালে একই বস্তুতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিরূপে থাকিতে পারে? তাহার উত্তর ভগবানের শক্তি অচিন্ত্য। আমাদের বুদ্ধি উহার ধারণা করিতে না পারিলেও অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে উহা সম্ভব।

বলদেবের মতকেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জীব অঙ্গ, ভগবানের দাস, জগৎ সত্য এবং জীব কখনও ভগবানের সমান হইতে

পারে না—এ সকল বিষয়ে রামানুজ, মধব, বল্লভ বা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ একমত । রামানুজ ও মধবমতে দাসভাবের প্রাধান্য । বল্লভের মতে দাসভাব স্বীকার করা হইলেও উহার প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই । গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বামিস্ত্রীভাবে সেবাই পরম পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । গোড়ীয় বৈষ্ণবমতে বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে পূর্বেবাক্ত বৈষ্ণব মতগুলির সংমিশ্রণ দেখা যায়, উহা ছাড়া গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে । ইহারা দাসভাবের উপর আরও ৪টি ভাবের সংযোগ করিয়াছেন । ইহাদের মতে ভাব ৪টি :—(১) শাস্ত (২) দাস্য [৩] সখ্য [৪] বাৎসল্য ও [৫] মধুর । ইহার মধ্যে মধুর ভাবটি বল্লভের পদ্বিষ্ট-মার্গের ভাবের অনুরূপ । শাস্তাশ্রিত ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে আত্মনিবেদনের ভাব পরিস্ফুট থাকিলেও প্রবৃত্ত-শূন্য সাধনের ব্যবস্থা থাকায়, উহা অনেক ক্ষেত্রে অধিকার লাভের পূর্বে ব্যক্তিগত সাধনা ত্যাগপূর্বক তরল তামসিকতার পরিণত হইয়াছে এবং দর্শনতা প্রগ্রস্ব পাইয়াছে এবং অনেক অনধিকারী ব্যক্তি পদ্বিষ্টমার্গের বা মধুরভাবের সাধন করিতে গিয়া সমাজে ব্যাভিচার আনিতেছেন । ব্রহ্ম সগুণ সর্বশেষ, জীব অণু, নেবক, ভগবান সেবা । ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি হয় । জগৎ সত্য, ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—এইগুলি মধব এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব উভয়মতেই স্বীকার করা হয় । মধবমতে জীব ও ব্রহ্ম চিরভিন্ন অর্থাৎ মুক্তিকালেও ভিন্ন । অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাই স্বীকার করা হয়, তবে বলা হয়, গুণ ও গুণিভাবে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং অভিন্ন ; সেই অর্থে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় । সাধন বিষয়ে উভয় মতের পার্থক্য বিদ্যমান । বল্লভের মতে (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে) বিগ্ৰহ, অনন্ত গুণাশালী, অচিন্ত্য অনন্তগতি, সাক্ষদানন্দ পদ্রুমোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বেদাদি শাস্ত্রের, প্রতিপাদ্য বিষয় এবং বৃন্দাবনে গোপীভাব লাভই পরম পদার্থলাভ বা মুক্তি । শ্রীকৃষ্ণই সূর্য ভগবান্ ও পূর্ণব্রহ্ম । বল্লভের মতে ব্রহ্ম সূতন্ত, কর্তা, জগতের নিয়ামক, সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানস্বরূপ এবং জীবগণের ভোগ ও মুক্তিপ্রদাতা । ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণ এবং দেহ ও নৈহিভাবে প্রতীতির

বিবর হন। জীব অদ্বৈতেনা হইলেও নিত্যজ্ঞানাদি-গুণবিশিষ্ট। এ বিষয়ে ঈশ্বর ও জীবের সমতা আছে, তবে ঈশ্বর বিভূতেনা এবং জীব অদ্বৈতেনা। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য, অক্ষয় ও অনন্ত সুখস্বরূপ। ব্রহ্মের শক্তি স্വാভাবিক—উহা (১) সর্বিং (জ্ঞান), সর্বিনী (সং), ও হলাদিনী (আনন্দ) রূপা। বলদেবের মতেও ব্রহ্ম নিগূঢ়, তবে এই নিগূঢ় শব্দের অর্থ ব্রহ্মে প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই। কিন্তু তাহার স্বরূপানুবিশিষ্ট অতিপ্রাকৃত গুণ আছে। বলদেবের মতে পরমেশ্বরের প্রতি বিমুখতাই জীবের বন্ধন, আর পরমেশ্বরের প্রতি আভিমুখ্যই ভগবানের স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণ-রূপ বন্ধনদ্বয়কে নিবৃত্ত করিয়া স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। মুক্ত অবস্থাতেও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক। মুক্তজীব পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মের সমান ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সর্বদাই স্বরূপগত এবং সামর্থ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় না এবং জীবের ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি হয় না। বলদেবের মতে (১) ঈশ্বর (২) জীব (৩) প্রকৃতি (৪) কাল এই চারিটী পদার্থই নিত্য এবং জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশা। ভগবদুপাসনা ও ভগবন্তত্ব জ্ঞানদ্বারা একবার ভগবল্লোক প্রাপ্তি ঘাটলে আর সেই মুক্ত জীবের পতন ঘটে না। বহুজন্মের পুণ্য-পুঞ্জের পরিপাকে সংসারবিরক্ত ও শূন্যচিত্ত ভক্ত আনন্দ-স্বরূপ সেই পরম রমণীয় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া আর স্বতঃই তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন না; ভগবানও তাহার ভক্ত এই প্রকার মুক্ত জীবকে শ্বলোক হইতে পাতিত করিতে ইচ্ছা করেন না। বলদেব বলেন ভক্তিই মুক্তির প্রধান সাধন এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য উহার সহকারী সাধন। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি-বাতীত ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। ভক্তি অনুশীলনের তিনটী অবস্থা :—(১) সাধন (২) ভাব (৩) প্রেম। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণাদ্বারা সাধনীয় সামান্য ভক্তির নাম সাধন-ভক্তি। ইহা জীবের অন্তর্নিহিত প্রেমভাবকে উদ্বেগ করে বলিয়া ইহার নাম সাধনভক্তি। শূন্যসত্ত্ববিশেষরূপ, প্রেমসংঘাৎশূন্যসদৃশ এবং রূচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নাম ভাব। এই ভাবই

প্রেমের প্রথম অবস্থা। ভাব ঘনীভূত হইলে তার নাম প্রেম। বলসেবের ভক্তি
হ্লাদিনী ও সাক্ষী (জ্ঞান) শক্তির সার। জ্ঞান দ্বিবিধ (১) বিদ্যা (২) বেদন ;
শব্দ 'ত্' পদার্থানুসন্ধি জ্ঞানের নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা কৈবল্য বা নির্যাগমুক্তির
সাধন এবং 'তৎ' পদার্থ-পরিপূর্ণ-বিস্তাররূপ সাধকজ্ঞান বা বিধিভক্তি ও নিগূঢ়-
ভক্তিরূপ প্রকৃত পুরুষার্থসাধক জ্ঞান বা রূচিভক্তির নাম বেদন।

শক্তিবিংশটাদ্বৈতবাদ—শক্তিবিংশটাদ্বৈত বাদটী অদ্বৈত বাদেরই অনুরূপ।
এই মতে অচিন্ত্যরূপে অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ এই জগদ্‌বৈচিত্র্য হইয়াছে বলা হয়।
সেই শক্তি নিত্য, মিথ্যা নহে (অদ্বৈতমতে শক্তি মিথ্যা)। অগ্নি ও দাহিকাশক্তি
যেমন অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। ব্রহ্মও নিত্য, জগৎও নিত্য।
ইহা কতিপয় শাক্ত, অধিকাংশ শৈব ও কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত। পূর্বোক্ত
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ব্রহ্মভের মত, অনেক তন্ত্রের মতকে শক্তিবিংশটাদ্বৈত বাদে
মধ্যে ফেলা যায়। তবে মহানির্বাণ তন্ত্র কিংবা মহাকালসংহিতার মতের সহিত
অদ্বৈতবাদের পার্থক্য নাই।

ইহা ছাড়া ভারতীয় ভাবধারায় চার্বাকমত, মীমাংসামত প্রভৃতি আরও
কতকগুলি মত আছে।

উপসংহার :—

পূর্বোক্ত মতসকলের মধ্যে সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা কপিল, ন্যায়মতের গৌতম
এবং বৈশিষ্ট্যমতের প্রতিষ্ঠাতা কণাদ। বৌদ্ধমত বুদ্ধদেব হইতে প্রবর্তিত।
জৈন, রামানন্ড, নিম্বাক প্রভৃতি আচার্যগণ যে অদ্বৈত, বিংশটাদ্বৈত,
দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ঐ মতবাদগুলি পূর্বেও ছিল,
ইহা শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়। পরবর্তী আচার্যগণ সেইসকল মতের প্রচার ও
পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধমত ভিন্ন পূর্বোক্ত মতগুলি বেদের উপর
প্রতিষ্ঠিত এবং উহাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। বৌদ্ধমতে
বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত নহে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচার্যগণ
অদ্বৈতমত গ্রহণের জন্য এবং অপবাদীর মত খণ্ডনের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়া

গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুদর্শন-দ্বারার পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম সার্বজনীন। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যে কোন একটিতে পড়িবে। আবার হিন্দুধর্মের যে বিভিন্ন ভাবধারা অদ্বৈতবাদে সকলেরই স্থান আছে। অদ্বৈতবাদীর চরমসিদ্ধান্ত অন্যান্য মতবাদের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নরূপ হইলেও (জগতের মিথ্যার অদ্বৈতবাদী ও মাধ্যমিক বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য কেহই স্বীকার করেন না। জীব ও ব্রহ্মের একত্বও অন্যাবদীগণ স্বীকার করেন না) অদ্বৈতবাদী বলেন, চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম, উপাসনা, ভক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন। এই হিসাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি ভাবের (অধিকার হিসাবে) প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং অদ্বৈতমতটি সার্বজনীন।

পূর্বোক্ত সকল বাদের আচার্যগণই গ্রন্থের পাত্র। সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতি-পদার্থের বিবেকদ্বারা, যোগদর্শন চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় প্রদর্শন করিয়া এবং বৈকবাচার্যগণ ভাব ও ভক্তিরাজ্যে চিত্তকে উন্নীত করিয়া দিয়া অদ্বৈততত্ত্ব অবধারণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং উক্ত দ্বৈতবাদগুলি অদ্বৈতবাদে উঠিবার সোপানস্বরূপ।

অনেক অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী আচার্যগণকে হীনভাবে আক্রমণ করেন, উহা ভাল নয়। আবার অনেক দ্বৈতবাদীও জ্ঞানের বা শব্দের নাম শূন্যে চাঁটিয়া যান, উহাও ভাল নয়। আপন আপন মতে নিষ্ঠা থাকা ভাল, পরমত-অসহিষ্ণুতা ঠিক নয়। ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আচার্য শব্দের ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত করিয়া হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুরই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি সকল ভাষাদি লিখিয়া গিয়াছেন, পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাস্তকরতঃ হিন্দুধর্মের জয় পতাকা উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছেন—ইহা কম প্রতিভার কথা নয়। তিনিই পঞ্চদেবতার পূজা পুনঃ প্রবর্তিত করেন, তিনি নাস্তিক ছিলেন না। অদ্বৈতরাজ্যের জ্ঞানসম্প্রদায় হইয়াও দ্বৈতবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক তিনি যে সকল ভক্তিস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন, ভাষার সরলভাষ্য,

ভাবের গাম্ভীৰ্য্য এবং ছন্দের কাকারে উহা অতুলনীয়। অপরপক্ষে বৈতবাদী
আচার্য্যগণও প্রশংসার পাত্র। তাহাদের ত্যাগ, সাধনা, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান
প্রভৃতি প্রত্যেকেরই অনুধাবনযোগ্য ও শিক্ষণীয়। অন্যান্য বাদিগণ অষ্টৈতবোধে
স্থিত করিয়া দিবার জন্য ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন মূৰ্ত্তি। সেই সৰ্ব্বাত্মক
ভগবানকে নমস্কার। “সৰ্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।”

সমাপ্ত

ଅନୁତାମୃତବର୍ଷିଣୀ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ

অবতারবাদ কি বেদসম্মত ?

আজকাল কেহ কেহ সামান্য বেদান্তের চর্চা করিয়াই বলিতে চান বেদে অবতার-বাদ বা মূর্ত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই, পরে পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ বা মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হয়। বৈদিকযুগে একমাত্র ব্রহ্ম বা ভগবানই ছিলেন সকলের উপাস্য বস্তু, তিনি নিরাকার ও নিগূঢ় এবং মস্তও ছিল এক ওঁকার বা বৈদিক গায়ত্রী। কিন্তু পরে বহু দেবতার ও বহু মন্দের উপাসক হওয়ায় সনাতন হিন্দু-ধর্মের অধঃপতন হইয়াছে এবং হিন্দুগণ জাতীয় একতা হারাইয়া দুর্বল হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় হিন্দুজাতিকে এক ও সবল করিতে হইলে এক দেবতা ও এক মন্দের উপাসনার পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইবে। এতদ্দেশ্যে তাঁহারা লেখনীও ধারণ করিয়াছেন এবং অবতারবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মতে শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণাদি কোন অবতার পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে অবতরণ করেন নাই। বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মূনিগণের মনের ভাবকেই শাস্ত্রে অবতাররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহারা রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি অবতার মূর্ত্তির এবং গীতাди শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ও যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে নিজ পাণ্ডিত্য ও বাহাদুরী প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কয়জন গুরুত্বপূর্ণ করিয়া বেদ পাড়িয়াছেন জানি না—তাঁহাদের লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বেদের সামান্য অংশমাত্র দেখিয়া স্বীয় স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল আমাদের অধিকাংশই হিন্দুর মূল শাস্ত্রগ্রন্থ সকলের সহিত পরিচিত নহি। এই সুযোগে ইহারা সমাজ-কল্যাণের নামে কাল-প্রবাহের অনুকূল সস্তার খরিদারের মন যোগাইয়া নিজেদের নাম জাহির করিতে চান অথবা শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞতাই তাঁহাদের ঐ প্রকার প্রবৃত্তির কারণ। উপযুক্ত আচার্য্য-মুখেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইতে হয়। নিজে শাস্ত্র পাড়িয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না। সেইজন্যই ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হইয়াছে—“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” অর্থাৎ ‘আচার্য্যবান্ পুরুষই জানিতে পারেন’ (৬/১৪/২) “আচার্য্যশিষ্যে বিদ্যা বিদিতা সার্থিষ্ঠ্যং প্রাপতীতি” অর্থাৎ ‘আচার্য্য হইতে বিদিত বিদ্যা সাধুতম হইয়া থাকে।’ অবশ্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডিত-গণ ইহাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ যাহারা

শাস্ত্রের বিশেষ খোঁজ রাখেন না, তাঁহারা সহজেই ইহাদের খপরে পড়িয়া প্রভাবিত হইতে পারেন। ইহারা বৃহদেদোষে সমাজের কল্যাণ সাধনের নামে উহার অর্নিষ্ঠ সাধনে প্রবৃত্ত। আর্থ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দ্বামী দয়ানন্দও পূর্বোক্ত-প্রকার মত প্রচার করেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ সনাতনী হিন্দুগণ তাঁহার মত গ্রহণ করেন নাই। সেইজন্য আমরাও নিম্নে শাস্ত্রানুকূল বিচারদ্বারা উপর্যুক্ত মতের দোষ প্রদর্শন করিব। কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাসী জনগণ যাহাতে উক্ত প্রচারে বিভ্রান্ত না হন, তদুদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ লিখিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং সংক্ষেপেই আমরা উক্ত অশাস্ত্রীয় মতবাদের খণ্ডন করিব।

প্রথমে দেখা যাক্ বৈদিক যুগে মূর্তি-পূজার প্রচলন ছিল কি না এবং বেদে অবতারগণের বীজ আছে কি না। এ বিষয়ে বৃষ্ণিতে হইলে আমরা দিগকে ব্রহ্মের নিগূঢ় ও সগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রে জানিতে হইবে। কারণ বেদে ব্রহ্মের সগূঢ় ও নিগূঢ় উভয়ভাষ্যেরই কথা পাওয়া যায়। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—“দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং তৈরামূর্তং চ” (২/৩/১) অর্থাৎ ‘ব্রহ্মের মূর্তি ও অমূর্তি এই দুইটি রূপ। বেদে যে নিগূঢ় ব্রহ্মের কথা আছে, অদ্বৈত-যেদ্বৈতমতে উহা ই পরম ও চরম সত্য। সেই নিগূঢ়ব্রহ্ম নিঃশব্দিক; সুতরাং উহাতে জীব জগৎ ঈশ্বর ও অবতার রূপনার অবসর নাই—ইহা সত্য কথা। কিন্তু সেই নিগূঢ়ব্রহ্ম অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অনক্ষল, অচিন্ত্য ও অব্যবহার্য ইহা মান্ডুকা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই নিগূঢ় ব্রহ্মকে ব্যবহাররাজ্যে আনা যায় না। সেই নিগূঢ়ব্রহ্মকে ব্যবহাররাজ্যে আনিতে গেলে ব্রহ্মে মায়াক্রান্তির স্বীকার আবশ্যক হয়—তখন সেই নিগূঢ়ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এই মায়াক্রান্তি অবিস্মার্ত্তি দ্বারা এক ব্রহ্মকে বহুরূপে প্রদর্শন করিয়া জীবকে বঞ্চ করেন এবং তিনিই আবার বিদ্যাবৃষ্টি দ্বারা বহুত্বের মতো একত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাকে মূর্ত্ত করেন। ঈশ্বরের এই মায়াক্রান্তি শব্দ-সত্ত্বপ্রধানা বলিয়া উহা ঈশ্বরের স্বরূপদৃষ্টি আবৃত করে না—সেইজন্য ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানী, নিত্যমূর্ত্ত ও মায়াদীণ। ঈশ্বর সগূঢ় হইয়াও নিগূঢ়, সব কিছু করিয়াও কিছু করেন না—তিনি সৃষ্টি-

কর্তারূপে প্রতীত হইলেও সর্বদা স্থায়ী নিগূঢ় স্বরূপেই স্থিত। যেমন সূর্য্য-রশ্মির সাহায্যে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই, এইরূপ মায়া হইতে উৎপন্ন আমাদের শৃঙ্খল-সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতেই আমরা আমাদের নিগূঢ়-স্বরূপের অবধারণ করিতে পারি এবং প্রাথমিকভাবে নিগূঢ়-ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হই। যদিও নিগূঢ়-ব্রহ্ম ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়া মায়া মিথ্যা, তথাপি বেদ, গুরু, ঈশ্বর, অবতার প্রভৃতি মায়িক বস্তুর সাহায্যেই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। সেইজন্য পণ্ডদশী বলিয়াছেন—ঈশ্বরমৈত জ্ঞানের বাধক নহ, পরন্তু সাধক'। মনে রাখা উচিত যে, অষ্টমতে, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি নিগূঢ়-ব্রহ্মে ব্যবহারদৃষ্টিতে আরোপিত।

নিগূঢ়-ব্রহ্ম যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অগোচর, সেইরূপ ঈশ্বরের মায়াক্রিয়াও আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অগম্য। সেইজন্য পণ্ডদশীকার বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিত মিলিত হইয়াও মায়ার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারিবেন না। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন যে মায়ায় সবই সম্ভব। আমাদের নিদ্রাশক্তিই যখন স্থলে অচিন্ত্য ও অদ্ভুত দৃশ্য ও ঘটনারাশি প্রদর্শন করে, তখন ঈশ্বরের মায়াক্রিয়া যে এই বিচিত্র জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিবে ইহা আবার বিচিত্র কি? মায়া অঘটন-ঘটন-পট্টয়াসী। মায়াক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বর জীব ও জগদ্রূপ ধারণ করেন এবং মায়াক্রিয়া দ্বারাই তিনি ভূতলে মনুষ্য-রূপে অবতরণ করিয়া জীবগণের কল্যাণ-সাধন করেন এবং উহাদের মুক্তির পথও নির্দেশ করেন। ঈশ্বর যে মায়াক্রিয়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন, ইহার শত শত প্রমাণ-প্রমাণ আছে—“ইন্দ্রো মায়াক্রিয়াঃ পুরুরূপে ঈহতে” (বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯) অর্থাৎ পরমাত্মা মায়াক্রিয়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। “রূপং রূপং প্রতিরূপো কভূব” (ঐ) অর্থাৎ তিনি প্রতিরূপের অনুরূপ হইয়াছিলেন। “তৎসৃষ্টনা তদেবান্দ্রাবিশং” অর্থাৎ তিনি সৃজন করিয়া উহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন’ (তৈত্তিরীয় ২/৬) ইত্যাদি (নিগূঢ়-ব্রহ্ম ঈশ্বরের আরোপ করিয়াই প্রমাণিত সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন)। এখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি ব্রহ্ম হইতে স্তব্ধপর্য্যন্ত সবই সৃষ্টি করিতে পারেন তবে তিনি নিজেই অবতাররূপেই বা সৃজন করিতে

পারিবেন না কেন? তবে ঈশ্বরকে সর্ববাক্তমান্ বলারই বা সাধকতা কোথায়? ভগবানের জন্ম ও কর্ম অলৌকিক তত্ত্ব—উহাকে সাধারণ যুক্তি-কোঠায় আনিয়া মাপা যায় না। একজন সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের মায়ার মোহিত হইয়া যখন আমরা বহু অদ্ভুত ও অসম্ভব ঘটনা সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করি, যুক্তিবিচার দ্বারা উহার সমাধান করিতে পারি না, তখন পরমমায়াবী ঈশ্বরের মায়ারশক্তিদ্বারা মোহিত হইয়া আমরা যে তৎসংগত জগৎকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিব এবং যুক্তিবিচার দ্বারা যে জগদ্-রহস্য ভেদ করিতে পারিব না, উহা আর বিচিষ্ট কি? ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও অবতারাদি রূপ ধারণ করিয়া আত্মহনন করেন না—পরন্তু ঐ সকলের মধ্যে স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়া জীবের নিকট আত্ম-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন। সিঁড়ি বাহিয়া যেমন ছাদে উঠিতে হয়, এইরূপ প্রথমে শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিয়া ও দেবতা, অবতার প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা চিত্তের পাপ ক্ষয় করিয়া ক্রমণঃ নিগূর্ণতত্ত্বে উঠিতে হয়—নতুবা কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে লুপ্ত হইয়া অধোগতি হইয়া থাকে। ইহাও মনে রাখা উচিত যে, বেদে কর্ম ও উপাসনার কথাই অধিক—জ্ঞানকাণ্ডে উহার তুলনার খুব কম।

নিগূর্ণব্রহ্মের ঠিক্ ঠিক্ ধারণা করিতে পারেন এরূপ অধিকারী অতি বিরল। সেইজন্যই ভগবান্ গীতায় বলিলেন—“মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ বেত্তি তত্ত্বতঃ” (৭।৩) অর্থাৎ ‘সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধির (কর্মজা সিদ্ধির) জন্য যত্ন করে। কর্মজাসিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রব্রজশীল সাধকগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।’ আমাদের কারবার সর্বদা মূর্তি লইয়া। লোক, জন, ঘর, বাড়ী, চন্দ্র, সূর্য, নদ, নদী, বৃক্ষ, পর্বত সবই মূর্তি। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ভগবান্ আমাদের একবারে নিগূর্ণক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা বিভীষিকা দেখিব। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়—প্রভাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রাক্কালে নিজেকে একাকী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন—“সেহবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভীতঃ” (১।৪।২)। গীতায়ও দেখা যায়, অর্জুনের মত বীরও ভগবানের সর্বব্যাপক আদ্য সগুণ বিষ্ণুরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার কিন্নীট, চক্ষু ও গদাধারী খণ্ডমূর্তি দেখিতে চাহিয়া-

ছিলেন। সুতরাং যদি ভগবান্ স্বীয় মায়াক্রিয়া দ্বারা আমাদের মধ্যে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদেরকে ধর্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দান করেন, তবে তাহার আদর্শের অনুসরণে আমরা নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে পারি। বেদে যদি অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি দেবতার উপাসনা আছে, উহারাও মূর্তিমান্। ঋগ্বেদের পুরুষসুক্ত মন্ত্রে “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মূর্তিরই কল্পনা করা হইয়াছে। ভাগবতে (২।৬।৪১) সেই বিরাট পুরুষকে আদ্য অবতার বলা হইয়াছে। যাহারা মূর্তি-পূজায় বিভীষিকা দেখেন, মূর্তিসকলের মধ্যে রক্ষকের ক্ষুরণ বা উহাদের অধিষ্ঠান-স্বরূপ রক্ষকে দেখিতে না পান, তাহাদের উচিত সর্বপ্রকার বাক্য, চেষ্টা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিরোধ সমাধিতে ডুবিয়া থাকা। তাহাদের মূখে আবার সমাজ, জাতি প্রভৃতির উন্নয়নের কথা কেন? যিনি সমাজের উন্নয়ন করিবেন এবং যাহাদের উন্নয়ন করিবেন, উহারা মূর্তিমান্ কিনা? নিজে সমাজ-কল্যাণের নামে মূর্তি উপাসক হইয়া মূর্তিপূজার বিরোধী মত প্রচার করা মিথ্যাচারমাত্র। কোনোপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, পরমাত্মশক্তি ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে অন্তরিক্ষে বহুবিশ্ব শোভাসম্পন্ন হোমান্বিতভূষিতা স্ত্রীমূর্তি ধারণ করতঃ উমারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। “স তাম্মেন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামৃদমাং হৈমবতীম্” (৩।৮) ॥ তৈত্তিরীয় সংহিতায় একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তামিন্ প্রজাপতিবায়ুভূত্বাহরৎ। স ইমামপশাত্তং বরাহো ভূত্বাহরৎ।” কৃষ্ণ যজুঃ ৭।৭।১৫ ॥ অর্থাৎ ‘সৃষ্টির পূর্বে’ সলিলমাত্র ছিল। প্রজাপতি উহাতে বায়ু হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। তিনি সলিল-মগ্ন ভূমি দর্শন করিয়া উহাকে বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক আহরণ বা উদ্ধার করিয়া-ছিলেন। এইরূপ বেদে আরও অবতারবাদের বীজ রহিয়াছে। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। ঐ মহাভারতে দেখা যায় যে, মহাত্মা ভীষ্মদেব শরণযায় শয়ন করিয়া ভগবানের অনেক অবতার-মূর্তির স্তব করিয়াছেন (শান্তিপর্ব)। গীতাও মহাভারতের অন্তর্গত এবং উহাতে যে অবতারের কথা আছে, ইহা সকল হিন্দুরই পরিজ্ঞাত। বেদে যদি অবতারবাদের কথা না থাকিত, তবে বেদানুকূল রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থেও অবতারবাদের কথা থাকিত বা। মহাভারতাদি শাস্ত্র-

গ্রন্থ কি অবৈদিক ? মহাভারতে বলা হইয়াছে—“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদে
সমুপবৃংহয়েৎ । বিভেত্যপশ্রুতবাদং বেদো মামহং প্রহরিস্যতি । (১।১:২৬৭)
অর্থাৎ ‘ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে বহুল করিয়া বলিবে । যদি কেহ বেদ ভাল
করিয়া গুরুমুখে শ্রবণ না করিয়া উহার ব্যাখ্যা করে, তবে বেদ তাহাকে ভয় করিয়া
যেন বলেন—‘এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে ।’ শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি আচার্যগণ
নিগূঢ় অদ্বৈতবাদী হইয়াও যে এত দেবদেবীর স্তুতি করিয়া গেলেন, তাহারা কি
বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতেন না ?

ভগবান্ গীতায় বলিলেন—“অজোহপি সন্নব্যাসাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়াম্” (৪।৬) অর্থাৎ ‘আমি ভূতসকলের
জ্ঞানশক্তি-স্বভাব, ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় বৈষ্ণবী দ্বারাকে বেশে রাখিয়া
আত্মায়া দ্বারা দেহবানের ন্যায় যেন ভূতগ্রহণ করি ।’ তিনি আত্মায়া দ্বারা
দেহধারণকরতঃ লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হইলেও ইহাতে তাহার স্বরূপ প্রচু্যতি ঘটে
না । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন—“স আদিকর্তা
নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুভৌমস্য রক্ষণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবত্যাং বস্তুদেবাদংশেন
কিল সংভূতঃ, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ সাদবৈদিকো ধর্মঃ তদধীনত্বাদ্-
বিশ্রমভেদানাম্” অর্থাৎ সেই আদিকর্তা নারায়ণ নামক বিষ্ণু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্বের
রক্ষার জন্য বস্তুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে অংশরূপে আবির্ভূত হন । যেহেতু
ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা হইলে বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয়, কারণ ব্রাহ্মণত্বের তাহারই অধীন ।’
দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সকল বাদের আচার্য্যগণই তাহাদের ভাষ্যে
অবতারবাদের সমর্থন করিয়াছেন । এরূপক্ষেত্রে অম্পর্কীয় ও অপণ্যস্ত
আমাদের পক্ষে অবতারবাদ খণ্ডন করিতে যাওয়া মূখ্যতা ও উদ্দেশ্যের পরিচায়ক ।
তবে আশ্চর্য্যকর যে অনেক সম্প্রদায় আপনাদের গুরুগণকে অবতার বলিয়া প্রচার
করিতে চান, ইহা অবতারবাদের অবমাননা । কারণ অবতার ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত
এবং অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন । অবতার নিত্যজ্ঞানী ও নিত্যমুক্ত অবতার-
দেহ ধর্মধর্ম বা পাপপুণ্যের অধীন নয়—ইহা ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য
সত্যদৃষ্ট্যে স্বাধীন ঈশ্বরের স্বেচ্ছামূর্তি—ইহা আমাদের ন্যায় পার্শ্বভৌতিক দেহ

নয়। রাম, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি অবতারে ভেদদৃষ্টি অজ্ঞতাবশতঃই আসিয়া থাকে এবং উহা দ্বারা সমাজে সাম্প্রদায়িকতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়—ইহা অবশ্য দূর করা প্রয়োজন। হিন্দু ইহা জানে যে, এক অষ্টিত ভগবানই কালে কালে ভূতলে রাম, কৃষ্ণ, দূর্গা, শিব প্রভৃতি নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন ও করিবেন। সুতরাং অজ্ঞতাপ্রসূত ভেদদৃষ্টিকে জ্ঞানের প্রচার দ্বারা নাশ আবশ্যক হইলেও বাহ্য ব্যবহারিক জগতের ভেদনাশের প্রয়োজন নাই এবং উহা সম্ভবও নয়। ভেদের মধ্যে অভেদ-দর্শনই হিন্দুধর্মের শিক্ষা, উহা জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে—“অভেদদর্শনং জ্ঞানম্।” সেই জ্ঞান আবার হঠাৎ লাভ হয় না। অগ্রে দেবতা, গুরু, অবতার প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা শৃঙ্খলিত হইতে পারিলে তবেই সেই সাত্ত্বিক চিত্তে নিম্ন জ্ঞানের উদয় হয়। অজ্ঞদৃষ্টিতে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার্য্য। অবতারবাদ অবৈদিক বলিলে গীতা-বক্তা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ বলিতে হয়—উহাতে গীতার মর্মাদাও ক্ষুণ্ণ করা হয়।

সকলের পক্ষে একদেবতার ও একমন্ত্রের উপাসনার প্রবর্তন করিতে যাওয়াও একপ্রকার মূর্থতা। কারণ, যাহার যেরূপ প্রকৃতি ও অধিকার তিনি তদনুসারেই উপাসনা করেন। সদগুরুও শিষ্যের প্রকৃতি ও অধিকারানুযায়ী তাহাকে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। অধিকার বিবেচনা না করিয়া শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিলে সফলের পরিবর্তে কুফলই হইয়া থাকে। সেইজন্য ভগবান্ গীতায় বলিলেন—“ন বৃদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্” (৩.২৬) অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত কর্মমার্গে প্রবৃত্ত অজ্ঞানী কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণকে কর্ম কিছই নয়, উপাসনা কিছই নয়, অবতারাদি নাই’ ইত্যাদি বাক্যে উহাদের বৃদ্ধিকে বিচলিত করিবেন না। কারণ উহা দ্বারা উহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম ও উপাসনা ত্যাগকরতঃ চিত্তশৃঙ্খল লাভ করিতে না পারায় জ্ঞানলাভেরও অধিকারী হইতে পারিবে না। লোকের প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে সনাতনধর্মে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মূর্তি ও মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা”—এখানে বিচার্য্য এই যে, প্রত্যেক সাধকই কি নিজ

নিজ দেবতার রূপ কল্পনা করিয়া লইবেন ? তাহা যদি হয়, তবে প্রত্যেক সাধকের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনাবশতঃ কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি দেবতার মূর্তি তাহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট বীজমন্ত্র ও ধ্যান আছে, উহার সার্থকতা থাকে না। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্যান্তর্গত “ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” অংশের কর্তার ঘণ্টী করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। তাহা হইলে ঐ বাক্যের অর্থ হইবে—‘সাধকগণের হিতের জন্য ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপের কল্পনা করিলেন।’ ঈশ্বর ঈশ্বরে স্থিত সেই সকল দেবতার মন্ত্র ও রূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সমাধিনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের জপ ধ্যানের সুবিধার জন্য উহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন কোন স্থপতির মনের কল্পনা মস্তিষ্কে স্পন্দিত বা রেখাম্বিত হইতে হইতে প্রথমে কাগজে নক্সারূপে অঙ্কিত হয় এবং পরে উহা বাহিরে আসিয়া সকলের প্রত্যক্ষযোগ্য বৃহৎ অটালিকা-রূপ ধারণ করে, এইরূপ সত্য-সম্বৎসর স্বাধীন ঈশ্বরের সঙ্কল্প যে বাহ্য প্রত্যক্ষ-যোগ্য স্থূল রূপ ধারণ করিবে, উহা আর বিচ্ছিন্ন কি ?

বেদ যে এক ঔকার ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্র নাই, এরূপ মনে করাও ভুল। বেদ তো মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শব্দের সমষ্টি। বেদে এক এক মন্ত্রের পূর্বে এক এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম, ঐ মন্ত্রের ছন্দঃ ও দেবতার নাম দেখা যায়। ধীহারা বৈদিক সম্বাদ্য করেন, তীহারা উহা অবগত আছেন। তবে ঔকার ও গায়ত্রী মন্ত্রের মাহাত্ম্য অধিক, ইহাও বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এক একটি মন্ত্রের উচ্চারণ চিদাকাশে এক একটি স্পন্দন-তরঙ্গ উৎপন্ন করে। ঐ স্পন্দন-তরঙ্গ এক একটি রূপের সৃষ্টি করে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেমন যেমন, যেমন ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত-ব্যাহৃতির উচ্চারণ করেন, সস্তু সস্তু গায়ত্রী, উকিক্ প্রভৃতি সপ্ত ছন্দের এবং ভূঃ, ভূবঃ প্রভৃতি সপ্তলোকের উৎপত্তি হয়। বেদে কথিত হইয়াছে, গায়ত্রী ছন্দের স্পন্দনে ব্রাহ্মণের, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের স্পন্দনে ক্রীতয়ের এবং জগতী ছন্দের স্পন্দনে বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত এই বৈদিক সৃষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে ছন্দের সহিত হইয়া থাকে। ছন্দই সূত্র—ব্রহ্মোদিত এই বৈদিক সৃষ্টিতে দৃষ্ট

নাই—ইহাই ঈশ্বরবৈত । “ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা । জাগ্রদাদি-
বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ” (পণ্ডেশী, তৃপ্তিদীপ ৪ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘ঈক্ষণ
হইতে প্রবেশ পর্য্যন্ত সৃষ্টি ঈশ্বরদ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রদাদি অবস্থা হইতে মুক্তি
পর্য্যন্ত সংসার জীবকল্পিত ।’ যাহা আচ্ছাদন করে, উহাই ছন্দঃ । ঈশ্বরের
মায়াকৃতি নানাবিধ ছন্দদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপটি আবৃত করিয়া অদ্বৈত ঈশ্বরকে
আমাদের নিকট বহুরূপে প্রতীত করায়, উহাই সৃষ্টি । যে ব্যক্তি যে ছন্দে উৎপন্ন,
সেইটি তাহার স্বাভাবিক ছন্দঃ । নিজ স্বাভাবিক ছন্দের অনুবর্তন করিয়া মানুষ
ছন্দের প্রভাব অতিক্রম করিয়া শূন্যে মূর্তিলাভ করিতে পারে—অপরের ছন্দের
অনুবর্তনে বিপরীত ফল হয় । ভগবানও সেইজন্য গীতায় বলিলেন—“স্বধর্ম
নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ” (৩।৩৫) অর্থাৎ ‘স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ পরধর্ম
ভয়ের অর্থাৎ নরক-প্রাপ্তির কারণ । সেইজন্যই শাস্ত্রে সাধারণ শ্রী-শ্লোকাদির পক্ষে
ওঁকার মন্ত্রের ও গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । অথর্ববেদীয় নৃসিংহ-
তাপনীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং শ্রীশ্লোকায়
নেচ্ছতি । সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ শ্রীশ্লোকঃ স মৃতোহথো
গচ্ছতি । তস্মাৎ সর্বদা নাচ্যেত যদ্যচ্যেত স আচার্য্যন্তেনৈব মৃতোহথো গচ্ছতি”
(১।৩।১) অর্থাৎ ‘সাবিত্রী, প্রণব, বেদমন্ত্র ও লক্ষ্মীবীজ শ্রীশ্লোককে ইচ্ছা করে
না । শ্রীশ্লোক ঐ সকল মন্ত্র জানিলে উহারা মরণের পর অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।
সেইজন্য শ্রীশ্লোককে সর্বদা ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করাইবে না । যদি কোন আচার্য্য
উহাদিগকে ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করান, সেই আচার্য্যও মরণের পর অধোগতি প্রাপ্ত
হন ।’ বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ভিন্নরূপ—কিন্তু
উহার জ্ঞান না থাকায় আজকাল চিৎকই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রই জপ করিয়া
থাকেন । কিছুকাল হইতে হিন্দুশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ,
হিন্দুশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ভঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন । আজকালকার দিনে
ধিনি যত শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ভঙ্গিতে পারেন, তিনিই তত উদার, বিশ্বপ্রেমিক
ও সমাজ-সংস্কারক—শাস্ত্রবিরোধী এইরূপ মত প্রচারের ফলে সমাজে দিন দিন
উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহার ফল হইবে ধ্বংস । ধর্ম ও অধর্ম

প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু নয় : সুতরাং সেই অলৌকিক তত্ত্ব ধর্মার্থমের নিয়ুপগে শাস্ত্রই প্রমাণ—কোন ব্যক্তি বিশেষের মৃতি বা ভাবপ্রবণতা এবিষয়ে প্রমাণ নয়। ভগবানও গীতায়—“তন্মাং শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাব্য্য—ব্যবস্থিতৌ”(১৬।২৪) ইত্যাদি বাক্যে উহা দেখাইয়াছেন।

ওঁকার বা গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ না করিলে যে শ্রীশূদ্ৰাদির মৃতি হইবে না, ইহা নয়—অন্য মন্ত্র জপ দ্বারা ও পুরাণপাঠে তাহাদেরও মৃতি হইতে পারে, তবে শাস্ত্র-মর্যাদা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি কেন? আজকাল আধুনিক শিক্ষিতগণ হিন্দু জাতির সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়াছেন এবং উহার উচ্ছেদেরও চেষ্টা করিতেছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই হিন্দুর এই বর্ণাশ্রম-বিভাগের কথা আছে। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদজ্ঞ পূর্বাচার্যগণ সকলেই উহা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা কি আমাদের বেদ, পুরাণাদি মূল শাস্ত্রকে বিদ্যায় দিয়া আমাদের সনাতনধর্মকে রক্ষা করিব?

সকল হিন্দুর এক দেবতা ও এক মন্ত্র হইলেই যে সকল হিন্দু এক হইয়া যাইবে এ ধারণাও ভুল। ভেদের বীজ খুব গভীর অন্তরে নিহিত। উহা মায়া বা অজ্ঞানের মধ্যে সংস্কাররূপে থাকে। মূলে সংস্কার-বীজের ভেদ থাকায় বাহিরে এত বিভিন্ন মৃতির আবির্ভাব। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত ভেদের নিরসন হইবে না—সেই ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানার শাস্ত্রোক্ত দ্বারার অনুসরণেই হইবে, কুমাগে হইবে না। যদি এক ধর্মাবলম্বী হইলে ও এক দেবতার উপাসক হইলেই সকলের মধ্যে বিভেদ দূর হইত, তবে খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণের নিজেদের মধ্যে এত বিবাদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হইত না। বিশ্ব নানাপ্রকার জাতিভেদ রহিয়াছে ও থাকিবে—যখন কোন ভেদ থাকিবে না, তখন মহাপ্রলয়। যদি বলা যায় সবই যখন ভগবানের সন্তান, তখন মানুষের মধ্যে ভেদ করা কেন? তদুত্তরে বলি—পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই তো ভগবানের সন্তান, তবে উহাদের সহিত মানুষেরই বা ভেদ করা কেন? মনে রাখা উচিত—ভেদ লইয়াই ব্যবহার, অভেদে ব্যবহার নাই।

আর দ্বা একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কোন দেবতার অবতার-মূর্তিকে অস্বীকার করিয়া কোন শাস্ত্রের বা দেবতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে, উহাতে হিন্দু-সমাজের ক্ষতি হইবে। কারণ, ‘শ্রীকৃষ্ণাদি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, গীতাদি শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী ও অলম্ব্য এই বদ্বিধ না থাকিলে গীতাদি শাস্ত্রের পূর্ববৎ আদর থাকিবে না। আরও একটা কথা— আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বদ্বিধ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য— সুতরাং কাহার ব্যাখ্যা ঠিক্ ইহার নিগূহ করা কঠিন। সুতরাং পূর্বোক্তাঙ্গণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে বিরত হইয়াছেন।

রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণের বাহ্য ব্যবহারে দোষ দেখাইয়া উহাদের অবতারত্বের খণ্ডন করিতে যাওয়ার ন্যায় মূখ্যতা ও বাতুলতা আর কিছু নাই। শাস্ত্র বলা হইয়াছে যে, মদুস্ত পদ্রুশগণকে অস্ত্র ব্যক্তিগণ কেবল বাহ্য ব্যবহার দেখিয়াই চিনিতে পারে না। পূর্ব প্রারম্ভণতঃ মদুস্ত পদ্রুশগণের আচরণ কাহারও যোগিবৎ, কাহারও ভোগিবৎ, কাহারও উন্মাদবৎ, কাহারও পিশাচবৎ ইত্যাদি নানাপ্রকার হইতে পারে। শান্তিগীতা বলিয়াছেন—“ন জায়তে তদ তান্ দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্চিহ্নং বাহ্যতঃ” অর্থাৎ সেইসকল জ্ঞানী মদুস্ত পদ্রুশগণকে বাহ্য কোন চিহ্ন দেখিয়া জানা যায় না।’ সেই জন্য শাস্ত্র জ্ঞানীর লক্ষণ স্ব-সংবেদ্য ইহা বলা হইয়াছে। যখন মদুস্ত পদ্রুশগণকেই আমরা সব সময় বাহ্য আচরণ দেখিয়া ধরিতে পারি না, তখন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রাম, কৃষ্ণাদি অবতারের বাহ্য আচরণ দেখাইয়া উহাদের অবতারত্বের খণ্ডন করিতে যাওয়া ঔষ্যতা ও দঃসাহসের পরিচায়ক।

বেদপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রমাণ

আত্মপ্রত্যয় ও অহং প্রত্যয়

“প্রত্যক্ষণ অন্দমিত্যা বা যন্তুপায়ো ন বদ্যতে। এতদ্বিন্দতি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা” (সায়নাচার্য্য) অর্থাৎ ‘প্রত্যক্ষ ও অন্দমান-প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় জানা যায় না, ইহা বেদ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইজন্যই বেদের বেদত্ব।’

আজকাল অনেকে বলেন—‘আমরা যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব বা যাহা যুক্তিসম্মত, উহাই মানিব, উহা ব্যতীত বেদ বা ঈশ্বর প্রভৃতি মানার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও যুক্তি বলিতে কি বদ্যায়, ইহা আমাদের অনেকেই জানি না। সেইজন্যই এই প্রবন্ধে আমরা উহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। বাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। উহাদের দ্বারা আমাদের ষষ্ঠাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শের জ্ঞান হয়। কোন বিষয়ের জ্ঞানের উদয়ের পর যদি ঐ বস্তুটি আমাদের সংস্কারের অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, তবে তৎজন্য আমাদের উহা লাভের বা ত্যাগের ইচ্ছা হয় এবং সেইজন্য আমরা কর্ম করি। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান হয়, উহাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি। যেমন চক্ষুর দ্বারা ঘটের সহিত আমাদের মনের যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, তখন আমাদের ঘটজ্ঞান হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞানে ঘটবস্তু বাহিরে স্থিত। আমাদের অন্তঃকরণ বা মন চক্ষুরিন্দ্রিয়সাহায্যে বাহ্য ঐ ঘটের উপর পতিত হইয়া উহার একটা ছাপ লইয়া অন্তরে ফিরিয়া আসে এবং উহা হইতে আমাদের ঘটজ্ঞান হয়—ঘটজ্ঞানে ঘটের ঐ ছাপের সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ঐ ঘটের ছাপ আমাদের সকলের ঠিক সমান হইতে পারে না। কারণ, আমাদের সকলের চক্ষুর lease-এর ব্যাসার্ধ সমান নয় এবং সকলে সমান দূর হইতেও ঐ ঘটকে দেখি না এবং আমাদের চিত্তগত সংস্কারেরও বিভিন্নতা আছে। তথাপি বস্তুসকলকে আমরা মোটামুটি সমানভাবে দেখি ও উহাদের ব্যবহার করি, উহার কারণ আমাদের

বাঁকিগত বৃদ্ধি বা মনের পশ্চাতে একটি সর্বসাধারণ বৃদ্ধি বা মন রহিয়াছে—
উহাকে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মন বা মহামন বলা হয়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সকলকে মাপ
করে বলিয়া উহাদের নাম মাত্রা—কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সীমাবদ্ধ বলিয়া উহারা নিজ
নিজ সীমার মধ্যে অবস্থিত বিষয়েরই মাপ করিতে পারে। যেমন চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়
চক্ষুর অতি সন্নিহিত কাজলকে দেখিতে পায় না, আবার অতি দূরের বস্তুকেও
দেখিতে পায় না। হৃদয়দ্বারা আমরা আরও দূরস্থ বা নিকটস্থ বস্তুকে প্রত্যক্ষ
করিতে পারিলেও তাহারও বাহিরে বস্তু থাকিয়া যায়, ইহা আমরা অনুমান করিতে
পারি এবং সেই অনুমানের সাহায্যেই আমরা কার্যকারণ শৃঙ্খলার অনুসরণে
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিতে করিতে এমন
একস্তরে উপনীত হন, যেখানে গিয়া কোন বস্তুর মূল স্বরূপটি আর খুঁজিয়া পান
না। ইহা আমরা এই গ্রন্থের শক্তিতত্ত্ব-প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের উক্তি হইতে
দেখাইয়াছি।

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন উহাকে দীর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চ, হালকা, ভারী,
শক্ত, নরম, লাল, নীল ইত্যাদিরূপে দর্শন করি। কিন্তু দীর্ঘ-প্রস্থাদি সেই
বিশেষণ। বিশেষণ কোন বস্তুতে (বিশেষ্যে) লাগান হয়। বিশেষণগুলি বাদ
দিয়া ঐ বিশেষ্যের স্বরূপ কি প্রকার ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।
বিশেষণ নিজে কোন বস্তু হয় না—উহা যাহাতে লাগান হয়, উহাই বস্তু। সর্ব
বিশেষণ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, যাহাকে আর বাদ দেওয়া যায় না, উহাই
প্রকৃত বস্তু। হিন্দু-শাস্ত্রে উহাকেই একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্মকে
কল্পিত সর্প যেমন ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া সত্য সর্পরূপে প্রতীত হয়,
এইরূপ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্ হইয়া ঘট, পটাদি জাগতিক সকল বস্তুই স্বরূপতঃ
অবস্তু হইয়াও আমাদের নিকট বস্তুরূপে প্রতীত হয়। মনুষ্য-সমাজে জন্মগ্রহণ
করিয়া আমাকে দীর্ঘ-প্রস্থাদির যে রূপ সংস্কার দেওয়া হইয়াছে, আমি সেই সকল
সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত হইয়াই বাহ্যবস্তুসকলকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কদকদাদি
জীবগণ ঐ সকল বস্তুকে আমাদের ন্যায় দীর্ঘ-প্রস্থাদিরূপে দেখে না। আবার

আমাদের অপেক্ষা যদি দেবতাদি কোন উচ্চকোটি জীব থাকে, তবে তাহাদের ইন্দ্রিয় সংখ্যা কত এবং তাহারাই বা বস্তুসকলকে কিরূপে দর্শন করেন, কে জানে? কোন বস্তুর মূলানুস্থানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে শক্তির প্রভাবে উহার মূল খুঁজিয়া পাই না, শাস্ত্রে উহাকে ঈশ্বরের মায়াশক্তি বলা হইয়াছে—জীবের নিকট উহাই অজ্ঞান। সুতরাং দেখা গেল লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করতে পারি না। আবার বস্তুর প্রত্যক্ষ হইলেই যে উহা সত্য হইবে, ইহাও ঠিক নয়। আমরা স্বপ্নস্থ বস্তুগুলিকে স্বপ্নকালে ‘এই বাঘ’, ‘এই হাতী’, ইত্যাদিরূপে প্রত্যক্ষ করি এবং ভ্রান্তিকালেও ‘এই সপ’ বলিয়া রংজুতে সপের প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু স্বপ্ন হইতে জাগিলে আমরা স্বপ্নের ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতিকে এবং ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে রংজুতে দৃষ্ট সপকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারি। সুতরাং যাহাকে সাধারণতঃ আমরা প্রত্যক্ষ বলি, উহা ভ্রান্তিমূলক। সেইজন্য বেদান্তশাস্ত্রে লৌকিক প্রত্যক্ষকে প্রমাণাভাস বলা হয় এবং বেদকেই প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা হয়। সত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বীয় শক্তি বেদ দ্বারা আপনাকে শব্দ ও অর্থরূপে প্রকট করেন—ইহাই সৃষ্টি। এই বেদ অনাদি এবং বীজাকুর-প্রবাহের ন্যায় প্রবাহতমে নিত্য। ইহা কোন পদ্রুপ রচিত নয়—নিঃস্বাদের ন্যায় স্বচ্ছন্দে ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত সেইজন্য বেদ অপৌরুষেয়। কোন পদ্রুপ রচিত নয় বলিয়া বেদ অলঙ্ঘন্য সনাতন। হিন্দুগণ অলৌকিক তত্ত্ব-নিশ্চারণে যে প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন : শ্রুতি, পুরাণাদি গ্রন্থসকল মন্ব্যরচিত বলিয়া উহাদের প্রমাণ বেদপ্রমাণ অপেক্ষা দুর্বল। এইজন্য বলা হইয়াছে—‘শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তদ শ্রুতিরেব গরীয়সী।’

এখন প্রত্যক্ষপ্রমাণ লাভ হইলে উহার উপর দণ্ডায়মান যে অনুমান বা যুক্তি-প্রমাণ উহাও সত্য হইতে পারে না। যুক্তি-প্রমাণে (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু (৩) দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ অন্ততঃ এই তিনটি অঙ্গ থাকিবে। যেমন কেহ বলিলেন—‘পর্বতে বহিমান্’ অর্থাৎ ‘পর্বতে অগ্নি রহিয়াছে’—ইহা প্রতিজ্ঞা। হেতু দেখাইলেন—‘ধূমবত্বাৎ’ ‘যে হেতু উহা ধূমবান্’। দৃষ্টান্ত দিলেন—‘যথা

মহানসমু' অর্থাৎ 'যেমন রন্ধনশালা।' রন্ধনশালায় আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া থাকি যে, যখনই ধূম উঠে, উহার নীচে অগ্নি থাকে। উহা হইতে আমাদের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, ধূম থাকিলেই, উহার সঙ্গে অগ্নিও থাকে। পূর্বোক্ত তিনটি অঙ্গ হইতে আমরা যুক্তি দ্বারা পর্বতে বহির অনুমান করি। কিন্তু ধূম যে অগ্নির সহচারী ইহা পূর্বে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করা না থাকিলে আমরা ধূমদ্বারা পর্বতে বহির অনুমান করিতে পারিব না। সুতরাং দেখা গেল অনুমান বা যুক্তি-প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্রুত বলিয়া অনুমান প্রমাণও দ্রুত। পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণ দ্বারা পর্বতে যে বহিঃজ্ঞান হয়, উহা প্রত্যক্ষের দ্বারা সমর্থিত না হইলে উহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ, বাষ্প দেখিয়াও আমরা উহাকে ধূম মনে করিতে পারি। সে ক্ষেত্রে ঐ অনুমান দ্বারা পর্বতে অগ্নি সিদ্ধ হইবে না। এখানে যে হেতুটি দেওয়া হইল সেই হেতুটিই সিদ্ধ নয়—সুতরাং উহা প্রকৃত হেতু নয়, উহা হেতুভ্রাস। এইরূপ নানাপ্রকার হেতুভ্রাস জন্য যুক্তি-প্রমাণেও দোষ থাকিতে পারে।

আর এক কথা—আমরা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া যে কিছু মানি না, উহা সত্য নয়। অধিকাংশস্থলেই আমরা বিনা যুক্তিতেই বস্তুসকলকে স্বীকার করিয়া লই। ইহা ঘট, ইহা পট, ইহা মনুষ্য, ইহা পশু, ইহা পক্ষী, ইহা পর্বত, ইহা সমুদ্র, ইহা চন্দ্র, ইহা সূর্য ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই আমাদের মানিয়া লওয়া। আমাদের গুরুজন বা অপরে আমাদেরকে যেমন শিখাইয়াছেন, আমরা অশ্রদ্ধাবে উহা মানিয়া লইয়াছি, যুক্তি-বিচারপূর্বক উহাদিগকে গ্রহণ করি নাই। আমরা শিক্ষকের নিকট যে বিদ্যা-শিক্ষা করি, উহাতেও আমাদেরকে শিক্ষকের বাণী সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হয়। আবার অমূলক ব্যক্তি যে আমার পিতা, ইহাও মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়াই জানিতে হয়, যুক্তিতর্ক দ্বারা উহা জানা যায় না। এইরূপ পরম্পিতা ঈশ্বরের নির্ধারণে আমাদেরকে প্রথমে মাতার ন্যায় হিতকারিণী প্রতীর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। বেদ সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ এবং সমস্ত জ্ঞানের আকর। মূলে একটি

সত্যবস্তু স্বীকার না করিলে আমাদের যুক্তি-বিচারাদি নিরাশ্রয় হইয়া কেবল ঘূর্ণিতেই থাকিবে, প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না—“তর্কমপ্রতিষ্ঠম্ ।” ধর্ম, অধর্ম, স্বর্গ, নরক, জীবন্তক্লেশ একত্ব প্রভৃতি অলৌকিকতত্ত্বের নিরূপণে সত্ত্বের প্রকাশরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ । প্রত্যক্ষ, যুক্তি প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ দ্বারা উহাদিগকে জানা যায় না । কেবল প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকমত ভারতে বহু পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে । যদিও সনাতনী হিন্দুর নিকট বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তথাপি আপাতদৃষ্টিতে বেদের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন উক্তিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় । ঐ সকলের সামঞ্জস্য করিবার জন্য এবং তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য বেদানুকূল যুক্তিবিচারের আবশ্যকতা আছে । কিন্তু সেই বিচারদ্বারা শাস্ত্রানিপুণ উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয় । আজকাল সচরাচর আমরা যে সকল তর্কবিচার করি, উহা বিচার নামের অযোগ্য । উহা ব্যক্তির প্রাধান্য-স্থাপনের কলহমাত্র । উহা বিতণ্ডাও নহে, কারণ বিতণ্ডাতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন । ন্যায়শাস্ত্রে তিন প্রকার তর্ক-পদ্ধতি দেখা যায়, যথা (১) বাদ (২) জল্প ও (৩) বিতণ্ডা । কেবল তত্ত্ব-নিরূপণের জন্য গুরুরূশিষ্যাতির মধ্যে যে তর্কবিচারাদি অনর্দীষ্ট হয় উহাকে ‘বাদ’ বলে—ইহাতে কাহারও জয়েচ্ছা থাকে না । কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর জয়েচ্ছা থাকে, সেখানে যে তর্কাদি অনর্দীষ্ট হয়, উহাকে জল্প বা বিতণ্ডা বলে । এই প্রকার তর্ক-মধ্যস্থ, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ সভাপতি প্রভৃতি থাকার প্রয়োজন । ‘জল্প’ কথায় বাদী ও প্রতিবাদী প্রত্যেকেই স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন করেন । কিন্তু বিতণ্ডায় প্রতিবাদী নিরপেক্ষ স্থাপন না করিয়া নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া পরপক্ষের দোষই প্রদর্শন করেন । তত্ত্বনিশ্চয় হইলে বাদ কথার সমাপ্তি ঘটে । কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডায় তত্ত্বনিশ্চয় হউক বা না হউক একপক্ষের পরাজয়েই বিচারের সমাপ্তি হয় । তর্কমধ্যে বাদই শ্রেষ্ঠ । ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—“বাদঃ প্রবদ্যামহম্” (১০:৩২) । বেদপ্রমাণ না মানিয়া কেবল যুক্তি দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বোধগণ কুমারিলে ও আচার্য্য শঙ্করের

নিকট পরাস্ত হন। সেইজন্য পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন—“অনাদ্যত্যা
শ্রুতিং যৌথ্যাদিমে বৌদ্ধান্তপশ্বিনঃ। আপেদিরে নিরাশ্রয়ান্দমানৈকচক্ষুষা।”
(পঞ্চভূতবিবেক ৩৯ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘এই বৌদ্ধ তপস্বিগণ মূর্খতাবশতঃ
শ্রুতির (বেদের) অনাদর করিয়া অন্দমান-প্রমাণবারা তত্ত্ব নিরূপণ
করিতে গিয়া নিরাশ্রয় বা শূন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শূন্যকেই চরমতত্ত্ব
বলিয়া বর্ণিয়াছে।’ ঐ গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—“সচ্ছন্দনয়োবিরোধি-
স্ফাচ্ছন্দ্যামাসীৎ কথং বদ” (ঐ ৩৩ শ্লোঃ)। অর্থাৎ ‘সৎ’ শব্দের অর্থ কোন বস্তুর
অস্তিত্ব; ‘শূন্য’ শব্দের অর্থ কোন বস্তুর নাশিত্ব; অস্তিত্ব ও নাশিত্ব এই
বিরোধী ভাবদ্বয় কিরূপে একই কালে এত অধিকরণে থাকিতে পারে? যিনি
শূন্যবাদ স্থাপন করিবেন, তিনি আছেন কি নাই? তিনি থাকিলে শূন্যবাদ
প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি না থাকিলেই বা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা কে করিবে?

আত্মপ্রত্যয় ও অহং-প্রত্যয়

আজকাল আমাদের অনেকেই আত্মা ও অহংকারের ভেদ অবগত নহেন;
সুতরাং তাঁহারা অহংপ্রত্যয়কেই আত্ম-প্রত্যয় মনে করেন। সেইজন্য আমরা এই
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আত্মা ও অহংকারের ভেদ প্রদর্শন করিতেছি। মহর্ষি রমণ
বলিয়াছেন—“What is usually called self-reliance is nothing but
egoreliance” অর্থাৎ ‘সচরাচর আমরা যাহাকে আত্ম-প্রত্যয় বলি, উহা অহংপ্রত্যয়
বলি, উহা অহংপ্রত্যয় ‘বাতীত অন্য’ কহু নয়।’ “অর্থাৎ, ব্যাপ্পোতি ইতি আত্মা”
—অর্থাৎ যাহা সর্ববস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, উহা আত্মা। ভগবান্ গীতার
বলিয়াছেন—“অহমাত্মা গুড়াক্ষেণ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ” (১৩।২০) অর্থাৎ ‘হে জিতেন্দ্রিয়
অর্জুন! আমি সর্বভূতের স্থানস্থিত আত্মা’—আত্মা ভগবানের বিভূতি, উহা
অহংকার নয়। আবার শ্রুতি বলিলেন—‘অয়ং যাত্মা ব্রহ্ম’ (মাণ্ডুক্য) অর্থাৎ ‘এই

আত্মাই ব্রহ্ম ।’ এখন দেখা যাক্ অহংকার কাহাকে বলে । সর্বব্যাপক আত্মা বা ব্রহ্ম যখন একটি খণ্ড বুদ্ধির মধ্যে স্থিত হইয়া, অব্যবহৃতঃ উহার সহিত যেন একাকারভাব প্রাপ্ত হইয়া ‘অহং’ ‘অহং’ এই ব্যংগ্যরূপে স্ফুটিত হন, তখন উহাই অহংকার । মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“দৃগ্-দর্শন-শক্ত্যাঃ কাণ্ডাতে-বাস্মিতা” (সাধনপাদ ৩ সূত্র) অর্থাৎ ‘দৃক্-শক্তি বা চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা-পদার্থ ও দর্শনশক্তি বুদ্ধির অব্যবহৃতঃ যেন একাকারভাবে যে প্রতীতি, উহাই আস্মিতা বা সূক্ষ্ম অহংকার । বিষয়-সম্পর্কে উহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে । বুদ্ধিতে অভিমানী এই চৈতন্যের নাম জীৱ—ইনিই কর্তা, ভোক্তা বলিয়া সাংসারিক সূত্রে নিমগ্ন ও বশ । আত্মা কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিহীন সূত্রে নিবিষ্কার দ্রষ্টা মাত্র, অসঙ্গ ও নিত্যমুক্ত । বুদ্ধিতে অভিমানী আত্মা বশ, আবার বিবেকধারা আত্মস্বরূপের পরিচয় হইলে দেখা যাইবে যে, আত্মা সর্বদা মুক্ত । এই আত্মা ও অনাত্মার বিভেদজ্ঞান না থাকায় আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অহংকারের মর্যাদাকে আত্মমর্যাদা মনে করেন, এবং সেই অহংকারের মর্যাদাকে রক্ষা করিতে গিয়া অনেকে নীতিবিগর্হিত পথের আশ্রয় গ্রহণ করেন । বিম্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান” অর্থাৎ আমরা আমাদের অহংকারকে গৌরব দিতে গিয়া আমাদের আত্মার অবমাননা করি । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অহংকারকে ‘কাঁচা আমি’ এবং আত্মাকে ‘পাকা আমি’ বলিয়াছেন । এই আত্মা ও অহংকারের পার্থক্য আমরা যতই বুঝতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল । কারণ অহংকারের প্রাধান্যেই পৃথিবীতে যত অশান্তি ও গন্ডগোল ।

দেশ ও কাল

জগৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তির বিস্তার। সেই মায়াশক্তি প্রথমে দেশ ও কালশক্তি-রূপে প্রকটিত হয়। পরে সেই দেশ ও কালে জাগতিক অন্য বস্তুসকল অবস্থিত হয়। ঘটপটাদি বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যচন্দ্র গ্রহাদি এমন কি ব্রহ্মাবিশু-মহেশ্বর পর্যন্ত সমস্তই দেশকালের কুক্ষিগত। মায়ায় সেই দেশশক্তি বস্তুসকলকে থাকিবার অবকাশ দেয় বলিয়া উহাকে 'আকাশ' নামে অভিহিত করা হয়। যোগবাণিশ্ঠ রামায়ণে ভূতাকাশ, চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ এই তিনটি আকাশের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভূতাকাশ সর্বাপেক্ষা স্থূল—উহাতে বাহ্য বস্তুসকল স্থিত থাকে। চিত্তাকাশ ভূতাকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া ভূতাকাশ চিত্তাকাশেই স্থিত অর্থাৎ আমাদের মন বা চিত্তদ্বারাই ভূতাকাশের ধারণা আমরা করিতে পারি—নতুবা বাহ্য আকাশকে প্রমাণ করিবার উপায় নাই। চিত্ত ভূতাকাশকে থাকিবার অবকাশ দেয় বলিয়া উহাকে চিত্তাকাশ নামে অভিহিত করা যায়। চিদাকাশ আবার চিত্তাকাশকে ধারণ করে বলিয়া চিদাকাশ চিত্তাকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক (যাহা যত সূক্ষ্ম, তাহা তত ব্যাপক)। এক অখণ্ড জ্ঞানসত্তার উপরই আমাদের চিত্তের সত্তা নির্ভর করে—কারণ, সেই জ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা আমাদের যে চিত্ত আছে, উহা প্রমাণ করিতে পারি না। সুতরাং চিদাকাশই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। সেই চিদাকাশেই জীবসকলের এমনকি ব্রহ্মারও চিত্ত অবস্থান করিতেছে। দেশের ধারণাকালে আমরা বস্তুসকলের অবস্থিতির প্রাধান্য দিই; কিন্তু কালের ধারণার সহিত বস্তুসকলের গতি বা পরিবর্তনের ধারণা জড়িত। অর্থাৎ কালের ধারণা করিতে গেলে আমরাইগকে সূর্য্যচন্দ্রাদির গতি, বস্তুসকলের পরিণাম বা পরিবর্তন, আমাদের চিত্তে চিত্তাধারার ক্রম প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং দেশের ধারণায় স্থিতির এবং

কালের ধারণায় গতির প্রাধান্য। যে কার্যকারণ শৃংখলার অনুসরণে আমরা বিচার করি, উহাও দেশকালজ্ঞানের অধীন; অর্থাৎ দেশ ও কালের জ্ঞান না থাকিলে কার্যকারণ-শৃংখলা ধরিয়া বিচার করা যায় না। যেমন কারণরূপ মৃত্তিকা অধিক দেশ ও কালে স্থিত। কার্যরূপ ঘট অল্প দেশকালে স্থিত।

কিন্তু দেশ ও কাল একই মাত্রাংশের দুইটা দিক্‌মাত্র। দেশ হইতে পৃথক করিয়া কালকে বা কাল হইতে পৃথক্ করিয়া দেশকে দেখান যায় না। 'ঘট বস্তু আছে' বলিলেই মনে হইবে যে, উহা খানিকটা দেশ অধিকার করিয়া ও খানিকটা কাল ব্যাপিয়া অস্থান করিতেছে। বস্তুমাত্রেরই ঐ নিয়ম—তবে কোন বস্তু অধিক দেশকাল ব্যাপিয়া অবস্থিত্ কোনটি বা অল্প দেশ ও কালে স্থিত। বস্তুসকল কালে পরিণাম বা পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অল্প কালের পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আসে না—দীর্ঘকালের পরিবর্তনকে আমরা স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারি। বস্তুসকলের চরম পরিণতি দেখিয়া আমরা অনুমান দ্বারা ইহা বুদ্ধিতে পারি যে, ঐ চরম পরিণতি হঠাৎ একদিনে বা একক্ষণেই হয় নাই। প্রতিক্ষণেই বস্তুটির সূক্ষ্ম পরিণাম হইতে হইতে বস্তুটি দীর্ঘকাল পরে এই চরমদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বস্তুটির একক্ষণে যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাদি মাপ থাকে, পরক্ষণে উহার ঠিক সেই মাপ থাকে না—কিন্তু এই পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। সুতরাং বস্তুসকলের পরিমাণ-নির্ধারণে কালেরও অপেক্ষা আছে—অর্থাৎ বলিতে হইবে যে, এইকালে এই বস্তুটির, এই মাপ। সুতরাং বস্তুসকলের অধিকৃত দেশের সহিত কালেরও প্রত্যক্ষ জড়িত। সুতরাং দেশ ও কালকে আমরা বিচ্ছিন্ন-ভাবে বুদ্ধিতে পারি না। কারণ, দেশ ও কালের ধারণার জন্য বস্তুর ধারণাও চাই। যদি কোন বস্তুর জ্ঞান আমাদের না থাকে, তবে দেশ কালের জ্ঞানও আমাদের থাকিবে না। যেমন সূর্যোপ্তি বা নির্বিকল্প সমাধিকালে আমাদের কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে না বলিয়া দেশ ও কালের জ্ঞানও আমাদের থাকে না। প্রকৃত হইতে পারে, বস্তুসকলের উপর যখন

দেশ ও কালজ্ঞান অপেক্ষা করে, তখন বস্তুসকল আগে উৎপন্ন, না দেশকাল আগে উৎপন্ন? উত্তরে বলি—দেশকালই আগে উৎপন্ন। পূর্বে দেশ ও কাল না থাকিলে বস্তুসকল কেথায় উৎপন্ন হইবে? দেশ ও কাল (১) অমর্ত্য ও (২) মর্ত্য ভেদে দ্বিবিধ। অমর্ত্য দেশকালকে অমেরা বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু অনুমান দ্বারা ইহা বুদ্ধিতে পারি যে, যে দেশকালে বস্তুসকল অবস্থিত, বস্তুসকলের অভাব হইলেও উহা থাকিয়া যাইবে। বস্তুসকলের অভাব হইলেও উহা থাকিয়া যাইবে। বস্তুসকলের ধারণা ও উহাদের পরিণামের ধারণা হইতে আমাদের মর্ত্য দেশকালের ধারণা আসে। সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে যে মায়াকৃতি প্রথমেই আমাদের বুদ্ধিতে অখণ্ড দেশকালের দ্বারা ধারণা উৎপাদন করিয়া এই সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন। ঐ দেশ ও কালের স্বরূপ কি প্রকার, উহা আমরা বুদ্ধিতে পারি না—কারণ আমাদের বুদ্ধি ঐ দেশকালের অধীন। ইহা মায়ার প্রভাব—যাহার স্বরূপ বুদ্ধিতে পারা যায় না, অথচ যাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, উহাই মায়া—যেমন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের স্বরূপ আমরা বুদ্ধিতে না পারিলেও উহাকে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—‘তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ’ (২।১) অর্থাৎ সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আত্মাই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। ইনিই আবার কালেরও কর্তা—‘জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ’ (শ্বেতাশ্বতর ৬।২) অর্থাৎ ‘যিনি সকলের জ্ঞাতা, কালেরও প্রবর্তক, যিনি অপহতপাপাদি সর্ববিধ গুণসম্পন্ন ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি। কালের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্তিগীতায় বলা হইয়াছে—‘ততঃ সঙ্কল্প-বানীশস্তদ্বক্তা শ্বেচ্ছয়া স্বেতঃ। বহুঃ স্যামহমেবৈকঃ সঙ্কল্পোহস্য সমুৎখিতঃ ॥ মায়য়া উদ্গতঃ কালো মহাকাল ইতি স্মৃতঃ। কালশক্তির্মহাকালী চাদ্যা সদ্যঃ সমুদ্ভবাৎ ॥ কালেন জায়তে সর্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি। কালে বিলয়মাপ্নোতি সর্বং কালবশানুগাঃ ॥ সর্বব্যাপী মহাকালো নিরাকারা নিরাময়ঃ। উপাধিব্যোগতঃ কালো নানাভাবেন ভাসতে ॥ নিমেষাদিষদুগঃ কল্পঃ সর্বং তীক্ষ্মন্ প্রকল্পিতম্।

কালতোহভূমহত্ত্বং মহত্ত্বাদহংকৃতিঃ ॥' (৭ম অঃ ১৯-২০) ॥ অর্থাৎ 'অনন্তর সেই মায়াবৃত্তিদ্বারা পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় স্বতঃই সঙ্কল্প করিলেন—'এক আমি বহু হইব' তাহার এই সঙ্কল্প উঠিল। মায়াশক্তি হইতে মহাকাল নামক কালের উৎপত্তি হইল। মহাকালের শক্তি মহাকালীও তৎকণাৎ উৎপত্তা হইলেন—ইনি কলনাশক কালের আদিভূতা। সকল বস্তুই কালে জন্মগ্রহণ করে, কালে অবশিষ্ট থাকে এবং কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়—সকলেই কালের বশ। সর্বব্যাপী মহাকাল নিরাকার ও নিরাময়—উপাধিযোগে কাল নানাভাবে প্রতীত হয়। নিমেষ, যুগ, কল্প প্রভৃতি সমস্তই মহাকালের উপর কল্পিত। কাল হইতে মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব হইতে অহংকারের উৎপত্তি হইয়াছিল।' চণ্ডীতে বলা হইয়াছে—'কলাকাণ্ঠাদি-রূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি'—অর্থাৎ 'হে চণ্ডিকে! তুমি কলা, কাণ্ঠাদিরূপে বস্তুসকলের পরিণাম প্রদান কর'।

কালের প্রভাব আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই। কালে বীজ অঙ্কুররূপে পরিণত হয়। অঙ্কুর কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়—শেষে ঐ বৃক্ষ ধ্বংসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাস্ক্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়—শেষে মৃত্যু। জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ ষড়্‌বিকার কালের অধীন। কালে দেশ সমুদ্র এবং সমুদ্র দেশে পরিণত হয়, সূর্য্য-চন্দ্রাদিরও লয় হয়—কালে 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত' (বিদ্যাপতি)। কালের প্রভাব কেহ এড়াইতে পারে না; যাহার উৎপত্তি আছে, একদিন তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাল সকলের নিয়ামক বা সংযমনকারী। শক্তি বা যোগ্যতা থাকিলেও উহা উপযুক্ত কাল ব্যতীত ফল প্রদান করিতে পারে না—শক্তির সেই ফলদান-সামর্থ্য কালশক্তি দ্বারা বৃদ্ধ থাকে। বীজ বপন করিলে কালে উহা ফল প্রদান করে, অকালে ফল দিতে পারে না। কোন কালে কোন কার্য করিলে উহা কিরূপ ফল প্রদান করে, ইহার জ্ঞান থাকা আক্যক। সেইজন্য জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহগণের প্রভাব বিচার করিয়া কোন কালে কিরূপ কার্য বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর্তব্য, তাহা নিরূপণ

করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র কর্মকাণ্ডাত্মক বেদের নয়নস্বরূপ এবং ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) মধ্যে একটি বেদাঙ্গ। কাল দ্বাদশ মাসে লোকের আয়ঃ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান বলিয়া কালই দ্বাদশ আদিত্য। কাল মহাপ্রলয়ের ধ্বংসকারী অগ্নি। কাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন—কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। কাল জগদ্ভক্ষক—এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও কালের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। কাল জগদ্রূপ রঙ্গমণ্ডে নৃত্যাশিক্ষক। এখানে কাল বাহাকে যে সময়ে যে রূপ নাচাইবেন, তাহাকে সে সময়ে সেইরূপই নাচিতে হইবে—আবার কালের ইঙ্গিতেই তাহাকে যথাসময়ে এই জগদ্রূপ রঙ্গমণ্ড হইতে সরিয়া যাইতেও হইবে—কোন আপত্তিই চলিবে না। হওনা কেন তুমি বড় সম্রাট, হওনা কেন পথের ভিখারী, হওনা কেন তুমি বীর ষোধ্যা, হওনা কেন তুমি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বা শ্রেষ্ঠ দেশনেতা, হওনা কেন তুমি পণ্ডিত, হওনা কেন তুমি মূখ—তোমরা সকলেই কালের হাতের পুতুল, কালের পথযাত্রী, কালের নিকট তোমরা সকলেই সমান। লোকে এই কালবেগ লক্ষ্য করে না বলিয়া আপনার ধন, মান, জন, বল ইত্যাদির গর্ব করে—কাল অলক্ষ্য থাকিয়া উহাদের সেই মূখতাদর্শনে হাস্য করেন। কাল নিমেষে সকল হরণ করেন—“হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্” (শ্রীশঙ্করাচার্য—মোহমুগ্ধর)। এই যে দেশবিভাগের ফলে কত রাজা ফাঁকির হইয়া গেলেন, কতলোক ধনপ্রাণ হারাইল—ইহা কালমাহাত্ম্য। মানুষের বহু শতাব্দীর চেষ্টা ও আয়োজন কাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন। ভগবান কালেরও কাল—কাল তাহাতে পরিসমাপ্ত। সেইজন্য একমাত্র ভগবানের সম্যক্ প্রপন্ন ব্যক্তিই এই কালের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। কাল ভগবানের বিতৃতি—“কালঃ কলয়তামহম্” (গীতা ১০।৩০)—সেইজন্য কালের ধ্যান অতিশয় মঙ্গল প্রদ।

জাগতিক বস্তুসকলের কিরূপে পরিবর্তন হয়, এক্ষণে উহা দেখা যাক্। জাগতিক বস্তুসমূহই স্থিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক।

শাস্ত্র আরও বলেন, এই বিশ্ব সূর্য্যসোমাত্মক—“সূর্য্যসোমাত্মকং বিশ্বম্”—
 এই সূর্য্যসোমাই ভোক্তাভোগ্য তত্ত্ব। সূর্য্য সকলের প্রাণ এবং অগ্নিরূপে সকলের
 ভোক্তা এবং সূর্য্যই জাগতিক সর্বশক্তি উৎস—চন্দ্র রসবরূপ অন্ন। সেইজন্য
 প্রমোদপনিষদে বলা হইয়াছে—‘আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা, রসিঁবা
 এতৎ সর্বং যস্মৈ স্তোমাস্তৃণ্ড, তস্মা স্তোমস্তু রৈব রয়িঃ’ (১-৫) অর্থাৎ ‘আদিত্যই
 সকলের প্রাণ (ভোক্তা); চন্দ্রই রয়ি (অন্ন বা ভোগ্য)। যাহা কিছু মর্ত্ত
 ও অমর্ত্ত পদার্থ সমস্তই রয়ি বা ভোগ্য। (ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ ইহারা মর্ত্ত
 পদার্থ—আকাশ ও বায়ু অমর্ত্ত পদার্থ)। পঞ্চভূতাত্মক মর্ত্ত যে শরীর,
 উহাও রয়ি বা ভোগ্য। এখানে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, মৃত্যুপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ
 মহাপ্রলয়ে সকলকে ভক্ষণ করেন বলিয়া তিনিই মূল অগ্নি—তাহার নিকট
 জগতের যাহা কিছু, সবই অন্ন। তিনিই সূর্য্যমর্ত্তি ধারণ করিয়া পঞ্চভূতাত্মক
 বিশ্বের ভোক্তা। এই সূর্য্য ও সোমকে বৈজ্ঞানিকগণের Positive ও Negative
 Electricity বলা যাইতে পারে। সূর্য্য ও সোমের মিলনেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের
 সৃষ্টি—উহাদের মিলনে আবার স্থূলভূত-পঞ্চকের সৃষ্টি—উহা হইতে স্থূল
 বিশ্বের সৃষ্টি। বস্তুসকলকে ভাগ করিতে করিতে যদপেক্ষা আর সূক্ষ্ম ভাগ
 করা যায় না, উহাই বস্তুসকলের পরমাণু—উহাই সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রা।
 ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই চারিটি ভূতের পরমাণু চন্দ্রের রস-প্রভাবে সংহত
 হইয়া বস্তুসকলকে স্থূলমর্ত্তি প্রদান করে এবং উহারা দর্শনযোগ্য হয়।
 আকাশ সকল বস্তুকে থাকিবার অবকাশ প্রদান করে এবং বস্তু-সকলের মধ্যেও
 উহা অবস্থিত থাকে। বস্তুসকলের পরমাণু-পুঞ্জকে চন্দ্র রস দ্বারা সংহত
 রাখেন এবং সূর্য্য তাপ দ্বারা এই পরমাণু-পুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করেন। বস্তুসকলের
 উৎপত্তিকালে চন্দ্রের বা সোমের প্রাধান্য থাকে—সেইজন্য উৎপত্তির পর কিছুকাল
 বস্তুসকল সোম্য বা সূক্ষ্ম থাকে। সূর্য্যোস্তাপে বস্তুসকলের রস পক্ক হইতে
 থাকিলে বস্তুসকলের রস-অংশের হ্রাস হইয়া পরমাণু-পুঞ্জের ঘন-সম্মিলনে
 বস্তুসকল কঠিন ও দৃঢ় হয়—ইহাই বস্তুসকলের মধ্যবস্থা—ইহাতে সূর্য্য ও

সোমের সমতা থাকে। কিন্তু তখনও বস্তুসকলের উপর সূর্য্যোজ্ঞাপ পড়িতে থাকে। উহার ফলে বস্তুসকলের পরমাণু-পুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে এবং বস্তুসকল ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়—ইহাই বস্তুসকলের চরমাবস্থা। সুতরাং দেখা গেল, সূর্য্য ও সোম যথাক্রমে জগতের ক্ষয় ও পূরণকারী শক্তি। ক্ষয় ও পূরণের সাম্যেই জগতের স্থিতি—উহাই জগতের স্বাস্থ্য। অতিক্ষয় বা অতিপূরণ জগতের স্থিতির ব্যাঘাতকর। সমষ্টি জগতে যে নিয়ম, ব্যষ্টি দেহাদিতেও সেই নিয়ম। আমাদের দেহের ক্ষয়-পূরণের সাম্যই আমাদের স্বাস্থ্য। অধিক ক্ষয় বা অধিক পূরণ দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সূর্য্য ক্ষয়কারী শক্তি—ইনি যমের পিতা। যমের অপর নাম কাল। সেইজন্য সূর্য্য কালচক্র-প্রণেতা সেই ভগবান আদিত্য গতিবিশেষদ্বারা নিমেষ, ঋণ্টা, কলা, মূহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, অন্ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদির প্রবর্ত্তন করেন। নিমেষাদি যুগপর্য্যন্ত কলনাত্মক কাল চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া উহাকে ‘কালচক্র’ নামে অভিহিত করা হয়। অমূর্ত্ত মহাকালের বক্ষেই তদীয় শক্তি মহাকালী তাহার ঈক্ষণে তালে তালে বা ছন্দে ছন্দে নৃত্য সুরু করেন। তখন সেই অখণ্ড মহাকাল নিমেষ, মূহূর্ত্ত প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড কালরূপে আমাদের ক্ষেত্র বা মাপের যোগ্য হন। মহাকালীর ঐ তালে তালে নৃত্য জগতের নিয়মশৃংখলা রক্ষা করিতেছে—বেতাল স্পন্দনে জগতের ধ্বংস হয়।

কালের ধারণা সকলের সমান নয়। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে কালের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। মনুষ্যালোকের যাহা একমাস উহাই পিতৃ-লোকবাসিগণের পক্ষে এক দিবারাত্র। আবার মনুষ্যালোকের যাহা এক বৎসর, উহাই দেবলোকের এক দিবারাত্র ইত্যাদি। মনুষ্যালোকেও যে যেভাবে স্থিত, কালেরও ধারণাও তাহার তদ্রূপ। সুখী ব্যক্তির নিকট যে সময় অল্প বলিয়া প্রতীত হয়, উহাই দুঃখী ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ। ব্যবহারিক কোন নির্দিষ্ট সময়ে যাহার চিন্তে যত বেশী বিষয়-স্পন্দন হইবে, তাহার নিকট ঐ কাল ততই দীর্ঘ মনে হইবে। আবার ঐ সময়ে সমাহিত যোগীর চিন্তের স্পন্দন না হওয়ায়,

তাহার নিকট ঐ কালের ধারণাই হইবে না। অনেক সময় কোন সুদূর অতীতের ঘটনা সহসা আমাদের চিত্তে উদ্ভূত হয় এবং উহা অল্পকাল পূর্বের ঘটনা বলিয়া মনে হয়। এইরূপ হইবার ইহাই কারণ যে, চিত্তের স্পন্দনে কালের ধারণা ; চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে কাল নাই। যখন চিত্তের স্পন্দন-অংশের দিকে প্রধানভাবে দৃষ্টি না পড়িয়া, উহার অধিষ্ঠান চৈতন্যাংশে দৃষ্টি পড়ে, তখনই আমাদের উক্তপ্রকার অনুভব হয়। সেইজন্য দেশ ও কাল বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। দেশ ও কালের ধারণা অজ্ঞান-প্রসূত এবং ব্যবহারসিদ্ধির জন্য আমাদের বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত। দেশ ও কাল যে স্মৃতিপ্রসূত ইহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নানা উপাখ্যান দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনরূপে আমরা কালের ধারণা করি। বর্তমান কালে স্থিত হইয়া পূর্ব পূর্ব ঘটনার স্মরণ পূর্বক আমরা অতীত কালের কল্পনা করি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে পরে কি ঘটিতে পারে, এইরূপ অনুমান দ্বারা ভবিষ্যৎকালেরও চিন্তা করি। বর্তমানকে বাদ দিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ কালকে দেখান যায় না। তিনটি কালের মধ্যে বর্তমানটি আপেক্ষিক সত্য—ভূত ও ভবিষ্যৎ উহার উপর কল্পিত; কিন্তু বর্তমানই বা কতক্ষণ স্থায়ী? একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কঁটা লক্ষ্য কর। কঁটাটি এখন যে ঘরে আছে, উহা বর্তমান। যে ঘরগুলি অতিক্রম করিয়াছে, উহা অতীত, যে ঘরগুলিতে পরে যাইবে উহা ভবিষ্যৎ। বর্তমান—ভূত ও ভবিষ্যতের দধ্যবর্তী সীমারেখা। উহা কতটুকু কাল স্থায়ী? ‘বর্তমান’ শব্দের ‘ব’এর উচ্চারণ করিতে করিতেই কঁটাটি সরিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্বে যাহা বর্তমান ছিল, এখন তাহা অতীত। সুতরাং তিনটি কালই আত্মার উপর কল্পিত। একমাত্র আত্মাই বর্তমান। আত্মার অস্তিত্ব বা বর্তমানতা কালে আরোপিত হইলে উহাকে বর্তমান বলিয়া মনে হয় এবং উহা হইতে আবার ভূত ও ভবিষ্যৎকালের কল্পনা করা হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্ বিবেকজং জ্ঞানম্” (৩৫২) অর্থাৎ ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান হয়। ঐ

পাদের ৫৪ সূত্রে মহর্ষি বিবেকজ্ঞানের এইরূপ ফল দেখাইয়াছেন—“তারকং সৰ্ববিষয়ং সৰ্বথাবিষয়মক্রমণেতি বিবেকজং জ্ঞানম্” অর্থাৎ ‘এ বিবেকজ্ঞান সংসার-মোক্ষের হেতু—ইহা সৰ্ববস্তুবিষয়ক অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নাই, যাহা এই বিবেকজ্ঞানের অবিষয়—ইহা সৰ্বথা বিষয়ক, অর্থাৎ কোন বস্তু অতীত কালে কিরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতে উহার কিরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে, এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা উহাও অবগত হওয়া যায়—আর এই জ্ঞান অক্রম। অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইবার মাত্র যেমন যুগপৎ সৰ্ববস্তুর প্রকাশ হয়, এইরূপ যে যোগীর বিবেকজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার নিকট সৰ্ববস্তুর জ্ঞান যুগপৎ প্রকাশিত হয়।’ এই জ্ঞান লাভ করতঃ ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ হইতেন। ইহাই মহর্ষি-কথিত চরম বিভূতি। ইহার পর যোগীর বৃদ্ধি বিবেকজ্ঞানেও আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কৈবল্যাভিমুখী হয় এবং ধর্ম্মমেঘ সমাধির আবির্ভাব হয়। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন—“প্রসংখ্যা-নেহপ্যকুসীদসা সৰ্বথা বিবেকখ্যাতিঃ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ” (৪২৯) অর্থাৎ ‘বিবেকখ্যাতিজনিত সিদ্ধিতেও আসক্তিশূন্য যোগীর পূর্ণ বিবেকখ্যাতির উদয়ে ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইয়া থাকে।’ ইহাকেই বেদান্তিগণ নিষিদ্ধকল্প সমাধি বলেন। ইহার ফলে “তদা সর্বাংবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মঙ্গম্” (৪৩১) অর্থাৎ ‘তখন সর্ব আবরণ-মলরহিত সেই জ্ঞানের আনন্ডাহেতু চেতনাচেতন জ্ঞেয় বস্তুসকল অঙ্গ বা তৃচ্ছ হইয়া যায়।’ এই প্রকার যোগীর নিকট সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণামক্রম সমাপ্ত হইয়া যায়, ইহা মহর্ষি পরবর্তী ৫২ সূত্রে এই প্রকারে দেখাইয়াছেন—“ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তগুণানাম্।” [ততঃ (তাহা হইতে) কৃতার্থানাং গুণানাম্ (পদ্রুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া ত্রিগুণের কার্য শেষ হওয়ার কৃতার্থ গুণনকলের) পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (পরিণামক্রমের সমাপ্তি) ভবতি (হইয়া থাকে)] এই প্রকার যোগীর নিকট দেশ ও কালের জ্ঞান থাকে না। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত পদ্রুষের স্বরূপস্থিতি বা কৈবল্য প্রাপ্তি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ক্ষণ এবং উহার ক্রম কাহাকে বলে। তদন্তরে বলা যায়, বস্তুসকলের স্ফুটাস্ফুট বিভাগ যেমন পরমাণু, এইরূপ কালের স্ফুটাস্ফুট বিভাগ, যাহাকে আর বিভাগ করা যায় না, উহাই ‘ক্ষণ’। একটি ক্ষণ আসিল, পরে উহা চলিয়া গেল, অন্য ক্ষণ আসিল, উহাও চলিয়া গেল—এইরূপে আমরা আমাদের বুদ্ধিতে পরপর ক্ষণসমূহের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ দ্বারা ক্ষণের ক্রমধারার কল্পনা করি। কাল কিন্তু দৃশ্য হয় না, বস্তুসকলের পরিণামই দৃশ্য হয়, উহা হইতেই কালের ধারণা করা হয়। বস্তুসকলের পরমাণুপুঞ্জের স্ফুটাস্ফুট পরিবর্তন স্থূলবৃদ্ধি মানবের গ্রাহ্য নয়। কিন্তু অতিশয় শূন্যচিহ্ন যোগীর নিকট ঐ পরিবর্তন অজ্ঞাত নয়। পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে বলা হইয়াছে একটি চলিত পরমাণু যে সময়ে পূর্ব-অধিকৃত দেশ ত্যাগ করিয়া পরবর্তী দেশে গমন করে, উহাই ক্ষণ। কিন্তু ইহাও সাধারণ বুদ্ধির গ্রাহ্য নয়—কেবল যোগীগণের অনুভূতি-গম্য। সদা ভাগ্যত ও প্রমাদশূন্য যোগীর নিকট একটি ক্ষণও অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতে পারে না—সেইজন্য এইপ্রকার যোগীর জ্ঞান সর্ববিষয়ক, সর্বধর্ম-বিষয়ক ও অক্লম হইয়া থাকে। যোগীর এই জ্ঞান শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ‘সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সদৃশ’। বেদান্তের উক্ত অধিকারী দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদীর দৃষ্টিও উক্ত প্রকার শূন্য বলিয়া তিনি দেশ ও কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের বা কার্য-কারণের কোন ক্রম দেখিতে পান না। বাস্তবিক ঐ সকল না থাকিলেও আত্মরূপ অবিষ্টানের উপর মাত্রা বৃদ্ধপূর্বে ঐ সকল প্রদর্শন করেন—তাহার এইরূপ মনে হয়। তাহার নিকট ‘দৃষ্টিরেব সৃষ্টিঃ’ অর্থাৎ দৃষ্টিই সৃষ্টির প্রতি হেতু—নতুবা সৃষ্টি নাই। এই মতের অনুসরণে বলা যায় যে, সৃষ্টিকালে জীব থাকে না, স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন—‘স্বমপীতো ভবতি’ (ছান্দোগ্য ৬৮১)। আমরা যখন ভাগ্যকালে কার্য-কারণ শৃংখলা ধরিয়া সৃষ্টিকাল বিচার করি, তখন সৃষ্টিকালে জীবের অবিস্থিতি স্বীকার করিতে হয়—কারণ শ্রুতিতে দেখা যায় সৃষ্টিকালে জীব না থাকিলে উহার পুনরুত্থান ঘটিবে

কেন ? অসং হইতে সংএর উৎপত্তি হয় না ; কিন্তু কার্য-কারণ শৃঙ্খলার অনন্দসরণে এই যে বিচার, ইহাও মায়ার একটি ভ্রান্তি। তাই আচার্য্য গোড়পাদ বলিয়াছেন—“যাবশ্বেতফলাবশঃ সংসারতাবাদয়তঃ । ক্ষীণে হেতু-ফলাবশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ।” (মাণ্ডুক্যকারিকা ৪।৫৬) । অর্থাৎ ‘হেতু ও ফলে যাবৎ আগ্রহ থাকে, সংসার তাবৎ বিস্তৃত থাকে । হেতু ও ফলের আগ্রহ ক্ষীণ হইলে আর সংসারপ্রাপ্তি ঘটে না ।’ গীতাতেও বলা হইয়াছে—“কার্য্য-কারণকর্তৃষু হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে” (১৩.২১) অর্থাৎ ‘কার্য ও কারণের কর্তৃ-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হয় ।’ আবার মায়াই প্রকৃতি—“মায়াত্ম প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) । সুতরাং দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি ভাব এক অষ্টৈত শিবের বক্ষে মহাকালী বা মায়ার নৃত্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয় । সুতরাং এক অষ্টৈত পরমতত্ত্বে দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই নাই । যদিও অষ্টৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের ঠিক অনুরূপ নয়—সাধনবিষয়েও কিছু পার্থক্য আছে, তথাপি অষ্টৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তে স্থিত হইবার পক্ষে ঐ দর্শনোক্ত যোগ সহায়ক বলিয়া আমরা উপরে উহার উল্লেখ করিয়াছি । যোগশিখোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যোগ ভিন্ন জ্ঞানের এবং জ্ঞান ভিন্ন যোগের পূর্ণতা হয় না । অষ্টৈতবেদান্তের সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের পার্থক্য কি, উহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়—সুতরাং এখানে প্রদর্শিত হইল না ।

ওঁ তৎ সৎ

— — —

শক্তিতত্ত্ব

এই জগৎ শক্তির বিকাশ। শক্তির দুইটি অবস্থা অব্যক্ত ও ব্যক্ত। অব্যক্তাবস্থায় শক্তির স্বরূপটি কি প্রকার, ইহা আমরা জানিতে পারি না, কিন্তু শক্তির ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। উহা হইতে আমরা অব্যক্ত শক্তির অনুমান করি। সুতরাং শক্তি কার্য্যানুমেয়া। যেমন অগ্নির যে দাহিকা শক্তি আছে উহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও, উহা যখন আমাদের হস্ত বা কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে, তখন ঐ দাহকার্য্য দেখিয়া আমরা অগ্নির দাহিকাশক্তির অনুমান করি। বাহ্য জগতে শক্তির নানা প্রকার কার্য্য দেখা যায়, উহা হইতে মনে হইতে পারে শক্তিও নানা প্রকার। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায় যে, এক মূলশক্তিই আমাদের নিকট দেশশক্তি, কালশক্তি, চিৎশক্তি, জড়শক্তি, শব্দশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌম্বকশক্তি, আণবিক শক্তি ইত্যাদি নানাপ্রকারে প্রতিভাত হইতেছে। পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, পদার্থ ও শক্তি দুইটি বিভিন্ন বস্তু। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে পদার্থ ও শক্তি দুইটি বিভিন্ন বস্তু নয়। পদার্থকে শক্তিরূপে এবং শক্তিকে পদার্থরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মূলশক্তির স্থান বর্ধিত ঘটে না। তাহার কারণ মনে করেন যে, 'প্রোটন' 'ইলেকট্রন' 'পজিট্রন' ও 'নিউট্রন' ইহারা জগৎসৃষ্টির উপাদান। উহাদের মধ্যে 'প্রোটন' (Positive electricity) এবং 'ইলেকট্রন'ই (Negative electricity) প্রধান। কিন্তু প্রোটন, প্রভৃতির স্বরূপ কি প্রকার উহা বৈজ্ঞানিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক Plank তাহার "Where Science is going?" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন— Science can not solve the ultimate mystery of nature and that is because in the last analysis we ourselves are part of nature and therefore part of the mystery we are trying to

solve.....There is a point where Science and therefore every causal method of research is inapplicable and will always remain inapplicable.” অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান প্রকৃতির (শক্তির) চরম রহস্য ভেদ করিতে পারে না। উহার কারণ, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমরা নিজেরাই প্রকৃতির অংশ। সেইজন্য সে রহস্যের আমরা সমাধান করিতে যাইতোঁছি, আমরা উহারও অংশ।.....এমন একস্থানে উপনীত হইতে হয়, যেখানে বিজ্ঞান এবং কার্যকারণ-শৃঙ্খলার অনুসরণে গবেষণা প্রযোজ্য নহে এবং চিরকালই উহা অপ্রযোজ্যই থাকিবে।’ মাতা হইতে উৎপন্ন সন্তান যেমন মাতার জন্ম দেখিতে পায় না, এইরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বৃষ্টি দ্বারা আমরা প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি না। এই কথাই আমাদের দেশের দার্শনিকপ্রবর শ্রীবিদ্যারণ্য মূনি তাঁহার “পঞ্চদশী” নামক গ্রন্থে এইরূপে বলিয়াছেন—“নিরূপয়িতুমারম্বে নিখিলৈরিপি পণ্ডিতৈঃ। অজ্ঞানং পুরুতন্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ ॥” (চিত্রদীপ ১৪৩ শ্লোঃ) অর্থাৎ ‘পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতও মিলিত হইয়া যদি এই শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে যান, তবে তাঁহাদের অনু-সন্ধানের কোন স্তরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে অজ্ঞান রহিয়াছে।’ যদিও কোন শক্তির স্বরূপ আমরা নির্ণয় করিতে পারি না, তথাপি ঐ শক্তিকে অস্বীকার উপায় নাই—যেহেতু, উহার কার্য্য প্রত্যক্ষ। আমরা দেখি, শূনি, বলি, চলি, জপ, পূজা, ধ্যান, বিচারাদি যে কিছু কর্ম করি, উহা শক্তি-সাপেক্ষ—বস্তুতঃ আমাদের সম্মুখে যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, উহা শক্তিরই অভিব্যক্ত মূর্তি।

মূলে শক্তি এক—উহাই উপাধি ও কার্য্যভেদে আমাদের নিকট বহুরূপে প্রতীত হয়। সেই আদ্যাশক্তিই যখন জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তা হন, তখন তাঁহাকে মহা-সরস্বতী বলা হয়। আবার জগতের ধ্বংস-কর্তারূপে তাঁহাকে মহাকালী বলা হয়। এইরূপে আদ্যাশক্তির কার্য্য ও উপাধিভেদে হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে

সৃষ্টির আদি কাল হইতেই নানা গবেষণা চলিতেছে। শ্বৈতাম্ভবতর উপনিষদে দেখা যায় যে, ঋষিগণ জগতের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একত্র মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন—“কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ। জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠাতাঃ কেন সৃষ্টেতরেষু। বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবহাম্ ॥ কালঃ স্বভাবো নিয়তিষদৃচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। সংযোগ এষাং ন ত্রাত্ত্বাবাদাত্ত্রাপানীশঃ। সৃষ্টদৃঃখহেতোঃ ॥” (১১,২) অর্থাৎ ‘হে ব্রহ্ম-বাদিগণ! জগৎকারণ ব্রহ্ম কি প্রকার অথবা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ না উপাদানকারণ? (১) আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ও জন্মবার পর কাহার দ্বারা জীবিত আছি? (২) বিনাশের পর কোথায় স্থিতিলাভ করিব? (৩) কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সৃষ্টদৃঃখভোগের নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছি? (৪) [তাহারা বিচার করিলেন] সর্বভূতের পরিণামহেতু কালই কি জগতের কারণ? অথবা পদার্থসকলের কার্য্যনিয়ামিকা শক্তি যাহাকে স্বভাব বলে, উহাই কারণ? অথবা পুণাপাপাত্মক প্রাক্তন কর্ম যাহাকে নিয়তি বলা হয়, উহাই কারণ? অথবা সৃষ্টদৃষ্টিই কারণ অর্থাৎ এই জগৎ আকস্মিকভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা পৃথিবী, জল প্রভৃতি ভূতগণই কারণ? অথবা বিজ্ঞানাত্মা জীবই কারণ?—ইহা বিচার্য্য। অথবা পূর্বোক্ত বস্তুগুলির সংহতি বা একত্র মিলনই জগতের কারণ? কিন্তু পূর্বোক্ত বস্তুগুলি জড়; কোন চেতন বস্তুর উপকারের নিমিত্তই জড়বস্তু সকলের সংহতি দৃষ্ট হয়। সুতরাং চেতন জীবাত্তার উদ্দেশ্যেই উহারা সংহত। সুতরাং পূর্বোক্ত জড়বস্তুর সংহতি জগতের কারণ হইতে পারে না। তবে জীবাত্তাই জগতের কারণ হউক। তাহাও হইতে পারে না। কারণ জীব পুণাপাপাত্মক কর্মের ফল সৃষ্টদৃঃখভোগের অধীন ও পরবশ বলিয়া জীবাত্তাও জগতের কারণ হইতে পারে না। ইহার পর ধ্যানযোগে সমাহিত হইয়া ঋষিগণজগৎ-সৃষ্টির কারণীভূতা ঈশ্বরের শক্তিকে দেখিতে পাইলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—‘তে ধ্যানযোগানুগতা অপশান্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিকলানি তানি, কালাত্মবুদ্ধান্যধিতিষ্ঠতোকঃ’ (১৩) অর্থাৎ তখন তাহারা

ধ্যানযোগের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই স্বীয় শক্তি দ্বারা কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত পূর্বে কারণরূপে কল্পিত সমস্ত বস্তুকে নিয়মিত করেন। ত্রিগুণের কার্য্য পৃথিব্যাदि ভূত দ্বারা আবৃত সেই পরমাত্মশক্তিই জগৎসৃষ্টির কারণ। হিন্দুর বহু শাস্ত্রেই প্রকৃতিকে বা আদ্যাশক্তিকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। চন্দীতে বলা হইয়াছে—“যচ্চ ক্রিষ্ণংক্ৰীচদ্রবস্তু সদসদ্ বাঞ্চলাতিক্রমে। তস্য সর্বস্য য়া শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তব্ধসে তদা” অর্থাৎ ‘হে দেবি, জগতে নিত্য বা অনিত্য যে কোন বস্তু, যে কোন স্থানে আছে, তৎসমুদয়ের যে শক্তি তাহা যখন তুমিই, তখন তোমার আর স্তব কি করিব? (প্রথম মাহাত্ম্য ৮২ শ্লোক)। সেই আদ্যাশক্তির প্রভাবেই আমাদেব দেশ ও কালের এবং দেশ ও কালে স্থিত বস্তুসকলের ধারণা হইয়াছে। তাহারই প্রভাবে পরমাত্মা সূর্য্যরূপ ধারণ করিয়া জগতে তাপ প্রদান করেন এবং মনুষ্যাদি জীব ও বৃক্ষলতাদির প্রাণশক্তির সঞ্চার করেন। সেই সূর্য্যই কালের বিভাগকর্ত্তা ও কাল চক্র-প্রণেতা এবং জাগতিক সমস্ত শক্তির উৎস।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জড় শক্তি বা প্রকৃতির বিশ্লেষণেই ব্যস্ত। কিন্তু শক্তি কোন চৈতন্য বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথানিয়মে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করে ইহার সম্বন্ধ তাহারা পান নাই বা উহা লইয়া তাহারা মাথাও ঘামান না। বৈজ্ঞানিক Russel বলেন—“Science does not aim at immutable truth”. Thomson বলেন—“Science does not pretend to be a bed-rock of truth.” Eddington বলেন—“The physicist is unconcerned as to whether atoms or electrons exist”. Jeans বলেন—“We are not in contact with ultimate reality”. ইত্যাদি। সুতরাং দেখা গেল কি বৈজ্ঞানিক কি সাধারণ ব্যক্তি সকলের দৃষ্টি এক অজ্ঞানশক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও সত্যদর্শনে বঞ্চিত। যে বিজ্ঞান সত্যের স্বরূপ সম্যক্ দেখিতে পায় নাই, উহা অন্য বিজ্ঞান, সম্যক্ বিজ্ঞান নয়! সেইজন্য আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি চমকপ্রদ হইলেও এবং ভোগের পথ সুগম করিলেও সেই

ভোগসংগ্রহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উহা পৃথিবীতে নানাপ্রকার দুঃখ অশান্তি ও চঞ্চলতারও সৃষ্টি করিয়াছে। ঈশ্বরবিমুখ, অহংকার-প্রধান ও ভোগমুখীন এই সভ্যতার ফলে মানুষ শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। শক্তির সাধনা গিবে স্থিত হইবার জন্য, নতুবা উহা জগৎ ধ্বংসের কারণ। তপস্যা দ্বারা শক্তি লাভ হয়, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। দ্রাবণাদি অসুরগণও তপস্যা দ্বারা প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই তপস্যালব্ধ শক্তি পৃথিবীতে অশান্তি ও ধ্বংস আনয়ন করিয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে, শক্তি বা প্রকৃতি কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে—যেমন মানুষকে আশ্রয় করিয়া মানুষের এবং পশুকে আশ্রয় করিয়া পশুর প্রকৃতি বা শক্তি অবস্থান করে। আবার অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রস্তুতকরে আশ্রয় করিয়া উহার জড়জ শক্তি অবস্থান করে। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, উপরে যে প্রকৃতি বা শক্তির কথা বলা হইল, উহা কাহার আশ্রয়ে স্থিত? শক্তি যাহার আশ্রয়ে স্থিত, উহাকে শক্তিমান্ বলে। এখন প্রশ্ন উঠিবে, সেই শক্তি বা শক্তিমানের সম্বন্ধ কিরূপ? উহা ভেদ, না অভেদ, না ভেদাভেদ এবং সেই শক্তিমানের স্বরূপ কি প্রকার? সৃষ্টি স্বীকার করিতে গেলে শক্তির স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে, আবার শক্তিকে স্বীকার করিলে শক্তিমানকেও স্বীকার করিতে হয়। আবার শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়কে স্বীকার করিতে গেলে উভয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়ও আবশ্যিক হয়। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টি জগতে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্রাদি গ্রহ উপগ্রহগণ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছেন। সমস্ত বেলা জীবন করিতেছে না। দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসরাদি নিয়মিত-ভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হইতেছে। বাহার উৎপত্তি আছে, উহার বিনাশ অবশ্যস্বাবী। বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি ঠিক পর পর আসে ও চলিয়া যায়। এই সব দেখিয়া মনে সত্যই প্রশ্ন জাগে ‘এই নিয়ম কে করিল’? জড় শক্তি কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার নিয়ামক, ইহা আমরা দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিকগণ যে

সকল যন্ত্রের বা শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন, উহারা চেতন মনুষ্য দ্বারাই পরিচালিত। জড়া প্রকৃতি স্বয়ং অন্ধ—প্রকৃতি চেতন পুরুষের সাহায্য-ব্যতীত কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বা উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা দর্শন করিয়া আমরা উহার কারণরূপে কোন সর্বজ্ঞ চেতন পুরুষের অনুমান করিতে পারি—তিনিই ঈশ্বর। যদি বল প্রকৃতি নিজে কর্ম করিতে পারে, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে—যেমন চুম্বকের সম্মুখস্থিত লৌহ সূত্র বিচলিত হয়, জল স্বভাবতঃই নিম্নদেশে গমন করে, ইত্যাদি। এতদন্তরে বলি—চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করিবে এবং জলের যে নিম্নাভিমুখী গতি হইবে ইত্যাদি নিয়ম কে করিল? ঐ সকল নিয়মের কর্তা সত্য-সম্প্রদায় স্বাধীন ঈশ্বর। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্তঃ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী গরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্যামিতঃ”—ইত্যাদি (৩।৭।৩ হইতে) অর্থাৎ ‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে পৃথক্, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া উহাকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। আরও বলা হইয়াছে—“এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যোচ্চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ; এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, দ্যাৱাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ; এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, নিমেষা মূহুর্তা অহোরাত্রাণ্যধ্বাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতান্তিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি (৩।৮।৯) অর্থাৎ ‘হে গার্গি! এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, শ্বর্গলোক ও পৃথিবী ইহারা স্ব স্ব স্থানে বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মূহুর্তা, অহোরাত্রা, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতি বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।’ ভগবান্ ও গীতায় বলিলেন—“ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্” (৯।১০) অর্থাৎ অধ্যক্ষতা-হেতু প্রকৃতি সচরাচর (চেতন ও অচেতন) এই জগৎকে প্রসব করেন।’ ভগবান্ বাসদেবও ব্রহ্মসূত্রে—“ঈক্ষতে নাশদম্” (১।১।৫) এই সূত্র দ্বারা জড়া প্রকৃতির জগৎকর্তৃপদের নিষেধ করিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদ, না অভেদ, অথবা ভেদাভেদ ইহা লইয়া কতকগুলি ঈশ্বরবিশ্বাসী দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে। যাহারা মনে করেন শক্তি ও শক্তিমানের ভেদই সত্য এবং শক্তিমান দ্বারা শক্তি ও তৎকার্য্য জীব ও জগৎ নিয়ন্ত্রিত, তাহারা হইলেন দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়—যেমন ন্যায়, বৈশেষিক, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সম্প্রদায়। যাহারা মনে করেন, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা, তাহারা হইলেন অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়—অটাবক্র, ব্যাস, বিশিষ্ট, ভাষ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়গণ ভেদাভেদবাদী। এই ভেদাভেদবাদীগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় মনে করেন, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে এবং ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য—যেমন নিম্বাকাচার্য্য, ভাষ্করাচার্য্য, প্রভৃতির মত। নিম্বাকাচার্য্যের মতে শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে ব্রহ্ম নিগূঢ়; ভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনিই সগূঢ়। এই উভয়ই ব্রহ্মের ভাব, সুতরাং উভয়ই সত্য। আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাহার মতে জীব ও জগৎ-বিশিষ্ট এক অদ্বৈত সগূঢ়ব্রহ্মই জগতের কারণ। রামানুজের মতে ব্রহ্ম অংশী, জীব ও জগৎ তাহার অংশ ও বিশেষণ। অংশীর মধ্যে অংশ অন্তর্গত থাকে—যেমন অংশরূপ তরঙ্গঅংশী সমুদ্রের অন্তর্গত। কিন্তু অংশই অংশী নয়—যেমন তরঙ্গই সমুদ্র নয়। এইরূপ ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হইলেও জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নয়। রামানুজ ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার না করিলেও তাহার স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ ব্রহ্মে নিত্য শক্তির অবস্থিতি স্বীকার করেন—তাহারা শক্তিকে মিথ্যা বলেন না। শক্তিপ্রযুক্ত ব্রহ্মে বিশেষ স্বীকার করায় এই মতকে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বলে। তবে এই মতে রামানুজমতের ন্যায় শক্তিমানের সহিত শক্তির স্বরূপগত বা স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয় না—এই মত অদ্বৈতমতের সর্বাপেক্ষা সমীপবর্তী। কিন্তু মহানির্বাণ তন্ত্রের বা মহাকাল-সংহিতার মতের সহিত অদ্বৈতমতের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শক্তিমানের সহিত শক্তির একই কালে কিরূপে ভেদ ও অভেদ এই বিরুদ্ধ

সম্বন্ধদ্বয় থাকিতে পারে? ইহা ভো আমাদের বুদ্ধির ধারণার অতীত—ইহা বিচার করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিলেন—এ বিরুদ্ধ সম্বন্ধদ্বয় আমাদের চিন্তার অতীত হইলেও অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে একই কালে বিরুদ্ধ সম্বন্ধদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে। এইজন্য গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলা হয়—বৈষ্ণবগণ ইহাই চৈতন্যদেবের মত বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সাংখ্য অথবা মীমাংসাদর্শনে সর্বশক্তিমান্ নিতামুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রসঙ্গই উঠে না। সাংখ্যমতে, চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহের বিচলনের ন্যায়, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি সৃষ্টি বিচলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—পুরুষ সর্বদা অসঙ্গ ও উদাসীন বলিয়া এ বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব নাই। পূর্বমীমাংসামতেও জীবের অদৃষ্ট এবং পরমাণুই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকৃত।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু, ঈশ্বর, জীব, আকাশ, দিক, কাল প্রভৃতি বস্তুসকলকে নিত্য স্বীকার করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব-সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই মতে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা। ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ পরমাণু। কিন্তু সৃষ্টাদিবিষয়ে ঈশ্বর নিরপেক্ষ কারণ নহেন, অর্থাৎ তাহাকেও জীবসকলের ভিন্ন ভিন্ন কর্মসংস্কার অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি করিতে হয়, নতুবা তাহাতে বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈঘর্ন্য (নিষ্ঠুরতা) প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। পরমাণুসকল জন্য দ্রব্যের উপাদান কারণ। পদার্থসকলকে ভাগ করিতে করিতে যদি পক্ষা উহাদের আর সূক্ষ্ম ভাগ করা যায় না, উহাই পদার্থসকলের পরমাণু। পরমাণুসকল নিরবয়ব ও অদৃশ্য। জীবসকলকে কর্মফল প্রদান করিবার জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি ইচ্ছা হইলে ঈশ্বরেচ্ছায় দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্বাণ্ডকের সৃষ্টি করে, কিন্তু উহাও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দর্শনযোগ্য হয় না। তিনটি দ্বাণ্ডক বা ছয়টি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি ব্রহ্মণ্ডের সৃষ্টি করে—ইহা গব্যাক্ষপথের সূর্যালোকে আমাদের দর্শনযোগ্য হয়। এইরূপে ঈশ্বরেচ্ছায় পরমাণুসকলের

মিলনে শূন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই ন্যায়-বৈশেষিকগণের মত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুকেও বিভক্ত করিয়া Proton ও Electron নামক Positive ও Negative electricityকে জগৎকারণ বলিয়া মনে করেন, ইহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। ন্যায় মতে বলা হয়, কারণের মধ্যে কার্য্য থাকে না—কারণ হইতে নূতন কার্য্যবস্তুর উৎপত্তি হয়। দৃষ্টান্তে বলা হয়, সূত্ররূপ কারণ হইতে নূতন বস্তুর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। সূত্ররূপ কারণে বস্তুরূপ কার্য্য ছিল না। এইজন্য ন্যায়-বৈশেষিকগণকে অসংকার্য্যবাদী বা আরম্ভবাদী বলা হয়।

সাংখ্যমতে পদ্রুশের সান্নিধ্যে প্রকৃতিই জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা স্বীকার করা হয়, সেইজন্য সাংখ্য পরিণামবাদী। অবশ্য সাংখ্য প্রকৃতিরই পরিণাম স্বীকার করেন, পদ্রুশের পরিণাম স্বীকার করেন না। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মকা। ঐ তিন গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয়। ঐ তিন গুণের মাত্রার পরিমাণের তারতম্যানুসারে জগতে অসংখ্য বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। জাগতিক সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণাত্মক এবং প্রকৃতি-প্রসূত। প্রকৃতিই মহত্ত্ব, অহংকার, সূক্ষ্মভূত (তন্মাত্রা), ইন্দ্রিয়াদি ও শূন্যভূতরূপে বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পরিণামী হইলেও মিথ্যা নয়—প্রকৃতি পরিণামী নিত্য, পদ্রুশ কুঠংহ নিত্য। প্রকৃতিকে নিত্য স্বীকার করায় সাংখ্য দ্বৈতবাদী। সাংখ্যমতে কার্য্যবস্তুটি কারণে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, উহাই নিমিত্ত-কারণের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইলে, আমরা উহার উৎপত্তি স্বীকার করি। বস্তুতঃ যাহা অসৎ বা একেবারে নাই, উহা হইতে কোন সম্ভবত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না—ইহাই সাংখ্যদর্শন-স্বীকৃত সংকার্য্যবাদ। সাংখ্যমতে যাহাকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, উহাই বেদান্তের মায়াশক্তি এবং উহা ঈশ্বরের অধীন।

তান্দ্রিকগণের মতে শিব ও শক্তির মিথুনাই এই জগতের উৎপত্তি। শিব চৈতন্যস্বরূপ হইলেও তদীয় শক্তি ও তত্ত্বে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন

এবং শিবকে জীবরূপে মোহিত করিয়া অষ্টপাশে বদ্ধ করেন। আবার উপাসনা দ্বারা শক্তি তুষ্টা হইলে জীবকে পাশমুক্ত করিয়া পুনরায় স্বকীয় শিবপদে স্থাপিত করেন। এই শক্তিবিশিষ্টাষ্টৈতমতে শক্তি-সাধনার প্রাধান্য। এইমতে শক্তিহীন শিব শব্দস্বরূপ।

আচার্য্য শংকরও সৌন্দর্য্য-লহরী শ্লোকে বলিয়াছেন—“শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রসবিতুম্। ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। অর্থাৎ ‘শিব যদি শক্তির সহিত যুক্ত হন, তবেই জগৎসৃজন করিতে সমর্থ হন, নতুবা সেই দেবতার স্পন্দিত হইবারও সামর্থ্য নাই।’ তান্ত্রিক সাধকগণ সাধনা দ্বারা মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া, মূলাধারাদি ছয়টি চক্রে ক্রমশঃ ক্ষিত, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ ও অহংতত্ত্বকে জয় করিয়া এবং ‘অ’ কারাদি ‘ক্ষ’ কার পর্য্যন্ত বর্ণমালাকে নাদবিন্দুতে লয় করিয়া, পরে সহস্রারস্থিত পরমগুরু পরম শিবের সহিত মিলিত হন। ঐ পঞ্চাশটি বর্ণই ঈশ্বরের সৃষ্টি-শক্তি সরস্বতী। তাই সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—“কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।” শক্তি-বিশিষ্টাষ্টৈতবাদিগণের মতে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় শক্তি শিবের নিত্য সহচরী, উহা নিত্যা, মিথ্যা নহে। সৃষ্টি শক্তিমান্ ঈশ্বরের লীলা।

পূর্বোক্ত বাদিগণের মধ্যে এক অদ্বৈতবাদীই জগৎকে মিথ্যা বলেন, অপর বাদিগণের মতে জগৎ সত্য। জগৎ সত্য কি মিথ্যা ইহা লইয়া অন্য বাদিগণের সহিত অদ্বৈতবাদিগণের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, উহাদের উল্লেখ এই প্রবন্ধে সম্ভব নয় এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও উহা নয়। সিদ্ধান্তে অদ্বৈতমতের সহিত অন্য মতের বিরোধ থাকিলেও সাধনবিষয়ে বিরোধ নাই। অদ্বৈতবাদিগণ সাধন-হিসাবে পূর্বোক্ত সকল মতেরই উপযোগিতা স্বীকার করেন—কারণ সিঁড়ি না বাহিয়া কেহ ছাদে উঠিতে পারে না। ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই’ ইহাই অদ্বৈতবাদের সার কথা। অদ্বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্তে সৃষ্টি স্বীকৃত নয়, স্তূতরূপে শক্তিও স্বীকৃত নয়। অদ্বৈতমতে এক অদ্বৈত নিগূঢ় ব্রহ্মই জীবের অনাদি

অজ্ঞানবশতঃ উহার নিকট বহুরূপে প্রতীত হয়, উহাই সৃষ্টি। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে নিগূঢ় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিয়া যান, উহাতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর নাই। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জগৎ প্রত্যক্ষ—উহাদের নিকট ‘জগৎ নাই’ এই বাক্য প্রলাপতুল্য মনে হইবে। সেইজন্য অদ্বৈতমতে জীবের অজ্ঞানাবস্থায় জগতের একটা ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয় এবং অজ্ঞানিগণকে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে ষ্ঠৈতাবলম্বনে জপ, পূজা, ধ্যানাদিও করিতে বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল—সম্যক্ জ্ঞানলাভের পূর্বে অদ্বৈতবাদিগণও শক্তির স্বীকার করেন। বেদ, গুরু, ঈশ্বর প্রভৃতি শক্তিরই বিকাশ—ঐ সকল ব্যতীত কিরূপে নিগূঢ় ব্রহ্মের অনুভূতি হইবে? কিন্তু শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না বলিয়া অর্থাৎ শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির পৃথক্ সত্তা না থাকায়, অদ্বৈতমতে শক্তি মিথ্যা। যাহা স্বরূপতঃ নাই, অথচ প্রতীত হয়, উহাকে মিথ্যা বলে—মিথ্যা বস্তুর সত্তা ভ্রান্তিকালে স্বীকৃত। ভ্রান্তি কাটিয়া গেলে ঐ সত্তা থাকে না। অদ্বৈতমতে অজ্ঞানকালে জীব, জগৎ, ঈশ্বর স্বীকৃত এবং ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্টি-বিস্তারও স্বীকৃত। অদ্বৈতবাদে যে সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়, উহাতে সৃষ্টির সত্যতা প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু ‘তালপুকুর’ শব্দে যেমন তালগাছ দ্বারা পুকুরকেই নির্দেশ করা হয়, এইরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে নিগূঢ় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করানই সৃষ্টি-বর্ণনার তাৎপর্য্য। কিন্তু অন্য বাদিগণ সৃষ্টি সত্যজ্ঞানে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেন। যাহা হউক এই জগৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তির বিকাশ—ইহার স্বরূপ নির্ণয় মানবের পক্ষে অসম্ভব, ইহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি। সেই মায়াশক্তিকে সৎ বা অসৎ বা সদসৎ কোনরূপে নির্দেশ করা যায় না বলিয়া অদ্বৈত-বেদান্তে মায়াকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ভ্রান্তিকালে ঈশ্বরের সেই মায়াশক্তি আমাদের নিকট সত্যরূপে প্রতীত হয়, বিচারকালে উহাকে অনির্বচনীয় মনে হয়, তদুদ্দেশ্যে ঐ মায়া নাই। সেই মায়াশক্তির আবার দুইটি বিভাগ—(১) অবিদ্যাশক্তি (২) বিদ্যাশক্তি। মায়ার যে শক্তি আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিকে আবৃত করিয়া এক অদ্বৈতব্রহ্মকে আমাদের নিকট

বহুরূপে প্রদর্শন করে, উহা অবিদ্যা শক্তি । যে শক্তি বহুরূপের মধ্যে এক অষ্টৈত
ব্রহ্মকেই প্রদর্শন করে, উহা বিদ্যা শক্তি । এই বিদ্যা ও অবিদ্যা আলোক ও
অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বলিয়া বিদ্যা (বৃত্তিজ্ঞান) দ্বারা অবিদ্যার
(অজ্ঞানের) নাশ হইয়া থাকে । বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে সেই জ্ঞানী
জীবের প্রথমে সর্বত্র সমদর্শন লাভ ও পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে, পরে জীবের স্বীয়
নিগূঢ়ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়—ইহাই নিবর্ণিমোক্ষ । এই অবস্থা বাক্য ও
মনের অগোচর—এখানে সৃষ্টি, জগৎ, ঈশ্বর, মায়া কিছুই নাই । সেইজন্য
আচার্য্য গোড়পাদ মাণ্ডুক্য কারিকাতে বলিয়াছেন—“ধর্মা য ইতি জায়ন্তে, জায়ন্তে
তে ন তত্ত্বতঃ । জন্ম মায়াপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে” (৪৫৮) অর্থাৎ
'যে সকল আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা জন্মে না । তাহাদের
জন্ম মায়াসদৃশ—সেই মায়াও আবার প্রকৃতপক্ষে নাই ।' কিন্তু মায়ের কুপা-
ব্যতীত যেমন বাবার পরিচয় হয় না, এইরূপ ঈশ্বরশক্তি বিদ্যার কুপাব্যতীত
আমরা নিগূঢ় ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারি না । মাতৃ-স্বরূপিণী ঈশ্বরের
সেই বিদ্যাশক্তিকে সেইজন্য আমরা গায়ত্রী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ
প্রভৃতিরূপে উপাসনা করি—শক্তি ভিন্ন সাধনা হয় না । আমরা প্রতি বস্তুর
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় দেখিতে পাই—উহা শক্তির প্রভাবেই হইয়া থাকে ।
সেইজন্য আমাদের ত্রিসংখ্যায় গায়ত্রীমন্ত্রে আমরা ব্রহ্মাণী (সৃষ্টিশক্তি) বৈষ্ণবী
(পালনশক্তি) এবং রৌদ্রী (ধ্বংস শক্তি) শক্তির ধ্যান করি । সূর্য্যরশ্মির
সাহায্যেই যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, এইরূপ শক্তির সাহায্যেই শক্তিমানকে ধরিতে
হয় । শক্তির সাহায্যে শক্তিমানের সম্যক্ প্রপন্ন হওয়াই প্রকৃত কল্যাণের পথ ।
তাই ভগবান্ গীতার শেষে বলিলেন—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং নবপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শূচঃ ॥” (১৮:৬৬) অর্থাৎ 'ধর্ম ও
অধর্মের সমস্ত সংস্কার ত্যাগপূর্বক কেবল আমার (ঈশ্বরের) শরণ গ্রহণ কর ।
আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব ; শোক করিও না ।'

শব্দ-প্রমাণ

শাস্ত্রীপ্রমার করণকে শব্দ-প্রমাণ বলে। এখানে করণ ও কারণ কাহাকে বলে, উহা জানা আবশ্যক। ব্যাপারবান্, অসাধারণ কারণকে করণ বলে। যেমন চক্ষু-ইন্দ্রিয় ব্যাপারবান্, হইয়া রূপদর্শনের অসাধারণ কারণ হয় বলিয়া চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপদর্শনের করণ। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, যেমন—‘চক্ষুশ্চা পণ্যতি’। কার্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববৃত্তিই কার্যের কারণ। যেমন ঘটাতির যে নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববৃত্তি কপালবয় উহা ঘটের কারণ। কারণ দুই প্রকার :— (১) সাধারণ (২) অসাধারণ। সর্বকার্যের কারণকে সাধারণ কারণ বলে। ঈশ্বর ও তাহার জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দিক্, কাল, অদৃষ্ট, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকাভাব এই নয়টি সাধারণ কারণ। ইহা ছাড়া ঘটাতির যে কপালাদি কারণ, উহারা অসাধারণ কারণ। উহাদের মধ্যে কোনটি উপাদান-কারণ, কোনটি নিমিত্ত-কারণ। যাহার স্বরূপে কার্যের স্থিতি, উহা উপাদান-কারণ—যেমন মৃত্তিকা-স্বরূপেই কপালবয়ের স্থিতি বলিয়া মৃত্তিকা কপালবয়ের বা ঘটের উপাদান কারণ। উহা হইতে যাহা ভিন্ন, উহা নিমিত্ত কারণ—যেমন কুণ্ডকার, চক্ষু, দণ্ডাদি। নিমিত্ত-কারণ কার্যে অনঙ্গত থাকে না।

শাস্ত্রী-প্রমা দুই প্রকারের হয়—(১) ব্যাবহারিক (২) পারমাথিক। ব্যাবহারিক শাস্ত্রী-প্রমা আবার দুই প্রকারের হয়—(১) লৌকিক বাক্যজন্য (২) বৈদিক-বাক্যজন্য। “নীলো ঘটঃ”—ইহা লৌকিক বাক্যজন্য। “বজ্রহন্তঃ পুরুন্দরঃ”—ইহা বৈদিক বাক্যজন্য ; বেদবাক্য ভিন্ন পুরুন্দর বা ইন্দ্র যে বজ্রহন্ত, উহা জানা যায় না। বৈদিক বাক্য আবার দুই প্রকারের হয়—(১) ব্যাবহারিক অর্থের বোধক (২) পরমার্থ-তত্ত্ববোধক।

স্বরূপ-বোধক বাক্য দুই প্রকার—(১) ‘তৎ’ পদার্থ বা ‘তৎ’ পদার্থের স্বরূপবোধক অবাচ্য-বাক্য। যেমন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ’ (তৈত্তিরীয় ২১) ইহা ‘তৎ’ পদার্থের বা ব্রহ্মের

স্বরূপবোধক বাক্য। কিন্তু “যোঃঃঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭) অর্থাৎ ‘এই প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থ জ্যোতির্ময় পুরুষ (তিনিই আত্মা)’ এই বাক্যে জীবের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত বাক্য দুইটিতে রক্ষা ও জীবের স্বরূপ পৃথক পৃথক রূপে প্রদর্শিত হইলেও উহাদের একত্ব কথিত হয় নাই। সুতরাং ঐ বাক্য দুইটি হইতে জীবব্রহ্মের একত্ব জানা যায় না—ইহারা অবান্তর বাক্য। (২) ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’ পদার্থের অভেদবোধক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। যেমন—“তত্ত্বমসি” ‘তুমিই সেই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির বেদের অবান্তর বাক্য শ্রবণে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়। শৃংখলিত ব্যক্তি মহাবাক্য-বিচার শ্রবণে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন। এখানে ইহা জানা আবশ্যিক যে, ঘট, পটাদি বস্তু সম্মুখে থাকিলেও কেহ যদি বলিয়া না দেয়, ‘ইহা ঘট’ ‘ইহা পট’ তবে আমাদের ঘট পটাদির জ্ঞান হয় না। শব্দশ্রবণ ব্যতীত কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না। এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানও গুরুমুখে শ্রুত বেদান্তবাক্য হইতেই হইয়া থাকে, বাক্যশ্রবণ ব্যতীত ঐ জ্ঞান হয় না।

কতকগুলি পদ দ্বারা একটি বাক্য গঠিত হয় এবং একটি বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিষয় দুইটি অংশ থাকে। যাহার বিষয় কিহু বলা হয়, উহা উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যের বিষয়ে যাহা বলা হয়, উহা বিষয়। পদসকলের দ্বারা বাক্য গঠিত হয় বলিয়া পদসকলের অর্থজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞান বাতীত বাক্যার্থ জ্ঞান হয় না। পদের অর্থের সহিত পরিচয় হইলে পর পর উচ্চারিত শব্দের স্মরণ এবং উহাদের সম্বন্ধের জ্ঞানপূর্বক বাক্যার্থজ্ঞান হয়। বাক্যার্থজ্ঞানজন্য প্রথমে পদশক্তির জ্ঞান এবং বাক্যার্থজ্ঞানের সহকারিকারণ (১) আকাঙ্ক্ষা (২) যোগ্যতা (৩) আসক্তি এবং (৪) তাৎপর্য প্রভৃতিরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পদসকলের পদার্থবোধক শক্তি তিন প্রকার (১) যোগ (২) রূঢ় এবং (৩) যোগরূঢ়। (১) যে পদে অবয়বশক্তি দ্বারা পদার্থের বোধ জন্মায়, উহা যৌগিক পদ। যেমন ‘পাচক’ এই পদ ‘পচ্’ ধাতু ‘ক’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ‘পচ্’ ধাতুর শক্তি পাক ক্রিয়াতে

এবং 'গক্' প্রত্যয়ের শক্তি কৰ্তৃতে । এইজন্য 'পাচক' শব্দ অবয়ব-শক্তিদ্বারা 'যে পাক করে' উহাকে ব্ৰূয়্যাইতেছে । এইজন্য উহা যৌগিক শব্দ । (২) কিন্তু যে পদে অবয়বশক্তি থাকিলেও উহার সাহায্য ব্যতিরেকেই কেবল সমুদায়ের শক্তি দ্বারা অর্থের বোধ জন্মায়, যে পদ কোন রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যবহৃত হয়, উহা রৌঢ়িক পদ । যেমন 'গম্' বাত্ 'ভো' প্রত্যয় করিয়া 'গো' পদ নিঃপন্ন । 'গম্' বাত্বের অর্থ গমন এবং 'ভো' প্রত্যয়ের অর্থ কৰ্তৃ । সুতরাং অবয়বশক্তি দ্বারা 'গো' শব্দের অর্থ—'যে গমন করে ।' কিন্তু উহা গমনকারী অন্য জীবকে ব্ৰূয়্য না । 'গো' পদ গরু অর্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ বলিয়া এই পদ রৌঢ়িক । (৩) যেখানে পদের অবয়বশক্তি এবং রূঢ়শক্তি উভয় দ্বারাই পদার্থের বোধ জন্মায় উহাকে যোগরূঢ় পদ বলে । যেমন 'পঞ্চজ' (পঞ্চ+জন+ড) শব্দ অবয়বশক্তি দ্বারা 'সাহা পক্ষে জন্মায়' সেই বস্তুকে ব্ৰূয়্য বলিয়া ইহা যৌগিক শব্দ । পক্ষে কুমুদ বা অন্য জলজন্তুও জন্মায় । কিন্তু 'পঞ্চজ' শব্দের অর্থ পক্ষ বা কমলেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ । ইহাতে যৌগিক ও রৌঢ়িক উভয় শক্তি থাকাতে 'পঞ্চজ' পদ যোগরূঢ় ।

এক্ষণে আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে—(১) আকাঙ্ক্ষা—কোন অসম্পূর্ণ বাক্য শূন্যবার পর উহার অর্থ সম্পূর্ণের জন্য শ্রোতার যে পদান্তর শূন্যবার ইচ্ছা থাকে, সেই আবশ্যকবোধকে আকাঙ্ক্ষা বলে । যদি কেহ 'আমি' এই শব্দের উচ্চারণ করেন, তবে শ্রোতার মনে এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইবে যে, বস্তু, 'আমি' পদ দ্বারা কি বলিতে চান ? বস্তুর গৃহ হইতে শ্রোতার আরও অনুরুদ্ধ পদ শূন্যবার ইচ্ছা হইবে । বস্তু যখন বলিবেন 'যাইব' তখন 'আমি যাইব' বাক্য হইতে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে । (২) যোগ্যতা—যে বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ ও যুক্তির অবিরোধী, উহাই যোগ্য বাক্য । যোগ্য বাক্যই যথার্থ বিষয় প্রকাশ করে । যেমন 'পূর্বদিকে সূর্য উঠে'—ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তির অবিরোধী বলিয়া যোগ্য বাক্য । কিন্তু 'অগ্নি দ্বারা সিগুন করিতেছে' 'এই ব্যক্তির জননী বধ্যা' ইত্যাদি বাক্য প্রত্যক্ষ ও যুক্তির বিরোধী বলিয়া যোগ্য বাক্য নহে । কিন্তু এই স্ত্রী বধ্যা' ইহা যথার্থ অর্থ প্রকাশ

করিতেছে বলিয়া যোগ্য বাক্য । (৩) আসক্তি—বাক্যস্থ পদগুলির সম্বন্ধানুসারে বিনা বিলম্বে পর পর উচ্চারণ করার নাম ‘আসক্তি’ । বাক্যস্থ পদসকল আসক্তিক্রমে উচ্চারিত না হইলে শ্রোতা বক্তার মনোভাব বুঝিতে পারে না । ‘গরু ঘাস খাইতেছে’ এই বাক্যটি যদি ‘ঘাস খাইতেছে গরু, এইভাবে বলি, অথবা যদি এখন ‘গরু’ পদটি বলিয়া দ্রুই ঘণ্টা পরে বলি ‘ঘাস এবং আরও দ্রুই ঘণ্টা পরে বলি ‘খাইতেছে’ তবে আসক্তিক্রমে উচ্চারিত না হওয়ায় ঐ বাক্য অর্থপ্রকাশক হইবে না (৪) তাৎপর্য—বক্তার মনোগত অভিপ্রায়ই তাহার বাক্যের তাৎপর্য । এই তাৎপর্য শব্দজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ । যে বাক্যের তাৎপর্য নাই, উহা আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতানুসারে উচ্চারিত হইলেও অপ্রমাণ । তাৎপর্যবলে যোগ্যতা-বিহীন বাক্যও সাধু বলিয়া বিবেচিত হয় । যেমন ‘এই ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা’ এই এই বাক্যে বাক্যার্থপ্রকাশে অযোগ্য হইলেও বক্তার তাৎপর্যানুসারে উত্তম ভাবের বোধক হইতে পারে । যেমন যদি কেহ বলেন ‘ঈশ্বর নাই’ এবং তদন্তরে যদি অপর ব্যক্তি বলেন—‘ইহার মাতা বন্ধ্যা’ তবে তাহার বক্তব্যের তাৎপর্য স্বীয় জননী হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্যতানের পক্ষে তাহাকে বন্ধ্যা বলা যেমন উপহাসকর, এইরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন জীবের পক্ষে ঈশ্বরকে অস্বীকার করাও উপহাসকর । পশুদর্শীকার বলিয়াছেন—‘আমার জিহ্বা নাই’ এইরূপ উক্তি যেমন লজ্জার কারণ, যেহেতু জিহ্বা দ্বারাই ঐরূপ উক্তি করা হয় ; সেইরূপ বোধ বা জ্ঞানকে আমি বুঝি না বা জানি না বলাও লজ্জার কথা ।’ যেহেতু ‘আমি যে বোধকে বুঝি না’ উহাকে আমি বোধদ্বারাই বুঝি বা জানি । সুতরাং এখানে বক্তার তাৎপর্যানুসারে—‘ইহার মাতা বন্ধ্যা’ এই বাক্য অপ্রমাণ নহে, পরন্তু উৎকৃষ্ট ভাবের ব্যঞ্জক বলিয়া প্রমাণ । সেইজন্য ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণই হইতেছে, উহার তাৎপর্য-জ্ঞান । যাহা হউক যে বাক্য আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে, যে বাক্যের অর্থপ্রকাশের যোগ্যতা আছে, যে বাক্যের পদসকল সম্বন্ধানুসারে পর পর অব্যবহিতভাবে উচ্চারিত হয় এবং যে বাক্যের তাৎপর্য আছে, এতাদৃশ বাক্যই লোকমধ্যে প্রমাণ ।

শব্দের বৃত্তির ভেদ :—(এতৎ সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

তথাপি এখানে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হইতেছে) — পদের অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলা হয়। শক্তি ও লক্ষণাভেদে বৃত্তি দুই প্রকার। (১) শক্তিবৃত্তি — পদার্থের বোধহেতু সামর্থ্যকে শক্তি বলে। যেমন ‘ঘট’ এই পদের শক্তির ঘটকত্বকে বৃদ্ধাইবার সামর্থ্য আছে। পদের শক্তি যে অর্থে (বিষয়ে) হইরা থাকে, ঐ অর্থকে পদের শক্তি বলা হয়। যেমন ‘ঘট’ ও ‘পট’ এই পদদ্বয়ের অর্থ কলস ও কুম্ভ, সুতরাং উহারা ঐ পদদ্বয়ের শক্ত্যর্থ, উহাকে বাচ্যার্থও বলা হয়। (২) যেখানে কোন বাক্যে পদের শক্ত্যর্থ গ্রহণ করিয়া বাক্যার্থের সামঞ্জস্য করা যায় না, সেখানে প্রথমে পদের শক্ত্যর্থ-গ্রহণপূর্বক সেই শক্ত্যর্থের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে পদের লক্ষ্যার্থ নির্ণয় করিয়া বাক্যার্থ করিতে হয়। যেমন কোন ব্যক্তি বলিল — “গঙ্গায় ঘোষঃ” অর্থাৎ ‘গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।’ বক্তার ঐ বাক্য হইতে শ্রোতার মনে প্রথমে ‘গঙ্গা’ পদের যে বাচ্যার্থ বা শক্ত্যর্থ ‘ভাগিরথী-জলপ্রবাহ’, ঐ অর্থেরই উদয় হইবে। কিন্তু, ভাগিরথীর জলপ্রবাহে ঘোষের বা ঘোষপল্লীর অবস্থিতি অসম্ভব। তখন শ্রোতা ঐ পদের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া ঐ শক্ত্যর্থের সহিত সম্বন্ধ যে ভাগিরথীতীর, উহাতেই ঘোষপল্লীর অবস্থিতি — ইহা বলাই বক্তার ঐ বাক্যের তাৎপৰ্য্য লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ইহা বুঝিয়া লইবেন। এই লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যেই ত্রীণের ব্রহ্মজ্ঞান হয়; শব্দের শক্তিবৃত্তি দ্বারা হয় না। সেই লক্ষণা তিন প্রকার — (১) জহতী (২) অজহতী (৩) জহতী-অজহতী বা ভাগ-ত্যাগলক্ষণ। ‘জহতী’ পদের অর্থ ‘যে ত্যাগ করে’। পূর্বোক্ত “গঙ্গায় ঘোষঃ” বাক্যে জহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত। কারণ এ স্থলে ‘গঙ্গা’ শব্দের বাচ্যার্থের ত্যাগপূর্বক বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিধিষ্ট লক্ষ্যার্থ তীরের গ্রহণ করিতে হয়। (২) কিন্তু যে লক্ষণাদ্বারা বাচ্যার্থের সহিত বাচ্যার্থ-সম্বন্ধবিধিষ্ট অন্য অর্থেরও জ্ঞান হয়, উহাকে ‘অজহতী-লক্ষণা’ বলে। যেমন ‘লাল দৌড়াইতেছে’ এই বাক্যে ‘লাল’ পদের বাচ্যার্থ লাল রং। কিন্তু, লাল রং-এর দৌড়ান অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হয় যে, — ‘লাল রং বিধিষ্ট ঘোড়া দৌড়াইতেছে’ ইহা বলাই বক্তার ঐ বাক্যের তাৎপৰ্য্য বা লক্ষ্য। ‘অজহতী’ পদের অর্থ ‘যে ত্যাগ করে না’ — সুতরাং এখানে বাচ্যার্থের ত্যাগ হইল না বলিয়া এই লক্ষণার নাম ‘অজহতী’। এখানে

বাচ্যার্থ 'লাল রং' এর সহিত অশ্বেষরও গ্রহণ হইল। এইরূপ 'কাক হইতে দাঁধ রক্ষা কর'—এই বাক্যে কাকের সহিত অন্যান্য প্রাণী হইতে দাঁধ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা বলাই বড়ার ঐ বাক্যের তাৎপর্য। কিন্তু বাচ্যার্থ কাকের ত্যাগ না হওয়ার ইহাও অজহতী-লক্ষণের দৃষ্টান্ত। ৩। জহতী-অজহতী বা ভাগত্যাগ-লক্ষণা—যে লক্ষণা দ্বারা পদত্রয়ের শকার্থের বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ দ্বারা উহাদের সমান অংশ গ্রহণ করা হয়, উহাই জহতী-অজহতী লক্ষণা বা ভাগত্যাগ লক্ষণা। যেমন "সোহয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যে ভাগত্যাগ লক্ষণা দ্বারা পূর্বকালদৃষ্ট এবং অধুনাদৃষ্ট দেবদত্ত ব্যক্তির একত্ব বুদ্ধাইতেছে। এই স্থলে 'সেই' পদ দ্বারা বাচ্যার্থ অতীতকালস্থ, অত্যাগতস্থ দেবদত্তকে বুদ্ধাইতেছে এবং 'এই' পদদ্বারা সম্মুখ-দেশস্থ এবং বর্তমানকালস্থ দেবদত্তকে বুদ্ধাইতেছে। দেবদত্তের আকার-প্রকারেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এই বিরোধী অংশগুণি দ্বারা বিশেষিত করিয়া দেবদত্তের একত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু ভাগত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধ বিশেষণ অংশ-গুলির ত্যাগপূর্বক উভয়ক্ষেত্রে সমান বিশেষ্য অংশ যে দেবদত্ত ব্যক্তিমাত্র উহার গ্রহণ দ্বারা এই একত্ববোধ হইয়া থাকে। এইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যেও ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শিত হয়। নতুবা বাচ্যার্থ জীব ও ব্রহ্মের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ 'অং' পদের (জীবের) বাচ্যার্থ হইতেছে—যে চৈতন্য অপেক্ষ অল্পপণ্ডিতমান ও অপরোক্ষ এবং 'তং' পদের বাচ্যার্থ হইতেছে—যে চৈতন্য সর্বজ্ঞ, সর্বপণ্ডিতমান ও পরোক্ষ। এখন অপেক্ষ, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া উভয়চৈতন্যের একত্ব-সম্পাদন সম্ভব নয়—বরং ঐ প্রকার বিশিষ্ট চৈতন্যবস্তুর আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং এই বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বোধজন্য ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা উভয়ের বিরুদ্ধ বিশেষণ অংশের পরিত্যাগপূর্বক উভয়ের মধ্যে সমানভাবে স্থিত বিশেষ্যাংশ শব্দ-চৈতন্যের গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ কোন বাক্যের অর্থ বুঝিতে গেলে, পদসকলের অর্থের জ্ঞানপূর্বক পদসকলের অর্থ বা সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে বাক্য কেবল স্বরূপমাত্রের বোধক, সেখানে পদ-সমূহের সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীতও বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পারে। এরূপস্থলে বাক্যকে অখণ্ডার্থ-

বোধক বাক্য বলে। যেমন “সোহয়ং দেবদত্তঃ” এই বাক্যে দেবদত্ত ব্যক্তিমাট্রের স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তের সহিত বস্তুমানদৃষ্ট দেবদত্তের সম্বন্ধ বদ্বায় না। এইরূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্যরূপের ঐক্য বা অভেদই অর্থান্বেতাৎ। উহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের কোনরূপ সম্বন্ধ বদ্বায় না।

শঙ্কা—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, মহাবাক্যবিচার ব্রহ্ম-জ্ঞানের কারণ। কিন্তু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—“যস্মানসা ন মনতে” (কেনোপনিষৎ) অর্থাৎ ‘যাহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না।’ আরও তৈত্তিরীয়ে দেখা যায়—“যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (২।৯) অর্থাৎ ‘মনের সহিত বাক্য বাহাকে না পাইয়া নিবর্ত্ত হয়।’ সুতরাং ‘মহাবাক্য ব্রহ্মপ্রমার করণ’ এইরূপ কখন বিরুদ্ধ।

সমাধান—তাহা হইলে “তং হোপনিষদং পদ্রুশং পৃচ্ছামি।” অর্থাৎ ‘সই উপনিষদবেদ্য পদ্রুশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি’ বৃহদারণ্যক শ্রুতির এরূপ কখন অসঙ্গত হইবে। অতএব বৃদ্ধিতে হইবে যে, শক্তিবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান শব্দ হইতে হইবে না। কিন্তু লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মগোচর জ্ঞান হইবে। সেই জন্য শক্তিবৃত্তি দ্বারা শব্দের ব্রহ্মজ্ঞানের করণতা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ; কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা শব্দের ব্রহ্মজ্ঞানকরণতা স্বীকৃত। লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় ব্রহ্মের উপনিষদ-বেদ্যত্ব সম্ভব। লক্ষণাবৃত্তিজন্য জ্ঞানেও চিদাভাসরূপ ফলের বিষয় ব্রহ্ম নহেন। কিন্তু আবরণ-ভঙ্গরূপ বৃত্তিমাট্রের বিষয়তা ব্রহ্মবিষয়ে আছে। সেইহেতু শব্দজন্য জ্ঞানের ব্রহ্মবিষয়তা সর্বথা নিষিদ্ধ নয়। এইরূপ মানসজ্ঞানের বিষয়তাও সর্বথা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু শব্দমাদিসংস্কাররহিত বিকল্প মনের ব্রহ্মজ্ঞানে হেতুতা নাই। মানসজ্ঞানে যে চিদাভাস-অংশ আছে, উহারও ব্রহ্মবিষয়তা নাই। অর্থাৎ মহাবাক্যবিচার-জনিত ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’রূপ বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক আবরণ ভঙ্গ হইবার পর, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য চিদাভাসের কোন উপযোগিতা নাই। ভাষ্যকারের রীতিতে সংস্কৃত শব্দ মন ব্রহ্মপ্রমার সহকারী এবং শব্দই করণ।

শব্দ-সংস্কারকে লক্ষণা বলে। যদিও উক্ত রীতিতে ব্রহ্ম শক্তিবৃত্তিজন্য জ্ঞানের

অবিষয় সূত্রাং শব্দের শক্তিবৃত্তিকথন নিরর্থক তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানে পরস্পরাক্রমে শক্তিবৃত্তির সার্থকতা আছে, কারণ :—(১) পদের শক্তিজ্ঞানবিনা শব্দের বা বাচ্যার্থের জ্ঞান হয় না (২) শব্দের জ্ঞানভিন্ন শব্দ-সম্বন্ধরূপ লক্ষণের জ্ঞান হয় না (৩) লক্ষণের জ্ঞানভিন্ন লক্ষ্য পদার্থের জ্ঞান হয় না এবং (৪) পদার্থজ্ঞানভিন্ন বাচ্যার্থের জ্ঞান হয় না। সেইজন্য (১) শক্তিজ্ঞানের শব্দজ্ঞানে (২) শব্দজ্ঞানের লক্ষণতে (৩) লক্ষণজ্ঞানে লক্ষ্যরূপ পদার্থজ্ঞানে এবং (৪) পদার্থজ্ঞানের পদার্থ-সমুদয়ের সম্বন্ধজ্ঞানে বা সম্বন্ধসহিত পদার্থসমূহের জ্ঞানরূপ বাচ্যার্থজ্ঞানে উপযোগিতা থাকায় শক্তিবৃত্তির কথন নিষ্ফল নয়।

মহাবাক্য হইতে জিজ্ঞাসুর অখণ্ডব্রহ্মের বোধ হইবে, এইরূপ ঈশ্বরের অনাদি তাৎপর্য আছে, সেইজন্য মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—সেই অপরোক্ষত্বের লক্ষণ কিরূপ? তদুত্তরে বলা যায়—স্ব-ব্যবহারের অনুকূল চৈতন্যের (বৃত্তিচৈতন্যের) সহিত অনাবৃত বিষয়ের অভেদকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ বলে। সংসার-দশায় আবৃত ব্রহ্মের স্বব্যবহারানুকূল চৈতন্যের সহিত অভেদ থাকে। কিন্তু অনাবৃত-ব্রহ্মরূপ বিষয়ের সহিত অভেদ না হওয়ায় ঐ জ্ঞানের ব্রহ্মাপরোক্ষত্ব নাই। এই প্রকার অবাস্তব বাক্যজন্য জ্ঞানেও আবৃত বিষয়ের সহিত অভেদ হইলেও ঐ জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নাই। বিষয়াকারা বৃত্তি-উপহিত চৈতন্যেরই অপরোক্ষত্ব ধর্ম। সেই অপরোক্ষত্বের উপাধি বৃত্তি। সেইজন্য বৃত্তিতে অপরোক্ষত্বের আরোপ করা হয়। কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান লক্ষ্য নহে, চৈতন্যই লক্ষ্য। স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম সর্বদাই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—‘তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি’ (কঠোপ-নিষৎ (২.২।১৫) অর্থাৎ ‘তাহারই প্রকাশে সর্ববস্তু প্রকাশিত হয়।’ যাহার জ্ঞানালোকে সব বস্তু আমাদের নিকটে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ হয়, তিনি কিরূপে পরোক্ষ হইবেন? সেই ব্রহ্ম-বস্তুর অপরোক্ষত্ব অন্যবস্তুর অধ্যস্ত হইলে উহাদিগকে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়। যদিও ব্রহ্মের এই অপরোক্ষতা সর্বগত, তথাপি অনাদি অজ্ঞান দ্বারা আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকায় আমরা স্বরূপ-প্রকাশ ব্রহ্মের সেই সামান্য অপরোক্ষতা হইতে লাভবান হই না। ব্রহ্মের সেই সামান্য অপরোক্ষত্ব যখন আমাদের শব্দ-বৃত্তিগত বিশেষাকারে অনুভূত হয়, তখন

উহা আমাদের বৃদ্ধিস্থ অজ্ঞানের নাশপূর্বক আমাদেরিগকে মোক্ষপ্রদান করে। সেই জন্য গুরুমুখ হইতে শ্রুত বেদান্তবাক্য হইতে আমাদের বৃদ্ধিতে যে অহং স্বাক্ষাস্মি' রূপঅখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয় হয়, উহাতে স্থিত বিশেষজ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক হয়। তখন জীবের নিকট স্বীয় ব্রহ্ম-স্বরূপ স্বেতাই প্রকট হয়—ইহাকেই জীবের আপরোক্ষানুভূতি বলে। অশুদ্ধিগ্ৰে যে মহাবাক্যবিচার-শ্রবণে অখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয় হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। জীবের দিক্ হইতেই পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভবের কথা। নতুবা নিগূঢ় ব্রহ্মে পরোক্ষ ও অপরোক্ষত্বের প্রসঙ্গ নাই।

শঙ্কা—(১) বাচ্য অর্থের লক্ষ্যচেতনে সম্বন্ধ মানিলে লক্ষ্য অর্থের অসঙ্গতার হানি হইবে (২) সম্বন্ধ না মানিলে লক্ষণাই সিদ্ধ হয় মা। যেহেতু শঙ্কা-সম্বন্ধকেই লক্ষণা বলে উহা অসঙ্গ চেতনো সম্ভব নয়।

সমাধান—(১) বাচ্য অর্থের চেতন ও জড় এই দুই ভাগ আছে। উহাদের মধ্যে চেতনভাগে লক্ষ্য অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ আছে। সকল পদার্থের স্বরূপে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ হয়। বাচ্যভাগ চেতনের স্বরূপই লক্ষ্য চেতন। সুতরাং (১) বাচ্যে চেতনভাগের লক্ষ্যচেতনের সহিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ আছে এবং (২) বাচ্যে জড়ভাগের লক্ষ্যচেতনের সহিত অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধ আছে। কল্পিতের সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নতার স্বভাবের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এক্ষণে আমরা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যনির্ণয়জন্য শাস্ত্রে যে ষড়্‌লিঙ্গের বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহা দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সেই ছয়টি লিঙ্গ এইরূপ,—(১) উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য (২) অভ্যাস (৩) অপূর্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ (৬) উপপত্তি।

(১) বৈদিক কোন প্রকরণের তাৎপর্য্য বৃদ্ধিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, প্রথমে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ লইয়াই প্রকরণের উপসংহার হইবে। এই উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য দেখিয়া ঐ প্রকরণের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। (২) আরও দেখা যায়, প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রকরণমধ্যে পুনঃ পুনঃ

উল্লেখ থাকে—উহাই অভ্যাস। (৩) প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয় যদি অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা না যায়, তবে উহাই উহার ‘অপূর্বতা’ (নূতনত্ব)। (৪) ঐ প্রকরণের বিষয়বস্তুর জ্ঞানে বা সাধনে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়—উহাই ‘ফল’। (৫) কোন প্রকরণের যাহা বিষয় শ্রোতাকে সেই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রকরণমধ্যে যে প্রশংসা দেখা যায়—উহাকে ‘অর্থবাদ’ বলে। কোন বিষয় হইতে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রকরণমধ্যে যে ঐ বিষয়ের নিন্দা দেখা যায়, উহাও অর্থবাদ মধ্যে গণ্য। (৬) উপক্রমে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থনের নাম ‘উপপত্তি’। নিম্নে আমরা ছান্দেগো উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় হইতে ঐ প্রকরণের ষড়্লিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছি।

(১) “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম,” (৬।২।১) অর্থাৎ হে সোম্য ! অগ্র এই জগৎ অদ্বিতীয় সংই ছিল’ এই বাক্য দ্বারা ঐ প্রকরণের আরম্ভ করা হইয়াছে—ইহাই ‘উপক্রম’। পরে ঐ অধ্যায়ের (৬।১।৩) বাক্যে বলা হইয়াছে— “স য এষোহ্ণিমা ঐতদাক্যামিদং সর্বম্” অর্থাৎ ‘সেই এই যে অগ্নি, ইহাই সকলের আত্মা’ ইহা বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা উপক্রম ও উপসংহারের এক্য প্রদর্শিত হইল। কারণ যিনি এক ও অদ্বিতীয় তিনিই সকলের আত্মা হইতে পারেন। (২) (৬।৮।৭) মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ততুমসি’ মহাবাক্য দ্বারা নয়বার জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাই অভ্যাস। (৩) “অত্র বাব কিল সং সোম্য ন নিভালয়সেহ্ণৈব কিলেতি” (৬।১০।২) অর্থাৎ হে সোম্য ! (যেমন তুমি জলে গলিত লবণ দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু ইহাতে উহা রহিয়াছে এইরূপ) এই শরীরে এই সংকে দেখিতে পাইতেছ না কিন্তু তিনি ইহাতে রহিয়াছেন’—ইহাই প্রকরণের অপূর্বতা (কারণ শাস্ত্র ও গুরুপদেশে ভিন্ন ইহা জানা যায় না)। (৪) “আচার্য্যবান্ পদুষো বেদ । তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন কিমোকোহং সম্পৎসো (৬।১৫।২) অর্থাৎ ‘আচার্য্যবান্ পদুষে জ্ঞানিতে পারেন, তাহার ব্রহ্ম-সম্পদ বহিতে সেইটুকুই বিলম্ব যাবৎ তাহার দেহপাত না হয়।’ এখানে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য মোক্ষরূপ ফলের বিষয় উক্ত হইল—ইহাই ‘ফল’। (৫) “উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যাদি (৬।১।৩) অর্থাৎ ‘তুমি কি আচার্য্য-

কে সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ষাহা দ্বারা অশ্রুত-বিষয়ও শ্রুত হয়? ইত্যাদি—ইহা 'অর্থবাদ'। ব্রহ্মজ্ঞানের এই প্রশংসাবাক্য শুনিলে তৎকর্তুর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। (৬) 'যথা সোম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচ্যভূতং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈত্যেব সত্যম্'" (৬।১:৪) অর্থাৎ 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে আনিলে সমুদয় মৃন্ময় বস্তু জানা যায়, বিকার কেবল বাক্যের অবলম্বন-স্বরূপ একটি ব্যাবহারিক নামমাত্র মৃত্তিকাই সত্য'—ইহা 'উৎপত্তি' অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা সদ্বস্তুর সত্য এবং তি'ভিন্ন বস্তুর মধ্যাত্ম-প্রতিপাদন এইরূপ ঐ প্রকরণে অন্যান্য যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। লৌকিক বাক্যে কোন বস্তু যদি যুক্তিপূর্ণভাবে তাহার বস্তুব্য বলেন তবে ঐ ছয়টি লিঙ্গ বিচার করিয়া বস্তুর বস্তুবোর তাৎপর্য বুদ্ধিতে পারা যায়। শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত যখন আমরা ঘটপটাদি কোন ব্যাবহারিক বস্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, তখন অলৌকিক তত্ত্ব-খ্যাপনে যে বেদবাক্যরূপ শব্দ-প্রমাণের অপেক্ষা আছে, ইহা বলাই বাহুলা।

বৃত্তি-জ্ঞানের স্বরূপ ও উহার ফল

[মহাত্মা নিম্চল দাসকৃত 'বৃত্তি-প্রভাকর' গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত]

“অহং ব্রহ্মস্মি” এই বৃত্তিদ্বারা কার্য-সিহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি হয়। ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। এখানে এইরূপ প্রশ্ন হয় যে,— (১) বৃত্তি কি? (২) বৃত্তির কারণ কি? (৩) বৃত্তির প্রয়োজন কি? এতদ্বত্তরে বলা যায় যে (১) অন্তঃকরণের ও অজ্ঞানের পরিণামকেই ‘বৃত্তি’ বলে। যদিও ক্রোধ, স্খল্যাদিও অন্তঃকরণের পরিণাম এবং আকাশাদি অজ্ঞানের পরিণাম, উহাদিগকে বৃত্তি বলা যায় না, তথাপি বিষয়ের প্রকাশকারী যে অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানের পরিণাম উহাকেই বৃত্তি বলা হয়। কেননা, স্খল্যাদিরূপ যে অন্তঃকরণের পরিণাম উহাদ্বারা কোন পদার্থের প্রকাশ হয় না এবং আকাশাদি দ্বারাও কোন বিষয়ের প্রকাশ হয় না, এইজন্য উহাদিগকে বৃত্তি বলা যায় না। কিন্তু কেবল জ্ঞানরূপ পরিণাম হইতেই বিষয়ের প্রকাশ হয়, এইজন্য উহাকেই বৃত্তি বলা হয়। যদিও স্খল্য, দ্বেষ, কাম তৃপ্তি, ক্রোধ, ক্রমা বৃত্তি, অবৃত্তি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতিকে অনেক স্থলে বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তথাপি ‘তত্ত্বানুসন্ধান’, ‘অদ্বৈতকোশ্চরিত’ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশ-পরিণামের নামই ‘বৃত্তি’ ইহা বলা হইয়াছে। এইজন্য অদ্বৈতমতে মায়া (অজ্ঞান) এবং অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি-শব্দের পারিভাষিক অর্থ। [(২) বিষয় না থাকিলে বৃত্তি হইতে পারে না এবং বাসনারূপ কর্ম সংস্কারও থাকিবে চাই। সুতরাং স্খল্যসংস্কারাদি বিষয়-সকল এবং কর্মসংস্কারই বৃত্তির কারণ। ঘটাকারা, পটাকারা কিংবা স্খল্যাদি আকারা অন্তঃকরণ বৃত্তি সকল খণ্ড ও স্পষ্ট বলিয়া উহাদিগকে সহজেই বৃত্তিতে পারা যায়; কিন্তু অজ্ঞানবৃত্তিসকল সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বলিয়া উহাদিগকে সহজে বৃত্তিতে পারা যায় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা-বৃত্তিনিদ্রা” অর্থাৎ ‘সদৃশ্যপ্তিকালে বৃত্তি অভাবপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া অবস্থান

করে । 'মহর্ষি' প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি আরও চারিপ্রকার বৃত্তির কথা বলিয়াছেন । সত্য-সম্বন্ধে ঈশ্বর শব্দসাম্বন্ধিক মায়াবৃত্তি দ্বারা অনায়াসেই সৃষ্ট্যাদি কার্যসম্পন্ন করেন । ঈশ্বরের সেই মায়াবৃত্তিও অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া আমরা সহজে ইহার ধারণা করিতে পারি না । সৃষ্টিপ্তিকালীন জীবান্ত্রিত যে অজ্ঞানবৃত্তি উহা তমঃপ্রধান—কিন্তু উহাতে যে রক্তঃ ও সত্ত্ববৃত্তি একেবারে নাই, তাহা নয় । উহা হইলে জীব সৃষ্টিপ্তিকালীন সূত্থের বা আনন্দের অনুভব করিতে পারিত না । জীব যে সৃষ্টিপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া বলে—'সূত্থে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, জীব সৃষ্টিপ্তিদশায় সূত্থ ও অজ্ঞানের অনুভব করিয়াছিল, নতুবা জাগিয়া উঠিয়া উহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিত না । যেহেতু পূর্বে অনুভব না হইলে পরে স্মৃতি হয় না । সৃষ্টিপ্তিকালে অবিদ্যাবৃত্তিতে আরুঢ় সাক্ষী অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং সূত্থস্বরূপকেও প্রকাশ করে । সৃষ্টিপ্তি-অবস্থায় সূত্থাকারা অবিদ্যার পরিণাম যে অজ্ঞানাংশের হইয়া থাকে, সেই অজ্ঞানাংশে জীবের অস্তঃকরণ লীন থাকে । জাগ্রৎকালে ঐ অজ্ঞানাংশের অস্তঃকরণরূপ পরিণাম হয় । সেইজন্য অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা অনুভূত সূত্থের জাগ্রৎকালে স্মৃতি হয় । উপাদান কারণ ও কার্যের ভেদ না থাকায় অনুভব ও স্মরণের ভিন্ন অধিকরণতা হয় না । শব্দ-সত্ত্বপ্রাধান্য মায়াবৃত্তি ঈশ্বরের স্বরূপদৃষ্টি আবৃত করিতে পারে না । কিন্তু অজ্ঞানবৃত্তি বা অবিদ্যাবৃত্তি জীবের স্বরূপদৃষ্টি আবৃত করিয়া উহাকে মোহে পাতিত করে । যদুতঃ যাদুকরের যে মায়াশক্তি, উহা যাদুকরের স্বরূপদৃষ্টি আবৃত করে না, উহা দর্শকগণের পক্ষে অজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায় । এইরূপ ঈশ্বরের মায়াশক্তিই জীবের নিকট অজ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয় ।

(১) জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়জন্য অস্তঃকরণবৃত্তি হয় (২) স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়-অজ্ঞান্য অস্তঃকরণবৃত্তি হয় এবং (৩) সৃষ্টিপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তি হয় । জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় অভিমানকে কখন বলে । অভিমান = ভ্রমজ্ঞান । উহাও বৃত্তিবিশেষ ; সত্ত্বাং বৃত্তিকৃত কখনই সংসার । স্মৃত্ত্বাং সংসারপ্রাপ্তির হেতু বৃত্তি । (৩) সংসার-

দশায় ব্যবহারসিদ্ধির জন্যও যেমন বৃত্তির প্রয়োজন, তেমনই আবার মোক্ষসিদ্ধির জন্যও বৃত্তির প্রয়োজন—বৃত্তির পরম-প্রয়োজন মোক্ষ ।

এই বৃত্তিজ্ঞান দুইপ্রকার—(১) প্রমারূপ (২) অপমারূপ । প্রমাণজন্য যে জ্ঞান, উহাকে প্রমা বলে এবং উহা হইতে ভিন্ন জ্ঞানকে অপ্রমা বলে । প্রমাজ্ঞান যথার্থ হয় ; অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণজন্য যে ঘটপটাদি বিষয়জ্ঞান হইয়া থাকে, ব্যবহারকালে ঐ সকল জ্ঞানের অন্যথা হয় না বলিয়া উহারা (ব্যবহারিক জগতে) যথার্থ । কিন্তু অপ্রমা জ্ঞান দুই প্রকার হয়—(১) যথার্থ (২) ভ্রম । দোষজন্য জ্ঞানকে ভ্রম বলে । যাহা দোষজন্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে হইয়া থাকে, উহাকে যথার্থ বলে । ভ্রমজ্ঞানের দৃষ্টান্ত, যেমন শূন্যে রজতজ্ঞান সাদৃশ্যদোষজন্য হইয়া থাকে । দোষজন্য যে প্রমাজ্ঞান হয়, উহাই ভ্রম । কেবল অবিদ্যারূপ দোষ হইতে জাত অধ্যাতবস্তুর সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলে এবং অন্য দোষ সহিত অবিদ্যা হইতে জাত অধ্যাত বস্তুর সত্তাকে প্রতিভাসিক সত্তা বলে ।

কিন্তু (১) স্মৃতি-জ্ঞান (২) সুখ দুঃখের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং (৩) ঈশ্বরের বৃত্তিজ্ঞান দোষজন্য নয়, সেইজন্য উহারা ভ্রম নয়, কিন্তু উহারা প্রমাণজন্যও নয়, সেইজন্য প্রমাও নয় । ইহারা ভ্রম ও প্রমাজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ ; পরন্তু যথার্থ । কেন না, সংসারদশায় যে বিষয়ের বাধ না হয়, উহাকে যথার্থ জ্ঞান বলে । (১) পূর্বানুভূত সংস্কার স্মৃতির হেতু । যেখানে যথার্থ অনুভব হইতে স্মৃতি হয়, সেই স্মৃতিও যথার্থ । কিন্তু যেখানে ভ্রমরূপ অনুভবের সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, উহা অযথার্থ । তথাপি উভয়স্থলেই স্মৃতি কোন প্রমাণজন্য নহে । (২) ধর্মাদি-নিমিত্তহেতু অনুকূল ও প্রতিকূল পদার্থের সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণের সত্তা ও রজোগুণের সুখাকর এবং দুঃখাকর পরিণাম হয়, উহাই সুখ-দুঃখের হেতু । ঐ ধর্মাদি-নিমিত্তহেতু সুখদুঃখ-বিষয়-গ্রহণকারী অন্তঃকরণবৃত্তি হইয়া থাকে । ঐ বৃত্তিতে আরুঢ় সাক্ষী সুখদুঃখের প্রকাশ করেন । যেহেতু সুখদুঃখাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি কোন প্রমাণজন্য নহে, সেইজন্য যদিও উহা প্রমা নয়, তথাপি যথার্থজ্ঞান (৩) ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন ন্যায়মতে নিত্য মানা হয়, কিন্তু

শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রভৃতির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, সেইজন্য উহারা নিত্য নয়। কিন্তু প্রাণিসকলের কর্মানুসারে সৃষ্টির আদিকালে সর্বপদার্থ-বিষয়কারী ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাই স্বীকৃত। উহার উপাদান কারণ মায়া এবং নিমিত্তকারণ সকল-প্রাণীর অদৃষ্টাদি। সেই জ্ঞান ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল পদার্থের সামান্য-বিশেষ ভাবে বিষয় করে এবং প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এইজন্য উহাকে এক ও নিত্য বলা হইয়াছে। এই প্রকার ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রযত্নও উৎপত্তিশীল এবং প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী। জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি সংবাদী (ফলপ্রদ) ও বিসংবাদী (নিষ্ফল) উভয় প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি নিষ্ফল-প্রবৃত্তির জনক না হওয়ায় বিসংবাদী নহে, কিন্তু সংবাদী। বিসংবাদী জ্ঞানকে ভ্রম এবং সংবাদী জ্ঞানকে যথার্থ বলা হয়। জীবের জ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ, ঈশ্বরের জ্ঞান মায়াবৃত্তিরূপ। ইহা কোন প্রমাণজন্য নহে, এইজন্য ইহা প্রমা নয়। আধার দোষজন্যও নহে এবং নিষ্ফল প্রবৃত্তির জনকও নহে, অতএব ইহা ভ্রমরূপ নয়, কিন্তু যথার্থ।

বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধহেতু আমাদের বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। আবার আমরা আমাদের সুখদুঃখের আন্তরপ্রত্যক্ষও করিয়া থাকি। সিদ্ধান্তে কেবল ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ হয়, এরূপ স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বৃত্ত্যাবচ্ছিন্ন চেতনের বিষয়াবচ্ছিন্ন চেতনের সহিত অভেদই জ্ঞানের প্রত্যক্ষতার হেতু বজিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুখাদিজ্ঞান এবং শূন্যজ্ঞান যদিও ইন্দ্রিয়জন্য নয় (শূন্যজ্ঞান শব্দজন্য) তথাপি ঐ দুই স্থলেও বিষয়চেতন ও বৃত্তিচেতনের ভেদ থাকে না। কারণ সুখাদি-আকারা বৃত্তি অন্তঃকরণেই হয় এবং সুখাদিও অন্তঃকরণেই হয়। এইরূপ আকারাবৃত্তির উপাদান কারণও অন্তঃকরণ এবং ঐ বৃত্তি অন্তঃকরণোপহিত চেতনোর অভিযুগ হইয়াই হয়। এইজন্য আকারা বৃত্তিও অন্তঃকরণদেশেই হয় এবং অন্তঃকরণই হয় শূন্যজ্ঞানের উপাধি। এই নিয়মে এখানেও দুই উপাধি একদেশ হইয়া বৃত্তিচেতন ও বিষয়চেতন অভেদই হইয়া থাকে। এইপ্রকার উভয় চেতনোর অভেদ হওয়ার সুখাদিজ্ঞান ও শূন্যজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপই (অপরোক্ষরূপই) হয়। বাহ্য পদার্থের

সহিত প্রমাতার বৃত্তিদ্বারা সম্বন্ধ হয়, কিন্তু আশ্রিত সূত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। কিন্তু অতীত সূত্রাদির সহিত প্রমাতার বর্তমান সম্বন্ধ হয় না। সেইজন্য অতীত সূত্রাদির জ্ঞান স্মৃতিরূপ হয়, প্রত্যক্ষরূপ হয় না। কিন্তু ধর্মাদি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুই নয়, এইজন্য উহারা প্রমাতার বর্তমান-সম্বন্ধী হইলেও উহাদের জ্ঞান হয় না।

আশ্রিত প্রত্যক্ষপ্রমা দুই প্রকারের হয়—(১) আত্মগোচর (আত্মবিষয়ক) এবং (২) অনাত্মগোচর (সূত্রদুঃখাদিবিষয়ক)। উহাদের মধ্যে আত্মগোচর প্রত্যক্ষ আধার দুই প্রকারের হয়—(১) শব্দাশ্রয়গোচর (কূটস্থচৈতন্য-বিষয়ক) (২) বিশিষ্টাশ্রয়গোচর (অহংবিশিষ্ট জীবচৈতন্য-বিষয়ক)। শব্দাশ্রয়গোচর প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার—(১) ব্রহ্মগোচর (ইহাতে আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়) (২) ব্রহ্মাগোচর (ইহাতে আত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ হয় না)। যেমন ‘ত্বং’ পদার্থবোধক বেদান্তবাক্য হইতে “শব্দ-প্রকাশোহম্” এই প্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়, এখানে যদিও বৃত্তিদেহেই অতঃকরণোপহিত শব্দচৈতন্য অবস্থিত, এইজন্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভেদ হওয়ায় এই বৃত্তি (জ্ঞান) অপরোক্ষও-বটে এবং যদিও এই বৃত্তির বিষয় শব্দচৈতনে ব্রহ্মতাও আছে, তথাপি উহা অবাস্তর বাক্য দ্বারা (যে বাক্য কেবল জীবের বা কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হয় না, উহা অবাস্তর বাক্য। মহাবাক্যসকল দ্বারা জীব ব্রহ্মের স্বরূপের একত্ব প্রদর্শিত হয়) উৎপন্ন হওয়ায় ঐ বৃত্তি কেবল আত্মাকারাই হয়, ব্রহ্মাকার হয় না। কিন্তু যদি মহাবাক্য হইতে ঐ বৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্যই ব্রহ্মাকার হয়। যদিও আত্মাতে সর্বদাই ব্রহ্মতা আছে, তথাপি ব্রহ্মতাবোধক বাক্যের অভাবে আত্মার ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। যেহেতু শব্দজন্য জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, শব্দ সন্নিহিত পদার্থকে যেখানে বোধন করে সেই রূপকেই জ্ঞান বিষয় করে এবং যেখানে শব্দ কণ্ঠিত হয় নাই, শব্দজন্য জ্ঞান সেইরূপকে বিষয় করে না। যেমন দশম পদ্যকে ‘দশমোহস্তি’ এই রীতিতে বলিলে শ্রোতায় ‘দশমোহম্’ এই প্রকার জ্ঞান হইবে না।

অবাস্তব বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে—(১) তৎপদার্থবোধক, যেমন—
 “সত্যং জ্ঞানমনঃতং ব্রহ্ম” এখানে কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, জীবের
 সহিত ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। (২) তৎ পদার্থবোধক, যেমন—“য এষ
 হৃদ্যাভ্যুজ্যোতিঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি—ইহাতে কেবল তৎ পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শিত
 হইয়াছে। তৎপদার্থবোধক অবাস্তব বাক্য হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরন্তু
 ঐ অপরোক্ষ জ্ঞান ব্রহ্মাভেদগোচর নয়, সেইজন্য পুরুষার্থের সাধক নয়।
 অপরোক্ষত্বম্ চৈতন্যের, বৃত্তির নহে বিষয়াকারাবৃত্তি-উপহিত চৈতন্যের
 অপরোক্ষত্ব মম্ চৈতন্যের অপরোক্ষত্বের উপাধি বৃত্তি। সেইজন্য বৃত্তিতে
 অপরোক্ষত্বের আরোপ করিয়া বৃত্তিজ্ঞান অপরোক্ষ এইপ্রকার ব্যবহার করা হয়।
 এইজন্য বৃত্তিজ্ঞান লক্ষ্য নহে, চৈতন্যই লক্ষ্য। জ্ঞানমাত্র দ্বারাই এবং অপরোক্ষ
 জ্ঞানমাত্র দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা বলা হয় নাই। কিন্তু প্রমাণের
 মহিমায় যেখানে বিষয়ের সহিত জ্ঞানের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইবে, ঐ জ্ঞান হইতে
 অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে। প্রমাণ-মহিমায় বাহ্য ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান এবং শব্দজন্য
 (মহাবাক্যরূপ) ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ের সহিত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।
 সেইজন্য উক্ত উভয়জ্ঞানে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। “অহং ব্রহ্মাশ্মি” এই জ্ঞানকে
 বাচ্যপরিভিষ্মন্ন মনোজ্ঞান বলায়াজেন। অপর অনেকের মতে ঐ জ্ঞান বাক্যজনা—
 সংক্ষেপ-শারীরিকের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ)
 জ্ঞানই হয় অন্য গ্রন্থকারের মতে বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান
 হয়, এবং বিচাররহিত কেবল বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান হয়। এ বিষয়ে চিত্তশুদ্ধি
 ও বৈরাগ্যের ভারতমো অধিকারহিসাবে সকলের উক্তিই ঠিক বলা যাইতে পারে।
 কিন্তু সকলের মতে “অহং ব্রহ্মাশ্মি” এই জ্ঞান শব্দাত্মগোচর এবং ব্রহ্মগোচর।

বেদান্ত বাক্য হইতে উপর “অহং ব্রহ্মাশ্মি”রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা প্রপঞ্চ-
 সহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়—উহাই মোক্ষ নামে অভিহিত। কলিত্বের নিবৃত্তি
 অবিষ্ঠান-স্বরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারনিবৃত্তিই মোক্ষ—উহা ব্রহ্মস্বরূপ
 সেই নিবৃত্তির অবিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট বা জ্ঞাতত্ব-উপহিত নহেন।
 কিন্তু উহা জ্ঞাতত্বস্বরূপ উপলক্ষ দ্বারা লক্ষিত। সুতরাং সেই নিবৃত্তিও জ্ঞাতত্ব-
 উপলক্ষিত অবিষ্ঠানস্বরূপ।

স্বরূপানুভূতির সাধনা

আত্মা চৈতন্য বা জ্ঞান-স্বরূপ । সেই জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম আমাদের বৃন্দগুহায় স্থিত হইয়া এবং অবिवেকবশতঃ উহার সহিত যেন একাকার ভাব প্রাপ্ত হইয়া ‘অহং’ বা ‘আমি’ ‘আমি’ রূপে স্ফুরিত হন । এই অহংএর মধ্যে দুটি অংশ আছে—একটি ‘অহং, এই খণ্ড আকার, অপরটি জ্ঞানমাত্র—যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের অহংভাবে জানিতে পারি এবং আমাদের সুষুপ্তিকালে যে অহংভাবে অভাব হয়, উহাও বৃদ্ধিতে পারি । প্রশ্ন হইতে পারে ‘অহং’ এর আকারটি কিরূপ ? তদন্তরে বলা যায়—‘অহং’ বা ‘আমি’ বলিলেই আমরা তুমি, তিনি, ইনি, উহা ইত্যাদি হইতে একটি পৃথক সীমাবদ্ধ ভাবের অনুভব করি—উহাই ‘অহং’ এর আকার । এখন জ্ঞানভিন্ন ‘অহং’কে পৃথকরূপে দেখান যায় না বলিয়া ‘অহং’ এর আকার অংশটি মিথ্যা, ‘জ্ঞান, অংশটি সত্য । কারণ, যাহার সত্তা অপরের উপর নির্ভরশীল যাহার পৃথক স্বাধীন সত্তা নাই, উহাই মিথ্যা—যেমন রজ্জুসর্প । যেমন ভ্রান্তি-বশতঃ রজ্জুর উপর সর্প কল্পিত হয়, এইরূপ আকারবিহীন জ্ঞানের উপরই আমাদের ‘অহং’ আকারটি অনাদি অজ্ঞানবশতঃ কল্পিত । ঐ আকারবিহীন জ্ঞানই আমাদের আত্মা ! জ্ঞান আকারবিহীন হইলে উহাকেই সর্বব্যাপক চৈতন্য বা ব্রহ্ম বলে সেইজন্য শ্রুতিও (মাণ্ডুক্য) বলিয়াছেন—“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” অর্থাৎ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ । সুষুপ্তি (স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রা) হইতে বুদ্ধিযুক্ত হইবার সময় এই ‘অহং’ এর মধ্যে সংসার বিস্তৃত হয় এবং সুষুপ্তিতে ‘অহং’ এর লয়ে সংসারেরও লয় হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি । সুতরাং বলা যায় যে, সংসার ‘অহং’ এরই বিস্তার—অহং ভিন্ন সংসার বলিয়া পৃথক কোন বস্তু নাই । পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে ‘অহং’ ভাবটি মিথ্যা—সুতরাং অহংমুখে উৎপন্ন সংসারও মিথ্যা । যদি শঙ্কা কর যে, আমার সুষুপ্তিকালে জগৎ (সংসার) আমার নিকট

না থাকিলেও অপরে তখন জগৎ দেখিতেছে, সুতরাং তখনও জগতের অভাব হয় নাই, সুতরাং জগৎ মিথ্যা হইবে কেন ? তদন্তরে বলি—তুমি যে অপরের কথা বলিতেছ, উহারা তো জগতেরই অন্তর্গত, সুতরাং উহারা যে তোমার সৃষ্টি-কালে ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

জ্ঞানস্বরূপ তোমার সত্তার উপরেই জীব ও জগতের সত্তা নির্ভর করে। তুমি নিজেকে বাদ দিয়া অপর কাহারও সত্তা প্রমাণ করিতে পার না। জাগ্রৎকালে জ্ঞানস্বরূপ তুমি জীব ও জগদ্রূপে বিস্তৃত হও, আবার সুষুপ্তিকালে তুমি জীব ও জগৎ লয় বলিয়া স্বীয় চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থান কর। তোমার স্বপ্ন যেমন তোমারই বিস্তার, এইরূপ জাগ্রৎকালে দৃষ্ট এই সংসারও তোমারই বিস্তার। যেহেতু তোমাকে বাদ দিয়া তুমি জাগ্রৎকালের সংসার দেখাইতে পার না। জাগ্রৎকালে যেমন স্বপ্ন মিথ্যা, এইরূপ অজ্ঞান-নিদ্রার অবসানে জাগ্রৎকালের জীব, জগৎও কিথ্যা। মনে কর তুমি স্বপ্নে কাণী গিয়াছ এবং সেখানে পথ, ঘাট, লোক, জন, মন্দির কত কি দেখিতেছ, স্বপ্নকালে তোমার মনে হইতেছে, আমি যেমন পথ, ঘাট, মন্দিরাদি দেখিতেছি, স্বপ্নস্থ লোকেরাও সেইরূপ দেখিতেছে ! এখন তুমি জাগিয়া উঠিলে। তখনই কি তোমার মনে হইবে যে, স্বপ্নস্থ লোকগুলি এখনও সেই কাণীর পথ, ঘাট, মন্দিরাদি দর্শন করিতেছে এবং উহারা সত্য ? এইরূপ জগন্নিদ্রা হইতে সম্যক প্রবুদ্ধ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এক আত্মা বা ব্রহ্ম বাতীত জীব, জগৎ বলিয়া কিছুই নাই। অনাদি লাভিবশতঃ এক আত্মাই জীব ও জগদ্রূপে প্রতীত হন।

অনাদি অজ্ঞানবশতঃ যখন আত্মা স্বীয় শূন্য স্বরূপটি ভুলিয়া গিয়া বৃক্ষের পূর্বোক্ত আকারভাবের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন, তখন ঐ আত্মার বা চৈতন্যের নাম হয় জীব—অর্থাৎ অহং-অভিমান-বিশিষ্ট আত্মাই বর্ত্তাভোক্তা বংশ জীব। আবার যখন আত্মা বিবক্ষরারা স্বীয় নিত্য-শূন্যবৃক্ষ জ্ঞান-স্বরূপটি বুঝিতে পারেন, তখন তিনিই নিত্যমুক্ত শিব। অখণ্ড চৈতন্য বা জ্ঞান যখন বৃক্ষের গণ্ডীতে আবদ্ধ হন, তখন তিনি বৃক্ষস্থ চৈতন্যকে ‘অহং’ এবং বৃক্ষের বাহিষ্ঠ চৈতন্যকে (চৈতন্যের উপর কল্পিত জগৎকে) ‘ইদং’ বলিয়া ভ্রম

করেন। আমরা সর্বদা এই ‘অহং’ ও ‘ইদং’ ভাবের অনুভব করি। ইহাদের মধ্যে অহংভাব আত্মাকে (self) এবং ইদংভাব অনাত্মাকে (non-self) লক্ষ্য করে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে, ‘অহং’ এর আকারভাগটি আত্মা নয়, সত্তরাং উহা অনাত্মা এবং উহাও ‘ইদং’ এর কোঠাতেই পড়ে। আমরা নিজেদের চৈতন্য-স্বরূপটি ভুলিয়া গিয়া চৈতন্যের উপর কল্পিত কতকগুলি ইদং বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার পদ, আমার স্ত্রী, আমার বিত্ত, ইত্যাদি প্রকারে মোহিত হইয়া সংসারে নির্জোদগকে মায়াজালে জড়াইয়া ফেলি এবং সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করি। বিচার দ্বারা যদি আমরা ঐ মিথ্যা ‘আমি ও আমার’ ভাবকে ত্যাগ করতে পারি, তবে আমাদের নিকট আমাদের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যমুক্ত জ্ঞান-স্বরূপটি প্রকটিত হয়।

‘আমার’ ‘আমার’ ভাবের মূল হইতেছে ‘আমি’ ভাব। আমি না থাকিলে আমার ভাবের উৎপত্তি হয় না। ‘আমি’ ভাব মূল, ‘আমার’ ‘আমার’ ভাব উহার ডাল-পালা। যেমন কোন বৃক্ষের ডালপালা অগ্রে কাটিয়া পরে উহার মূলের ধ্বংস করিতে হয়, এইরূপ প্রথমে ‘আমার আমার’ ভাব ত্যাগপূর্বক শেষে ‘আমি’ ভাবকে নাশ করিতে হয়। ‘আমি’ ভাবটি এক, কিন্তু আমার বলিতে যাহা-দিগকে বুঝায়, উহারা বহু। আমি বস্তুটির মধ্যে সুখ-দুঃখ নাই, আমি-ভিন্ন বস্তু সকলের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই আমরা সুখ দুঃখ ভোগ করি। বস্তুতঃ ‘আমার গরু’ বলিলে যেমন আমি গরু হইতে পৃথক্ বস্তু (কারণ দুইটি পৃথক্ বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ হয়) এইরূপ ‘আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমার প্রাণ, আমার মন, আমার বুদ্ধি’ ইত্যাদি বাক্যেও ‘আমার’ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায়, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্ বস্তু। আমরা আমাদের দেহের বাহিরে স্থিত স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদি বিষয়ে কদাচ ‘আমি’ শব্দের প্রয়োগ করি না—‘আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিত্ত’ ইত্যাদি প্রকার বলি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রী পুত্রাদি যে আমি নহি এই প্রকার নিষ্কলঙ্ক জ্ঞান আমাদের আছে—তথাপি উহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনই

আমাদের সুখদুঃখের কারণ হয় (সংসর্গাভ্যাস) । কিন্তু দেহ, মন, বুদ্ধির সহিত আমাদের তাদাত্ম্যাব্যাস থাকায় ঐসকল আমি নহি, উহা অত সহজে আমরা বুদ্ধিতে পারি না । কারণ দেখা যায়, যদিও আমরা ‘আমি দেহ, আমি ইন্দ্রিয়, আমি মন’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া ‘আমার দেহ, আমার মন, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করি, তথাপি দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্মসকলে আমরা ‘আমি শব্দেরও প্রয়োগ করি—যেমন আমি কৃশ, আমি শূল, আমি অশ্ব, আমি খজ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বৃদ্ধমান্, আমি বোকা, ইত্যাদি । সুতরাং দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আমি কি না, এ বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে । এই সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য বেদান্তশাস্ত্রে পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা আত্মস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে । আরও বিচার করিলে ইহা বুঝা যায় যে—দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মী বস্তুগুলি যদি আমি না হই (যেহেতু ঐ সকলে ‘আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি প্রকারে ‘আমার’ শব্দের প্রয়োগ হয়) তবে উহাদের শূলত্ব, কৃশত্ব, অশ্বত্ব, খজত্ব, সুখ-দুঃখাদি ধর্মসকলের পৃথক্ সত্তা নাই । তীব্র রৈরাগ্য বান্ উত্তম অধিকারী পুরুষ কেবল বেদান্তবিচার দ্বারা স্বীকৃত স্বরূপের অনন্তব করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন । কিন্তু ঐ প্রকার অধিকারী খুবই বিরল । সেইজন্য বিচারে সঙ্গে সঙ্গে যোগেরও প্রয়োজন । যেমন বায়ুদ্বারা কম্পিত দীপশিখার আলোকে গৃহস্থিত বস্তুসকলের ঠিক্ ঠিক্ অবধারণ হয় না, এইরূপ চঞ্চল চিত্তের বিচার দ্বারা ঠিক্ ঠিক্ আত্মস্বরূপের অবধারণ হয় না । সেইজন্য নিম্নে আমরা আত্মানুভূতির সাধন-বিষয়ক অভ্যাস সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি ।

সাধকের উচিত প্রত্যহ নিজনে বসিয়া কিছু সময় ‘আমার’ ‘আমার’ ভাবগুলি (যাহারা বহু বস্তু বিষয়ক) ত্যাগকরতঃ ‘আমি’ ভাবে (যাহা এক ও সকল আমার ভাবের মূলে অবস্থিত) স্থিতির অভ্যাস করা । বাহ্য কোন বস্তুতে চিস্তধারণা করা অপেক্ষা এই অহংতত্ত্বে স্থিতির অভ্যাস সহজ, স্বাভাবিক ও অশঙ্কনানুপ্রদ সাধনা । এই অভ্যাসের অহংতত্ত্বকে ধরিতে হইবে না, উহা

আমার (জীবের) স্বরূপ বলিয়া ধরাই আছে। 'ইদং' 'ইদং' রূপে যাহারা বহিমুর্তিতে আমার নিকট প্রতীত হইতেছে, যাহারা আমার স্বরূপ নয়, সব সময় আমার নিকট থাকে না (আমাদের স্মৃতিপুঙ্খকালে আমাদের দেহ, মন প্রভৃতি ও দৃশ্য জগৎ আমাদের নিকট থাকে না) যাহারা আগন্তুক ও দূঃখদায়ক উহা-দিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিচারদ্বারা উহাদের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে উহা-দিগকে ত্যাগ করা সহজ হইবে। বিষয় হইতে চিত্তকে অহংতত্ত্বে গুটাইয়া আনার সাধনা পরম কল্যাণপ্রদ। সাধকের পক্ষে এই অহংতত্ত্ব একটি মূল্যবান কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে আত্মা বাহিরের জগতের দিকে যেমন যাইতে পারেন, তেমনি অহংএর অন্তর্মুখতায় উহার মধ্যে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপেরও অনুভব করিতে পারেন। অহংবাহিমুখ হইয়া মনের সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করে, অন্তর্মুখ হইলে জীব সেই অহং বৃত্তিতে প্রতিফলিত স্বীয় ব্রহ্ম স্বরূপের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অপরোক্ষানুভবও লাভ করিতে পাবেন। সেইজন্য মহর্ষি রমণ বলিয়াছেন — "The I am in the ego-sense is just like a master's scent for a dog" কিন্তু এই অহংতত্ত্বে স্থিত হওয়াও সহজ নয়—পুনঃ পুনঃ অভ্যাস-সাপেক্ষ। কেবল ভাসা ভাসা বেদান্তালোচনায় রত না থাকিয়া ইদংভাববাহিত এই অহংতত্ত্বে স্থিতির অভ্যাসই প্রথমে প্রয়োজন। অভ্যাসকালে চিত্ত পূর্বাসংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ অহংএর কোঠা ত্যাগ করিয়া ইদং কোঠায় ধাবিত হইবে। উহার প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক বহিমুখ চিত্তকে উৎপত্তিমুখে ধরিয়া উহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন ঘুমন্ত ঘরে চোর চুরি করে, এইরূপ মন বেহুঁস জীবকে বহিমুখে লইয়া যায় এবং দূঃখে পাতিত করে। নিজে সজাগ ও সতর্ক থাকিয়া মনের এই চালাকি ধরিতে পারিলে মন স্বতঃই সাবধান হইবে। সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছেন — "অজ্ঞান কুম্ভী দেখ, নিকট হ'তে দিও নাকো, জ্ঞানের প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে।" কোন বন্ধ ঘরের আলোক দরজার ছিদ্রমুখে বিদ্যুদ্রূপে নির্গত হইয়া বাহিরে বিস্তার লাভ করে। ঐ আলোককে ছিদ্রমুখে একটি অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, কিন্তু উহা বাহিরে বিস্তার লাভ করিলে সমগ্র শরীর দ্বারাও উহাকে রুদ্ধ করা যায় না। এইরূপ বহিমুখ চিত্তকে উৎপত্তিমুখে

ধরিতে পারিলে উহাকে ত্যাগ করা সহজ হয়, কিন্তু ঐ চিন্তা বহুদূর বিস্তৃত হইলে উহাকে ত্যাগ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইদংভাব হইতে মনকে ফিরাইয়া অহংভাবে ধরিয়া রাখার অভ্যাস যত বাড়ান যায়, ততই মঙ্গল। এই অহংভাবটি ব্যাধি অহংতত্ত্ব—ইদংভাবের অপেক্ষায় ইহা খণ্ড ও স্পষ্ট হইয়া থাকে। ইহা যত যত ইদংভাবের অপেক্ষা রহিত হইবে, ততই উহা ব্যাপক ও সূক্ষ্ম হইয়া পড়িবে—ইহাই সমষ্টি অহংতত্ত্ব বা মহতত্ত্ব। মহতত্ত্ব অবস্থায় ‘কে আমি, কাহার পুত্র, কোথায় অবস্থিত’ ইত্যাদি বিশেষভাব থাকিবে না কেবল ‘আছি মাত্র’ এইরূপ ব্যাপক একটা আনন্দময় ভাবের অনুভব হইবে। যদিও ইহা পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ নয়, তথাপি ইহা পূর্ণ ব্রহ্মানন্দানুভবের দ্বার-স্বরূপ।

পূর্বোক্ত সাধনা পরিপক হইলে ব্রহ্মানন্দানুভব সহজেই হইবে। ব্রহ্মানন্দ জীবের সাধনা দ্বারা উৎপন্ন হয় না। উহা জীবের স্বরূপ। সাধনা দ্বারা যতই বাধা অপসৃত হয়, ততই শান্তিচিন্তে উহার স্ফূরণ হয়। উক্ত সাধনার পর এইরূপ বিচার করিবে যে, পূর্বোক্ত ব্যাধি ও সমষ্টি অহংভাবে কে আমি যে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করি উহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। ঐ শব্দ চৈতন্যকে বাদ দিয়া আমার ব্যাধি বা সমষ্টি অহংভাবে কে আমি প্রমাণ করিতে পারি না। সুতরাং ঐ ব্যাধি-সমষ্টিভাব, ব্যাপ্য ব্যাপকভাব প্রকৃতিরাজ্যে স্থিত। নির্বিকার শব্দচৈতন্যে দেশ ও কালের অভাব বলিয়া সমষ্টি, ব্যাধি, সগুণ, নিগুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, সত্য, মিথ্যা, ভিতর, বাহির, অহং, ইদং ইত্যাদি কোনপ্রকার ভেদ বা বিকল্প নাই। এইভাবে সারক জীব সম্যক্ অহংকারের ত্যাগপূর্বক চৈতন্যমাত্রের প্রাপ্ত হইলে জীবের পরমানন্দ প্রাপ্ত ও মুক্তি অনিবার্য। যাহারা কতকটা শব্দচৈতন্য, বিষয়চিন্তাধারিত ও স্তম্ভমুখ, যাহারা পরাশক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাহাদের অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। পূর্বোক্ত সাধনায় লাগিয়া থাকিলে তাহারা অবশ্যই অভীষ্ট ফল লাভ করিবেন। কিন্তু যতক্ষণ ভিতর বাহিরে সর্বত্র সমদর্শন না হয়, যতক্ষণ গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগারূঢ় প্রভৃতির লক্ষণ স্ব-সংবেদ্যরূপে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ সাধনা ত্যাগ করিবেন না। ফল পারিলে যেমন বোটা হইতে আপনি

এইরূপ সাধনার পরিপক্বাবস্থায় সম্যক জ্ঞানলাভে জপ, ধ্যান, বিচারাদি সাধনা আপনাই জীবকে ত্যাগ করে। “সর্বং কর্মখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে” (গীতা—৪।৩০)।

স্বরূপানুভূতির পূর্বোক্ত সাধনাই কঠোপনিষদে এইরূপে কথিত হইয়াছে—
 “যচ্চেহদ্ব্যামনসী প্রাক্তন্তদ্যচ্চেহজ্জ্ঞানআত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্চেহচ্ছাত
 আত্মনি” (১৩।১৩) অর্থাৎ প্রাক্ত ব্যক্তি বাক্যকে মনে নিরুদ্ধ করিবেন, উহাকে
 বৃদ্ধি বা অহংতত্ত্বে নিরুদ্ধ করিবেন, অহংতত্ত্বে মহত্তত্ত্বে নিরুদ্ধ করিয়া শেষে
 উহাকে শান্ত-আত্মায় নিরুদ্ধ করিবেন। মনে যাহা উদ্ভিত হয়, উহাই লোকে
 বাক্য দ্বারা বল। সুতরাং মন কারণ, বাক্য কার্য। কার্য বাক্যকে বন্ধ করিয়া
 উহার কারণ, মনে আনিতে হইবে। কিন্তু বাহ্যবাক্য বন্ধ হইলেও মন ভিতরে
 নানা কল্পনাজপনা তুলিবে। কিন্তু মনে যে সকল চিন্তা উঠে, উহাদের মূলে
 ‘অহং’ বা ‘আমি’ ভাব আছে। ‘অহং’এর অজ্ঞাতে মনে কোন চিন্তা উঠিতে
 পারে না। সুতরাং মন কার্য, অহং কারণ। কার্য মনকে বাদ দিয়া উহার
 কারণ অহংতত্ত্বে উহাকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। ব্যক্তি অহংবৃদ্ধির কারণ, সমষ্টি
 অহং বা মহত্তত্ত্ব। ব্যক্তি অহংবৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিন্তকে সমষ্টি অহংতত্ত্বে
 (মহত্তত্ত্বে) নিরুদ্ধ করিতে হইবে। এই মহত্তত্ত্বে চিন্তনিরোধের কথা পূর্বে বলা
 হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—“আত্মৈবেদমগ্র আসীত পুরুষ-
 বিধঃ সোহনৃবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোহপশ্যৎ সোহহমস্মীতাগ্রে ব্যাহরৎ ততোহহং-
 নামাভবৎ তন্মাদপ্যতর্হ্যামশ্রিতোহহময়মিত্যেবাগ্ন উক্তানথানাম্রাম প্রবৃতে যদস্যা
 ভবতি” (১৪।১) অর্থাৎ ‘এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্বে পুরুষরূপী আত্মাভাবেই
 অবস্থিত ছিল। সেই আত্মা (প্রজাপতি) আলোচনা করিয়া আপনা বাতীত অন্য
 কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমেই উচ্চারণ করিলেন,—‘আমি
 আছি’। সেইজন্য তাহার নাম হইল ‘অহং’। সেইজন্য এখনও লোককে
 সম্বোধন করিলে সে প্রথমেই ‘এই আমি’ এইরূপ বলিয়া পরে তাহার অন্য নাম
 বলে। অর্থাৎ যদি কাহাকেও অশ্বকারে প্রশ্ন করা হয়—‘কে তুমি’? সে প্রথমে
 উত্তর দেয়—‘আমি’—ইহাই পুরুষের আদি ব্যাপক নাম (সর্বনাম)। পরে যদি

পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করা হয়—‘আমি কে’? তখন সে তাহার ব্যক্তিগত নাম (রাম, শ্যাম প্রভৃতি) বলে। যাহা হউক, মহতত্ত্বে চিন্তা নিরুদ্ধ করিবার পর শেষে উহাকে জ্ঞানপূর্বক নির্বিকল্প শান্ত-আত্মায় নিরুদ্ধ করিতে হইবে—তবেই স্বরূপস্থিতি লাভ হইবে। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে—“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্” (২।৩।১০) অর্থাৎ যখন মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়চিন্তা-বিরত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে, বুদ্ধিও কোন চেষ্টা করে না, উহাই পরমার্গতি বা মোক্ষ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও উহার সমাধান

প্রঃ—ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে ?

উঃ—সদ্‌গুরুমুখে বেদান্তবিচার শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যের বৃত্তিতে ‘আমি ব্রহ্ম’ এইপ্রকার যে প্রতিবিশ্বশূন্য দৃঢ় নিশ্চয় বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উহাই ব্রহ্মজ্ঞান ।

প্রঃ—গৃহস্থাশ্রম কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে ?

উঃ—ব্রহ্মজ্ঞানলাভ পূর্ব পূর্ব বহু সূক্ষ্মতা ও বৈরাগ্যের ফল । সংন্যাসাশ্রমই বেদান্ত-চর্চার মূখ্য স্থান । কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য না থাকিলে সংন্যাস গ্রহণ করিলেও জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করা যায় না । আবার ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায় যে, গৃহস্থাশ্রমে স্থিত বশিষ্ঠ, বিদূর, জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি অনেক জ্ঞানী ছিলেন । ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও গৃহস্থাশ্রমেই অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন এবং পরে তিনি চিত্তবিশ্রান্তি ও জীবনমুক্তি-সুখলাভের জন্য বিদ্বৎসংন্যাস গ্রহণ করেন । কিন্তু বশিষ্ঠ, জনকাদি জ্ঞানের দৃঢ়তাহেতু গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই শাস্ত্রীয় কর্মের অনুবর্তনমাত্র করিয়াছিলেন । সুতরাং সম্যক্ বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধি থাকিলে যে কোন আশ্রমে জ্ঞান হইতে পারে এবং জ্ঞানের উদয়ে স্বাভাবিক সংন্যাস হইয়া থাকে ।

প্রঃ—এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে ব্রহ্মকারাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তি তে বৃত্তিরই হয় । সেই বৃত্তি যতই শূন্য হউক, উহা তো সগুণ, সাকার ও জড় । সুতরাং নিগূঢ় শূন্যচেতন্যে উহার কিরূপে ব্যাপ্তি হইবে ?

উঃ—শূন্যচেতন্য বা নিগূঢ়ব্রহ্মে বৃত্তিব্যাপ্তি হয় না । শূন্যচেতন্য বা নিগূঢ়-ব্রহ্মে কোন আকরণ নাই, সুতরাং আকরণ-ভঙ্গের জন্য উহাতে বৃত্তিব্যাপ্তির

অষ্টমোত্তরবর্ষী

প্রয়োজনও নাই। 'অহংব্রহ্মস্মি' এই প্রকার ব্রহ্মকারা বৃত্তি প্রত্যগাত্মা (কূটস্থচৈতন্য) হইতে অভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মকে বা অজ্ঞানবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে বিষয় করিয়া ঐ বৃত্তিতে প্রতিবিস্তৃত চৈতন্যের সাহায্যে চৈতন্যগত অজ্ঞানের নাশ করে। অজ্ঞানাবরণের নাশ হইলে শৃংখল সাক্ষরক বিদ্যাবৃত্তিতে স্থিত জীবচৈতন্য নিরাবরণভাবে আপনার নিগূঢ় ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিতে পারে। যেমন দর্পণব্যতীত আমরা আমাদের মূখ দেখিতে পারি না, এইরূপ বিদ্যাবৃত্তিতে স্থিত না হইয়া আমরা আমাদের নিগূঢ়-স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারি না। সেইজন্য কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“যথাদর্শে-তথাত্মনি” (২:৫) অর্থাৎ ‘যেমন দর্পণে মূখকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, এইরূপ শৃংখলবৃত্তিতে স্পষ্টরূপে আত্মদর্শন হয়।’ জীব বিদ্যাবৃত্তিতে স্থিত হইয়া দ্বৈতের মিথ্যা-জ্ঞানপূর্বক বাধমুখে দ্বৈতাভাব-উপলব্ধিত স্বীয় নিগূঢ়-স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। ঐ বৃত্তিজ্ঞান নিগূঢ়-ব্রহ্মবিষয়ক হইলেও উহাই নিগূঢ় ব্রহ্ম নয়—সুতরাং ঐ জ্ঞানও মিথ্যা। সেইজন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—“জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্যৎ পরিত্যজেৎ” (উত্তরগীতা) অর্থাৎ ‘জ্ঞানদ্বারা (বৃত্তিজ্ঞানদ্বারা) জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিয়া পশ্যৎ ঐ জ্ঞানকেও ত্যাগ করিবে।’ জ্ঞান হইলে সর্বত্র সমদর্শনবশতঃ আর জ্ঞানী অজ্ঞানী এই ভেদ থাকে না। ঐ বৃত্তিজ্ঞান সগূঢ় ও সর্বিশেষ। কোন বস্তুর বিশেষ জ্ঞানকে ঐ বস্তুর অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। অপরোক্ষজ্ঞানে উপাধি থাকা চাই। সেইজন্য পঞ্চদশী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—“নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিসম্বৃতঃ। যাবাদ্বৈদহকৈবল্য-মুপাধেরনিবারণাৎ” (তৃপ্তিদীপ ৮৪ শ্লোক)। পূর্বশ্লোকে পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিয়াছেন—‘জীবের অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকায় জীবচৈতন্য (কূটস্থরূপে) অপরোক্ষ হইতে পারেন; কিন্তু ব্রহ্মের কোন উপাধি না থাকায় কিরূপে তিনি অপরোক্ষ হইতে পারেন? তদন্তরে এই শ্লোকে বলা হইল—‘এরূপ নহে, ব্রহ্মজ্ঞানও সোপাধিক, কারণ যাবৎ বিদেহকৈবল্য লাভ না হয়, তাবৎ

উপাধি নিবারণ সম্ভব নয়।’ প্রশ্ন হইতে পারে—‘সেই উপাধি কি?’ তদন্তরে উক্ত গ্রন্থকার পুনরায় বলিয়াছেন—‘অন্তঃকরণসাহিত্য যেমন জীবের উপাধি, অন্তঃকরণ-সাহিত্যও তেমনি ব্রহ্মের উপাধি।’

নিগূঢ় ব্রহ্মে জ্ঞান, অজ্ঞান, নিরোধ, উৎপত্তি, বধন, মূর্ত্তি, পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি কোন বিকল্প নাই। সুতরাং নিগূঢ় ব্রহ্ম জ্ঞানদাতা নহেন বা নিগূঢ়জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক নহে। মাহাশক্তি আরোপিত হইলে সেই নিগূঢ়ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম ঈশ্বররূপে প্রতীত হন। এই ঈশ্বরই ন্যায়মুক্ত ও নিত্যজ্ঞানী—ইহারই অনুগ্রহে জীবের জ্ঞান হয়। “ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামশ্বেতবাসনা” (অবতগীতা ১ম শ্লোক)। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—“তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরুবঃ শ্রুতয়ো যথা। প্রজ্ঞৈব তরেকিবানীশ্বরানুগৃহীতয়া” (বিবেক-চূড়ামণি ৪৪৮ শ্লোক) অর্থাৎ ‘গুরু ও বেদসকল তটস্থরূপে শিষ্যের বোধ উৎপাদন করে। শিষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত প্রজ্ঞা দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন।

শ্রুতি বলিয়াছেন—“পাদোহস্য বিম্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিব” (ঋগ্বেদ, পদ্যসংস্কৃত) অর্থাৎ ‘ব্রহ্মের একপাদে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল—অপর তিনপাদ (নিগূঢ়পাদ) অমৃত ও উৎকর্ষ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত।’ ব্রহ্মের ঐ নিগূঢ়পাদে আবরণ না থাকায় আবরণ ভঙ্গের প্রসঙ্গও নাই। উহাতে দেশ ও কাল না থাকায় উৎপত্তি, বিনাশ, সর্ব, অল্প প্রভৃতির কথাও উঠে না। যখন সৃষ্টি ভাঙ্গে, তখন আমরা সেই নিগূঢ়ব্রহ্মে সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতির আরোপ করি। তখন তিনি ঈশ্বর হইয়া যান। পঞ্চদশী বলিয়াছেন—“সর্বদেশপ্রকল্পৈপ্যব সর্বগতং ন তদ্বতঃ (নাটকদীপ ২১ শ্লোক) অর্থাৎ ‘ব্রহ্মের সর্বগত্ব দেশের কম্পনা হইতেই হইয়া থাকে—নতুবা স্বতঃ তাহার সর্বগত্ব নাই।

ব্রহ্মের যে একপাদে এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল দেখা যাইতেছে, উহাতেই জীব, জগৎ ঈশ্বর, বধন, মূর্ত্তি প্রভৃতির কম্পনা। এই পাদে স্থিত সর্ববস্তুরূপে ব্যাপ্ত করিয়া থাকায় ঈশ্বর সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপকত্বহেতু ঈশ্বরের নিকট স্বসত্ত্বাতিরিক্ত

দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা না থাকায় ঈশ্বরের দ্বিতীয় বস্তু হইতে ভয়ের কারণ নাই— সেইজন্য ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি উহা শূন্যসত্ত্বপ্রধান বলিয়া উহা ঈশ্বরের স্বরূপদৃষ্টি কখন আবৃত করে না—সেইজন্য ঈশ্বর সগুণ হইয়াও নিগূঢ়, সর্বজ্ঞ ও নিত্যজ্ঞানী—তিনি সব কিছু করিয়াও কিছুই করেন না। কিন্তু জীবের এই সর্বব্যাপক দৃষ্টি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়া জীব খণ্ড দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাদাত্ম্যভাব স্থাপন করিয়া ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ‘সংসারে বদ্ধ হয় এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে। যখন কোন পুণ্যোদয়ে জীব ঈশ্বর বা ঈশ্বরশক্তি মহামায়ার সম্যক্ প্রপন্ন হয়, তখন ঈশ্বর-জীবের বুদ্ধিতে জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন এবং জীব আপনার সর্বব্যাপক ব্রহ্মভাবটি বুদ্ধিতে পারে এবং মুক্ত হইয়া যায়—কারণ সর্বাশ্রকভাবই মুক্তির কারণ—ইহার পর সম্যক প্রার্থনায় জীব স্বীয় নিগূঢ়স্বরূপে স্থিতি লাভ করে—ইহাই নির্বাণমোক্ষ বা বিদেহকৈবল্য। ইহাতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি নাই।

প্রঃ—অষ্টৈতমতে যখন জগৎ মিথ্যা বা তদ্বৃত্তঃ নাই, তখন জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর নিকট আর জগতের ভান বা প্রতীতি না হওয়াই উচিত; সুতরাং জ্ঞানীর ব্যবহার কিরূপে সম্ভব? জীবমুক্ত পুরুষের কি ঈশ্বরের সহিত পার্থক্য আছে?

উঃ—জগতের বিস্মৃতিই জ্ঞান নয়; উহা সদৃশপু মূচ্ছাদি অবস্থায়ও হয়, কিন্তু তজ্জন্য জ্ঞান হয় না। শূন্য বুদ্ধি দ্বারা ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ প্রতিবন্ধ-শূন্য দৃঢ় নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তিস্থিত ঐ জ্ঞানও সত্যবস্তু নয়। উহা বহুদর্শনারূপ অজ্ঞানের নাশ করিয়া স্বতঃই ক্রমশঃ নাশ প্রাপ্ত হয়, অন্য সাধনের অপেক্ষা করে না। ঐ বৃত্তিজ্ঞানের সম্যক্ ক্ষয় হইলে বাক্যমনের অগোচর এক নিগূঢ়ব্রহ্মই থাকিয়া যান ও জগদদর্শন থাকে না। জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগতের উচ্ছেদক বা নাশক নয়। কিন্তু জ্ঞান অবিদ্যারূপ সংসারবীজকে ভজিত করিয়া উহার সাংসারোৎপাদিনী শক্তির নাশ

করে। জ্ঞান যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবিদ্যার নাশক হইত, তবে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানিদুরূষের জগদর্শন লোপ পাইত ও দেহের পতন ঘটিত। তাহা হইলে জ্ঞানের উপদেশটা আচার্য্য-সম্প্রদায় থাকিত না। কারণ, যিনি একবারে জগদর্শন করেন না, তিনি, কিজন্য কাহাকে, কি উপদেশ করিবেন? আর অজ্ঞ ব্যক্তি যাহার নিজেরই জ্ঞান হয় নাই, তিনিই বা কিরূপে অপরকে জ্ঞানের উপদেশ করিবেন? অতএব যিনি জীবমুক্ত, যিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয় কোঠাই দেখিতে পাইতেছেন, তিনিই অজ্ঞ জনগণকে উপদেশ করিতে সমর্থ। জ্ঞান হওয়ার পরও প্রারম্ভ-বেগবশতঃ জ্ঞানীর শরীর কিছুকাল থাকে। প্রারম্ভ কর্ম ভোগ বাতীত ক্ষয় হয় না। তবে জ্ঞানীর উহাতে সত্যবৃদ্ধি না থাকায় সেই প্রারম্ভ-ভোগ জ্ঞানীকে বিচলিত করিতে পারে না। বিদেহমুক্তির পূর্বপর্্য্যন্ত জ্ঞানীর অঙ্গবিস্তার বিক্ষেপ থাকে, সেইজন্য জীবমুক্তের অবিদ্যালেশ থাকা স্বীকৃত হয়। যত যত ঐ বিক্ষেপের নাশ হয়, ততই জ্ঞানীকে উচ্চভূমিতে স্থিত বলা হয়। সমাহিত জ্ঞানী বিদেহমুক্তসদৃশ—তাহার প্রারম্ভ লোকে দেখে, তাহার উহাতে খেয়ালও থাকে না। যেমন মাতা ঘুমন্ত শিশুকে ঈষৎ জাগাইয়া দৃশ্য পান করান এবং বালকও অভ্যাসের সংস্কারবশতঃ ঐ দৃশ্য পান করে এবং লোকে উহা দেখে, কিন্তু বালকের উহাতে খেয়াল থাকে না, সমাহিত জ্ঞানীর প্রারম্ভ ভোগও এইরূপ লোকদৃষ্টির কথা।

জীবমুক্ত পুরুষ ঈশ্বরসদৃশ হইলেও ঈশ্বর নহেন—যেহেতু তিনি বশাবস্থা হইতে মুক্ত, কিন্তু ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। জীবমুক্তের ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু জীবমুক্ত পুরুষ ইহা জানেন যে, স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই—যাহা শক্তির ব্যাপার উহা মিথ্যারাজ্যে স্থিত। জীবমুক্তের কদাচিৎ বিক্ষেপ আসিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য জ্ঞান নষ্ট হয় না—নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের ঐরূপ বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই। জীবমুক্ত পুরুষই ঈশ্বরের সম্যক্ প্রপন্ন ও ভক্ত। বাহ্য জগতের ভার তিনি ঈশ্বরের উপর ছাড়িয়া দিয়া আত্মানন্দে বিভোর থাকেন; এইপ্রকার জ্ঞানিভক্তের ধোগক্ষেম ভগবান্‌ই বহন করেন।

প্রঃ—কিন্তু নিগদ'গবন্ধের তুলনায় ঈশ্বরও তো মিথ্যা ?

উঃ—উহা সভ্য বটে—ঈশ্বরও ও জীবও উভয়েই মায়াশক্তি দ্বারা নিগদ'গবন্ধের উপর কল্পিত । নিগদ'গবন্ধই একমাত্র সত্যবস্তু ; কিন্তু সেই নিগদ'গবন্ধকে ব্যবহাররাজ্যে আনা যায় না । উ'হাকে ব্যবহাররাজ্যে আনিতে গেলে তিনি ঈশ্বর হইয়া পড়েন । মাণ্ডুকা উপনিষদে নিগদ'গবন্ধকে অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, ইত্যাদি বলা হইয়াছে । নিগদ'গ বন্ধে প্রয়োক্তরূপ ব্যবহার নাই—ঈশ্বর-রাজ্যে স্থিত হইয়াই ঐ ব্যবহার সম্ভব হয় । ঈশ্বর সব কিছু করিয়াও কিছু করেন না, বা স্বীয় নিগদ'গবন্ধরূপ হইতে ছাত হন না । এ বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত জীবমুক্তের সাদৃশ্য আছে । শাস্ত্রসকল ও আচার্য্যগণ অনেক স্থলেই নিগদ'গবন্ধকে লক্ষ্য করিয়া 'ঈশ্বর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ।

প্রঃ—অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ । কিন্তু সৎ, চিত্র ও আনন্দ এই তিনটি শব্দ বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক । সুতরাং উহারা কিরূপে অদ্বৈত ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিবে ?

উঃ—সৎ, চিত্র ও আনন্দ শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ উভয়েই আছে । বাচ্যার্থে 'সৎ' শব্দ দ্বারা অসত্তার, 'চিত্র' শব্দ দ্বারা জড়ত্বের এবং 'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দুঃখের নিষেধ করা হয় । সুতরাং বাচ্যার্থে ঐ তিন শব্দের ভেদ আছে । কিন্তু ঐ তিনটি শব্দ দ্বারা অসত্তা, জড়ত্ব ও দুঃখের নিষেধপূর্বক যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয়, উহাতে কোন ভেদ নাই—উহাই নিগদ'গবন্ধ । 'অদ্বৈত' শব্দদ্বারাও উ'হাকেই লক্ষ্য করা হয়, দ্বৈতের অপেক্ষায় যে অদ্বৈত, উহাকে লক্ষ্য করা হয় না ।

প্রঃ—অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বেদান্তের সম্যক্ অধিকার লাভের পূর্বেই বেদান্তবিচারে শ্রবণ করিয়া 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার একটা জ্ঞানও লাভ করেন । ই'হাদের ঐ প্রকার জ্ঞানের দ্বারা কৃতার্থতা হইবে কি ?

উঃ—সম্যগ্বেদগোপ্যবান্ ও শূন্যচিত্ত অধিকারীই সদ'গদ'বন্ধে বেদান্তবিচারে শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রতিবশশূন্য দৃঢ় জ্ঞানলাভপূর্বক কৃতার্থতা লাভ

করেন। তবে বেদান্তের গোণ অধিকারীও আছে। উঁহারা সম্যক বৈরাগ্যবান্ ও শূন্যচিত্ত না হইলেও সদ্গুণসম্পন্ন ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন। ইঁহারা গুরুমুখে বেদান্তবিচার শ্রবণ করিয়া একটা অদৃঢ় ও প্রতিবন্ধযুক্ত অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন, উহা কল্যাণজনক হইলেও উহা স্ৱাৰ্থ কৃতার্থতা লাভ হয় না। আজকাল বেদান্তের এই প্রকার গোণ অধিকারীই অধিক, মূখ্য অধিকারী বিরল। বেদান্তবিচার স্ৱারা জীবরক্ষের একত্বের একটা মোটামুটি নিশ্চয় করিয়া যদি সাধক বিষয়চিন্তা-পরিহারপূর্বক আত্মনিষ্ঠায় লাগিয়া না থাকেন এবং নিজেকে লোকসমাজে জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যান, তবে বহির্মুখতাহেতু তিনি নিজের ও সমাজের ক্ষতি করেন। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে জগতের মিথ্যাঅবোধহেতু চিন্তা স্ৱতঃই বিষয়-বিমূঢ় ও সমাহিত হইবে এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ করিয়া চিন্তা খণ্ড খণ্ড বিষয়ানন্দের দিকে ধাবিত হইবে না। যতক্ষণ অযত্নতঃ স্ৱরূপ-বিসৃষ্টি না হয়, যতক্ষণ না অহং ইদং বা ভিতর-বাহির ভাব তিরোহিত হয়, যতক্ষণ শাস্ত্রোক্ত শ্রিতপ্রজ্ঞ ও জীবমুক্তাদির লক্ষণ-স্বসংবেদ্যরূপে (আমি সর্বদা আনন্দী কিনা, আমি নিভয় ও সর্বত্র সমদর্শী হইয়াছে কিনা ইত্যাদি, আমার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না) আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠায় লাগিয়া থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে—সম্যক জ্ঞানে স্ৱতঃই কর্মের নিবৃতি ঘটিবে। সেইজন্য আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার ‘বৈবেকচূড়ামনি’ গ্রন্থে এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্করানন্দ তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় জ্ঞানকে প্রতিবন্ধশূন্য ও দৃঢ় করিবার জন্য সৎদা জ্ঞাননিষ্ঠায় লাগিয়া থাকিতে ও সমাহিত হইতে বলিয়াছেন; উহা আমাদের অনুধাবন করা কর্তব্য। মনে রাখা উচিত প্রতিবন্ধযুক্ত মন্দজ্ঞান (যাবৎ প্রতিবন্ধের ক্ষয় না হয় তাৎ) মূর্ত্তি প্রদান করিতে পারে না—যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেও উহার দাহশক্তি যাবৎ মণিমস্তাদির দ্বার প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাবৎ উহা দাহকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। সাঁহারা বিচার দ্বারা তত্ত্ব অবধারণ করিয়াও বহির্মুখতা ত্যাগ না করেন, তাঁহারা

যোগস্রষ্ট হন। যদিও তাঁহাদের বর্হিমুখতা হেতু তৎকালে মৃত্যু হয় না, তথাপি তাঁহারা দূর্গতি প্রাপ্ত হন না এবং অন্য জন্মে জ্ঞানসংস্কারের উপচয়বশতঃ ক্রমশঃ প্রতিক্ষণশূন্য হইয়া দৃঢ়জ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যু হন। গৃহস্থশ্রমেও যে বেদান্তবিচার পরম কল্যাণজনক হয়, ইহা এই গ্রন্থে ‘আত্মানাত্মবিচার’ প্রবন্ধের প্রথমেই আচার্য্য শ্রীশঙ্করের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রঃ—কিন্তু লোকের উপকার না করিয়া নিজ আত্মানন্দে বিভোর থাকা তো স্বার্থপরতা !

উঃ—যতদিন প্রাণবশতঃ দেহ থাকে, ততদিন জ্ঞানী স্বভাবতঃই সর্বভূতের হিতে রত থাকেন—“তে প্রাপ্নুর্বাণীত মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ” অর্থাৎ “সর্বভূতের হিতে রত সেই জ্ঞানিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।” (গীতা ১২৪)। মনে রাখা উচিত, সম্যক্ অজ্ঞানক্ষেয়ে লোকোপকারের কথাই উঠিতে পারে না। স্বপ্ন হইতে সম্যক্ জাগ্রত পুরুষ কি স্বপ্নকালে দৃষ্ট দৃষ্টিগণের দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হন? স্নাতরাং লোকোপকারের চেষ্টা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানের কিছু জের বা অবিন্যালেশ স্বীকার করিতে হয়। যোগবাণীশ্ঠে কথিত সপ্তজ্ঞান-ভূমিকার মধ্যে চতুর্থী ভূমিকায় স্থিত জ্ঞানী কর্ম করিতে ও উপদেশাদি প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু যেমন যেমন অসংস্কৃতি, পদার্থভাবনী প্রভৃতি উচ্চ ভূমিকার আবির্ভাব হয়, জ্ঞানীর কর্ম ও উপদেশ ততই কমিয়া যায়। সপ্তম ভূমিকার জ্ঞানী কর্ম করিতে বা উপদেশাদি প্রদান করিতে পারেন না—এতদবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—“কালকৃত্যাসহঃ পূর্বং, ততো বাগিদন্তরাসহঃ। অথ চিত্তাসহন্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ” (অষ্টাবক্র-সংহিতা—বাদশ প্রকরণ ১ শ্লোক) অর্থাৎ ‘প্রথমে দৈহিক কার্য্য অসহ্য হইল, উহার পর বেশী বাক্য বলাও অসহ্য হইল, পরে চিত্তও অসহ্য হইল—আমি এইরূপেই অবস্থিত আছি।’ যোগবাণীশ্ঠও বলিলেন—“তদা ত্ৰিভুজিতগম্ভীরং ন তেজো ন

তমন্ততম্ । অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥” অর্থাৎ ‘তখন ক্রিয়ারহিত দূরবগাহ সংমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন—তিনি তেজ নহেন, অশকারও নহেন, তাহার কোন নাম নাই, বাক্য দ্বারাও তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না ।

যদিও জ্ঞানস্বরূপ আত্মার কোন ভেদ নাই, তথাপি বিক্ষেপের তারতম্যানুসারে বৃদ্ধিতে স্থিত জ্ঞাননিষ্ঠের দৃঢ়তা ও অদৃঢ়তারূপ-তারতম্য আছে—নতুবা ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিদ্বৎ, ব্রহ্মবিদ-বরীয়ান্ ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না । প্রতিবন্ধশূন্য দৃঢ় জ্ঞানই মোক্ষ—উহা ব্রহ্মস্বরূপ । সাধারণ জ্ঞানি দ্বারা লোকানুগ্রহাদি কার্য্য ভাল হয় না—উহা শক্তি ও বিভূতিসম্পন্ন আধিকারিক পুরুষগণ দ্বারা বা অবতারপুরুষগণ দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় (এ বিষয়ে আচার্য্য শ্রীশঙ্করানন্দের গীতার ৩।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । লোকোপকার দুই প্রকারে করা যায় :— (১) অর্থাৎ বা সেবাদি দ্বারা লোকের দুঃখ দূরীকরণ (২) জ্ঞানপ্রদান দ্বারা মনুষ্যগণকে সর্বদুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-প্রদর্শন । সামর্থ্য থাকিলে জ্ঞানী উভয়প্রকার লোকোপকারে স্বতঃই প্রবৃত্ত হন, কোন স্বার্থবৃদ্ধি থাকে না । অর্থাৎ বা সেবাদি দ্বারা লোকের তৎকালিক দুঃখ দূর ও উপকার করা যায়—কিন্তু এই উপকার অস্থায়ী । দ্বিতীয় প্রকার উপকারে লোকের স্থায়ী কল্যাণ করা হয় । জ্ঞানিপুরুষ জ্ঞান প্রদানকরতঃ লোকদিগকে ভগবানের ‘উপ’ অর্থাৎ সমীপে করাইয়া দিয়া উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন । জ্ঞানী যতই উচ্চ-ভূমিতে উঠেন, ততই তাহার লোকোপকারের প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায়—কারণ, তাহার নিকট এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মব্যতীত লোক বলিয়া কিছু থাকে না । তিনি নিজ দেহের এবং অপরের ভার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং আত্মকীড়-আত্মরতি ও আত্মমিথুন হন । এই অবস্থায় স্থিত জ্ঞানীর অবস্থান-প্রকারই বেদান্তের মৌলি ব্যাখ্যা এবং ইহা লোকশিক্ষার

সহায়ক হয়। ইহার ফল সুদূর-প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। ভারতের পদস্থানসমূহে এবং হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে আকাশবাতাসে বেদান্তের মৌনব্যাখ্যার সেই সুস্বাদু বাণী এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উচ্চভূমিতে স্থিত যোগিচিন্তের সুস্বাদু বোতরযন্ত্রেই কেবল উহা ধরা পড়ে। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আবার ভারতে এরূপ উচ্চকোটির মহাত্মাগণের আবির্ভাব হউক !

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ, বসুধরা পুণ্যবতী চ তেন।

অপারসিচ্চৎসুখসাগরেহস্মিন লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥”

অর্থাৎ ‘এই অপার সচ্চিদানন্দসাগররূপ পরব্রহ্মে যে জ্ঞানীর চিন্তা লীন হয় তাহার কুল পবিত্র হয়, এবং জননী কৃতার্থা হন, বসুধরা তাহার দ্বারা পুণ্যবতী হয়।’

ওঁ ব্রহ্মার্পণমহুতং

— — —

“অদ্বৈতামৃতবার্ণী” প্রথম সংস্করণ-সম্বন্ধে সুধাবর্ণের কতিপয় অভিমত :—

পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ
বাগ্‌চি তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অভিমত :

‘আমার অতি সুপরিচিত এবং আমার বিশেষ বাঞ্ছনীয় শ্রীযুক্ত অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ‘অদ্বৈতামৃতবার্ণী’ নামক পুস্তক খানা আমি আগ্রহের সহিত নিপুণভাবে এই পুস্তকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই পুস্তকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনপ্রসঙ্গে দেশেরও নানা সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। অতি সুক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি বিষয় লইয়া গ্রন্থকার অতি অপূর্ব সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গ্রন্থকার কোনও বিষয়েই শাস্ত্রীয় রীতির রেখামাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই এবং আলোচ্য বিষয়গুলি নিজে বিশেষভাবে মনন করিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। একজন বৈষ্ণবিক লোকের পক্ষে এই জাতীয় পুস্তক প্রণয়ন অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। নানা বিষয়-ক্ৰমে নিম্নলিখিত আকিরাণ্ড শাস্ত্রীয় দূরদৃষ্টি বিষয়গুলি এরূপ বিশদভাবে বর্ণিত লেখা সহজ ব্যাপার নহে। গ্রন্থকারের শাস্ত্র ও যুক্তির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। এ জাতীয় গ্রন্থ প্রায় দেখি নাই বলিলেই চলে। এই গ্রন্থপাঠে পাঠকের নিম্নলিখিত জ্ঞানাদয় হইবে ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। ৩৮৩৭-য় মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ১৬২নং বৌদ্ধজারে উৎসব সংসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সংসঙ্গে নানাবিধ ধর্মের আলোচনা হইত। এই গ্রন্থলেখক মহাশয় এই উৎসব সংসঙ্গের একজন নিয়মিত সভ্য ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর এই সংসঙ্গের আলোচনা শোনার ফলে গ্রন্থকারের মনে এই জাতীয় গ্রন্থ লেখার বাসনা হইয়াছে। গ্রন্থকারের

মার্জিত রুচিই ইহার সাক্ষী। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।
এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার যত বেশী হইবে দেশের পক্ষে ততই কল্যাণ।
ভগবচ্চরণে গ্রন্থকারের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।”

স্বাঃ মঃ মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

(অগোকাষ্টমী ৮ই চৈত্র ১৩৫৯)।

অদ্বৈতবেদান্তে সুপণ্ডিত উপনিষৎ সকলের অনুবাদক

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ গিরি (পূর্বাশ্রমে

অগ্নিযুগের শ্রীহৃষীকেশ কাজিলাল)

মহারাজের অভিমত :

‘আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূলপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়
প্রণীত “অদ্বৈতামৃতবর্ষণ” নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি পরম পরিতৃপ্তি
লাভ করিয়াছি। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি পরমানন্দরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করে। এই
অমূল্য গ্রন্থখানিতে যে সব প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের সুগভীর
চিন্তা এবং পারমার্থিক সত্যের অনুভূতি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ
গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সুনিপুণ বিচার এবং
জীব জগতের স্বরূপ, পরমানন্দ বা অমৃতত্ব লাভ করিবার সাধন এই গ্রন্থে
সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার সংঘাতঃকরণে
কামনা করি। আমার প্রিয় বঙ্গীয় যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলকেই আমি এই
গ্রন্থ হইতে নিঃসৃত অমৃতধারা পান করিতে অনুরোধ করি। ভগবানের নিকট,
প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার বন্ধুবর শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সুখ,
স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং শান্তি প্রদান করেন। ইতি”—

স্বাঃ স্বামীবিশ্বদেবানন্দ গিরি

ভোলানন্দ-সংন্যাস-আশ্রম, হরিদ্বার।

৯ই চৈত্র, ১৩৫৯ সাল।

**সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায়
শ্রীকালীপদ তর্কচাৰ্য্য মহাশয়ের
অভিযত (২১. ৪. ৫৩.)**

“সুদীৰ্ঘ দার্শনিক শ্রীযুক্ত অমূলপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “অদ্বৈতামৃতবার্ষণী” নামক দর্শনগ্রন্থ পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় প্রতিপাদন পূৰ্ব্বক প্রচলিত দার্শনিক-মতবাদসমূহ অতি শ্রদ্ধাসহকারে নিপুণভাবে আলোচনা করায় গ্রন্থখানি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার গ্রন্থনিৰ্মাণ-প্রসঙ্গে যেমন শাস্ত্রের অনুবর্তন করিয়াছেন, তেমনই নিজ নিপুণ অনুসন্ধান-শক্তির সৰ্বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থ যে শাস্ত্রপ্রণয়ী এবং অনুসন্ধানসু উভয় সমাজেরই প্রিয় ও উপকারক হইবে ইহা নিশ্চিত।

এই গ্রন্থ আলোচনায় মনে হয়, গ্রন্থকার অপূৰ্ব দার্শনিক চিন্তাশক্তি ও সাধন-প্রসূত বিভূতির অধিকারী। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে বর্তমান কালোচিত নানা বিশৃঙ্খলায় ঘোর অগাধিগ্রস্ত জনসমাজ অনেক পরিমাণে শান্তির সন্ধান পাইবে।

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,—গ্রন্থকার নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নিজ অকুণ্ঠ কর্মশক্তির বলে এই জাতীয় নানা উপদেশ গ্রন্থ নিৰ্মাণ ও প্রচার করিয়া জন-সমাজে প্রভূত উপকার সাধন করিতে থাকুন।”

স্বা :—শ্রীকালীপদ তর্কচাৰ্য্যস্য

যুগান্তর পত্রিকার অভিযত (৫. ৪. ৫৩.)

“এই পুস্তকে অনেকগুলি তত্ত্ববিচার প্রবন্ধাকারে স্থান পাইয়াছে। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য কতকগুলি বিষয় ছাড়া, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, সাধনা এবং দর্শনবিষয়ক নানাপ্রকার ‘বাদের’ সুন্দর আলোচনাও ইহাতে আছে। লেখকের মনে কোন বিশেষ মতবাদের প্রতি কোনপ্রকার পক্ষপাত স্থান পায়

নাই। বরং তাহার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেকটি মতবাদেই উপযোগিতা আছে—
বিশেষতঃ অদ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে দ্বৈত মতাবলম্বন উপায়স্বরূপ।
সুতরাং একের সহিত অন্যের সম্পর্ক বিরোধের নহে, পরিপূরকের। তিনি
প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের জন্য কেবল শাস্ত্রগ্রন্থের উপর নির্ভর করেন নাই,
সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাদ্বারাও অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এই
বইখানিকে শুধু বিদ্যার আলোচনা বলিলে বোধ হয় অন্যায় করা হইবে। ইহার
মূল্য তাহা অপেক্ষাও হয়ত কিছু বেশী।”

অদ্বৈত-বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নেপালের রাজ-কলেজের

ইংরাজী সাহিত্যের ভূত-পূর্ব অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীচন্দ্র

চক্রবর্তী এম এ. (এখন D.Lit) মহাশয়ের

অভিমত :—

* * * * * সংক্ষেপে ও আনন্দস্বরূপ ভাষার বিচার “অদ্বৈতামৃতবার্ষিনী”
গ্রন্থে সুন্দররূপে করা হইয়াছে। প্রমান সম্বন্ধেও বহু সম্বন্ধ বিষয় ইহাতে
উল্লিখিত হইয়াছে। চিন্তাশীল গ্রন্থকার অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক ভ্রমের
নিরসন করিয়া অদ্বৈতমार्গ সরল, সরস ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাংলাদেশে
এইরূপ গ্রন্থরঞ্জের যত প্রচার হইবে ততই দেশের ও দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত
হইবে।”.....

অমৃতবাজার পত্রিকার অভিমত :—(৩, ৫, ৫৩)

ADVAITAMRITA-VARSHINI: By Amulapada Chattyo-
padhyaya. In Bengali Published by the author from
14/3C Balaram Basu Ghat Road, Calcutta-25. Pages
272 Rs. 2-8.

Even though the author believes in non-dualism, he
asserts that one should begin with dualism and then ascend
higher and higher along the path to the realization of the
Ultimate who is One, even though the different preachers and
prophets may call the ONE by numerous names. The author
is a well read scholar and his erudite contribution will help
many to obtain the answers to their spiritual queries.

(R 8416)

কুবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক
(গরে ইনি প্রধান শিক্ষক হন) শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ মহাশয়ের
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অভিমত :—(২২, ৬, ৫৩)

“মহাশয় ! আপনি আমাকে যে “অদ্বৈতামৃতবিশিণী” গ্রন্থখানি উপহার দিয়া-
ছিলেন, তাহা আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি ; উহা পাঠ করিয়া যে
আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয় । উহা এত সরল ভাষায়
লিখিত এবং কঠিন বিষয়গুলি এরূপ সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে
সাধারণ পাঠকের খুবই উপকার হইয়াছে । এরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই
আছে, নাই বলা চলে । আমি বেদান্তের সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী বহুগ্রন্থ পাঠ
করিয়াছি । দৃ একটি বিষয়ে আমার যে সন্দেহ ছিল, আপনার গ্রন্থপাঠে তাহা
দূরীভূত হইয়াছে । ইহার জন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ।”

স্বাঃ শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, গুরুদ্বাপ পোঃ হুগলী ।

উদ্বোধন পত্রিকার অভিমত :—(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০)

... ..”বইটি অদ্বৈতবাদকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তের বিবিধ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের
সংকলন । জটিল দার্শনিক সমস্যাসমূহের সরল ব্যাখ্যা লেখকের চিত্তাশীল
সূক্ষ্ম মনের পরিচয় দেয় । ‘আনন্দ’ প্রবন্ধটী সত্যই আনন্দদায়ক । সম্প্রদায়
নির্বিশেষে ধর্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট বইটী সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই । শেষের
দিকে লেখকের ভারতীয় দার্শনিক-চিত্তার বিভিন্ন ভাবধারার সারাংশটিও উপ-
ভোগ্য ।”

আনন্দবাজার পত্রিকার অভিনত :—(২৮, ৬, ৫৩)

“গ্রন্থখানি আদ্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রথমে বিশেষভাবে
এই কথাটাই অলিঙ্গিত পাঠকের মনে হইবে যে, লেখক শৃঙ্খল বহু শাস্ত্রই অবগত

করেন নাই, তিনি সাধু ও মহাপুরুষেরও সেবা করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের
মুখ হইতেই তিনি বেদান্ত প্রবণ করিয়াছেন, তদুপরি সূয়ং বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছেন এবং সম্বশেষে সূয়ং অধীত ও শ্রুত বিষয়ের দীর্ঘ মনন করিয়াছেন,
তাহারই ফলে এমন একখানি গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। অদ্বৈতবাদ
এবং তত্ত্বের ন্যায় এমন একটী দূরদূর ও গভীর বিষয়কে এমন সহজবোধ্যভাবে
বুঝানো বস্তুতঃ দুর্লভ শক্তির পরিচায়ক। শ্রম্বেয় গ্রন্থকারের বলায় ভঙ্গীটি
এমনই নিজস্ব ও অপূর্ব যে, বহুপরিচিত কথাও চেতনায় নতুন হইয়া দেখা দেয়।
ইহা গ্রন্থকারের সাধক চরিত্রেরই লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানি সম্বশেষে
অকুণ্ঠচিত্তেই বলা খাইতে পারে যে, এমন পুস্তক খুব সচরাচর দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থ-
কারের শ্রম সার্থক হইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যে তিনি একখানি অমূল্য গ্রন্থই
উপহার দিয়াছেন। যদিও গ্রন্থে অদ্বৈত সিংধাত স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি অদ্বৈত
রাজ্যে উঠিবার সোপানস্বরূপ নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত
হইয়াছে। ফল কথা, এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের
প্রয়োজনীয় জ্ঞাতবাই সংক্ষেপে পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন। ভারতীয়
দার্শনিক বিভিন্ন চিন্তাধারার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু গ্রন্থের উপসংহারে প্রদত্ত
হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই উপাদেয়। সম্মতিঃকরণে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার
কামনা করি। ”